বিদেশিনী

পাশ্চাত্ত্য প্রেমের গল্পের সংকলন

মীনাক্ষী দত্ত সম্পাদিত

নতুন সাহিত্য ভবন :: কলিকাতা-২০

প্রকাশক
সুশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
গ্রন্থক
সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৯৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
চিত্র ও প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৭

ভূমিকা

যে-চব্বিশজন পাশ্চাত্ত্য লেখকের গল্প এই সংকলনে একত্রিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম উনিশ শতকে। ঐ শতক ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ। আজকে ছোটোগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, বস্তুত, উনিশ শতকের আগে তার অস্তিত্ব ছিলো না। আর যতই আমরা বিশ শতকের দিকে অগ্রসর হই ততই লক্ষ করি ছোটোগল্পের আকার ও চরিত্র বদলে যাচ্ছে। ছোটোগল্প, এই শতকে, হয় গল্পের ছদ্মবেশধারী প্রবন্ধে পরিণত হয়েছে, নয়তো গদ্য-কবিতায়—যার মধ্যে কোনো ঘটনা নেই, নায়ক নেই, বাস্তবানুগ কোনো চরিত্রও এমনকি নেই।

অন্যদিকে, উনিশ শতকের ছোটোগল্পে ঘটনার নাটকীয়তা আছে, স্বাভাবিক চরিত্র আছে, এবং সব মিলিয়ে জীবনের এক বাস্তব ছবিও সে-যুগের গল্পে পাওয়া যায়। অথবা, এমন এক ছবি পাওয়া যায় যা হুবহু জীবনের মতো না-হ'লেও বিশ্বাস্য, এমনকি পরিচিত, ব'লে বোধ হয়। নির্জলা বাস্তবতার স্থান নেই সাহিত্যে; লেখকমাত্রেই কল্পনা মিশিয়ে জীবনকে সরস করেন। উনিশ শতকের লেখকরাও—যেহেতু তাঁরা সাংবাদিক নন, সাহিত্যিক—জীবনকে সাহিত্যের কাঁচামাল হিশেবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য যুগের লেখকদের তফাত এই যে তাঁদের গল্পের বিষয়বস্তু সমাজবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবন; যাঁরা অলৌকিক কিংবা অবিশ্বাস্যকে গল্পে স্থান দিয়েছেন, তাঁদেরও রচনাভঙ্গি বাস্তবধর্মী। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বাস্তব চরিত্র-চিত্রণের সাহায্যে তাঁরা এমন এক স্বাভাবিকতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতেন—যেমন এই গ্রন্থভুক্ত 'মরু-কুসুম' গল্পে করেছেন ফরাশি লেখক বালজাক—যে তাতে পাঠকের মনে কোনো অবিশ্বাস থাকতো না।

অন্যদিকে, উনিশ শতকের আগে অলৌকিককে মানুষ অনায়াসেই মেনে নিয়েছে, আর বর্তমান যুগে সাধারণ ঘটনাও হ'য়ে উঠেছে অলৌকিক। অর্থাৎ গত শতাব্দী, কেবল ছোটোগল্পেরই নয়, সাহিত্যে বাস্তববাদেরও স্বর্ণযুগ।

তাহ'লে তাঁদের লেখা গল্পে কী অর্থে 'ঘটনার নাটকীয়তা' আছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি নিহিত। এই গ্রন্থের প্রথম লেখক হোফমানের গল্পে আছে অলৌকিক ও নাটকীয় ঘটনা, আর মোপাসাঁ কি ও. হেনরির গল্পে আছে

সাধারণ, দৈনন্দিন ঘটনার নাটকীয়তা। মোপাসাঁর গল্পে প্রবহমান জীবনের এমন একটি মুহূর্ত চিত্রিত হয় যখন ঘটনার স্রোত হঠাৎ বাঁক নিয়ে অভাবনীয়ের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তাঁর গল্পের ঘটনাবলী আমাদের অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয় না, বরং আমরা ব'লে উঠি: 'ঠিক, ঠিক, জীবনেও ঠিক এইরকম ঘটে। জীবনও এইরকম বিচিত্র; জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাও এমনি অভাবনীয়।' অর্থাৎ আমাদের মনে হয় লেখক রহস্যময় কিছু উদ্ভাবন করছেন না, আসলে যেন জীবনের রহস্যকেই উদ্‌ঘাটন করছেন।

উনিশ শতকের ছোটোগল্পের আবেদন যে এমন সার্বজনীন তার কারণ জীবনের সঙ্গে তার যোগ একই সঙ্গে গভীর ও আপতিক, আর বিশ শতকের ছোটো-গল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক প্রতীকী, বা সাংকেতিক; একালে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর পাঠকের কাছে আদর বাড়লেও ছোটোগল্পের জনপ্রিয়তা চ'লে গেছে; পাশ্চাত্ত্য দেশে, আধুনিক কবিতার মতো, ছোটোগল্পও হ'য়ে উঠেছে জটিল, নিগূঢ় ও কূট রহস্যময়। অতি সামান্য কিছুকালের জন্য, মাত্র উনিশ শতকে, ছোটোগল্প একযোগে উত্তম সাহিত্যের আধার ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলো। 'বিদেশিনী'র পাঠক হয়তো এই গ্রন্থ থেকে ছোটোগল্প নামক এই কৃশকায়, চিত্তাকর্ষক ও ক্ষীণায়ু ব্যক্তিটির উত্থানপতনের ইতিহাস অনুমান ক'রে নিতে পারবেন।

কিন্তু, আশা করি, ছোটোগল্পের ইতিহাসে যাঁরা কৌতূহলী নন 'বিদেশিনী' তাঁদেরও মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে। 'বিদেশিনী'তে আছে একুশটি ছোটো গল্প ও তিনটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস। এইসব গল্প রচিত হয়েছে বিচিত্র কৌশল, বিভিন্ন উপাদান ও বহুবিধ উপায়ে। ছোটোগল্পের পাঠকের সংখ্যা, সৌভাগ্য-বশত, আমাদের দেশে এখনো নিতান্ত নগণ্য নয়। যাঁরা ছোটোগল্পের অনুরাগী পাঠক তাঁরা পাশ্চাত্ত্য লেখকদের উদ্ভাবনী শক্তি দেখে বিস্মিত না-হ'য়ে পারবেন না।

ভিন্নতা সত্ত্বেও এই চব্বিশটি গল্প ও উপন্যাস যে-সূত্রে একত্র গ্রথিত হয়েছে তা হ'লো প্রেম। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়বস্তুই প্রেম। 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে' বলছি এইজন্য যে এই গ্রন্থে এমন দু'একটি গল্প নেয়া হয়েছে যাতে প্রেমকে প্রেম ব'লে চেনা যায় না—বরং যে-অনুভূতিটি

নায়ক বা নায়িকার মনের উপরিতলায় বর্তমান, তা যেন ঘৃণা কি আক্রোশের কাছাকাছি। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রণীত 'ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বারের ক্ষণসুখের জীবন' গল্পটিতে ঘৃণা ও আক্রোশের দ্বারা তাড়িত চরিত্রগুলির স্বাভাবিক অনুভূতি বিকৃত হ'য়ে গেছে। যেমন কোনো বীজের অঙ্কুর আলো-বাতাসের অভাবে বেঁকেচুরে বেড়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই অনেক অনুভূতি—যা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রেমে পরিণত হ'তো—বিকারে পরিণত হয়েছে।

প্রেম নামক এই অনুভূতিটি তাহ'লে কী? যে-প্রেমের প্রভাবে সারা জগতের মানবকুল চালিত হয় তার আসল রূপটি কী? প্রেম আকর্ষণ, না বিকর্ষণ? স্বার্থপর, না উদার? সুন্দর, না কুৎসিত?

এর প্রত্যেকটির উত্তরেই হ্যাঁ বলা যায়। প্রেম কখনো কাছে টানে, কখনো দূরে ঠেলে দেয়। 'মরণের নৃত্য' নামক যে-ভাস্কর্য বোদলেয়রকে মুগ্ধ করেছিলো, যে অর্ধেক তরুণী আর অর্ধেক কঙ্কাল, সে-ই প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। কারণ তারই মতো প্রেমের এক হাতে ধরা আছে জীবন ও আরেক হাতে আছে মৃত্যু। খ্রীষ্টীয় পুরাণের মতে, ঈশ্বর তখনি নারীর মনে লজ্জা ও কাম এবং শরীরে সন্তানধারণের ক্ষমতা দিলেন যখন সে অমরতা হারালো। প্রেম ও মৃত্যু আছে ব'লেই জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব; একটি ছাড়া, প্রকৃতির আইনে, অন্যটি অচল।

অর্থাৎ মানুষের জীবনে প্রেমের স্থান এক সন্ধিক্ষণে। নারী ও পুরুষ একত্র মিলিত হ'য়ে যে-মুহূর্তে এক নতুন প্রাণের জন্ম দেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা জীবনের প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে স'রে যান; তাঁরা জীবনের রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে থেকে স'রে আসেন। এবং তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করে নতুন আরেক পুরুষ। এমনিভাবেই চাকা ঘোরে জীবনের, এবং সেই চক্রের উত্থানের শীর্ষমুহূর্তে অবস্থিত প্রেম—যারপরেই ঘটে অধঃপাত…

'আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ: এই দেহ ম্রিয়মাণ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ

ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর, থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।*

এবং, শুধু মানুষের জীবনে নয়, প্রেমের স্থান শরীরেরও এক সন্ধিস্থলে। এবং বোদলেয়র লক্ষ করেছিলেন যে শিশুর পবিত্র প্রাণ এমন এক দ্বার দিয়ে তার মাতার শরীরে প্রবেশ করে যে-পথে জননীর দেহের ক্লেদ নির্গত হয়।

এমনি ভাবেই প্রেমের মধ্যে যা পরম ও যা নিতান্তই দৈহিক, সুন্দর ও কুৎসিত, অমল ও মলিন, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, স্বার্থপরতা ও আত্মসমর্পণ একই সঙ্গে বিরাজমান। এক সঙ্গে, না ভিন্ন-ভিন্ন মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভাবে? সবাই কি নিজেকে সমর্পণ করতে চান, নাকি কেউ-কেউ শুধু গ্রহণই করেন? এই প্রশ্নের ভয়ানক এক উত্তর দিয়েছেন ব্লেক :

"'Love seeketh not Itself to please
'Nor for itself hath any care,
'But for another gives its ease
'And builds a Heaven in Hell's despair.'

So sang a little clod of clay
Trodden with the cattle's feet
But a pebble of the brook
Warbled out these metres meet.

'Love seeketh only Self to please,
'To bind another to Its delight,

---

* যে-আঁধার আলোর অধিক : বুদ্ধদেব বসু।

'Joys in another's loss of ease
'And builds a Hell in Heaven's despite.' "

এই কবিতাটি পড়ার পরে এক গভীর সংশয়ে পাঠকের মন আক্রান্ত হয়। প্রেম যদি সত্যিই এমন দুই বিপরীত শক্তি, তবে তাকে শান্ত করার উপায় কী? এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র মানবহৃদয়: কাজেই এদের মধ্যে, মিলন না-হোক, সন্ধি স্থাপন প্রয়োজন। প্লেটোর কথা যদি সত্যি হয় তাহ'লে এক নিরক্ষর মেষপালিকা প্রেমের এমন এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যার মধ্যে এই সমন্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

"…'প্রেমের জন্ম কার ঔরসে,' প্রশ্ন করলাম আমি; 'যে-ইতিহাস তুমি জানতে ইচ্ছুক, তা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ,' বললেন দিওতিমা, 'এতৎসত্ত্বেও এ-রহস্য আমি ব্যাখ্যা করছি। দেবী ভিনাসের জন্ম উপলক্ষে দেবগণ এক মহান উৎসব পালন করেন; উৎসবকারীদের একজন ছিলেন মেটিস-নন্দন। ভোজের প্রতুলতা দর্শন ক'রে, ভিক্ষার আশায়, দারিদ্র্য দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো যখন রাত্রের আহার শেষ হয়েছে। বেরিয়ে এলেন প্রাচুর্যদেব, সোমরস পানের ফলে মত্ত—তখনো সুরা আবিষ্কৃত হয় নি—এবং জুপিটরের উদ্যানে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। দারিদ্র্য, তার হীনাবস্থা মোচনার্থে, প্রাচুর্যের ঔরসে সন্তান কামনা করলো, শায়িত হ'লো দেবতার পাশে এবং তাঁর আলিঙ্গনে গর্ভে ধারণ করলো প্রেম। প্রেম ভিনাসের অনুবর্তী ও সেবক, যেহেতু ঐ দেবীর জন্মক্ষণে তার উৎপত্তি এবং যেহেতু ভিনাস সৌন্দর্যের আকর, সে স্বভাবতই সৌন্দর্য-প্রেমিক, আর প্রেম যেহেতু দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের সন্তান, তাই উভয়েরই স্বভাব ও ভাগ্যের অংশ পেয়েছে সে। প্রেম চিরজীবন দরিদ্র, এবং কোমল ও সুন্দর তো সে নয়ই—যদিও মানুষ প্রেমকে ঐ রূপেই কল্পনা করে—আসলে সে কুৎসিত ও কুঞ্চিত। সে গৃহহীন, তার চরণ অনাবৃত, প্রায় ভূমিস্পর্শী তার উড্ডয়ন; মুক্ত পথে কিংবা দ্বারপ্রান্তে আচ্ছাদন বিনা সে শয়ন করে এবং তার মাতার চরিত্রের অংশীদার ব'লে অভাব তার নিত্যসহচর। কিন্তু যেহেতু সে তার পিতার স্বভাবেরও অংশ পেয়েছে, তাই সে সর্বদাই যা-কিছু সুন্দর ও শুভ তা করায়ত্ত করার চক্রান্তে রত; সে অশ্রুহীন,

উদ্দাম ও বলীয়ান। প্রেম এক নিদারুণ ব্যাধ, নিত্য নতুন পাশ বুনন করছে, উপরন্তু সে অতি সাবধানী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচক এবং বিচিত্র উদ্ভাবন ক্ষমতার অধিকারী: তাছাড়া, সে তার জীবনের সর্বাবস্থায় একজন দার্শনিক, শক্তিমান ঐন্দ্রজালিক, ঘোর জাদুকর এবং কূট তার্কিক।'…"

এই সংকলন কোনো 'শ্রেষ্ঠ' গল্পের সমষ্টি নয়। প্রত্যেক লেখকের 'শ্রেষ্ঠ' রচনা নির্বাচন করার চেষ্টা আমি করি নি; আমি চেষ্টা করেছি বিচিত্র স্বাদের গল্প সংগ্রহ করতে; এবং কয়েকজন নগণ্য লেখকের রচনাকেও স্থান দিয়েছি শুধু নৈপুণ্য ও অনুবাদগুণের জন্য। 'শ্রেষ্ঠ রচনা' নির্বাচনে প্রয়াসী হই নি, তার কারণ রচনার শ্রেষ্ঠত্ব নিক্তিতে ওজন করা যায় না এবং সে-চেষ্টা করাও ধৃষ্টতা। বৈচিত্র্যের অন্বেষণ করেছি, তার কারণ বিষয় এক ব'লে একঘেয়েমির আশঙ্কা ছিলো। এবং অনুবাদযোগ্যতার প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করেছি এই হেতু যে যদিও এটি বিদেশী গল্পের সংকলন, 'বিদেশিনী' তবু বাংলা ভাষারই বই; প্রত্যেকটি গল্প যাতে বেশ তরতর ক'রে বাংলায় পড়া যায়, এই ছিলো আমার লক্ষ্য।

অবশ্য সুপাঠ্য করার জন্য অর্থের মুণ্ডপাত যাতে না-হয় সে-বিষয়ে সতর্ক ছিলাম। কিন্তু প্রধানত ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে ব'লে কখনো-শখনো হয়তো মূলের অর্থ অবিকল থাকে নি। এটুকু বলা চলে যে প্রত্যেকটি গল্পের 'অনুবাদের' চেষ্টা করেছি আমরা, 'ভাবানুবাদ' করি নি—যা আমাদের দেশের অনেক অনুবাদকই ক'রে থাকেন। অনেকেই সুখপাঠ্য করতে গিয়ে মূলের অনেক অংশ বর্জন করেন, কিংবা সারাংশটি নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন। যথাসম্ভব বিশ্বস্ত ও মূলানুগ রাখার চেষ্টা করেছি আমরা।

স্বীকার করি যে এই আদর্শ রক্ষা করতে সর্বত্র সক্ষম হই নি। কিন্তু সম্পাদকের অক্ষমতা আরো স্পষ্ট হ'য়ে পাঠকের নজরে পড়তো যদি না ফাদার পিয়ের ফালোঁ আমাকে সাহায্য করতেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁদের কাছে আমার ঋণের বোঝা সব চাইতে ভারি তাঁরা হলেন সত্রাজিৎ দত্ত, সুবীর রায়চৌধুরী ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি পদক্ষেপে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন। বস্তুত, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য বিনা এই সংকলন প্রকাশ সম্ভব হ'তো না। বই-এর প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা রচনা

করেছেন পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী। আর প্রুফ দেখে দিয়েছেন বিমান সিংহ। শুদ্ধশীল বসু, সুভদ্রা চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা সোম এবং প্রণবকুমার সেনগুপ্ত অনুবাদের অনুলিপি প্রস্তুত করেছেন। পিরানদেল্লো ও লরেন্সের গল্প দু'টি সিগনেট প্রেস-এর শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত-র সৌজন্যে মুদ্রিত। এঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর জানাই অনিলকুমার সিংহকে, যিনি এই সংকলনের আদিতে উৎসাহ ও শেষ দিকে তাগাদা দিয়ে মুদ্রণ ত্বরান্বিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের তালিকা যদিও দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে, তবুও কুণ্ঠিলতার অপরাধ স্খালনের জন্য আরেকটি স্বীকারোক্তি প্রয়োজন : 'বিদেশিনী' বুদ্ধদেব বসুর একটি কাব্যগ্রন্থেরও নাম ; এই নামটি সেখান থেকেই আহৃত।

১লা বৈশাখ ১৩৬৭ মীনাক্ষী দত্ত

কলকাতা

সূচিপত্র

বিদেশিনী



ছায়াহারা

এর্নস্ট্ থিয়োডর আমাডিয়ুস হোফমান

চিরকাল ধ'রে এরাজ়মুস স্পিক্কের মনে-মনে যে-অভিলাষ লালন ক'রে এসেছিলো, অবশেষে তা পূর্ণ করার সময় এলো একদিন। থলিভর্তি টাকা সঙ্গে নিয়ে উৎফুল্লভাবে সে উঠে বসলো কোচবাক্সে; উত্তর-দেশের এই গৃহকোণ ছেড়ে উষ্ণ সুন্দর ঝলমলে ইতালিতে যাবে সে এতদিনে। স্ত্রী অবশ্য অপর্যাপ্ত চোখের জল ফেললো; অত্যন্ত ভালো-মানুষ তার স্ত্রী, তার প্রিয়জন; শেষটায় ছোট্ট 'রাজ়মুসের নাকমুখ ভালো ক'রে মুছিয়ে দিয়ে কোচবাক্সে তাকে বাপের কাছে তুলে দিলো বিদায়চুম্বনের জন্য। 'তাহ'লে এসো, এরাজ়মুস স্পিক্কের, প্রিয় আমার,' কথা বলার সময় স্ত্রীর গলা ধ'রে এলো, 'ঘরবাড়ির তদারকি আমিই করবো—ভালোভাবেই তা করতে পারবো ব'লে আশা করি। তুমি কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার কথা মনে কোরো, খাঁটি থেকো কিন্তু আমার কাছে বিশ্বস্ত, আর আন্তরিক। আর, হ্যাঁ, ভালো কথা; তোমার তো আবার গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা বের ক'রে লোকজনকে অভিবাদন করার অভ্যেস—খেয়াল রেখো যাতে তোমার ওই বেড়াবার টুপিটা—ভারি সুন্দর টুপিটা, না? —যেন আবার হারিয়ে না-যায়।' স্পিক্কের তাকে সব প্রতিশ্রুতি দিলো।

ঝলমলে ফ্লোরেন্সে পৌঁছোবার পর স্বদেশীয় কয়েকজন তরুণের সঙ্গে দেখা হ'লো এরাজ্‌মুসের; সেই আশ্চর্য দেশের যাবতীয় সজীবতা ও ফুর্তিই তারা অবাধে ও পূর্ণোদ্যমে উপভোগ করছে। সে যে তাদেরই একজন অতিশয় ফুর্তিবাজ সঙ্গী, এটা সে অচিরেই প্রমাণ ক'রে দিলে; পান-ভোজন আমোদ প্রমোদের যতরকম ব্যবস্থা করা যায়, সবই হ'লো; উপরন্তু স্পিক্রের প্রাণময়তা ছিলো প্রবল, আর প্রচণ্ড ফুর্তির মধ্যেও কী ভাবে মেধা ও চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তোলা যায়, সে-বিষয়ে এক আশ্চর্য প্রতিভা ছিলো তার; ফলে প্রতিটি অনুষ্ঠানই যেমন বিশিষ্ট হ'তো, তেমনি তাতে বিনোদেরও কোনো অন্ত থাকতো না। একদিন রাত্রে তাই এই তরুণেরা (এরাজ্‌মুসের বয়স যেহেতু সাতাশের কিছুমাত্র বেশি নয়, তাই তাকেও তাদেরই অন্যতম ব'লেই গ্রহণ করা উচিত) সুগন্ধি এক প্রমোদবীথিকায় এমনি এক আনন্দবাজার বসিয়েছিলো। শুধু এরাজ্‌মুস ছাড়া বাকি সকলেই সঙ্গে একজন ক'রে রূপসী তরুণী নিয়ে এসেছিলো। পুরুষদের পরনে ছিলো পুরোনো ধাঁচের আলেমান পোশাকের আদ্যোপান্ত, আর মেয়েরা সেজেছিলো উজ্জ্বল ও ঝকমকে বসনে। প্রত্যেকের ছদ্মবেশই কাল্পনিক ও আজগবি, এবং কেউই অন্যের অনুকরণ করে নি—প্রত্যেকেই সেজেছে আলাদাভাবে; যখন তারা আবির্ভূতা হ'লো মনে হ'লো যেন মনোরম কতগুলি মায়াবী ফুল। প্রথমে হয়তো কোনো তরুণী কোনো-একটি ইতালিয়ান প্রেমের গান গাইতে শুরু ক'রে দিলে—সঙ্গে ফিশফিশ বাজছে ম্যাণ্ডোলিন; তারপরে সেটা শেষ হ'তে-না-হ'তেই হয়তো আরেকজন একটি নতুন গান শুরু ক'রে দিলে; আর তারই সঙ্গে সাইরাকুজের সুরাভর্তি পানপাত্র ঠুনঠুন ক'রে বাজিয়ে পুরুষেরা তার জবাবে উদ্দীপ্ত আলেমান উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলো। কারণ প্রেমের দেশ যদি কাউকে বলে তো সে এই ইতালি। তরুণীরা যখন ঠাট্টা কৌতুক আর বিনোদে-ভরা দুষ্টুমি শুরু করলে—বলাই বাহুল্য, এমন সব ফন্দি কেবল ইতালির মেয়েদেরই মাথায় আসে, কেননা অর্থহীন যত লালিত্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি আছে সবই তো তাদের নখদর্পণে—তখন গোধূলির হাওয়া এমনভাবে মর্মর তুলে ব'য়ে গেলো মনে হ'লো যেন তা বাসনায় বিধুর ও ভারাতুর হ'য়ে আছে; লেবুগাছের গন্ধ এলো সেই সঙ্গে, গন্ধ এলো জুঁই ফুলের, ঝোপঝাড় লতাপাতায় তা যেন প্রণয়েরই কোনো মধুর আবেশের মতো ঝিম ধরিয়ে গেলো। দলের ভিতরে সবচেয়ে সংরক্ত ছিলো ফ্রেডেরিক। এক

হাতে তার প্রেমিকার কটিদেশ জড়িয়ে ধ'রে শেষকালে সে উঠে দাঁড়ালো, তার অন্য হাতে ফেনিল সাইরাকুজ়-ভর্তি পানপাত্র তুলে-ধরা; চেঁচিয়ে বললে, 'ওগো ইতালির রূপসীরা, স্বর্গসুখ যদি তোমাদের কাছেই না-মেলে তবে তা আর কোথায় মিলবে, কারণ তোমরাই তো মূর্তিমতী প্রেম। কিন্তু তুমি,' স্পিক্কেরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে, 'তুমি দেখছি কিছুতেই অভিভূত বা বিহ্বল হচ্ছো না—তোমার যে কোনো বোধ আছে, কিংবা সংবেদনা, তা-ই তো কিছুতেই মনে হয় না। কারণ তুমি যে কেবল আমাদের শর্তকেই অবহেলা করেছো, তা নয়—এমনকি আমাদের রীতি ও দস্তুরকে পর্যন্ত অমান্য করেছো তুমি: কোনো মহিলাকেই তুমি এই ভোজসভায় আমন্ত্রণ করো নি। তার উপর আজ তোমাকে এমন বিষণ্ণ আর আনমনা দেখছি যে আজ যদি তুমি কোনো মনুষ্যসন্তানের মতো পানাহার না-করতে কিংবা গান না-গাইতে তো আমার তো তোমাকে অসহ্য এক বিষাদগ্রস্ত ছাড়া আর-কিছুই মনে হ'তো না।'

'এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমরা যেভাবে ফুর্তি করো, আমি কিছুতেই সেভাবে নিজেকে উপভোগ করতে পারি না,' এরাজ়মুস উত্তর দিলে। 'তুমি তো জানোই, ফ্রেডেরিক, ঘরে আমার ভালোমানুষ বউ আছে, তাছাড়া অন্তরের একেবারে অন্তঃস্তল থেকে তাকে আমি ভালোবাসি। এই অবস্থায় যদি একদিনও সন্ধেবেলায় এখানকার কোনো রূপসীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করি তাহ'লে এতে যে তার প্রতি অবিচার করা হয়, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তোমরা কেউ বিয়ে করো নি, তোমাদের কথা আলাদা; কিন্তু আমি হলাম একটি পরিবারের প্রধান, যাকে বলে সর্বময় কর্তা, তা-ই; তাছাড়া আমার ছেলে আছে।'

এ-কথা শুনে যুবকেরা সবাই চেঁচিয়ে হেসে উঠলো। কারণ 'পরিবারের প্রধান' কথাটা ঘোষণা করার সময় এরাজ়মুস তার সুশ্রী ও তরুণ চোখমুখ এমনভাবে কুঁচকে ভাঁজ ফেলে নকল গাম্ভীর্যে ভারিক্কি ও রাশভারি ক'রে তোলার প্রয়াস পেলো, যার ফলে তাকে দেখালো ঠিক এক বিদূষকের মতো। এরাজ়মুস উত্তর দিয়েছিলো আলেমান ভাষায়; ফ্রেডেরিকের বন্ধুনির অনুরোধে তা যখন ইতালিয়ানে তর্জমা ক'রে দেয়া হ'লো, তখন সে তার দিকে ফিরে খুব গম্ভীর ভঙ্গি ক'রে, কোমলভাবে তাকে সাবধান ক'রে, একটা আঙুল উঁচিয়ে বললো, 'বড়ো নিঃসাড় তুমি, জর্মান, বড়ো বেশি ঠাণ্ডা!

কিন্তু সাবধান থেকো, সাবধান। এখনো তো জোলিয়েত্তাকে তুমি চোখে দ্যাখো নি!'

ঠিক সেই মুহূর্তে বীথিকার দুয়ারের কাছে রেশমি কাপড়ের খশখশে শব্দ উঠলো, আর তার পরেই রাতের কালো অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে দেখা দিলো আশ্চর্যসুন্দর এক রূপসী! তার শুভ্র পোশাকের মধ্য থেকে অর্ধস্ফুটভাবে উন্মোচিত হ'য়ে আছে স্তন, গ্রীবা আর কাঁধ; কনুইয়ের কাছে জামার হাতা ফুলে আছে; ঘাগরার কুঞ্চিত প্রান্তদেশ লুটিয়ে আছে মাটিতে—অসংখ্য ভাঁজ তার, আর খুব চওড়া। কপালের কাছে কেশগুচ্ছ ভাগ করা, কয়েকটি বিনুনি ক'রে পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে মস্ত একটি খোঁপা বসানো; আর এই কুমারীর পুরোনো ধরনের জাঁকজমককে সম্পূর্ণ করার জন্যই গলায় আছে সোনার হার, আর কব্জিতে দামি-দামি বালা। যেন রুবেন্স কিংবা সেই উপভোগ্য শিল্পী ভ্যান ডের মের-এর কোনো ছবির মধ্য থেকে এই মেয়েটি বেরিয়ে এলো।

'জোলিয়েত্তা!' মেয়েরা সবাই আশ্চর্য হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

অপ্সরীর মতো রূপসী জোলিয়েত্তা, অন্যদের চেয়েও ঢের ঝলমলে ও দীপ্তিময় তার রূপ; এখন সে যখন কথা বললো, মনে হ'লো তার কণ্ঠস্বরও বুঝি মধুরতম: 'তোমাদের উৎসবে আমাকেও অংশ নিতে দাও—কী গো, জর্মান তরুণেরা, দেবে না? আমি বরং ওই বিষণ্ণ একলা ও প্রেমহীন যুবকটির সঙ্গে গিয়ে যোগ দিই!'

এই ব'লে এরাজ্‌মুসের দিকে তাকিয়ে মোহিনীর মতো স্মিত হাসলো। ঠিক ছিলো: এরাজ্‌মুসও সঙ্গে কোনো মেয়ে নিয়ে আসবে, তাই তার পাশেই একটা আসন খালি প'ড়ে ছিলো; আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঠিক ওই আসনটিতেই সে ব'সে পড়লো। তাকে দেখে মেয়েরা ফিশফিশ ক'রে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে: 'এই, দেখেছিস, জোলিয়েত্তা ঠিক আগের মতোই রূপসী আছে!' আর যুবকেরা সবাই বলাবলি করলো, 'সুন্দরীতমাটিকে জিতে নেবার পরেও এরাজ্‌মুস যে এখনো ভুরু কুঁচকে আছে, তার কারণটা কী? কী হ'লো তবে ওর?'

এরাজ্‌মুস কিন্তু জোলিয়েত্তার দিকে প্রথমবার তাকাবার পর থেকেই এমন অসাধারণভাবে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো যে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কিসে তাকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিলে। সে যখন কাছে এসে বসলো,

তখন অলৌকিক কোনো শক্তি তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে নিলো যেন, এমন এক বিষম ভারের মতো তা তার বুকের উপর চেপে বসতে চাইলো যে তার যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে যেতে চাইলো, যেন হঠাৎ তার নিশ্বাস ফেলার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। মেয়েটির দিকে অনিমেষে তাকিয়ে সে ব'সে রইলো, অবশ হ'য়ে গেছে তার ঠোঁট, কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত বিলুপ্ত, যার ফলে অন্যরা যখন জোলিয়েত্তার রূপলাবণ্যের প্রশংসায় মুখর ও উন্মুখর হ'য়ে উঠলো, সে তখন একটি কথাও বলতে পারলে না! কানায়-কানায় ভরা একটি সুরাপাত্র হাতে নিয়ে জোলিয়েত্তা তারপর উঠে দাঁড়ালো, বন্ধুর মতো তা বাড়িয়ে ধরলে তার দিকে; গেলাশটিকে যখন আঁকড়ে ধরলো এরাজ়মুস তখন কী ক'রে যেন মেয়েটির নরম হাতের স্পর্শ লাগলো তার হাতে, নিঃশেষ ক'রে ফেললো সে গেলাশ, আর অমনি তার শিরায়-শিরায় যেন আগুন ছুটে গেলো। 'কী? আমাকে তোমার সঙ্গিনী করবে তো?' হাল্কাভাবেই তাকে জিগেস করলে জোলিয়েত্তা। কিন্তু এরাজ়মুস যেন পাগল হ'য়ে গেছে ততক্ষণে: তার সামনে সে ব'সে পড়লো নতজানু, দুই হাতে বুক চেপে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো: 'তুমি, তুমি, হ্যাঁ, তুমিই তো সেই! তোমাকেই তো ভালোবেসে এসেছি আমি প্রথম থেকে, স্বর্গের মেয়ে তুমি, আমার অপ্সরী! তোমাকে— তোমাকেই তো দেখেছি আমার স্বপ্নে! তুমিই আমার নিয়তি, আমার পূর্ণতা, আমার সুধা, আমার উৎকৃষ্টতর সত্তা!'

এরাজ়মুসের মাথায় নিশ্চয়ই সুরা পৌঁছেছে, এই কথাই ভাবলো তার সঙ্গীরা, কারণ তারা তাকে কখনোই ও-রকম বেশামাল ও অধীর দ্যাখে নি; অন্য লোক হ'য়ে গেছে যেন সে, এতটাই সে বদলে গেছে মুহূর্তে।

'তুমি, তুমিই আমার প্রাণ! আগুনের শিখার মতো তুমিই আমার রক্তের মধ্যে ঝড় তুলেছো! দাও, আমাকে গ'লে যেতে দাও তোমার মধ্যে, তোমার মধ্যে গ'লে যেতে দাও আমাকে। শুধু তোমার মধ্যেই নিজেকে ফিরে পাবো। তুমি, শুধু-তুমিই আমি হ'য়ে যেতে চাই,' এরাজ়মুস চীৎকার ক'রে এ-কথাই বলতেই জোলিয়েত্তা তাকে আস্তে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলো। তখন সে শান্ত হ'লো একটু, তার পাশে বসলো সন্তর্পণে। বাধা পেয়ে এতক্ষণ তাদের প্রণয়লীলা ও হুল্লোড় থেমে ছিলো, তৎক্ষণাৎ তা আবার নতুন ক'রে আমোদ কৌতুক আর গানে ভ'রে গেলো। জোলিয়েত্তা যখন গান ধরলে, মনে হ'লো যেন স্বর্গের কোনো স্বরলিপি বেজে উঠলো এখন, যা এর আগে কোনো-

দিনই কোনো মানুষ শোনে নি; স্পন্দনের মতো সেই স্বর যেন উঠে এলো তার হৃদয়ের গভীর থেকে, শিখার মতো তা যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো এই প্রমোদকে—যে-প্রমোদের কথা লোকে এতকাল কেবল মনে-মনে কল্পনাই ক'রে এসেছে। তার পূর্ণ স্বচ্ছ ও কেলাসিত কণ্ঠস্বরের ভিতর এমন একটি গোপন আগুন ছিলো যা তাদের সকলেরই সত্তাকে জয় ক'রে নিলে। তরুণেরা প্রত্যেকেই আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরলে তাদের বান্ধবীকে, প্রতিটি যুগলের চোখের তারা যেন দীপ্তি বিনিময় করলো। অবশেষে রক্তিম এক বিচ্ছুরণ যখন ঊষার আভাস ঘোষণা করলে, জোলিয়েত্তা তখন ঘোষণা করলে ভোজসভার অবসান, আর তারা সবাই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। জোলিয়েত্তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি হ'লো এরাজ়মুস। অন্যদিন তাকে কোথায় প্রাপ্তব্য সেই বাড়িটি তাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সেই মুহূর্তে জোলিয়েত্তা কিন্তু তার সান্নিধ্য প্রত্যাখ্যান করলে। পরে পুরুষেরা যখন আলেমান উল্লাসের সাহায্যে ভোজসভার সমাপ্তি উদ্‌যাপন করতে ব্যস্ত তখন সে সকলের অগোচরে বিতান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো—পরে দেখা গেলো, দূরের এক গলি দিয়ে সে চ'লে যাচ্ছে, সঙ্গে দু'জন ভৃত্য, আলো হাতে তারাই তাকে নিয়ে যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। কিছুতেই তাকে অনুসরণ করার সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারলে না এরাজ়মুস। অবশেষে যুবকেরা সবাই তাদের বান্ধবীদের হাত ধ'রে হৈ-হল্লা করতে-করতে চ'লে গেলো, আর এরাজ়মুসও শেষকালে তাদের পিছন-পিছন গেলো বটে, কিন্তু সে তখন শুধু যে অন্যমনস্ক তা-ই নয়, বাসনায় ও প্রেমে রীতিমতো বিচলিত। বন্ধুরা যে-যার চ'লে যেতেই অবশ্য সে তাড়াতাড়ি নিজের বাসস্থানের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লো, আর তার ছোট্ট ভৃত্যটিই মশালের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো তাকে। ঊষা আকাশে উঠে আসতেই, পথের পাথরে ঘা মেরে তার ভৃত্য মশালটি নিভিয়ে দিলে; আর সেই উড়ো ফুলকির মধ্যেই সেখানে হঠাৎ এরাজ়মুসের সামনে একটি ঢ্যাঙা ও কৃশকায় লোকের অচেনা ও অদ্ভুত মূর্তি আবির্ভূত হ'লো; বাজপাখির মতো ধারালো নাক তার, চোখের তারা দুটি ঝলমলে, আর তার কদাকার মুখটি টেরচাভাবে বেঁকে আছে: ইস্পাতের চকচকে-বোতাম-বসানো লাল রঙের একটি কোর্তা তার পরনে।

হো-হো ক'রে উঁচু গলায় হেসে উঠলো লোকটা, তারপর কুশ্রাব্য ধাতব

গলায় বললে, 'আপনার ওই ঢিলে কোর্তা, ঝাপ্পালাগানো আঁটো জামা,[১] আর পালকবসানো টুপি—সব দেখে মনে হয় আপনি যেন কোনো পুরোনো ছবির বই থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বড্ড হাস্যকর দেখাচ্ছে আপনাকে, হের এরাজ়মুস। রাস্তায়-ঘাটে সবাই আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করুক, তাই কি আপনি চান? তা যদি না-চান তো চটপট গিয়ে আপনার ওই পুরোনো পার্চমেণ্ট কাগজের মস্ত বইটায় গিয়ে ঢুকে পড়ুন।'

'আমি যা-ই পরি না কেন, তোমার তাতে কী এসে-যায়?' রেগে এই কথা ব'লে লাল পোশাক পরা লোকটিকে পাশে ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইলো এরাজ়মুস।

'আরে, আরে, এত তাড়া আবার কিসের জন্য?' অচেনা লোকটি ডাক দিলে তাকে। 'আপনি তো আর এখনি জোলিয়েত্তার কাছে যাবেন না!' অমনি এরাজ়মুস ঘুরে দাঁড়ালো, 'কী বলছো তুমি জোলিয়েত্তার সম্বন্ধে?' লাল পোশাক পরা লোকটার কোর্তা চেপে ধ'রে বন্য স্বরে সে ব'লে উঠলো। কিন্তু চক্ষের নিমেষে লোকটা নিজেকে মুক্ত ক'রে, এরাজ়মুস কিছু বুঝে ওঠার আগেই, অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো—এরাজ়মুস দাঁড়িয়ে রইলো স্তম্ভিত আর হতবাক, তাকিয়ে দেখলো তার হাতের মুঠোয় ইস্পাতের একটা বোতাম চকচক করছে: অচেনা লোকটার কোর্তা থেকে বোতামটা ছিঁড়ে চ'লে এসেছে তার হাতে। 'ও হ'লো সিনর দাপেরতুত্তো, ডাক্তারি করে, তুকতাক ঝাড়ফুঁকেও মস্ত ওস্তাদ,' ভৃত্যটি তাকে বললে, 'তা আপনার সঙ্গে আবার তার কী দরকার?' হঠাৎ কেন যেন বিষম ভয়ে ভ'রে গেলো এরাজ়মুস, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো সে তৎক্ষণাৎ।

সেই বিষম ভালোবাসা তাকে পুরোপুরি জয় ক'রে নিয়েছে দেখে জোলিয়েত্তা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুর মতো এরাজ়মুসকে গ্রহণ করলো। কেবল মাঝে-মাঝে হঠাৎ একেক সময় তার চোখের তারা দীপ্তভাবে ঝলমল ক'রে উঠতো; আর কোনো-কোনো মুহূর্তে সে এমন অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকাতো যে এরাজ়মুসের মনে হ'তো যেন তার বুকে কোনো ভয়ানকের ঠাণ্ডা নিশ্বাস পড়লো। সে যে এরাজ়মুসকে ভালোবাসে, এ-কথা

১ এখানে যে-জামার কথা বলা হচ্ছে, তার নাম 'ডাবলেট', পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে ইয়োরোপে এর প্রচলন ছিলো।

কোনোদিনই মুখ ফুটে না-বললেও তার সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করতো তা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'তো যে তাকে ভালোবাসে জোলিয়েত্তা। কাজেই আরো-কোনো গভীর ও নিকটতম সূত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো; যেন এতদিনে সত্যিকার ঝলমলে দিন শুরু হ'লো এরাজমুসের। কদাচিৎ তার সাক্ষাৎ পেতো বন্ধুরা, কারণ জোলিয়েত্তার সূত্রে তার নতুন বন্ধু জুটেছিলো; জোলিয়েত্তাই তাকে অদ্ভুত একদল লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো, যাদের ধরনধারন ক্রিয়াকর্ম সবই ছিলো অন্যরকম।

এমনি যখন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন ফ্রেডেরিকের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেলো। সে তো কিছুতেই তাকে ছাড়লো না, বরং মাঝখান থেকে এমন সব কথা বলতে লাগলো যে এরাজমুসের মনে বাড়িঘর দেশের স্মৃতি জেগে উঠলো; শেষে যখন দেখলো যে এই সব কথাবার্তায় এরাজমুসের উন্মাদনা কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন বললো, 'তুমি যে ভীষণ একদল লোকের পাল্লায় পড়েছো, তা কি তুমি বুঝতে পারছো না, স্পিক্কের? জোলিয়েত্তা যে জগতের চতুরতম বেশ্যাদের একজন, নিশ্চয়ই এতদিনের মধ্যে এটুকু উপলব্ধি করার বোধ তোমার হয়েছে। নানারকম সত্যিমিথ্যে গল্প শোনা যায় তার সম্বন্ধে—সে-সব গল্পে তাকে অদ্ভুত ও রহস্যময়ী ক'রে আঁকা হয়েছে। সে যে ইচ্ছে করলেই পুরুষদের উপর এক অপ্রতিরোধ্য প্রভাব খাটাতে পারে, কিংবা অনায়াসেই যে সে যে-কোনো লোককে ক্রীতদাস ক'রে রাখতে পারে, তা তো তোমাকে দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আদ্যোপান্ত বদলে গেছো তুমি, এরাজমুস—মোহিনী জোলিয়েত্তার হাতের পুতুল হ'য়ে গেছো একেবারে। এমনকি দেশে যে বাড়িতে তোমার স্ত্রী ও প্রিয়জন আছে, তাও তুমি নিদারুণভাবেই ভুলে গেছো।'

তার কথা শুনে এরাজমুস দু'হাতে মুখ ঢেকে, স্ত্রীর নাম ধ'রে ডেকে, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার ভিতরে যে ভীষণ এক দ্বন্দ্ব চলেছে ফ্রেডেরিক তা স্পষ্টই দেখতে পেলে।

'স্পিক্কের,' সে বললে, 'চলো, আমরা চটপট এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যাই।'

'হ্যাঁ ফ্রেডেরিক,' আবেগে তক্ষুনি তার গলা কেঁপে উঠলো, 'তুমি ঠিকই বলেছো! কেন জানি না, ভীষণ সব বিভীষিকার আশঙ্কা আমাকে ভ'রে তুলেছে—অলুক্ষুণে সব কালো বোধ যেন ঘিরে আছে আমাকে—মনে হয় যেন শিগগিরই কোনো অশুভ ব্যাপার ঘটবে। অমঙ্গলের আশঙ্কায়—এই ছাখো

—আমার বুক কেমন কেঁপে উঠছে। এক্ষুণি আমার চ'লে যাওয়া উচিত—আজকেই আমি চ'লে যাবো।'

কিন্তু দুই বন্ধুতে মিলে যেই রাস্তা দিয়ে দ্রুত চ'লে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সিনর দাপেরতুত্তোর সঙ্গে তাদের দেখা হ'য়ে গেলো। পাশ দিয়ে যাবার সময় এরাজমুসের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে চেঁচিয়ে বললে, 'শিগগির, খুব শিগগির চ'লে যাও। জোলিয়েত্তা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—তার চোখে জল দেখে এলাম আমি, আর তার বুকে কী তীব্র বাসনা। আর দেরি কোরো না, শিগগির চ'লে যাও, শিগগির।'

এই কথাগুলি বিদ্যুতের মতো এরাজমুসকে নাড়িয়ে দিয়ে গেলো।

'ওই লোকটা,' ফ্রেডেরিক বললে, 'ওই হাতুড়ে ডাক্তারটাকে দেখলেই আমার বমি পায়—আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেমন যেন ঘৃণায় ভ'রে ওঠে। আর একবার ভেবে ছাখো তো—অমন লোক কিনা সময় নেই অসময় নেই সব সময়েই জোলিয়েত্তার বাড়িতে যাতায়াত করছে, আর ভেল্কি থেকে ভেষজ সব কিছু তাকে বেচে দিয়ে আসছে!'

'কী বললে?' এরাজমুস চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই ভীষণ লোকটা জোলিয়েত্তার কাছে যায়—জো লি য়ে ত্তা র কাছে?'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এরাজমুস? সব সেই থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে। কখনো কি আমার কথা ভুলেও তোমার মনে পড়ে না?' একটা বাড়ির অলিন্দ থেকে কে যেন তাকে ডেকে অত্যন্ত মধুর গলায় এই কথাগুলি বললে।

সে আর কেউ নয়, জোলিয়েত্তা! কথাবার্তায় দুই বন্ধুতে এমনি তন্ময় হ'য়ে পড়েছিলো যে কখন যে তারা ঠিক জোলিয়েত্তারই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা মোটেই খেয়াল করে নি। এক লাফে এরাজমুস ভিতরে চ'লে এলো। 'বাঃ, বেশ তো! এখন তবে আর কাকে আমি উদ্ধার করবো? ও তো চ'লেই গেলো। বুঝলাম, ওর আর নিষ্কৃতি নেই।' রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে আপন মনেই বললে ফ্রেডেরিক।

এত স্নিগ্ধ, এত কমনীয়, এত মধুর জোলিয়েত্তা আগে কখনো ছিলো না, ছিলো না এত গভীরভাবে ভালোবাসার যোগ্য। একদিন যে-পোশাক প'রে সে ওই প্রমোদবীথিকায় গিয়েছিলো, সেই পোশাকই প'রে আছে সে এখন, আর রূপ-যৌবন-লাবণ্য যেন ঝলমল ক'রে উপচে পড়ছে। ফ্রেডেরিকের সঙ্গে

এইমাত্র তার কী কথাবার্তা হ'য়ে গেছে, সব এরাজ্‌মুস মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলো। যেন এখন পরাকাষ্ঠায় পৌঁছোলো তার স্বর্গসুখ, আগের চেয়েও আরো অভিভূত ও বিহ্বল। তার গভীর প্রেমকে জোলিয়েত্তা এর আগে আর কোনোদিনই এমন অসংবৃতভাবে প্রকাশ করেনি আজ যেন সব বাধা উঠে গেছে, যেন একটানে কেউ পর্দা তুলে দিলে, আর অসংকোচে ও অনাবৃতভাবে এটাই ফুটে বেরোলো এরাজ্‌মুসের জন্য তার ভালোবাসা কী গভীর আর তীব্র। মনে হ'লো এরাজ্‌মুস ছাড়া আর-কিছুই যেন তার চোখে পড়ে না, মনে হ'লো যেন কেবল এরাজ্‌মুসের জন্যই তার বেঁচে থাকা, যেন তার সমস্ত অস্তিত্বটুকুই শুধুমাত্র এরাজ্‌মুসেরই জন্য। সেবার গ্রীষ্মকাল কাটাবার জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছিলো জোলিয়েত্তা, ঠিক ছিলো সেখানে তারা আমোদ-প্রমোদের মেলা বসাবে; এবার তারা সকলে মিলে দল বেঁধে সেখানে চ'লে গেলো। দলের মধ্যে ছিলো তরুণ একজন ইতালিয়ান; সে যে দেখতেই শুধু বিশ্রী তা-ই নয়, তার হাবভাব-সুদ্ধ কদাকার। জোলিয়েত্তার প্রতি বেশ টান ছিলো তার, মনোযোগের অনেকটাই সে নিবদ্ধ করেছিলো তার জন্য; আর তা এবার এরাজ্‌মুসের বুকে ঈর্ষা জাগিয়ে দিলে। বুক যখন রাগে আর ক্ষোভে ফেটে যাচ্ছে তখন সে দল ছেড়ে একলা চ'লে এলো বাগানে, ছোট্ট একটা সরু গলিতে গিয়ে উত্তেজিত-ভাবে পায়চারি করতে লাগলো যাতে নিজেকে কোনোরকমে ঠাণ্ডা করতে পারে। কিন্তু জোলিয়েত্তা তাকে এখানে নির্জনে খুঁজে বার করলো।

দুই হাতে তাকে বুকের উপর চেপে ধরলো জোলিয়েত্তা, তার ঠোঁটে চুমো খেতে-খেতে বললো, 'কী হ'লো তোমার? দল ছেড়ে তুমি চ'লে এলে কেন একা? তাহ'লে কি এখনো তুমি পুরোপুরি আমার নও?'

যেন আগুনের শিখায় তাকে বিদ্ধ করা হ'লো! প্রায় হিংস্র ও সংরক্ত -ভাবে সে তার প্রিয়তমাকে বুকে চেপে ধ'রে ব'লে উঠলো, 'না, কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে চ'লে যাবো না, কোনোদিনই না—এমনকি তার জন্য যদি আমাকে ভীষণ অনাচার আর লজ্জাও সহ্য করতে হয়, তাও সই, তবু কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়বো না।'

এ-কথা বলতেই দুর্বোধ একটি হাসিতে জোলিয়েত্তার মুখ ভ'রে গেলো; তার চোখে সেই অদ্ভুত ও রহস্যময় দৃষ্টি ফুটে উঠলো যা চোখে পড়লেই এরাজ্‌মুস ভয়ে ও আতঙ্কে একেবারে ভ'রে যায়। ভোজসভায় ফিরে এলো

তারা। আর তক্ষুনি সেই অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর ইতালিয়ানটি ঠিক এরাজ্‌মুসেরই ভূমিকা গ্রহণ ক'রে বসলো ; ঈর্ষায় অধীর হ'য়ে সাধারণভাবে সব জর্মানদের সম্পর্কেই কতগুলি ধারালো ও অপমানকর টিপ্পনি করলে সে, এবং তার মধ্যে কতগুলি খোঁচা একেবারে সরাসরি স্পিক্কেরের প্রতি উদ্দিষ্ট হ'লো। শেষকালে এক সময়ে তা এরাজ্‌মুসের ধৈর্য ও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো ; ওই সব কাটা-কাটা মন্তব্য আর সহ্য করতে না-পেরে সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্পিক্কের।

'আমার আর আমার জাতের উদ্দেশে ওই যে সব শস্তা দেঁতো হাসি আর টিপ্পনি ব্যবহার করছো, এক্ষুনি সব তোমাকে বন্ধ করতে হবে, না-হ'লে সোজা তোমাকে ওই পুকুরে ছুঁড়ে মারবো, যাতে বেশ একটু সাঁতার শিখে নিতে পারো।' সে বললে।

তৎক্ষণাৎ ইতালিয়ানটির হাতে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এরাজ্‌মুস রাগে অস্থির হ'য়ে তক্ষুনি আর ঘাড় ধ'রে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। ঘাড়ের হাড়ে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিলে সে গায়ের জোরে, অমনি গলায় খানিকটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে কাতরাতে-কাতরাতে ইতালিয়ানটি তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

সঙ্গে-সঙ্গে এরাজ্‌মুসও অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হ'য়ে পড়লো, মুহূর্তের মধ্যে চেতনা লোপ পেলো তার। ওই অচৈতন্য অবস্থাতেই ঝাপসা মনে হ'লো কারা যেন তাকে ধরাধরি ক'রে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। জেগে উঠে মনে হ'লো যেন কোনো বিপুল মূর্চ্ছার মধ্য থেকে সে উঠে এসেছে—দেখতে পেলো ছোট্ট একটি চোরকুঠুরিতে জোলিয়েত্তার পায়ের কাছে সে শুয়ে আছে। তার মাথা ঝুঁকে আছে তার উপরে, আর দুই হাত দিয়ে আস্তে তাকে জড়িয়ে আছে সে।

'কী ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে!' জোলিয়েত্তা বললো, 'আপাতত তো বিপদ থেকে তোমাকে আমি বাঁচালাম, কিন্তু ফ্লোরেন্সে কিংবা ইতালিতে তুমি মোটেই নিরাপদ নও। আমাকে ছেড়েই তোমাকে চ'লে যেতে হবে, আমাকে ত্যাগ করতেই হবে তোমায়—অথচ আমি কিনা তোমাকেই এমন ভীষণভাবে ভালোবাসলাম!'

বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই এরাজ্‌মুস যেন বর্ণনাতীত কোনো যন্ত্রণায় ছিঁড়ে গেলো! 'আমাকে তুমি থাকতে দাও, জোলিয়েত্তা,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'বিনা

প্রতিবাদেই আমি মৃত্যুকে মেনে নেবো, তবু তোমাকে ছেড়ে থাকবো না—কারণ তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু তো কোনো অংশেই খারাপ নয়।'

ঠিক সেই মুহূর্তে দূরের থেকে কোনো-এক ক্ষীণ ও দুর্বল কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এলো তার কাছে—যেন কেউ করুণভাবে তার নাম ধ'রে ডাকছে। ওই কণ্ঠস্বর আর-কারো নয়, তার জর্মান স্ত্রীর, যাকে সে দেশে রেখে এসেছে। অমনি সে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো।

'স্ত্রীর কথা ভাবছো তুমি এখন, তাই না?' অতিশয় অদ্ভুত শোনালো জোলিয়েত্তার জিজ্ঞাসা। 'হায়, এরাজ়মুস! শিগগিরই, অল্পদিনের মধ্যেই, তুমি আমাকে ভুলে যাবে।'

'যদি আমি চিরকাল তোমারই কাছে থাকতে পারতুম—চিরকাল!' উত্তর দিলো এরাজ়মুস।

মস্ত একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলো তারা; সেই ছোট্ট চোর-কুঠুরিটিরই দেয়ালে আয়নাটা বসানো—দু'পাশে উজ্জ্বল মোমবাতি জ্বলছে। জোলিয়েত্তা আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাকে বুকে চেপে ধরলো, তারপর আস্তে স্নিগ্ধ গলায় তার কানে-কানে বললো, 'তাহ'লে ওই আয়নায় তোমার যে-ছায়াটা পড়েছে তা-ই আমাকে দিয়ে যাও। আমার সোনা, আমার সর্বস্ব, তুমি যদি না-ই থাকো তবে তোমার ছায়াটা অন্তত আমার কাছে থাক—চিরকাল অন্তত তা-ই আমার সঙ্গে থাকবে তবে।'

'জোলিয়েত্তা!' আশ্চর্য হ'য়ে গেলো এরাজ়মুস! 'এ তুমি কী বলছো, জোলিয়েত্তা, কী বলতে চাচ্ছো! আমার ছায়া! আমার প্রতিবিম্ব?' আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলে, যেভাবে জোলিয়েত্তাকে বুকে চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, হুবহু তারই ছবি ফুটে উঠেছে আয়নায়। 'আমার প্রতিবিম্ব তুমি নিজের কাছে রাখবে কী ক'রে?' তার বিস্ময় যেন কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। 'আমার প্রতিবিম্ব তো আমার সঙ্গেই যায় সর্বত্র—স্বচ্ছ জল কিংবা কোনো উজ্জ্বলমসৃণ জিনিশ হ'লেই হ'লো—তারই ভিতর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে সে অভিবাদন জানায়।'

'একবার তুমি পরিপূর্ণভাবে আমার হ'তে চেয়েছিলে—দেহে-মনে শুধু-কেবল আমার,' জোলিয়েত্তা বললে, 'আর এখন কিনা তুমি তোমার ওই স্বপ্নস্বরূপটুকু পর্যন্ত দিতে চাচ্ছো না আমাকে, ওই আয়নার ভিতরেই কেবল

যাকে দেখা যায় শুধু সেই ছায়াটুকুকেও কি আমাকে দেবে না? যা আমার জীবনের দুঃখে ও দুর্দশায় সান্নিধ্য দেবে, তোমার সেই ক্ষীণদুর্বল বিগ্রহটুকুতে পর্যন্ত আমার অধিকার নেই? এখন তবে আর কী রইলো আমার? তুমি চ'লে যাচ্ছো আমাকে ছেড়ে, আর কি জীবনে কোনো দিন ভালোবাসা কি আনন্দের মুখ দেখতে পাবো?'

আর এরাজমুস সহ্য করতে পারলে না। তার ভালোবাসা তাকে যেন পাগল ক'রে দিলো। চেঁচিয়ে উঠলো সে উন্মত্তের মতো, বললো, 'তবে কি তোমাকে ছেড়ে চ'লে যেতেই হবে সত্যি-সত্যি? যদি যেতেই হয় শেষ পর্যন্ত, তাহ'লে থাকুক আমার ছায়া, তোমার কাছেই চিরকাল থাকুক আমার প্রতিবিম্ব। যতদিন না তুমি আমাকে আস্ত গ্রাস ক'রে নিচ্ছো, দেহে-মনে একেবারে সম্পূর্ণ, ততদিন কেউ, কোনো শক্তিই—সে যদি মূর্তিমান শয়তানও হয় স্বয়ং—তোমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না!'

এই কথা ব'লে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই জোলিয়েত্তার চুম্বন তার মুখকে যেন আগুনের মতো পুড়িয়ে দিলো। তার পরেই তাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে দিলো জোলিয়েত্তা; আতুর দুই হাত সে বাড়িয়ে দিয়েছে আয়নার দিকে, বাসনায় অধীর ও অস্থির হ'য়ে আছে, আর অমনি—এরাজমুস দেখতে পেলো—আস্তে তার ছায়া বেরিয়ে এলো আয়না থেকে, আপনিই সে বেরিয়ে এলো—নিজে-নিজেই, আর সে বাধ্য রইলো না এরাজমুসের, রইলো না বশংবদ কি অনুগত কি অধীন; যেন সে ভেসে চ'লে এলো আয়নার ভিতর থেকে, আর জোলিয়েত্তার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ'লে গেলো। পরক্ষণেই এরাজমুসের ছায়া আর জোলিয়েত্তা সে-ঘর থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো—শুধু অদ্ভুত একটা গন্ধ এলো যেন কোত্থেকে আর আস্ত ঘরটাকেই ঝিম ধরিয়ে দিলো; আর তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা ক'রে যত রাজ্যের কুৎসিত কণ্ঠস্বর শোনা গেলো সেই ঘরে দানবিক ঘৃণায় তারা সেই ঘরের ভিতর চ্যাঁচামেচি ও উচ্চ-হাসি জুড়ে দিয়েছে। তীব্র কোনো ভয় যেন তাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে ফেললে। যেন ছোরার মতো বাঁটসুদ্ধ তার বুকে আস্ত ব'সে গেলো আতঙ্ক, আর চেতনা হারিয়ে মোহমান এরাজমুস মেঝেয় প'ড়ে গেলো বিহ্বল। কিন্তু সেই অভিভূত মূর্ছার মধ্য থেকে যা তাকে জাগিয়ে দিলে তা হ'লো বিভীষিকা। কালো অন্ধকারে টলতে-টলতে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো: সিঁড়ি বেয়ে কেমন ক'রে নিচে নেমে এলো তা সে নিজেই ভালো ক'রে

বুঝলো না। একবার বাড়ির বাইরে আসতেই কে যেন তাকে ধ'রে একটা কোচবাক্সে তুলে দিলে, আর তক্ষুনি তা দ্রুতবেগে রাতের রাস্তা ধ'রে ছুটতে শুরু ক'রে দিলো।

'মহদাশয় দেখছি অনেকখানিই বদলে গেছেন,' পাশে যে-লোকটা ব'সে ছিলো, আলেমান ভাষায় সে বললে। 'মহাশয় দেখছি প্রভূত পরিমাণে বদলে গেছেন। কিন্তু আপনি যদি আমার হাতেই সব ভার নিশ্চিন্ত মনে তুলে দিতে পারেন, যদি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন আমার কাছে, তাহ'লে সব আবার এক্ষুনি ঠিক হ'য়ে যাবে। আমার জোলিয়েত্তা অবশ্য তার ভূমিকা যথাযথই সম্পন্ন করেছে – সে-ই আপনার সম্বন্ধে সুপারিশ করলে কিনা আমার কাছে। বেশ সুন্দর তরুণ আপনি, চমৎকার মানুষ, আর হাল্কা সব হাসি ঠাট্টা ও ফুর্তিতে দিব্যি দখল আছে আপনার - অবশ্য আমাদের পক্ষে তা পরম উপযোগী হয়েছে, আপনার স্বভাব অন্যরকম হ'লে আমাকে ও জোলিয়েত্তাকে বেশ মুশকিলে পড়তে হ'তো। শ্রীযুক্ত আমোরোসোর ঘাড়ে আপনি যে-লাথিটা বসিয়েছিলেন, সত্যিকার জর্মান পদাঘাত যদি কিছুকে বলে তো সে তাকেই। আহা! তার জিভটা যখন মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঝুলে থাকলো কী চমৎকার রক্তিমই না তা দেখালো। বেশ মজার দেখাচ্ছিলো তখন। আর যখন ঘাসের উপর ছটফট করতে-করতে ভীষণ আর্তনাদ করলে, যখন জোরে-জোরে নিশ্বেস ফেললে সাঁ-সাঁ ক'রে - আহা—সে এক দৃশ্য বটে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

লোকটার ঠাট্টা এমন ন্যক্কারজনক, আর তার এই এলোমেলো কথাবার্তা এমনি বিকট যে, তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন ছোরার ঘায়ের মতো এরাজমুসের হৃৎপিণ্ডে আমূল ব'সে গেলো।

'তুমি যেই হও না কেন, চুপ করো, দয়া ক'রে চুপ করো,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ওই ভয়ানক দুর্ঘটনার কথা আর বোলো না। সেজন্য আমার অনুতাপের আর শেষ নেই।'

'কী বললে? অনুতাপ? হ্যাঁ? অনুতাপ!' লোকটা উত্তর দিলে। 'জোলিয়েত্তার সঙ্গে দেখা হ'লো, তার ভালোবাসা পেলে—এই সবের জন্য তুমি তাহ'লে এখন দুঃখিত হচ্ছো!'

'হায়! জোলিয়েত্তা, আমার জোলিয়েত্তা!' এরাজমুস দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'কী ছেলেমানুষ তুমি!' লোকটা ব'লেই চললো। 'এখন তুমি যত ইচ্ছে

ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন দেখতে পারো, কিন্তু তাতে কোনোই লাভ হবে না—অবস্থার তাতে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না,—সব যেমন আছে তেমনি থাকবে। এটা অবশ্য বিশ্রী হ'লো—মানতেই হয়—এই যে জোলিয়েত্তাকে ছেড়ে আসতে হ'লো তোমার! কিন্তু ধরো তুমি এখানেই থাকতে পেলে এবং আমি তোমাকে শত্রুপক্ষের ছুরিকা ও তথাকথিত ন্যায়বিচারের হাত থেকে রক্ষা করলুম, তখন?'

জোলিয়েত্তার সঙ্গে থাকতে পারবে, এই ভাবনা আবার এরাজ্‌মুসের হৃদয়কে উত্তেজিত ক'রে তুললো। 'কিন্তু তা কী ক'রে হয়?' সে জিগেস করলে। 'তা কি কিছুতেই সম্ভব?'

'তোমার শত্রুদের চোখে কী ক'রে ধোঁকা দেয়া যায়, তার অনেক পন্থা আমার জানা আছে।' লোকটা ব'লে চললো। 'সংক্ষেপে ধরো, আমি এমন ক'রে দিলাম যে তোমার মুখটাই সম্পূর্ণ বদলে গেলো—একেবারে আলাদা একটি মুখ নিয়ে তুমি লোকসমাজে দেখা দিলে—কেউ তোমাকে তখন আর চিনতেই পারবে না। সকাল হ'লেই দয়া ক'রে কোনো আয়নার দিকে অনেকক্ষণ ভালো ক'রে তাকিয়ে থেকো। তোমার প্রতিবিম্বের উপরেই গোটা কয়েক ছোটোখাটো অস্ত্রোপচার ক'রে দেবো—না, না, ভয় কোরো না, তোমার ছায়ার তাতে কোনোই ক্ষতি হবে না আর তুমিও দিব্যি নিরাপদ হবে, জোলিয়েত্তার সঙ্গে তখন অনায়াসেই নিশ্চিন্ত মনে মজা ক'রে দিন কাটাতে পারবে—বিপদের আর কোনো আশঙ্কাই থাকবে না!'

'কী ভয়ানক! কী ভীষণ!' চেঁচিয়ে উঠলো এরাজ্‌মুস।

'ভীষণটা আবার কী দেখলেন, মশায়?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে লোকটার ঠোঁট বেঁকে গেলো।

'হায়! আমি—আমি—' বলবার চেষ্টা করলো এরাজ্‌মুস।

'প্রতিবিম্বটাও বুঝি খুইয়ে এসেছেন আপনি!' চট ক'রে লোকটা শূন্য স্থানে কথা বসিয়ে দিলো। 'জোলিয়েত্তার ওখানে ফেলে এসেছেন বুঝি! হা, হা, হা! চমৎকার! এ একেবারে রাজকীয় ব্যাপার হ'লো! তাহ'লে আর কী! এখন তবে ছুটুন মাঠঘাট বন-পাহাড় নদী-নালার উপর দিয়ে, দৌড়ে পালিয়ে যান তবে গ্রাম শহর লোকালয়ের উপর দিয়ে, গিয়ে বউ আর ছোট্ট 'রাজ্‌মুসের কাছে আশ্রয় নিন। আবার তাহ'লে বাড়ির কর্তা হ'য়ে বসতে পারবেন। অবশ্য কোনো ছায়া থাকবে না আপনার। তা আপনার স্ত্রী

নিশ্চয়ই তা নিয়ে প্যানপ্যান করবেন না, কারণ তিনি তো আপনাকেই পেয়ে যাবেন, রক্তমাংসের একটি আস্ত মানুষ, আর জোলিয়েত্তা যা পাবে তা তো সামান্য ছায়া মাত্র, কেবলমাত্র আপনার ঝকমকে স্বপ্নস্বরূপটাই!'

'চুপ করো, চুপ করো! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো!' এরাজ্‌মুস চেঁচিয়ে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি হাসিখুশি শোভাযাত্রা কাছে এগিয়ে এলো, গান গাচ্ছে তারা সমস্বরে, হাতে তাদের মশাল, আর তারই আলো এসে পড়লো কোচবাক্সের ভিতর। সঙ্গীর মুখের দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলে এরাজ্‌মুস—এ আর কেউ নয়, সেই জঘন্য লোকটা, ডাক্তার দাপেরতুত্তো! লাফিয়ে নেমে পড়লো সে কোচবাক্স থেকে, দৌড়ে গেলো শোভাযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য, কেননা দূর থেকেই সে ফ্রেডেরিকের গভীর সুকণ্ঠ চিনতে পেরেছিলো। গ্রামাঞ্চলের এক জমকালো ভোজসভা থেকে ফিরছে তার বন্ধুরা। এরাজ্‌মুস গিয়ে চটপট ফ্রেডেরিককে ব'লে দিলো ইতিমধ্যে কী সব সাংঘাতিক ব্যাপার ঘ'টে গেছে—সে যে সেই সঙ্গে ছায়াও হারিয়ে ব'সে আছে, কেবল এটাই সে বন্ধুর কাছে চেপে গেলো। সব শুনে তক্ষুনি শহরের দিকে এগোলো ফ্রেডেরিক;—তারপর এত তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলা হ'লো যে ভোরবেলায় দেখা গেলো টগবগে একটি ঘোড়ার পিঠে ক'রে ফ্লোরেন্স থেকে এরাজ্‌মুস অনেক দূরে চ'লে এসেছে।

পথে তাকে কত-যে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিলো, স্পিকের তা সবই লিখে রেখেছিলো। ছায়া হারাবার অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুবিধে সম্বন্ধে সব প্রথম সে যেভাবে সচেতন হয়েছিলো, ওই সব অভিজ্ঞতার ভিতর সেটাই হ'লো সবচেয়ে চমকপ্রদ। যাতে তার অবসন্ন ঘোড়া একটু বিশ্রাম পায়, এইজন্য মস্ত একটি শহরে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিলো তাকে। দৈবচক্রে সরাইখানার এমন একটি টেবিলে তাকে বসতে হয়েছিলো, যে-টেবিলে আরো অজস্র লোক ঠাশাঠাশি ক'রে বসেছিলো। তার মুখোমুখি যে একটা উজ্জ্বল আয়না ঝোলানো স্পিকের তা খেয়ালই করেনি। এক হতভাগা ওয়েটার তার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলো; হঠাৎ সে লক্ষ করলে যে আয়নায় স্পিকেরের চেয়ারটা খালি দেখা যাচ্ছে—কেউ যে সেই চেয়ারে ব'সে আছে, আয়নায় তার কোনোই প্রতিবিম্ব পড়েনি। যা নিরীক্ষণ করলে তক্ষুনি তা এরাজ্‌মুসের পাশের লোকটিকে সে ব'লে দিলে; সে আবার এই তথ্যটা পাশের লোকটিকে চালান ক'রে দিতে একটুও দেরি করলে না; আর এইভাবে

একটুক্ষণের মধ্যেই টেবিল জুড়ে গুঞ্জন ও আলোড়ন শুরু হ'য়ে গেলো। সবাই একবার ক'রে এরাজ্‌মুসের দিকে তাকায়, তারপরেই আবার আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাখে। সে নিজেই যে এই উত্তেজনার উৎস, এরাজ্‌মুস সেটা তখনো বুঝে উঠতে পারে নি। শেষকালে ভারিক্কি গোছের একটি লোক টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এরাজ্‌মুসকে টেনে আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো আয়নায়। শেষে অন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে সে ব'লে উঠলো, 'সত্যি তো, এর দেখছি সত্যিই কোনো ছায়া নেই! কোনো প্রতিবিম্বই তো পড়লো না আয়নায়!'

'কোনো প্রতিবিম্বই নেই তার।' একের পর এক এই কথাটাই চেঁচিয়ে বললো সকলে। 'Un mauvais sujet! Homo nefas! বের ক'রে দাও ওকে ঘর থেকে—দূর ক'রে দাও!'

লজ্জায় আর অসহায় রাগে ফুলতে-ফুলতে এরাজ্‌মুস তার নিজের ঘরে পালিয়ে এলো। কিন্তু ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই একটি বিজ্ঞপ্তি পেলে পুলিশের কাছ থেকে: এক ঘণ্টার মধ্যে যদি তার পূর্ণ ও সঠিক প্রতিবিম্ব নিয়ে সে কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হ'তে না-পারে, তাহ'লে এক্ষুনি তাকে এই শহর ছেড়ে চ'লে যেতে হবে। তক্ষুনি সে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু তবুও কি নিষ্কৃতি আছে? রাস্তায় একদল ভবঘুরে ও ভিখিরি তার পিছন নিলে, চীৎকার ক'রে তারা বলতে লাগলো, 'শয়তানের কাছে ওই লোকটা ওর প্রতিবিম্ব বেচে দিয়েছে। ওই যে যাচ্ছে ছায়াহারা! ভাখো, ভাখো, ছায়াহারাকে ভাখো!' অবশেষে শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের পথে এসে পৌঁছোলো এরাজ্‌মুস। এর পর থেকে সে যেখানেই যেতো, সব আগে সেখানকার সব আয়নার উপর ঢাকনি বসাবার ব্যবস্থা করতো সে। ছুতো দিতো: ছেলেবেলা থেকেই নাকি প্রতিবিম্বকে সে বিষম ভয় করে—যে-কোনো প্রতিবিম্ব দেখলেই সে নাকি একেবারে শিউরে ওঠে। এর পর থেকে তার উপনাম হ'য়ে গেলো জেনারেল স্থভোরভ: এমনি এক অদ্ভুত বাতিক স্থভোরভেরও নাকি ছিলো।

দেশে নিজের বাড়িতে ফিরতেই তার স্নেহশীলা স্ত্রী আর ছোট্ট 'রাজ্‌মুস তাকে খুব হৈ-চৈ ক'রে অভ্যর্থনা জানালো, আর স্পিক্কের মনে-মনে ভাবলো বাড়ির এই শান্ত ও ঘরোয়া আবহাওয়ায় সে নিশ্চয়ই শিগগিরই তার ছায়া হারাবার ক্ষতি ও শোক সামলে উঠতে পারবে। ততদিনে সে জোলিয়েত্তার কথা

পুরোপুরি ভুলে গেছে, এমন সময় একদিন ছোট্ট 'রাস্‌মুসের সঙ্গে সে যখন খেলা করছে তখন 'রাস্‌মুস তার দু'হাতে বাবার গাল চেপে ধরলো ; ঝুলকালি লেগেছিলো তার হাতে—সব বাবার মুখে লেপ্টে গেলো।

'দ্যাখো বাবা, দ্যাখো, তোমাকে কি-রকম কালো ভূত সাজিয়ে দিয়েছি!' ছোট্ট ছেলেটি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো ; আর স্পিকের তাকে থামাবার আগেই কোত্থেকে একটা আয়না নিয়ে এসে নিজে একবার তার দিকে তাকিয়ে বাবার মুখের কাছে তুলে ধরলো। পরক্ষণেই হাত ফশকে আয়নাটা তার মুঠো থেকে প'ড়ে গেলো। কাঁদতে-কাঁদতে জলভরা চোখে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। পরক্ষণেই স্পিকেরের স্ত্রী হুড়মুড় ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো—তার চোখে-মুখে ভয় আর বিস্ময় জ্বলজ্বল করছে।

'ছোট্ট 'রাস্‌মুস এসব কী বলছে তোমার নামে?' স্ত্রী জিগেস করলে।

'বলছে যে আমার কোনো প্রতিবিম্ব নেই, তাই না?' বাধা দিয়ে এরাস্‌মুস চেষ্টা ক'রে একটু শুকনো হাসলো। তারপর এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলো যে সত্যি কি কেউ কোনোদিন তার প্রতিবিম্ব হারাতে পারে, কখনো তা হয় না কি, তা কি সম্ভব না বিশ্বাস্য? কেননা, বস্তুত, কী-ই বা আছে হারাবার? ছায়া কিংবা প্রতিবিম্ব তো নিছকই একটি বিভ্রম মাত্র, বিশুদ্ধ একটি বিভ্রম, প্রপঞ্চময় একটি প্রতিরূপ, একটি ইচ্ছাপূরণকারী দিবাস্বপ্ন শুধু, তা হ'লো নিজের এমন একটি ধ্যানরূপ যা প্রায় অহমিকার পর্যায়ে উন্নীত। আর তা ছাড়া আয়নার উপর কোনো প্রতিমার আভাস হ'লো সত্তারই একটা সামান্য টুকরো : সত্য আর স্বপ্নের মধ্যে যে তফাত, কোনো মানুষ আর তার ছায়াতেও ঠিক ততটাই তফাত।

স্পিকের যখন একের পর এক এই সব জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করছে, তার স্ত্রী ততক্ষণে চট ক'রে একটা আয়নার উপর থেকে পর্দা তুলে দিয়েছে—আয়নাটা দৈবচক্রে সেই ঘরেই ঝুলতো। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়েই সে মেঝেয় আছড়ে পড়লো, যেন তার মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে, যেন এইমাত্র মুহূর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে গেলো। স্পিকের তাকে তুলে ধরলো, কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়েই আতঙ্কে ভয়ে বিভীষিকায় বিহ্বল তার স্ত্রী ধাক্কা দিয়ে স্পিকেরকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলে।

'ছেড়ে দাও,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ছেড়ে দাও আমাকে, দয়া ক'রে আমাকে ত্যাগ করো! ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে! তুমি তো আমার

স্বামী নও— কিছুতেই তুমি আমার স্বামী হ'তে পারো না। না, তুমি স্পিকের নও। নরকের কোনো জীব তুমি নির্ঘাত, আমার আত্মাকে কেড়ে নিতে এসেছো, চিরকালের জন্য আমাকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে চাচ্ছো, সর্বনাশ ঘটাতে চাচ্ছো আমার। যাও, এক্ষুনি এখান থেকে চ'লে যাও। আমার উপরে তোমার কোনো জারিজুরিই খাটবে না—অভিশপ্ত কোথাকার!'

গোটা ঘরটাকে যেন ঝনঝন ক'রে বাজিয়ে দিলো তার চীৎকার—হলঘর দিয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে পৌঁছোলো! আর ওই চীৎকার শুনে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো ভীত আর সন্ত্রস্ত দাসদাসীরা, আর এরাজমুস—রাগে আর ভয়ে সে তখন অভিভূত ও বিমূঢ়—তক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলো। যেন কোনো তীব্রপ্রবল উন্মত্ততা তাকে পেয়ে বসেছে এমনিভাবে শহরতলির সেই পার্কের পথে-পথে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—আর ঠিক এমন সময়েই হঠাৎ কখন যেন অপ্সরীদের মতো রূপসী জোলিয়েত্তার অপার্থিব সৌন্দর্য ও লাবণ্যময় প্রতিমা তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো ঝাপসা।

'তুমি কি তবে এই ভাবেই আমার উপর প্রতিশোধ নিলে, জোলিয়েত্তা,' তার গলা কেঁপে গেলো, তার চীৎকার ছড়িয়ে গেলো হাওয়ায়, 'নিজের বদলে শুধুমাত্র আমার ছায়া তোমাকে দিয়ে এসেছিলাম ব'লে, তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম ব'লে, এমনিভাবেই কি তুমি প্রতিশোধ নিলে আমার উপর? জোলিয়েত্তা, আমার জোলিয়েত্তা! তোমারই হবো আমি তবে—দেহে-মনে আদ্যোপান্ত শুধু-তোমার। যার কথা ভেবে তোমাকে আমি বিসর্জন দিয়েছিলাম, আমার সেই স্ত্রীও এখন আমার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে! জোলিয়েত্তা, জোলিয়েত্তা, আমার সর্বাঙ্গ আর আমার আত্মা স ব, সব এখন তোমার হোক, শুধুই তোমার।'

'তা অবশ্য মোটেই কিছুমাত্র কঠিন হবে না, মশাই,' সিনর দাপেরতুত্তো বললে। ইস্পাতের চকচকে বোতাম লাগানো লাল কোর্তা গায়ে হঠাৎ সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ভীষণ কথাগুলি সান্ত্বনার মতো শোনালো দুর্ভাগা এরাজমুসের কাছে! কাজেই, দাপেরতুত্তোর ধূর্ত ও কদাকার মুখের দিকে কিছুমাত্র নজর না-দিয়ে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে ভগ্নকণ্ঠে জিগেস করলে, 'তাহ'লে বলো আবার তাকে ফিরে পাবো কী ক'রে? সে তো চিরকালের মতোই হারিয়ে গেলো আমার কাছ থেকে!'

'মোটেই না মোটেই না!' দাপেরতুত্তো উত্তর দিলে। 'মোটেই এমন

কিছু দূরে নেই জোলিয়েত্তা, তা ছাড়া আপনার মূল্যবান সান্নিধ্যের জন্য অতিশয় ব্যাকুল আর উদগ্রীব হ'য়েই আছে সে। কারণ প্রতিবিম্ব বা ছায়া যে নিছকই একটি নিঃসাড় বিভ্রম, তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। উপরন্তু যক্ষুনি সে বুঝতে পারবে যে আত্মা এবং প্রাণ সমেত সশরীরে আপনি তারই হবেন, তখনি সে আপনার ওই সুন্দর মসৃণ, নিখুঁত প্রতিবিম্বটিকে উষ্ণ ধন্যবাদের সঙ্গেই ফিরিয়ে দেবে।'

'তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে, এক্ষুনি।' এরাজ়মুস চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোথায় আছে সে? কোনখানে?'

'কিন্তু তার আগেই যে ছোট্ট একটা বিষয়ের ফয়সালা ক'রে ফেলতে হয়!' দাপেরতুত্তো তাকে বাধা দিলে, 'জোলিয়েত্তার সঙ্গে দেখা করার আগে, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তার কাছে সমর্পণ করার আগে, আপনার প্রতিবিম্ব ফিরে পাবার আগে, অতিশয় তুচ্ছ একটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া দরকার। কেননা নিজেকে এভাবে হস্তান্তরিত করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো আপনার নেই, এখনো তো কয়েকটি বন্ধন থেকে গেছে আপনার। প্রথমে সেই সব বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। যেমন ধরুন আপনার প্রিয়তমা পত্নী, তারপর ধরুন আপনার শিশুপুত্র—এরা সব..... '

'এর সঙ্গে তাদের আবার কী সম্পর্ক?' হিংস্রভাবে চীৎকার ক'রে উঠলো এরাজ়মুস।

'এইসব বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি পাবার রীতিবিরুদ্ধ উপায় অবশ্য,' দাপেরতুত্তো ব'লে চললো, 'অতিশয় মানবিকভাবেই করা যেতে পারে। ফ্লোরেন্সে থাকার সময়ে নিশ্চয়ই জেনেছেন যে নানারকম তুকতাক ও ভেষজ বানাতে আমার বেশ দক্ষতা আছে। প্রতিকারের একটা উপায় আছে আমার হাতে, আমার নিজেরই তৈরি। আপনার এবং আপনার ভালোবাসার জোলিয়েত্তার মাঝখানে যে-কেউই বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াক না কেন, এই ওষুধের কয়েক ফোঁটা নিশ্বাসের সঙ্গে তার নাকে গেলেই তার পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। লোকে অবশ্য তাকে ম'রে-যাওয়া বলে, আর শোনা যায় মৃত্যু নাকি একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু তেতো বাদামের স্বাদও তো শেষ পর্যন্ত মধুর এবং উপভোগ্য —তাই নয় কি? হ্যাঁ, এই বোতলের মধ্যে যে-মৃত্যু আছে তা মোটেই তেমন তিক্ত নয়। মুহূর্তের মধ্যে চমৎকারভাবে নিরস্তিত্ব হ'য়ে যাবে আপনার পরিবার, আর দেখবেন পরক্ষণেই কটু বাদামের মতোই তা উপভোগ্য গন্ধ

ছিটিয়ে দেবে। তাহ'লে মান্যবর, গ্রহণ করুন এটা, নিন,' এরাজ্‌মুসের দিকে ছোট্ট একটা বোতল সে বাড়িয়ে ধরলে।

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো!' চেঁচিয়ে উঠলো এরাজ্‌মুস, 'বিষ দিতে বলছো আমাকে? স্ত্রী আর ছেলেকে বিষ দিতে বলছো তুমি!'

'বিষের কথা কে বললে!' লাল কোর্তাপরা লোকটা বাধা দিলো। 'এই বোতলের মধ্যে শুধু সুগন্ধি একটু গৃহনির্মিত প্রতিকার রয়েছে। আপনার মুক্তির আরো অনেক উপায় আমি জানি, কিন্তু সবচেয়ে স্বাভাবিক আর মানবিক পদ্ধতিতেই আমি কাজ হাঁশিল করতে চাই—আপনাকে ছাড়া আর-কাউকেই আমি এই কাজে লাগাতে চাই না। আমার ইচ্ছে, আপনিই এর ভার নেন। আর এত ভাবনাই বা কিসের? এখন তো অনায়াসেই ফুর্তি করতে পারেন আপনি।'

বোতলটা হাতে ক'রে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো এরাজ্‌মুস: কেমন ক'রে যে এটা তার হাতে এলো, তা সে বুঝতেই পারলে না। মাথার ভিতরটা যেন ফাঁকা হ'য়ে গেছে তার, সম্পূর্ণ শূন্য—কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ওই অবস্থাতেই টলতে-টলতে বাড়ি ফিরলো সে, কোনো দিকে না-তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো। আতঙ্কে ভয়ে যন্ত্রণায় গোটা রাতটা বিধ্বস্ত ক'রে গেছে তার স্ত্রীকে: বারে-বারে সে এই ব'লে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে বাড়িতে যে-লোকটা ফিরেছে সে কিছুতেই তার স্বামী নয়, বরং নরকের কোনো জীব—তার স্বামীর মূর্তি ধ'রে চ'লে এসেছে। কাজেই স্পিক্কের যেই বাড়ি ফিরলো, অমনি সবাই ভয় পেয়ে তার কাছ থেকে ছুটে পালালো। কেবল ছোট্ট 'রাজ্‌মুস সাহস পেলো তার কাছে আসতে; ছেলেমানুষের মতো সরলভাবে জিগেস করলে তার বাবা কেন প্রতিবিম্ব নিয়ে আসে নি সঙ্গে—মা যে সেইজন্যে ভয়ে-দুঃখে মারা যেতে বসেছে। বন্য চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো এরাজ্‌মুস, তখনো দাপেরতুত্তোর বোতল তার হাতের মুঠোয়। এমন সময় 'রাজ্‌মুসের পোষা ঘুঘু এসে বসলো তার কাঁধে, বোতলের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে একটা ঠোকর দিলে ছিপিতে। পরক্ষণেই তার মাথা একদিকে ঝুলে পড়লো—ম'রে গেলো ঘুঘুটা। দেখে এরাজ্‌মুস রাগে ক্ষোভে লজ্জায় প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠলো।

'বিশ্বাসঘাতক! বেইমান!' চীৎকার ক'রে উঠলো সে, 'কিছুতেই আমাকে দিয়ে এই নারকীয় কাজ তুই করাতে পারবি না।' ব'লেই সে খোলা জানলা

দিয়ে শান বাঁধানো উঠোনে ছুঁড়ে ফেললো বোতলটা। হাজার টুকরো হ'য়ে বোতলটা ভেঙে গেলো। পরক্ষণেই ঘরের ভিতর ভেসে এলো বাদামের তীব্র সুগন্ধ। আর এই সব দেখে ছোট্ট 'রাজমুসও এবার ভয় পেয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলো।

সেদিন সারা দিন ধ'রে ক্ষোভে অবিশ্রাম ছিঁড়ে গেলো স্পিকের কিন্তু যেই ঢং-ঢং ক'রে মধ্য রাত্রি বাজলো অমনি তার মনে ভেসে উঠতে লাগলো জোলিয়েত্তার আশ্চর্য রূপ। অনেক মেয়েই মুক্তোর বদলে লাল জামের মালা প'রে থাকে; অনেক দিন আগে একদিন সে জোলিয়েত্তার সঙ্গে ব'সে ছিলো, এমনি এক লাল জামের মালা ছিলো তার গলায়। কী ক'রে যেন সেই মালাটা ছিঁড়ে গিয়েছিলো হঠাৎ; তখুনি জামগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সে চটপট লুকিয়ে ফেলেছিলো—তারপর থেকে সযত্নে সে তাদের রক্ষা ক'রে আসছে, কারণ এই জামগুলি গলায় মালা ক'রে যে পরেছিলো সে তো তারই জোলিয়েত্তা। এখন বের ক'রে এনে সে অনিমেষে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো—আর মুহূর্তে সেই লুপ্ত প্রেম তার চিন্তা ভাবনা ও বোধকে সম্পূর্ণরূপে দখল ক'রে নিলে। জোলিয়েত্তার সঙ্গে থাকার সময় যে-মোহিনী গন্ধ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতো, হঠাৎ সেই সুগন্ধই যেন বেরিয়ে এলো জামগুলি থেকে, আর তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত অস্তিত্বে যেন ঝিম ধ'রে গেলো। 'হায়, জোলিয়েত্তা! একবার যদি তোমাকে দেখতে পেতুম তাহ'লে লজ্জা আর ঘৃণার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবে যেতেও কোনো ভয় করতুম না!' বলতে-না-বলতেই বাইরের বারান্দায় কার কাপড়ের খশখশে শব্দ উঠলো। স্পষ্ট শোনা গেলো পায়ের শব্দ। আর তারপরেই কে যেন ধাক্কা দিলে দরজায়। পূর্ববোধের যন্ত্রণা আর আশায় ভ'রে গেলো এরাজমুস—যেন এক্ষুনি তার দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। দরজা খুলতেই দেখলো ফুলের মতো সুন্দর জোলিয়েত্তা ঘরে ঢুকে তার পাশে এসে দাঁড়ালো; আনন্দে উল্লাসে ভালোবাসায় সে অধীর হ'য়ে উঠলো; বুকে চেপে ধরলো তাকে তক্ষুনি।

'এই তো এলাম, সোনা আমার,' জোলিয়েত্তার স্নিগ্ধ গলা ঝ'রে পড়লো তার কানে, 'ছ্যাখো, তোমার ছায়া আমি কেমন রেখে দিয়েছি।'

আয়নার উপর থেকে যেই সে পর্দা সরিয়ে দিলো, অমনি এরাজমুস সানন্দে দেখতে পেলো তার প্রতিবিম্ব দাঁড়িয়ে আছে, জোলিয়েত্তার গা ঘেঁষে, কিন্তু যদিও তারই প্রতিবিম্ব তবু আর তা তার বাধ্য নয়, নয় অনুগত কিংবা বশংবদ,

বরং তা সম্পূর্ণ স্বাধীন, এরাজ্‌মুসের নড়াচড়া চলাফেরা কোনো কিছুরই পুনরাবৃত্তি সে করে না। তার শিরা আর ধমনীর ভিতর দিয়ে ভয়ংকর শিহরণের স্রোত ব'য়ে গেলো।

'জোলিয়েত্তা,' সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমাকে ভালোবেসেছি ব'লে কি সব জ্ঞান আর বোধকেও হারিয়ে ফেলতে হবে? ছায়া ফিরিয়ে দাও আমাকে, ফিরিয়ে দাও আমার প্রতিবিম্ব, তার বদলে বরং আমাকে নাও—নাও আমার প্রাণ, আত্মা, শরীর—সব তুমি নাও, কেবল ওই ছায়া ফিরিয়ে দাও আমাকে।'

'এরাজ্‌মুস, সোনা আমার, আমার প্রিয়! এখনো যে কয়েকটা ছোট্ট বাধা রয়েছে আমাদের সামনে, তা তো তুমি জানোই।' জোলিয়েত্তা তাকে বললে, 'দাপেরতুত্তো নিশ্চয়ই সে-কথা তোমাকে বলেছে।'

'ম'রে যাওয়াও ভালো তার চেয়ে!'

'না, না, দাপেরতুত্তো কিছুতেই তোমাকে তা করতে দেবে না। সত্যি, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হ'তে পারে! কে জানতো এক পুরুতের আশীর্বাদ আর তুচ্ছ একটা প্রতিশ্রুতি এমন ভীষণ ফলপ্রসূ হবে! ওই বন্ধন তোমাকে খুলতেই হবে এরাজ্‌মুস, তা না-হ'লে তুমি কিছুতেই পুরোপুরি আমার হ'তে পারবে না। কিন্তু দাপেরতুত্তো যে-প্রস্তাব দিয়েছিলো, তার চেয়ে ঢের ভালো আরেকটা উপায় আছে—তাতে সহজেই তোমার সব বন্ধন খুলে যাবে।'

'কী? কী সেটা?' আবেগের ঝোঁকে এরাজ্‌মুসের গলা অধীর শোনালো।

জোলিয়েত্তা তার গলা জড়িয়ে ধরলো, দুই হাতে তার মাথা চেপে ধরলো তার বুকে, যেন তার স্তনের মধ্যে তাকে সে ডুবিয়ে দিলে; তারপর তার কানে-কানে নরম ক'রে বলতে লাগলো, 'ছোট্ট একটুকরো কাগজের মধ্যে অতি তুচ্ছ কয়েকটা কথার নিচে তোমার নাম, এরাজ্‌মুস স্পিকের, স্বাক্ষর ক'রে দাও। শুধু এই ক-টি কথা লিখলেই চলবে: "প্রিয় বন্ধু দাপেরতুত্তোকে আমি আমার স্ত্রী-পুত্রের উপর অধিকার দিচ্ছি, যাতে সে তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, যাতে সে তাদের ইচ্ছেমতো সরিয়ে দিতে পারে পথ থেকে, আর এইভাবে যাতে সে বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে আমাকে। কেননা এর পর থেকে আমার শরীর, রক্তমাংস, আমার আত্মা সবই জোলিয়েত্তারই হবে, সম্পূর্ণভাবে শুধুই তার—তাকেই আমি আমার পত্নী

নির্বাচন করলাম; একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতির দ্বারা তার সঙ্গেই আমি চিরকালের মতো নিজেকে জড়িয়ে দিলাম।" '

এরাজ়মুসের স্নায়ুগুলি যেন কুঁকড়ে গেলো নাড়া খেলো ছটফট ক'রে উঠলো; অগ্নিবর্ষী চুম্বন পুড়িয়ে দিলে তার ঠোঁট; জোলিয়েত্তা তার হাতে যে-কাগজের টুকরো গুঁজে দিয়েছিলো, তা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক। হঠাৎ এমন সময়ে জোলিয়েত্তার ঠিক পিছনেই দেখা গেলো দাপেরতুত্তোকে, দানবের মতো দেখাচ্ছে তাকে—তেমনি ভীষণ আর অতিকায়; সে-ই তার হাতে একটা ইস্পাতের কলম তুলে দিলে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট একটা ধমনী ছিঁড়ে গেলো এরাজ়মুসের ডান হাতে, আর ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্তের ধারা।

'কলম ডুবিয়ে নাও রক্তে, তারপর লেখো,' লাল কোর্তাপরা লোকটা কর্কশ স্বরে ব'লে উঠলো।

'আমার চিরন্তন, আমার প্রেম, আমার সর্বস্ব,' তার কানে-কানে বললো জোলিয়েত্তা, 'লেখো তুমি, লিখে ফ্যালো।'

রক্তে কলম ডুবিয়ে নিয়ে যেই সে লিখতে যাবে অমনি দরজা খুলে গেলো। আস্তে ঘরে এসে ঢুকলো শুভ্র একটি মূর্তি, তারপর অপলকে তাকিয়ে থাকলো এরাজ়মুসের দিকে।

'এরাজ়মুস! এরাজ়মুস!' কী বিষণ্ণ ও দুঃখী শোনালো সেই শুভ্র মূর্তির কণ্ঠস্বর, 'কী করছো তুমি, এরাজ়মুস! ভগবানের দোহাই– এই ভীষণ কাজ থেকে নিবৃত্ত হও!'

এই শুভ্র মূর্তি যে তার স্ত্রীর, তার স্ত্রী-ই যে তাকে সাবধান ক'রে দিতে চাচ্ছে, এরাজ়মুস শুধু এটুকুই বুঝতে পারলে। তৎক্ষণাৎ ওই কাগজ কলম দূরে ছুঁড়ে ফেললো সে। আর অমনি জোলিয়েত্তার চোখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো বিদ্যুৎময় আগুন, মুহূর্তে কদাকার ও বিকৃত হ'য়ে গেলো তার রূপসী মুখ, শরীরের বাঁকাগুলি জ্ব'লে উঠলো আগুনের শিখার মতো।

'নরকের অনুচর, আমার শরীর থেকে হাত সরিয়ে নাও তোমার— আত্মার একটি ফোঁটাও তোমাকে আমি দেবো না। যীশুর নামে বলছি, স'রে যা আমার সামনে থেকে, সাপিনী! নরকের আগুনে ঝলশে যাক তোর শরীর, ঝলশে যাক!' চেঁচিয়ে উঠলো এরাজ়মুস। তখনো জোলিয়েত্তা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ছিলো আর থাকতে না-পেরে স্পিক্কের তাকে

সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। ধাতব একটা আসুরিক গর্জন শোনা গেলো ঘরের মধ্যে, আর শোনা গেলো ডানার শব্দ : যেন দু'টি কালো দাঁড়-কাক ডানা ঝাপটাচ্ছে ঘরের ভিতর। দেয়াল ফেটে বেরিয়ে এলো ঘন, কালো ও কুণ্ডলাকার পুঞ্জ-পুঞ্জ ধোঁয়া, সব আলো নিভে গেলো আচমকা, আর তারই ভিতর ক্রমে মিলিয়ে গেলো জোলিয়েত্তা আর দাপেরতুত্তো। অবশেষে জানলা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো উষাকালের রশ্মি ও বিচ্ছুরণ। তখুনি এরাজ্‌মুস তার স্ত্রীর খোঁজে চ'লে এলো। ততক্ষণে শান্ত হয়েছে তার স্ত্রী, হয়েছে নম্র ও সুস্থির। এর মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েছে ছোট্ট 'রাজ্‌মুস, বিছানায় ব'সে আছে শান্ত। বিধ্বস্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্ত্রী হাত বাড়িয়ে দিলো, বললে, 'এতক্ষণে বুঝলাম ইতালিতে গিয়ে তুমি কী ভীষণ বিপদে পড়েছিলে—তোমার জন্য করুণা হয় আমার, দয়া হয় সর্বান্তঃকরণে। শত্রুরা অনেক বেশি পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী। যত রকম দুষ্ক্রিয়া ও অনাচার সম্ভব, যত ধরনের চৌর্যবৃত্তি—সব কিছুতেই কী ভীষণ ওস্তাদ তারা! অন্যায় কৌশলে তোমার ছায়া আত্মসাৎ করার লোভ পর্যন্ত সামলাতে পারে নি! তোমার ছায়া ছিনিয়ে নিয়েছে, যে সুন্দর ছায়া কিনা হুবহু তোমারই মতো দেখতে। কিন্তু একবার ওই আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাখো তুমি—'

তা-ই করলো স্পিক্কের, যেমন তাকে বলা হ'লো। সর্বাঙ্গ কাঁপছে তার, কী শোচনীয় আর করুণ তার মুখ! আয়না যেমন উজ্জ্বল আর পরিষ্কার ছিলো, তেমনি রইলো, কোনো এরাজ্‌মুস স্পিক্কেরই ফুটে উঠলো না আয়নায়। 'এখন যে আয়নায় তোমার ছায়া পড়ছে না,' স্ত্রী ব'লে চললো, 'এটা অবশ্য একদিক থেকে ভালোই, কারণ তোমাকে এখন কী ভীষণ উজবুক আর বোকা-বোকা দেখাচ্ছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এরাজ্‌মুস, প্রিয় আমার, এটা নিশ্চয়ই তুমি নিজেই ভালো ক'রে বুঝতে পারছো যে তোমার কোনো ছায়া কিংবা প্রতিবিম্ব নেই ব'লে লোকে তোমাকে কী নিষ্করুণভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে! তাছাড়া এই ছায়াহারা অবস্থায় তুমি যে কোনো পরিবারের যোগ্য কর্তা হ'তে পারবে না, বা তোমার স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে পুরোপুরি সম্মান পাবে না তাও নিশ্চয়ই তুমি বোঝো। এর মধ্যেই ছোট্ট 'রাজ্‌মুস তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু ক'রে দিয়েছে; শিগগিরই হয়তো কয়লার টুকরো দিয়ে তোমার মুখে মস্ত এক গোঁফ এঁকে বসবে—

কেননা তুমি এতটাই স্বপ্নাতুর হ'য়ে আছো যে এ-সব তুচ্ছ বিষয় তোমার চোখেই পড়বে না। কাজেই আরো কিছুকাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘোরাঘুরি ক'রে এসো গিয়ে, আর চেষ্টা কোরো যাতে শয়তানের কাছ থেকে হারানো ছায়া ফিরে পাও। চুম্বন করো আমাকে—;' স্পিকের তা-ই করলো—'তারপর, এখন তোমার যাত্রা শুভ হোক। হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে ছোট্ট 'রাজ্‌মুসের জন্য নতুন মোজা পাঠিয়ো, কারণ ছেলেটা এত হামাগুড়ি দেয় যে চট ক'রে সব মোজা ছিঁড়ে যায়, আর তাই অজস্র মোজা দরকার তার। আর যদি কোনো দিন নুরেমবের্গ-এ যাও, স্নেহাতুর পিতা হিশেবে তাকে একটা রং-করা ঘোড়সোয়ার পুতুল আর ওখানকার বিখ্যাত পিঠে পাঠিয়ে দিয়ো। বিদায় তাহ'লে, প্রিয় এরাজ্‌মুস। তবে তুমি এসো এবার।'

স্ত্রী পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো। ছোট্ট 'রাজ্‌মুসকে শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিলে স্পিকের, তারপর বুকে চেপে ধ'রে আদর করলো। কিন্তু এত আদরে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যেই সে কেঁদে উঠলো, তক্ষুনি তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে মস্ত খোলামেলা পৃথিবীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো এরাজ্‌মুস। একবার তার সঙ্গে জনৈক পিটার শ্লেমিলের[১] দেখা হয়েছিলো; সে নাকি টাকার লোভে শয়তানের কাছে নিজের ছায়া বেচে দিয়েছিলো। তারা দু'জনে একজোট হবার মতলব এঁটেছিলো তখন, কেননা এরাজ্‌মুস স্পিকেরের ছায়া আছে প্রতিবিম্ব নেই, আবার পিটার শ্লেমিলের প্রতিবিম্ব আছে কিন্তু ছায়া নেই; কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা থেকে মোটেই কোনো সুফল গজায় নি।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১ 'পিটার শ্লেমিলের আশ্চর্য কাহিনী' নামক ছোটো উপন্যাসটির লেখক আডালবের্ট ফণ শামিসো। টোমাস মান উচ্ছ্বসিতভাবে এর প্রশংসা করেছিলেন। এই বইটি যে একদা সমগ্র ইয়োরোপে বিপুল প্রভাব ফেলেছিলো, হোফমানের এই উল্লেখই তার নিদর্শন।



মরু-কুসুম

অনরে দ্য বালজ়াক

'কী ভয়ানক,' এস. মার্টিনের পশু-প্রদর্শনীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে সে বললে।

—অনুষ্ঠান-লিপির ভাষায় বলতে গেলে সে এতক্ষণ 'দুর্জয় সাহসীর প্রাণপণ করিয়া হায়নার সহিত কারবার' দেখছিলো।

'কী ক'রে,' সে ব'লে চললো, 'কী ক'রে লোকটা জন্তু-গুলোকে এমনভাবে পোষ মানাতে পারলো যাতে ওর প্রতি তাদের ভালোবাসার সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত—'

'তোমার কাছে যেটা রহস্যময় ঠেকছে,' বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'সেটা আসলে নিতান্তই স্বাভাবিক।'

'হুঁ?' অবিশ্বাসের হাসি খেলে গেলো তার ঠোঁটের উপর।

'তোমার কি ধারণা জন্তুদের হৃদয় ব'লে কিছু নেই?' আমি জিগেস করলাম।

'ঠিক উল্টো; আমরা সভ্য জগতের অধিবাসীরা হৃদয়ের যে-সব যন্ত্রণায় ভুগি তার প্রত্যেকটিই তাদের মধ্যে বর্তমান।'

সে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'তবু,' আমি ব'লে চললাম, 'প্রথমবার যখন এস. মার্টিনকে দেখি, স্বীকার করি আমিও তোমারই মতো বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম।' ঠিক আমার সঙ্গেই এসেছিলো একজন সৈন্য, ডান পা'টা খোঁড়া, দাঁড়িয়েছিলো আমারই পাশে। ওর মুখটা আমি লক্ষ না ক'রে পারি নি। যুদ্ধের ছাপ-মারা বীর মস্তকে নেপোলিয়নের যুদ্ধের চিহ্ন আঁকা। সরল, বিরক্তিহীন মুখের ভাব—চিরকালই এ-ধরনের মুখ আমার ভালো লাগে। সন্দেহ নেই, সে ছিলো সেই সব অশ্বারোহী সৈনিকদের একজন যারা কিছুতেই অবাক হয় না, মৃতকল্প বন্ধুর যন্ত্রণায় যারা হাসির খোরাক পায়, হাসতে-হাসতে তাকে স্যালুট করে, কিংবা মাটি চাপা দেয়, বন্দুকের গুলির মুখে দাঁড়াতে একটুও যাদের বুক কাঁপে না; সেই সব মানুষদের একজন, যারা ভেবেচিন্তে কোনো কাজ করে না, যারা ইতস্তত করে না স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে বন্ধুতা করতে। লোকটি বেশ মন দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো খেলোয়াড়ের দিকে, তারপর বিদ্রূপ আর অবজ্ঞাভরে ঠোঁট কামড়ালো, উঁচুদরের লোকেরা যেমন মাঝে-মাঝেই ক'রে থাকে—এ-কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য যে তাঁদের অত সহজে ভোলানো যায় না। তারপর, আমি যখন এস. মার্টিনের সাহসের গল্প ফেঁদে বসেছি, তখন সে সবজান্তাভাবে মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললে, 'ও তো পুরোনো কথা।'

'পুরোনো কথা মানে?' আমি বললাম। 'এ-রহস্যের সমাধান তুমি যদি ক'রে দিতে পারো তাহ'লে সত্যি বাধিত হবো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলাপ জ'মে উঠলো আমাদের, সেখান থেকে বেরিয়ে যে-খাবার-দোকানটা প্রথম চোখে পড়লো সেটাতেই ঢুকে পড়লাম দু'জনে। খাবার পরে এক বোতল শ্যাম্পেন এই আজগুবি বৃদ্ধ সৈনিকের পুরোনো স্মৃতিগুলি নতুন ক'রে জাগিয়ে তুললো। তার গল্প সে বললে আমাকে, এবং আমার আর-কোনো সন্দেহ রইলো না যে, 'ও তো পুরোনো কথা' বলার অধিকার সত্যিই তার আছে।

বাড়ি ফিরে আমার সঙ্গিনী আমাকে এত জ্বালাতে লাগলেন, এমন সব সাংঘাতিক দিব্যি দিলেন যে তাঁর জন্য সেই বুড়ো সৈন্যটির গল্পটা লিখে দেবো এমন কথা দিতে বাধ্য হলাম। পরের দিন সে এক মহাকাব্যের অন্তর্ভূত নিম্নোক্ত ঘটনাটির বিবরণ পেলো,—'মিশরে ফরাশি' মহাকাব্যটির এই নাম হ'লে বেমানান হ'তো না।

জেনারেল দঁসঁ যখন উত্তর মিশর আক্রমণ করলেন সেই সময় একটি ফরাশি সৈন্য মুরদের হাতে ধরা পড়ে। এই আরবেরা তাকে নিয়ে গেলো নীল নদীর ওপারে মরুভূমিতে।

ফরাশিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য মুরেরা সারাদিন কুচকাওয়াজ করতো, বিশ্রাম নিতো শুধু রাত্রে। খেজুর গাছের আড়ালে একটা কুয়োর ধারে তারা তাঁবু গাড়লো, আগে থেকেই খাবারদাবার লুকোনো ছিলো সেখানে। তাদের বন্দীর যে পালাবার মতলব থাকতে পারে এ-কথাটা তাদের মাথায় এলো না; তার দুই হাত শুধু বেঁধে রেখে নিজেরা খেজুর খেয়ে, ঘোড়াকে খাবার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লো তারা।

সৈন্যটি দেখলো যে শত্রুরা আর লক্ষ রাখছে না তার উপর; দাঁতের সাহায্যে একটা তলোয়ার তুলে এনে সেটা রাখলো দুই হাঁটুর ফাঁকে, তারপর হাতের দড়ি কেটে ফেললো তাতে ঘ'ষে; চোখের পলকে মুক্ত হ'লো সে। একটা রাইফেল আর একটা ছোরা নিলো, আর নিলো কিছু শুকনো খেজুর, বার্লি, বারুদ আর গুলি, কোমরে তলোয়ার বেঁধে লাফিয়ে চ'ড়ে বসলো একটা ঘোড়ার উপর, তারপর—যেদিকে গেলে ফরাশি সেনাদলের দেখা পাবে ব'লে মনে হয়—সবেগে ধাবিত হ'লো সেদিকে। নিজের ছাউনি আবার চোখে দেখার জন্য সে এত অধীর ছিলো, শ্রান্ত ঘোড়াটাকে সে এত জোরে ছোটালো যে জন্তুটার আর না ম'রে উপায় রইলো না। পাঁজর ফেটে গেলো ঘোড়াটার, আর সৈনিকটি দেখলো সারা মরুভূমিতে সে একা। সে কিছুক্ষণ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে চললো, এমন দুঃসাহসে ভর দিয়ে যা শুধু এক পলায়নকারী কয়েদির পক্ষে সম্ভব, কিন্তু এক সময় থামতেই হ'লো তাকে, শেষ হ'য়ে এলো দিন। প্রাচ্য আকাশের রাত্রির মনোরম শোভাও তাকে আর শক্তি জোগাতে পারলো না। ভাগ্যক্রমে একটা ছোটো পাহাড় অবশেষে চোখে পড়লো তার, বাতাসে পাতা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি খেজুর গাছ; দূর থেকে তাদের সবুজ রং তাকে আশা আর সান্ত্বনা জোগালো। এত ক্লান্ত ছিলো যে একটা গ্র্যানিট পাথরের উপর সে শুয়ে পড়লো—নিতান্ত খেয়ালের বশে প্রকৃতি সেই টুকরোটাকে ঠিক যেন শিবিরের বিছানার মতো ক'রে কেটে রেখেছেন। ঘুমের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করার মতো কোনো ব্যবস্থা না ক'রেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। নিজের জীবনকে বলি দিতে চলেছে সে। ঘুমোবার আগে তার শেষ

চিন্তা ছিলো অনুশোচনার। মুরদের ছেড়ে এসে এখন তার অনুতাপ হচ্ছিলো। তাদের থেকে বহুদূরে এই অসহায় অবস্থায় তার কাছে ঐ ভবঘুরে জীবনও উপাদেয় বোধ হ'লো। ঘুম ভাঙলো প্রখর রোদে: নির্দয় সূর্যরশ্মি গ্র্যানিটের উপর সোজাসুজিভাবে এসে প'ড়ে অসহ্য তাপ তুলেছে—আর সে বোকার মতো সবুজ খেজুর গাছের রাজকীয় পাতা যেখানে ছায়া ফেলেছে তার ঠিক উল্টোদিকে শুয়ে আছে। সেই নিঃসঙ্গ গাছগুলির দিকে তাকিয়ে সে শিউরে উঠলো—তার মনে পড়লো পত্রকিরীট স্তম্ভবেণীর কথা, আর্লের গির্জের মুসলমানী ঢঙের স্তম্ভগুলির যেটা বিশেষত্ব।

কিন্তু তারপর, খেজুর গাছগুলি গুনে সে চারপাশে তাকালো— যেন তীব্রতম হতাশার ঢেউয়ে তলিয়ে গেলো সে। তার সামনে বিস্তারিত এক অনন্ত সমুদ্র। চতুর্দিকে মরুভূমির গভীর বালি চ'লে গেছে দৃষ্টি ছাড়িয়ে, ইস্পাতের ধারালো তলোয়ারের মতো ঝকঝকে সেই বালুকারাশির উজ্জ্বল আলো এসে চোখে যেন আছড়ে পড়লো। যেন আয়নার সমুদ্র, কিংবা যেন অনেক হ্রদ একসঙ্গে মিশে আয়নায় গ'লে গেছে। জলন্ত বাষ্পের স্তর উঠে এসে কম্পিত মাটির বুকে এক চিরন্তন ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। আকাশ জ্বলছে প্রাচ্যের আশাবিহীন অঢেল নির্মলতায়, এমনকি কল্পনাতেও কোনো বাসনাপূর্তির স্থান নেই কোথাও। আলো জ্বলছে স্বর্গেমর্তে।

এই বন্য, এই ভয়ংকর রাজকীয় নিস্তব্ধতা অসহনীয়। চারিদিকের অন্তহীনতা, আর বিশালত্ব যেন তার আত্মাকে চেপে ধরলো। আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই, বাতাসে নেই কারুর নিশ্বাস, ভাঙন নেই বালির ক্রমাগত ব'য়ে-চলা ছোটো-ছোটো ঢেউয়ে; পরিষ্কার দিনে সমুদ্রতীরের দিগন্তের মতো, মাত্র একটা আলোর রেখা যেন তলোয়ার দিয়ে কেউ কেটে রেখেছে।

বন্ধুকে লোকে যেমনভাবে আলিঙ্গন করে সৈনিকটি ঠিক তেমনিভাবে খেজুর গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরলো, গ্র্যানিটের উপর পাম গাছের সংকীর্ণ ছায়াটুকুর আশ্রয়ে কাঁদতে লাগলো সে। তারপর সুগভীর বেদনা নিয়ে একভাবে স্থির হ'য়ে ব'সে ভাবতে থাকলো তার একমাত্র দ্রষ্টব্য এই 'অনমনীয়' দৃশ্যের কথা। যেন সেই নিস্তব্ধতা মেপে দেখবার জন্য সে সজোরে চীৎকার করতে লাগলো। পাহাড়ের ফোকরে বাড়ি খেয়ে তার গলা কোনো প্রতিধ্বনি তুললো না—শুধু মৃদু স্বর ভেসে এলো হাওয়ায়, প্রতিধ্বনি হ'লো তার অন্তরে। প্রঁভাসবাসী এই সৈনিকটির বয়স বাইশ—বন্দুকে টোটা ভরলো সে।

'অনেক সময় আছে,' এই ব'লে সে তার মুক্তির একমাত্র অস্ত্রকে মাটিতে নামিয়ে রাখলো।

একবার সেই কৃষ্ণ আর একবার সেই সুনীল বিস্তার দেখতে-দেখতে সে দেশের স্বপ্ন দেখলো—তার মনে পড়লো সেই সব শহরের কথা যার পথ দিয়ে হেঁটেছে—প্যারিসের নালি নর্দমার গন্ধও যেন পরম পুলকে সে নিশ্বাসে গ্রহণ করলো। তার মনে পড়লো বন্ধু সৈনিকদের মুখ আর জী·নের তুচ্ছাতি-তুচ্ছ খুঁটিনাটি। মরুভূমির স্তরের পর স্তর বিদীর্ণ ক'রে যে-সূর্যালোক খেলা করছে তার তলায় সে যেন হঠাৎ এক পলকে দেখতে পেলো তার প্রিয় প্রঁভাসের পাহাড়-শ্রেণী। এই মরীচিকার ডাকে ভয় পেয়ে সে উল্টোদিকের পাহাড়ের তলায় চ'লে গেলো ; গতকাল এই পথ দিয়েই এসেছিলো। সেখানে পাহাড়ের তলদেশে বিশাল গ্র্যানিটের পাথর কেটে প্রকৃতিদেবী স্বয়ং একটা গুহা তৈরি ক'রে রেখেছেন। এই আবিষ্কারের আনন্দে সে অধীর হ'য়ে উঠলো। ছেঁড়া কম্বলের টুকরো দেখে বুঝলো এর আগেও এখানে লোকে আশ্রয় নিয়েছে ; একটু দূরেই দেখলো ফলে ভরা একটা খেজুর গাছ। যা আমাদের প্রাণের পাথেয়, সেই সহজ প্রবৃত্তি আবার জেগে উঠলো তার মনে। আশা হ'লো যতদিন না কোনো আরব দল সে-পথ দিয়ে যায় ততদিন হয়তো কোনোমতে বেঁচে থাকতে পারবে ; কিংবা হয়তো কামানের গোলার শব্দ শুনতে পাবে ; কারণ নেপোলিয়ন সেই সময় মিশর পার হ'য়ে এগোচ্ছেন।

এই চিন্তা তাকে নতুন জীবন দান করলো। পাকা ফলের ভারে খেজুর গাছ-গুলি যেন নুয়ে পড়েছে। ঝাঁকিয়ে কিছু ফল মাটিতে ফেললো। আশার অতীত এই অমৃত ফলের স্বাদ গ্রহণ ক'রে তার নিশ্চিতরূপে মনে হ'লো যে কোনো মানুষ এই ফলের চাষ করেছে এখানে। সুগন্ধি টাটকা মাংসল খেজুরগুলি নিশ্চয়ই তার পূর্ববর্তী আগন্তুকের যত্নে তৈরি। অকস্মাৎ অন্ধকার নৈরাশ্য থেকে প্রায় উন্মাদ আনন্দে সে মেতে উঠলো। আবার পাহাড়ে উঠলো, ফলবিহীন যে-সব খেজুর গাছ গতরাত্রে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো তার একটি কাটতে কাটিয়ে দিলো সারাদিন। অস্পষ্ট স্মৃতির মতো মরুভূমির জন্তুদের কথা তার মনে আসছিলো। পাহাড়ের ঠিক তলদেশে দাঁড়িয়ে একটা ঝর্না চোখে পড়েছিলো তার, নিচে নামলে আর দেখা যায় না ; মনে হ'লো জন্তু জানোয়ারেরা রাত্রে সেখানে জল খেতে আসতে পারে : পাছে তার ডেরাতেও

হানা দেয় সেই ভয়ে সে তার আশ্রমের সামনে একটা বেড়া তৈরি ক'রে নিজেকে রক্ষা করবে স্থির করলো।

কিন্তু তার পরিশ্রম এবং শক্তি (ঘুমের মধ্যে কোনো জন্তুর ভক্ষ্য হবার ভয় তাকে যে-শক্তি দিয়েছিলো) সত্ত্বেও খেজুর গাছটা কেটে ফেললো বটে, টুকরো করতে পারলো না। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গে যখন মরুভূমির এই সম্রাট ভূপতিত হলেন, তাঁর সেই পতনের শব্দ নিবিড় স্তব্ধতায় বেজে উঠে ছড়িয়ে দিকে-দিকে পড়লো। সৈনিকটি শিউরে উঠলো—তার মনে হ'লো যেন এই স্বর তার আসন্ন শোকের সংবাদ ঘোষণা করলো।

কিন্তু উত্তরাধিকারী সন্তান যেমন পিতামাতার মৃত্যুতে খুব বেশিক্ষণ শোক করে না, সৈনিকটিও তেমনি সেই সুন্দর গাছ থেকে ছিঁড়ে নিলো কাব্যিক অলংকারের মতো সবুজ পাতাগুলি : সেগুলি পাটির মতো ক'রে বিছিয়ে নিলো শোবার জন্য।

গরমে আর পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলো সে : ভেজা গুহার একদিকে তার পত্র-শয্যায় শুয়ে অবসন্ন চোখে রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো; পরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তা সে নিজেই জানে না। ঘুম ভেঙে গেলো মাঝরাতে একটা অস্বাভাবিক শব্দে। সে উঠে বসলো, তার চতুষ্পার্শ্বের সুগভীর নীরবতায় সে যে নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনলো তার বন্য শক্তি যে কোনো মানুষের হ'তে পারে না সেটা বুঝতে তার দেরি হ'লো না।

অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর জাগ্রত কল্পনায় তার আশঙ্কা তীব্রতর হ'লো, ভয়ে বুক হিম হ'য়ে গেলো তার। স্পষ্ট অনুভব করলো মাথার চুল খাড়া হ'য়ে উঠেছে, প্রাণপণে চেষ্টায় অন্ধকার ভেদ ক'রে সে শুধু দেখতে পেলো হলুদ রঙের দুটি মৃদু আলো। প্রথমে ভাবলো ও বুঝি তার নিজের চোখেরই প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু একটু পরেই অন্ধকার কেটে যেতে রাত্রির স্পষ্ট উজ্জ্বলতায় সে ক্রমে-ক্রমে গুহার বিভিন্ন জিনিশ আলাদা-আলাদা ক'রে দেখতে পেলো, এবং আবিষ্কার করলো যে তার দু'পা দূরে শুয়ে আছে এক বিশাল প্রাণী। সিংহ, বাঘ, না কি কুমির?

অত বিদ্যা তার ছিলো না যে কী জন্তু চট ক'রে আন্দাজ করতে পারবে। কিন্তু তাতে ভয় আরো উদ্বেল হ'য়ে উঠলো; কিছু বুঝতে পারলো না ব'লেই যত রকম ভয় আছে সব সে একযোগে কল্পনা করতে লাগলো। ভোগ করছিলো নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, এক চুল নড়বার সাহস হচ্ছিলো না, একভাবে

কাঁটা হ'য়ে ব'সে সে তার দু'পা দূরের নিশ্বাসপতনের প্রতিটি ঢেউ কান পেতে শুনতে থাকলো। শেয়ালের গায়ের মতো একটা কটু গন্ধ—কিন্তু তার চেয়ে অনেক তীব্র, অনেক মর্মভেদী—সারাটা গুহা ভ'রে ফেলেছে : এবং এই গন্ধ সম্বন্ধে সচেতন হ'তেই তার ভীতি চরমে পৌছলো, কারণ আর তার কোনো সন্দেহ রইলো না যে এক ভয়ংকর সঙ্গী তার নিকটবর্তী হয়েছে এবং সে আশ্রয় নিয়েছে তারই রাজকীয় আবাসে।

একটু পরে দিগন্ত থেকে চাঁদের আলো এসে আভা ছড়ালো সেই গুহার অভ্যন্তরে, আর ধীরে-ধীরে হ'য়ে উঠলো আলোকোজ্জ্বল, চোখের সামনে ভেসে উঠলো চিতাবাঘের গায়ের চামড়ার চাকা চাকা দাগ।

ঘুমিয়ে ছিলো মিশর সিংহ, হোটেলের দরজার সামনে কোণে শান্তিপ্রিয় কুকুরের মতো গুটিয়ে শুয়েছিলো সে ; একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ ক'রে ফেললো। হাজারো মিশ্রিত চিন্তা খেলে যেতে লাগলো তার মনে ; প্রথমে মনে হ'লো, গুলি ক'রে মারে—কিন্তু দেখলো লক্ষ্য ঠিক করবার মতো যথেষ্ট জায়গা নেই—বন্দুকের নলই জন্তুটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর তা ছাড়া যদি জেগে থাকে? —এ-কথা ভাবতেও হাত-পা শক্ত হ'য়ে এলো? সেই স্তব্ধ জগতে ব'সে সে শুধু শুনতে লাগলো নিজের হৃৎস্পন্দন; আর মনে-মনে শাপ দিলো রক্তের তীব্র ঢেউয়ে বাড়ি খেয়ে সে-শব্দ অত জোরালো হ'য়ে উঠেছে ব'লে ; তার মনে হ'লো, যে-নিদ্রা তাকে পালাবার উপায় চিন্তা ক'রে বের করার অবসরটুকু দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডের দ্রুততাল শব্দে হয়তো তার ব্যাঘাত হবে।

দু'-দুবার সে তার শত্রুর মস্তকচ্ছেদ করার জন্য তলোয়ার তুললো ; কিন্তু শক্ত ছোটো-ছোটো লোম কাটার অসুবিধার কথা ভেবে এই দুঃসাহসী পরিকল্পনা থেকে বিরত হ'লো। যদি চেষ্টা ক'রে না পারে তাহ'লে মৃত্যু অবধারিত। অপরপক্ষকেও সমান সুযোগ দিয়ে ন্যায় যুদ্ধ করাই সে স্থির করলো : ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করলো মনকে। আর, ভোর তো প্রায় হ'য়ে এলো।

এ-বার একটু সহজ ভাবে বাঘটাকে লক্ষ করতে পারলো এই ফরাশি-তনয় ; মুখের চার পাশটা রক্তে লাল হ'য়ে আছে।

'ভোজটা ভালো হয়েছে ওর,' সে ভাবলে, কিন্তু ভোজটা যে নর-মাংসেরও হ'তে পারে সে-কথাটা ঠিক মাথায় এলো না তার। 'খিদে নিয়ে ওর ঘুম ভাঙবে না।'

বাঘ নয়, বাঘিনী। শরীরের দুই পাশে আর পেটে পশমের মতো লোম উজ্জ্বল শাদা, মখমল-নরম ছোটো-ছোটো দাগ গয়নার মতো তার দুই পা জড়িয়ে রেখেছে ; আঁকাবাঁকা ল্যাজটাও ধবধবে শাদা, শেষের দিকে শুধু কালো রঙের গোল গোল দাগ ; তার পরিচ্ছদের ঊর্ধ্বভাগ পুরোনো সোনার মতো হলুদ, কোমল, চিক্কন, মার্জার শ্রেণীর অন্যান্য সব প্রাণী থেকে চিতাকে আলাদা করেছে সর্বাঙ্গব্যাপী যে-দাগ তা যেন গোলাপের পাপড়ির মতো ঝ'রে পড়েছে তার দেহের ঠিক মধ্যস্থান থেকে। প্রশান্ত, ভয়ংকর এই গৃহকর্ত্রী নরম গদিতে বেড়ালের মতো কমনীয় ভঙ্গিতে শায়িত। তার রক্তচিহ্নিত, স্নায়ুবিশিষ্ট আর সশস্ত্র দুটি থাবা সে ছড়িয়ে রেখেছে মুখের উপর দিয়ে, তার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে রুপোর সুতোর মতো সোজা সরু গোঁফ।

এই ভাবে যদি তাকে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় সে দেখতো তাহ'লে তার লালিত্যে, এবং তার শরীরের স্পষ্ট রঙগুলির তীব্র পরস্পর-বিরোধিতায় তার পোশাকের রাজকীয় প্রাচুর্যের আমেজে যে প্রঁভাসবাসীটি মুগ্ধ হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে তার অশুভ উপস্থিতি তার চোখ থেকে মায়া কেড়ে নিয়েছিলো। শোনা যায় সাপের দৃষ্টি চুম্বকের মতো নাইটিঙ্গেল পাখিকে আটকে ফ্যালে ; ঘুমন্ত বাঘিনীটির উপস্থিতিও তাকে ঠিক সেইভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো।

কামানের গোলার মুখে দাঁড়াতে যে কাবু হ'তো না, এই বিপদের সামনে সে মুহূর্তের জন্য সাহস হারিয়ে ফেললো। কিন্তু তারপর এক দুঃসাহসী চিন্তা তার প্রাণে সূর্যের আলো জ্বালিয়ে দিলো, শুকিয়ে গেলো কপালের ঠাণ্ডা ঘামের উৎস। দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ যেমন মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে নিজেকে উৎসর্গ করে, সমর্পণ করে দুর্ভাগ্যের হাতে, তেমনি সেও এই অন্তিম নাটিকায় সসম্মানে নিজের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যাবে স্থির করলো।

'গত পরশু আরবরা তো আমাকে মেরে ফেলতে পারতো,' সে বললে নিজের মনে। অতএব নিজেকে মৃত ভেবে নিয়ে সে সাহসভরে উত্তেজিত কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো তার শত্রুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য।

সূর্য উঠলো : হঠাৎ চোখ মেললো বাঘিনী ; বেশ জোর দিয়ে থাবা বাড়িয়ে দিলো, যেন আলস্য কাটাবার জন্য আড়মোড়া ভাঙছে! তারপর হাই তুললো, ভয়ংকর দন্তপাটি এবং উখোর মতো খশখশে কাটা জিভ দৃশ্যমান হ'লো।

'কেমন ন্যাকামি করছে, দ্যাখো,' অমন নরম বেড়াল-ভঙ্গিতে তাকে গড়াগড়ি

দিতে দেখে ফরাশিটির মনে হ'লো। থাবা আর মুখের চারপাশের রক্ত সে চেটে পরিষ্কার ক'রে নিলো, মধুর ভঙ্গিতে মাথা আঁচড়ালো বারবার।

'ঠিক আছে সেজেগুজে নাও,' বললে ফরাশি লোকটি, তার ফুর্তি আর সাহস ততক্ষণে ক্রমে-ক্রমে ফিরে আসছে ; 'একটু পরেই আমরা পরস্পরকে নমস্কার জানাবো,' মুরদের কাছ থেকে যে ছোটো, বেঁটে ছোরাটা নিয়ে এসেছিলো সেটা মুঠোয় নিলো সে।

ঠিক সেই সময়ে মাথা ঘোরালো চিতা : একটুও না ন'ড়ে, একদৃষ্টে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ধাতব চোখের কঠোরতা আর অসহ উজ্জ্বলতায় সে কেঁপে উঠলো, বিশেষত যখন সে এগিয়ে আসতে লাগলো তার দিকে। কিন্তু তবু সে আদরের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলো, চোখে চোখ ফেলে রাখলো বাঘিনীকে মোহাচ্ছন্ন করবার জন্য, নিজের খুব কাছে তাকে এগিয়ে আসতে দিলো ; তারপর যেন পৃথিবীর সব চাইতে রূপসী নারীকে আদর করছে এমন সপ্রেম কোমলতায় মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো, চুলকে দিলো সেই কমনীয় অস্থিখণ্ডে, বাঘিনীর হলুদ পিছনকে যা বিখণ্ডিত করেছে। সবেগে ল্যাজ নাড়তে লাগলো জন্তুটা, নরম হ'য়ে এলো তার দৃষ্টি ; তৃতীয়বার এই উদ্দেশ্যমূলক তোষামোদের পর, বেড়ালরা যে-রকম শব্দে সুখ প্রকাশ করে সেই মর্মরধ্বনি যে-গলা থেকে বেরুলো তা এত শক্তিশালী, এত গভীর যে গির্জের অরগ্যানধ্বনির শেষ অনুকম্পনের মতো তা সারা গুহায় প্রতিধ্বনি তুললো। এই আদরের মূল্য যে কতখানি তা উপলব্ধি ক'রে সে দ্বিগুণ উৎসাহে এমন আদর করতে লাগলো যাতে এই দাম্ভিক রূপোপজীবিনী অবাক, আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়। তারপর যখন নিশ্চিত হ'লো যে তার এই হিংস্র সঙ্গিনীর হিংস্রতা সে প্রশমিত করেছে, (ভাগ্যক্রমে আগের দিনই সঙ্গিনীটির ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছিলো) তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে গুহার বাইরে গেলো ; তাকে যেতে দিলো বাঘিনী, কিন্তু সে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছোনার সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা শরীরে লাফ দিলো, যেন একটা চড়ুই লাফ দিলো এক ডাল থেকে আরেক ডালে ; তার পায়ের সঙ্গে সে নিজের শরীর ঘষলো, বেড়ালের মতোই পিঠ বেঁকিয়ে দাঁড়ালো। কোমল হ'য়ে আসা চোখের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেলো তার অতিথিকে, তারপর এক বন্য চীৎকার বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে : প্রাণীতত্ত্ববিদেরা এই চীৎকারকেই তুলনা করেছেন করাতের ঝাঁঝরির সঙ্গে।

'ও আরো চায়,' মৃদু হেসে ফরাশিটি বললে।

সাহসে ভর ক'রে সে ওর কান নিয়ে খেলতে লাগলো; পেটে আদর করলো, যথাসাধ্য চুলকে দিলো মাথায়। সুফল দেখে ছোরার ডগা দিয়ে তার মাথায় ছোটো-ছোটো বাড়ি দিতে লাগলো সে, মারবার উপযুক্ত সময়টা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু তার শক্ত হাড়ের জন্য শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না।

মরুভূমির সুলতানা সুললিত ভঙ্গিতে তাঁর প্রতি তাঁর দাসের এই মনোযোগকে অনুমোদন জানালেন; মাথা তুলে বাড়িয়ে দিলেন গলা, তাঁর প্রশান্ত ভাব তাঁর চিত্তের আনন্দ জানালো। হঠাৎ সৈন্যটির মনে হ'লো যে এই বন্য রাজকন্যাটিকে এক আঘাতে বধ করার সব চাইতে ভালো উপায় গলায় আঘাত করা।

সে ছোরা তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত বাঘিনী সুললিত ভঙ্গিতে শুয়ে পড়লো তার পায়ের উপর, যে-চোখ তুলে সে সৈন্যটির দিকে তাকালো তাতে তার স্বাভাবিক হিংস্রতা সত্ত্বেও মিশ্রিত শুভেচ্ছার এক অদ্ভুত দৃষ্টি খেলা করছে।

বেচারি সৈনিক! গাছে হেলান দিয়ে ব'সে খেজুর খেতে-খেতে তাকাতে লাগলো মরুভূমির দিকে, যদি কোনো মুক্তিদাতার হঠাৎ আবির্ভাব ঘ'টে সেই আশায়, আর তাকাতে লাগলো তার ভয়ংকর সঙ্গিনীর দিকে, যাতে তার এই অনিশ্চিত কোমলতাটা ভালো ক'রে লক্ষ করতে পারে।

খেজুরের বিচিগুলো যেখানে পড়ছিলো সেদিকে তাকিয়েছিলো বাঘিনী, আর যতবার সৈন্যটি বিচি ছুঁড়ে ফেলছিলো ততবার এক তীব্র অবিশ্বাসের দৃষ্টি ভেসে উঠেছিলো তার চোখে। প্রায় ব্যবসায়িক বিজ্ঞতা নিয়ে সে লক্ষ করছিলো লোকটিকে। অবশ্য তাতে তার কোনো ক্ষতি হ'লো না, কারণ তার যৎসামান্য আহার্য শেষ হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঘিনী তার শক্ত কর্কশ জিভ দিয়ে তার জুতো থেকে চেটে-চেটে আশ্চর্য নিপুণভাবে ভাঁজে-ভাঁজে যত ধুলো জমেছিলো সব পরিষ্কার ক'রে দিলো।

'হ্যাঁ, কিন্তু যখন ওর সত্যি-সত্যি খিদে পাবে!' ভাবলো ফরাশিটি। চিন্তাতেও শিউরে উঠলো সে, কিন্তু তবুও সকৌতূহলে বাঘিনীর আয়তন লক্ষ করতে লাগলো: ওর জাতের মধ্যে ও একটি অতি চমৎকার উদাহরণ তাতে সন্দেহ নেই। ল্যাজ বাদ দিয়ে চিতাটা উচ্চতায় তিন ফিট, লম্বায় চার ফিট। মুগুরের মতো গোল তার ঐ শক্তিধর অস্ত্রটি প্রায় তিন ফিট লম্বা। সিংহীর

মাথার মতো বিশাল তার মুখ এক দুর্লভ সুরুচির ছাপে ব্যক্তিত্বময়। বাঘের চিরন্তন নিষ্ঠুরতার ছাপ আছে সে-কথা সত্যি, কিন্তু তাতেও যেন ছলনাময়ী নারীর মুখের আদল পাওয়া যায়। সত্যিই, এই নিঃসঙ্গ রানীর মুখে যেন মাতাল নিরোর ফুর্তির আমেজ লেগে আছে, রক্ত খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে সে, এখন খেলতে চায়।

সৈন্যটি পায়চারি করবার চেষ্টা করলো, বাঘিনী তাকে ছেড়ে দিলো, নিজে সন্তুষ্ট থাকলো চোখ দিয়ে অনুসরণ ক'রে, সে ব'সে রইলো অনুগত কুকুরের মতো ততটা নয়, যতটা এক বিশাল শ্যামদেশীয় বেড়ালের মতো—অতি সহজে, এমনকি প্রভুর নড়াচড়াতেও যার শান্তির ব্যাঘাত হয়।

ঘুরে তাকিয়ে, ঝর্নার পাশে সৈন্যটি দেখলো তার ঘোড়ার শব প'ড়ে আছে। বাঘিনী ওটা টেনে নিয়ে এসেছে এতদূর। দুই তৃতীয়াংশ খাওয়া হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ওটা দেখে সে একটু নিশ্চিন্ত হ'লো।

গুহা থেকে বাঘিনীর অনুপস্থিতি এবং ঘুমন্ত সৈনিকটিকে রেহাই দেবার কারণ এ-বার বোঝা সহজ হ'লো। এই প্রথম সৌভাগ্যে সাহস পেয়ে সে ভবিষ্যতের কথা ভাবলো : এই অসম্ভব আশা তার মনে বাসা বাঁধলো যে সারাদিন ধ'রেই চিতাটার সঙ্গে সে বন্ধুভাব বজায় রাখবে ; তাকে পোষ মানাবার, তার সহৃদয়তা অর্জন করার কোনো চেষ্টাতেই ত্রুটি করবে না।

সে তার কাছে ফিরে এলো ; অনির্বচনীয় আনন্দ নিয়ে সে দেখলো যে, তাকে আসতে দেখে বাঘিনী প্রায় বোঝা যায় না এমনভাবে ল্যাজ নাড়ছে। ভয়শূন্য হ'য়ে সৈনিকটি গিয়ে তার পাশে বসলো, তারা দু'জনে খেলতে লাগলো। নিজের হাতে সে তুলে নিলো বাঘিনীর থাবা আর মুখ, কান নিয়ে খেলা করলো, গড়িয়ে দিলো উল্টো ক'রে, বাড়ি মারলো তার রেশম-নরম পার্শ্বদেশে। বাঘিনী তাকে তার যা খুশি তাই করতে দিলো, আর সে যখন তার পায়ের লোমে হাত বোলালো তখন সযত্নে থাবা গুটিয়ে রাখলো সে।

সৈন্যটি ছোরায় এক হাত রেখে তখনো ভাবছিলো এই আত্ম-সমর্পণকারী চিতাটির পেটের মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দেবে কি না, কিন্তু তার ভয় হ'লো যে, মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ প্রচেষ্টায় সে হয়তো তাকে পিষ্ট ক'রে মারবে। তাছাড়া যে-প্রাণী তার কোনো ক্ষতি করেনি তার সঙ্গে সসম্মান ব্যবহার করতে আদেশ জানাচ্ছিলো তার হৃদয়। সেই অন্তহীন মরুভূমিতে সে যেন এক বন্ধু লাভ করেছে। অর্ধচেতন ভাবে তার মনে পড়লো তার প্রথম প্রেমিকার কথা

যাকে সে 'মিনন' ছদ্মনাম দিয়েছিলো, ইচ্ছে ক'রে দিয়েছিলো উল্টো নাম, কারণ মেয়েটি ছিলো বিশ্রী রকম ঈর্ষাকাতর, তাদের প্রণয়কালে মেয়েটি তাকে সর্বদা ছুরির কথা ব'লে ভয়ে কাঁটা ক'রে রাখতো।

সেই কবেকার কথা ভাবতে-ভাবতে তার হঠাৎ মনে হ'লো ঐ নামে সাড়া দিতে শেখাবে এই তরুণী বাঘিনীটিকে, কারণ ততক্ষণে অনেক নির্ভীকভাবে সে মুগ্ধ হ'তে পারছে তার দ্রুততা কমনীয়তা আর কোমলতায়। দিন শেষ হ'য়ে আসতে-আসতে তার এই সাংঘাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সে মানিয়ে নিলো নিজেকে; এখন সে যেন প্রায় পছন্দ ক'রে ফেলেছে এই যন্ত্রণা। অবশেষে যতবার সে কৃত্রিম স্বরে 'মিনন' ডাকলো ততবার তার সঙ্গিনী চোখ তুলে তাকানোটা অভ্যাস ক'রে নিলো।

সূর্য অস্ত যাবার সময় মিনন কয়েকবার ছোটাছুটি ক'রে সুগভীর করুণ আর্তস্বরে ডেকে উঠলো। 'শিক্ষাদীক্ষা বেশ ভালোই হয়েছে,' বললে সৈনিকটি। তার মন ততক্ষণে বেশ হালকা হ'য়ে গেছে; 'প্রার্থনা করছে ও।' অবশ্য সঙ্গিনীর সুস্থির ব্যবহারই শুধু তাকে মনে-মনে এই রকম রসিকতা করার সাহস জুগিয়ে ছিলো। 'এসো, আমার ছোট্ট সোনালি মেয়ে, তুমি আগে শুতে যাও,' সে বললে; ঠিক ক'রে রেখেছিলো মিনন ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে পালাবে, অন্য কোনো আশ্রয় জুটিয়ে নেবে রাত্রির জন্য।

অধৈর্য হ'য়ে সৈনিকটি তার পালাবার সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো, এবং সে সুযোগ পাওয়ামাত্র প্রাণপণে ছুটতে লাগলো নীল নদীর দিকে; কিন্তু বালির উপর দিয়ে একটু দূরে যেতে না যেতেই সে শুনতে পেলো বাঘিনী লাফাতে-লাফাতে তার পিছনে আসছে, আর তার সেই লাফানোর শব্দের চাইতে করাত-কর্কশ আর্তনাদ আরো ভয়ানক ব'লে বোধ হচ্ছে।

'আ!' সে বললে, 'তাহ'লে আমাকে ওর পছন্দ হ'য়ে গেছে দেখছি; এর আগে আর কারুর সঙ্গে ওর দেখা হয়নি, এবং ওর প্রথম প্রেমিক হওয়াটা গৌরবের সন্দেহ নেই।' ঠিক সেই মুহূর্তে মরুভূমির আতঙ্ক সেই চোরাবালি, যা থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব তাতে পা দিয়ে ফেললো লোকটি। নিজের বিপদ উপলব্ধি ক'রে সে সভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো; বাঘিনীটি দাঁত দিয়ে তার জামার কলার চেপে ধরলো, তারপর সবেগে পিছনের দিকে লাফ দিয়ে যেন মায়াবলে সেই বালুর ঘূর্ণি থেকে তাকে টেনে তুললো।

'আ, মিনন!' বললে সৈনিকটি, প্রেমভরে সে আদর করলো তাকে; 'আমাদের

আমৃত্যু একসঙ্গে থাকতে হ'বে মনে হচ্ছে—কিন্তু মনে রেখো কোনো রকম বাজে রসিকতা চলবে না।' সে ফিরে এলো।

এরপর মরুভূমিটা আর জনশূন্য বোধ হ'লো না তার। মনে হ'লো সেখানে এমন একজন অন্তত আছে যার সঙ্গে সে কথা বলতে পারে, যার হিংস্রতা সে-ই প্রশমিত করেছে, যদিও তাদের এই বন্ধুতার কোনো ব্যাখ্যাই সে খুঁজে পাচ্ছিলো না। সতর্ক থাকার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সৈন্যটি ঘুমিয়ে পড়লো।

জেগে উঠে মিননকে দেখতে পেলো না; পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখলো অস্থিখণ্ডের অতিরিক্ত কোমলতার জন্য যে-সব পশু দৌড়োতে পারে না, তাদের সকলের মতো সেও লাফাতে-লাফাতে দূর থেকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। রক্তমাখা চোয়াল নিয়ে উপস্থিত হ'লো মিনন, গলা দিয়ে গরগর শব্দ ক'রে তার সঙ্গীর আদর নিতে-নিতে সে বুঝিয়ে দিলো কত সুখী হয়েছে সে। লাস্যেভরা তার দুটি কোমল চোখ, প্রঁভাসবাসীটির প্রতি আরো নরম দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো, আর সৈন্যটি গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকলো।

'কী শ্রীমতী! লক্ষী মেয়ে তুমি, তাই না? ছাখো একবার। তাহ'লে আমাদের নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে আমাদের সকলেরই সেটা বেশ পছন্দ হয়? তোমার লজ্জা করছে না? কোনো আরব কি অন্য কাউকে ধ'রে খেয়ে এলে তো? ঠিক আছে, তাতে কিছু এসে যায় না। তারাও তো তোমার মতোই জানোয়ার; কিন্তু ফরাশিদের আবার খেতে এসো না যেন, তাহ'লে কিন্তু আমি আর তোমাকে ভালবাসবো না।'

প্রভুভক্ত কুকুরের মতো সৈন্যটির সঙ্গে সে খেলা করতে লাগলো, সৈন্যটি তাকে একবার গড়িয়ে দিলো, একবার ধাক্কা দিলো, একবার চাপড় মারলো, সে বাধা দিলো না; মাঝে-মাঝে সে থাবা তুলে বন্ধুভাবে সৈন্যটিকে আহ্বান জানাতে লাগলো।

এইভাবে কেটে গেলো কয়েকটা দিন। এই সঙ্গটুকু লাভ ক'রে সৈন্যটি মরুভূমির স্বর্গীয় শোভা দর্শন করার সুযোগ পেলো; যার বিষয়ে সে চিন্তা করতে পারে, যার জন্য একবার সে ভীত হয়, আর একবার চিত্তের ধীরতা ফিরে পায়, এমন আরেকটি প্রাণ পেয়ে, প্রচুর খাদ্য পেয়ে, পরস্পরবিরোধী রসে তার মন ভ'রে উঠলো, বৈচিত্র্য এলো তার জীবনে।

নিস্তব্ধতা তার কাছে সকল গোপন রহস্য উন্মোচন করলো। তাকে আচ্ছন্ন করলো স্তব্ধতার সুখানুভূতি। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সে সর্ব জগতের অপরিচিত এক দৃশ্য আবিষ্কার করলো। মাথার উপর দিয়ে কচিৎ কখনো যদি পাখির ডানার মৃদু মর্মর ভেসে আসতো, বহু-বর্ণের, পরিবর্তন শীল মেঘের দলকে সে পরস্পরের মধ্যে গ'লে যেতে দেখতো, তখন সে জানতো শিহরণ কাকে বলে। রাত্রে সে দেখতো বালির সমুদ্রের বুকে চাঁদের আলো পড়লে কী ফল হয়, দেখতো চন্দ্রালোকে ঢেউয়ের গতি দ্রুত হয়েছে, সত্বর বদলে যাচ্ছে তারা। এই তো প্রাচ্য-দেশ, যার রূপের কথা এত শুনেছে।
সমতল ভূমির উপর ঝড়ের তাণ্ডবের পর, বালির ঘূর্ণি যেখানে লাল, কুয়াশাচ্ছন্ন মৃত্যুর মতো ভয়ংকর মেঘ নামাতো, সে অভ্যর্থনা জানাতো রাত্রিকে, কারণ তখন উঠে আসতো স্বাস্থ্যকর সতেজ তারা, আকাশের গায়ে সে শুনতে পেতো কাল্পনিক গান। স্তব্ধতা তাকে শেখালো স্বপ্নের সম্পদ নিয়ে ভ'রে থাকতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কাটিয়ে দিতো শূন্যকে স্মরণ ক'রে, তুলনা করতো বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীত জীবনের।
শেষ পর্যন্ত সে উদ্দাম আবেগে ভালোবাসলো চিতাটাকে ; কারণ কোনো না কোনো ভালবাসা তার পক্ষে অপরিহার্য ছিলো। হয়তো সৈন্যটির নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই বাঘিনীর স্বভাবে কোমলতা এসেছিলো, হয়তো তার মরুভূমি-বিচরণে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতো ব'লেই সে এই মানব-প্রাণটির সম্মান রক্ষা করেছিলো, কিন্তু তাকে ওভাবে পোষ মেনে যেতে দেখে সৈন্যটির সব ভয় দূর হ'য়ে গেলো।
বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটাতো সে, কিন্তু জালের মধ্যে মাকড়শার মতো তাকে লক্ষ রাখতে হ'তো যাতে তার মুক্তির মুহূর্তটি হারিয়ে না যায়। যদি কখনো কোনো মানুষ চ'লে যায় দিগন্তরেখার উপর দিয়ে, এই ভেবে সার্টের মায়া ত্যাগ ক'রে তা দিয়ে পতাকা বানিয়েছে, খেজুর গাছের মাথায় লতা-পাতা সরিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে সেই নিশানা। ঠেকলে মানুষ সব শেখে, ছোটো-ছোটো কাঠি দিয়ে নিশানাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে ; কারণ সেই পথিক যখন মরুভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করবে তখন বাতাস হয়তো নাও বইতে পারে।
যখন সব আশা তাকে ছেড়ে যেতো তখন সেই দীর্ঘ প্রহরগুলি সে কাটাতো চিতার সঙ্গে খেলা ক'রে। তার গলার বিচিত্র স্বর আর তার চোখের বিচিত্র

অভিব্যক্তির অর্থ ততদিনে বুঝতে শিখেছে সৈনিকটি; সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছিলো তার সোনার পোশাকের গায়ে আঁকা বিচিত্র ফুলের কুঁড়ি। সে যখন তার সঙ্গিনীর ল্যাজের চুল ধ'রে উঁচুতে তুলে তার গোল দাগগুলি গুনতো তখন একটুও রাগ করতো না মিনন, তার সেই লাবণ্যেভরা আভরণ-গুলি রোদে জ্বলতো মহামূল্যবান পাথরের মতো। বাঘিনীর দেহের নমনীয়, সূক্ষ্ম রেখাগুলি, তার পেটের শুভ্রতা, তার মাথার লালিত্যময় ভঙ্গি—সব দেখতে ভালো লাগতো তার। কিন্তু তখনই তাকে দেখতে সব চাইতে ভালো লাগতো যখন মিনন খেলতো। তার তৎপরতা আর যৌবনোচিত হাল্কা চলাফেরা দেখে তার বিস্ময় আর শেষ হ'তো না; যে-নমনীয় ভঙ্গিতে মিনন লাফাতো, পাহাড়ে চড়তো, গা-ধুয়ে লোম গোছাতো, হাঁটু-গেড়ে ব'সে লাফাবার জন্য প্রস্তুত হ'তো—সব সে অবাক হ'য়ে দেখতো। যত দ্রুতই লাফাক, যত পিছল পাথরের উপর-ই পা যাক, 'মিনন' ডাকটি কানে পৌঁছনোমাত্র স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়তো বাঘিনী।

একদিন, উজ্জ্বল দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্রালোকে, কোথা থেকে যেন বাতাসে ভেসে চ'লে এলো এক বিশাল পাখি। এই নতুন অতিথিকে দেখার জন্য চিতাকে তখনকার মতো ছেড়ে দিলো লোকটি; কিন্তু একমুহূর্ত অপেক্ষা ক'রেই গম্ভীর গর্জন ক'রে উঠলেন এই অবহেলিত সুলতানা।

'হায় কপাল! ওর হিংসে হয়েছে দেখছি।' মিননের দৃষ্টির কঠোরতা লক্ষ ক'রে বললে সৈনিকটি, 'তার সেই প্রেমিকা জিনির আত্মা ওকে ভর করেছে নিশ্চয়ই।'

ঈগল পাখিটি মিলিয়ে গেলো শূন্যে, সৈনিকটি চিতার মুখপার্শ্ব মুগ্ধ নয়নে দেখতে লাগলো।

কিন্তু কী আশ্চর্য যৌবন আর লাস্য ওর দেহের গড়নে। নারীর মতো রূপসী ও। পোশাকের সোনালি পশমগুলি গায়ের পাশের কোমল শ্বেত রঙের আভার সঙ্গে কি সুন্দর মিশে গেছে। সূর্যের উদার আলোকে সেই জীবন্ত সোনা, গায়ের সেই রাঙা চিহ্ন অনির্বচনীয় আকর্ষণ নিয়ে জ্বলতে থাকলো।

তারা পরস্পরের দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো; বন্ধুর করস্পর্শে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো ছলনাময়ী; বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে উঠলো তার চোখ—তারপর জোর ক'রে সে চোখ বুঁজে রইলো।

'ওর আত্মা আছে,' বালির সম্রাজ্ঞী, বালির মতোই সোনালি, বালির মতোই শ্বেতশুভ্র, বালির মতোই জ্বলন্ত সেই সম্রাজ্ঞীর শুদ্ধতা দেখে সৈন্যটি বললে।

সে বললে, 'জানোয়ারদের সপক্ষে তোমার যুক্তি শুনলাম; পরস্পরকে এত ভালো ক'রে বোঝবার পর ওদের পরিণতিটা কী হ'লো?'

'ও, সে-কথা! মানে—বুঝলে, সব আবেগেরই যা পরিণতি—ভুল বোঝাবুঝিতেই তাদের এই আবেগের সমাপ্তি ঘটেছিলো। ওরা ঝগড়া করলো, এবং শুধুমাত্র জেদের বশে বিচ্ছিন্ন হ'লো।'

'কিন্তু কখনো-কখনো এমন মুহূর্তও তো আসে যখন একটা ছোটো কথা কি একবার চোখ তুলে তাকানোই যথেষ্ট—কিন্তু সে যাই হোক, তুমি তোমার গল্প ব'লে চলো।'

'ভয়ংকর শক্ত সেটা,—কিন্তু তুমি বুঝবে,'—শ্যাম্পেন পানের পর লোকটা আমাকে যা বলেছিলো তাই বলছি—বলেছিলো,—'আমি ওকে ব্যথা দিয়েছিলাম কিনা জানিনা, কিন্তু হঠাৎ ও ঘুরে দাঁড়ালো, যেন রেগে গেছে, তারপর তার ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো আমার গলা—অবশ্য আলতো ক'রে; কিন্তু আমি, ও আমাকে খেয়ে ফেলবে মনে ক'রে আমি তার গলায় আমার ছোরা বসিয়ে দিলাম। গড়িয়ে গেলো সে, তার চীৎকারে আমার হৃদয় হিম হ'য়ে জ'মে গেলো। আর আমি তাকে মরতে দেখলাম, মরতে-মরতেও সে আমার দিকে ক্রোধশূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। সারা পৃথিবী আমি দিয়ে দিতে পারতাম—এমনকি আমার প্রাণও, যদিও সেটা সম্ভব ছিলো না—তাকে প্রাণে ফিরিয়ে আনতে সর্বস্ব দিতে পারতাম আমি। আমার মনে হচ্ছিলো সত্যি-সত্যি একজন মানুষকে আমি হত্যা করলাম। আমার নিশানা লক্ষ ক'রে যে-সেনাদল আমাকে সাহায্য করতে এলো তারা দেখলো চোখের জলে আমি ভেসে যাচ্ছি।'

'বুঝলেন মশাই,' একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, 'তারপর জর্মানিতে, স্পেনে, রাশিয়ায়, ফ্রান্সে আমি যুদ্ধ করলাম; অনেক দেখেছি কিন্তু মরুভূমির মতো আর-কিছু দেখিনি। আহা, সত্যি, মরুভূমি সত্যি সুন্দর।'

'কেমন লেগেছিলো তোমার সেখানে?' আমি জিগেস করলাম।

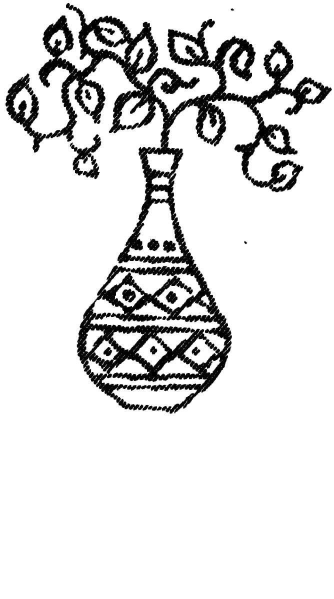
'সেটা মুখের কথায় বলা যায় না। বুঝলে হে। তাছাড়া সব সময়ই কি

আর সেই খেজুর গাছ আর চিতাকে নিয়ে হাহুতাশ করি। তাহ'লে তো সারাক্ষণই মনমরা হ'য়ে থাকতাম। মরুভূমিতে বুঝলে, মরুভূমিতে সবই আছে, আবার কিছুই নেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'মানে,' অধৈর্য সহকারে সে ব'লে উঠলো, 'মরুভূমি হ'লো মানবিহীন ঈশ্বর।'

অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত





কর্ত্রী থেকে দাসী

আলেকজাণ্ডার সার্জিয়েভিচ পুশকিন

রাশিয়ার এক প্রান্তবর্তী প্রদেশে ইভান পেট্রোভিচ বেরেস্টভের জমিদারি ছিলো। যৌবনে তিনি কিছুদিন রাজার দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ১৭৯৭ সালের শুরুতেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর গ্রামে ফিরে এলেন; তারপর আর সেখান থেকে নড়েননি। তিনি এক সদ্বংশের নিঃস্ব মহিলাকে বিবাহ করেন। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী যখন মারা যান, সেই সময়ে তিনি জমিদারির তদারকে বাইরে ছিলেন। নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে শিগ্‌গিরই তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। নিজের পরিকল্পনায় একটি বাড়ি তৈরি করলেন, কাপড়ের কল বসালেন, খাজনা বাড়িয়ে দিলেন তিনগুণ এবং নিজেকে শহরের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব'লে মনে করতে শুরু করলেন। যে-সব প্রতিবেশীরা সপরিবারে কুকুর নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদেরও সে-বিষয়ে মতভেদ ছিলো না। কাজের দিনে তিনি একটা মখমলের কোর্তা চাপাতেন, কিন্তু রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে নিজের কলে তৈরি কাপড়ের একটি বিশেষ ধরনের আলখাল্লা প'রে বেরোতেন তিনি। নিজেই খরচপত্রের

হিশেব রাখতেন—এবং 'সেনেটের ইস্তাহার' ব্যতীত অন্য কিছু কখনো পড়তেন না।

কিছুটা দাম্ভিক ব'লে মনে হ'লেও সব মিলিয়ে সকলেই তাঁকে পছন্দ করতো। শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিলো না—তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী গ্রিগরি ইভানোভিচ মুরোম্‌স্কি। এই শেষোক্ত ভদ্রলোকটি ছিলেন খাঁটি রুশ। মস্কোতে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ উড়িয়ে দিয়ে এবং প্রায় সেই একই সময়ে বিপত্নীক হ'য়ে অবশিষ্ট জমিদারির দেখাশোনা করতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর অমিতব্যয়ী স্বভাবকে এখানেও অনবরত প্রশ্রয় দিলেন, তবে অন্যভাবে। যা খাজনা পেতেন তার প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় ক'রে তিনি বিলিতি কায়দায় বাগান সাজালেন। তাঁর বরকন্দাজরা ইংরেজ জকিদের মতো পোশাক পরতো, কন্যার জন্যে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা রাখা হ'লো, জমি চাষ করালেন বিলিতি পদ্ধতিতে।

কিন্তু বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণ করলে রুশ শস্য কুফল দেয়। তাই চাষের খরচ ক'মে যাওয়া সত্ত্বেও গ্রিগরি ইভানোভিচ খাজনা বাড়াতে পারলেন না। তিনি নানাস্থানে নতুন ঋণ সংগ্রহের উপায় বার করলেন, এমনকি গ্রামেও। তবুও কেউ তাঁকে নির্বোধ ভাবতো না, কারণ তাঁর প্রদেশে তিনিই প্রথম জমিদার যিনি—পরিষদের কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখবার কথা চিন্তা করেছিলেন। সেই সময়ে এই কাজ অত্যন্ত জটিল এবং দুঃসাহসিক ব'লে ভাবা হ'তো। এই জন্যে যাঁরা তাঁর নিন্দাবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেরেস্টভ ছিলেন সবচেয়ে প্রবল। যে-কোনো পরিবর্তনের প্রতি ঘৃণা তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রতিবেশীর বিলিতিয়ানা সম্বন্ধে কিছুতেই তিনি শান্তভাবে কথা বলতে পারতেন না, আর এই প্রতিবেশীটির সমালোচনা করবার সুযোগ মিলেও যেতো অনবরত। যদি কোনো অতিথিকে তিনি তাঁর জমিদারি দেখাতে নিয়ে যেতেন, তার মিতব্যয়ী ব্যবস্থাপনার জন্যে বর্ষিত প্রশংসার জবাবে তিনি চতুর হেসে বলতেন :

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার প্রতিবেশী গ্রিগরি ইভানোভিচের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কোনোই মিল নেই। রুশ উপায়েই যদি আমরা দারিদ্র্য ঠেকিয়ে রাখতে পারি তাহ'লে বিলিতি কায়দায় নিজেদের সর্বনাশ করবার দরকার কি!'

এই ধরনের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, উপকারী প্রতিবেশীদের আগ্রহের দাক্ষিণ্যে, যথেষ্ট অলংকৃত হ'য়ে গ্রিগরি ইভানোভিচের কানে পৌঁছতে দেরি হ'তো না।

ইঙ্গ-প্রেমিকেরা সমালোচনা সহ্য করা বিষয়ে সাংবাদিকদের মতোই ধৈর্যহীন। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তার প্রতিপক্ষকে অসভ্য এবং গ্রাম্য ব'লে গাল দিতেন।

যখন বেরেস্টভের ছেলে গ্রামে ফিরলো দুই জমিদারের মধ্যে তখন এই রকমই সম্পর্ক চলছিলো। ছেলেটি পড়াশুনো করেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক—কিন্তু এই প্রস্তাবে তার পিতা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না। অথচ সরকারি চাকরিতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, এবং যেহেতু পরস্পর পরস্পরের প্রস্তাবে সম্মত হ'তে উৎসুক নন, যুবক আলেক্সি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হ'য়ে দিন কাটাতে লাগলো এবং গোঁফজোড়াকে স্বাধীনভাবে বাড়তে দিলো।[১]

আলেক্সি নিঃসন্দেহে সুদর্শন যুবক। তার সেই সুঠাম দেহ যদি কোনোদিন সামরিক পোশাক পরবার সুযোগ না পায় এবং যদি সে অশ্বপৃষ্ঠের বদলে আদালতের আপিশে কাগজের ওপর ঘাড় গুঁজে যৌবন কাটাতে বাধ্য হয়, তাহ'লে সেটা সত্যিই দুঃখের কথা হবে। শিকারের সময় সে এখন মাঠ পার হ'য়ে শিকার ধরবার জন্য এগিয়ে যায়, তা দেখে তার প্রতিবেশীরা একমত হতে বাধ্য যে সত্যিই সে কেরানি হবার জন্যে তৈরি হয়নি। তরুণীরা তার প্রতি কটাক্ষপাত করে, তাকে দেখে কখনো-কখনো তারা চোখ ফেরাতে পারে না। কিন্তু আলেক্সি এ-সব বিষয়ে মাথাই ঘামাতো না এবং তরুণীরা তার এই নিরাসক্তির জন্যে কোনো এক গোপন প্রণয়কে দায়ী করতো। সত্যিই, তাদের হাতে-হাতে তার একটা ঠিকানা লেখা চিঠি ঘুরতো: 'আকুলিনা পেট্রোভনা কুরোচকিনা সমীপেষু, মস্কো, আলেক্সিয়েভস্কি মঠের সম্মুখে কাঁসারি সাভোলিয়ভের বাটি, অনুরোধ তিনি যেন এ এন আর.-কে পত্রখানা হস্তান্তরিত করেন।'

আমার যে-সব পাঠক কখনো গ্রামাঞ্চলে থাকেননি, এই সব গ্রামের মেয়েরা যে কী আকর্ষণীয় হয় তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। নির্মল বাতাসে, নিজেদের আপেল গাছের ছায়ায় বেড়ে ওঠে তারা, পৃথিবী এবং জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে কেবল বই প'ড়ে। নির্জনতা, স্বাধীনতা এবং পঠনের ফলে তাদের যে-অনুভূতি আর আবেগ দ্রুত গ'ড়ে ওঠে তা শহরে প্রতিপালিত

১ আগে রুশদেশে কেবলমাত্র সেনাবিভাগের লোকেরাই গোঁফ রাখতেন।

সুন্দরীদের অজানা। এই মফস্বলবাসিনীদের কাছে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার আওয়াজ শোনা এক দারুণ ব্যাপার, নিকটতম গ্রামে বেড়াতে যাওয়া জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, আর বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তো সেই স্মৃতি তাদের মনে কখনো-কখনো চিরন্তন হ'য়ে থাকে। অবশ্য তাদের কতগুলো অদ্ভুত আচরণে হাসবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সেই সব আপাত দর্শকদের মস্করা তাদের মূল প্রতিভাকে বাতিল ক'রে দিতে পারে না; আর তাদের প্রধান প্রতিভা বোধ হয় সেই চারিত্রিক গুণ—স্বাতন্ত্র্য—জঁ৷ পলের মতে যা ব্যতীত মানবিক মহত্ত্ব সম্ভব নয়। রাজধানীতে মহিলারা হয়তো ভালো শিক্ষা পেতে পারেন কিন্তু জগতের সঙ্গে মেলামেশা চরিত্রকে সহজ ক'রে দেয় এবং সকলের আত্মাই যেন তাদের কেশবিন্যাসের মতো একই ধরনের হ'য়ে ওঠে। এটা আমি কিছু বিচার করবার ভঙ্গিতে বা নিন্দে ক'রে বলছি না, কিন্তু যেমন সেই প্রাচীন টীকাকার বলেছিলেন: 'আমাদের ধারণাই ঠিক।'

তরুণীদের আসরে আলেক্সি যে কী এক ধারণা তৈরি করেছিলো তা সহজেই কল্পনা করা যায়। তাদের কাছে সে-ই প্রথম যে বিষণ্ণ এবং উদাসীন, যে হারানো আনন্দ আর ক্ষয়িষ্ণু যৌবন বিষয়ে কথা বলে; উপরন্তু আঙুলে এক মড়ার মাথা আঁকা কালো আংটি পরতো। এই সমস্তই সেই মফস্বলে অত্যন্ত অভিনব। অল্পবয়সী মেয়েরা সব তার জন্যে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলো।

কিন্তু তাদের কেউই আমাদের ইঙ্গ-প্রেমিকের কন্যা লিজার (অথবা বেট্সী, যা ব'লে গ্রিগরি ইভানোভিচ সাধারণত ডাকেন) মতো ঔৎসুক্য অনুভব করেনি। যখন সকল প্রতিবেশী-কন্যাদের কথাবার্তার একমাত্র বিষয় আলেক্সি, পরস্পরের পিতাদের অসদ্ভাবের জন্যে লিজা কিন্তু তখনো তাকে দেখেনি। তার বয়স সতেরো। কালো চোখ আলোকিত করেছিলো তার শ্যামল এবং আশ্চর্য প্রীতিপদ চেহারাটিকে। সে ছিলো একমাত্র সন্তান এবং অনিবার্য-ভাবেই অত্যন্ত আহ্লাদী। লিজার উচ্ছলতা এবং অবিরাম দুষ্টুমিতে তার বাবা বিগলিত হ'য়ে যেতেন। আর তার গৃহশিক্ষিকা, চল্লিশ বৎসর বয়স্কের আত্মসচেতন মিস জ্যাকসনের হৃদয় হতাশায় ভ'রে যেতো, যিনি মুখে পাউডার ঘ'ষে, ভুরু কালো ক'রে বছরে দু-বার আদ্যোপান্ত 'পামেলা' পড়েন: এর জন্যেই দু-হাজার রুব্‌ল পান এবং এই বর্বর রাশিয়ার একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তিতে মরেন।

নাস্তিয়া ছিলো লিজার পরিচারিকা। বয়সে কিছু বড়ো হ'লেও সে প্রায় তার কর্ত্রীর মতোই দুর্দান্ত। তাকে লিজার খুব পছন্দ—সব গোপন কথা তার কাছে বলতো, একসঙ্গে দুষ্টুমির ফন্দি আঁটতো, এক-কথায় ফরাশি ট্রাজেডির বিশ্বস্ত সখীর চেয়েও সেই প্রিলুচিনো শহরে নাস্তিয়া অনেক জরুরি ব্যক্তি ছিলো।

'আজ আমাকে এক জায়গায় দেখা করতে যেতে দেবে দিদিমণি?' একদিন সকালে তাকে সাজাতে-সাজাতে নাস্তিয়া জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু যাবি কোথায়?'

'টুগিলোভোর বেরেস্টভদের বাড়ি। তাদের রাঁধুনির বউ-এর আজ নামকরণ করা হবে, আমাদের খেতে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে।'

'বেশ মজা তো!' লিজা বললো, 'মনিবে-মনিবে ঝগড়া, এদিকে ভৃত্যরা পরস্পরকে ভোজ দিচ্ছে।'

'কর্তাদের সঙ্গে আমাদের কী?' নাস্তিয়া জবাব দিলো, 'তাছাড়া আমি তোমার কাজ করি, বাবার তো নই। বেরেস্টভের ছেলের সঙ্গে আর তো তোমার কোনো ঝগড়া নেই। বুড়োরা যদি আনন্দ পায় তো তারা যত খুশি ঝগড়া মারামারি করুক।'

'নাস্তিয়া শোন্, আলেক্সি বেরেস্টভকে একটু দেখবার চেষ্টা করিস—কী রকম দেখতে, কেমন ধরনের মানুষ সব আমাকে এসে বলবি।'

নাস্তিয়া তাই কথা দিলো আর সারাদিন লিজা অধৈর্য হ'য়ে রইলো। অবশেষে সন্ধেবেলা নাস্তিয়া এসে উপস্থিত হ'লো।

'এই যে লিজাভেটা গ্রিগোরিয়েভনা,' ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে সে বললো, 'বেরেস্টভের ছেলেকে দেখে এলাম। খুব ভালো ক'রে দেখেছি—সারাদিন তো একসঙ্গে ছিলাম আমরা।'

'কী ক'রে থাকলি রে? বল্, আমাকে বল্—যা-যা হ'য়েছে স-ব বল।'

'বলছি। আমরা তো রওনা হলাম—আমি, আনিসিয়ো, ইয়োগোরোভনা, নেনিলা, ডুঙ্কা…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা আমি জানি—তারপরে কী হ'লো?'

'তোমার অনুমতি নিয়ে আমি সব-কিছুর বর্ণনা দিচ্ছি। ঠিক খাবার সময়ে গিয়ে পৌছলাম আমরা। ঘর-ভর্তি লোক। কোলবিনো থেকে, জাখারিয়েভো থেকে, খ্লুপিনো থেকে সব লোকজন এসেছে, গোমস্তার বউ-মেয়েরা…'

'ঠিক আছে, আর বেরেস্টভ ?'

'একটু সবুর করো—আমরা তো টেবিলে বসলাম। গোমস্তার বউ ছিলো প্রধান অতিথি, আমি বসেছিলাম ঠিক তার পাশেই। মেয়েগুলো অবশ্য মনে-মনে রাগ করছিলো, আমি গ্রাহ্য করিনি—'

'উঃ ভগবান, তোর এই অন্তহীন খুঁটিনাটি যে কী ক্লান্তিকর না!'

'কী অধৈর্য তুমি দিদিমণি। টেবিল ছেড়ে উঠে আমরা তো বসবার ঘরে গেলাম—হ্যাঁ, ঘণ্টা তিনেক ছিলাম সেখানে; খাবার-দাবার চমৎকার হয়েছিলো. প্যাস্ট্রি। নীল, লাল আর ডুরে কাটা—আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা সেখান থেকে বাগানে গেলাম সেই দড়ির খেলাটা খেলবার জন্যে—আর···আর ঠিক এই সময়েই ছোট কর্তা এসে ঢুকলেন।'

'সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে নাকি রে?'

'অদ্ভুত ভালো চেহারা: লম্বা, মজবুত আর গোলাপি গালে···'

'সত্যি? আর আমার কিনা ধারণা ছিলো যে সে খুব ম্লান। কী রকম মনে হ'লো রে তোর? বিষণ্ণ, ভাবুক··· ?'

মোটেই সে-রকম না! এমন পাগল বাপু আমি আমার জীবনে দেখিনি। আমাদের খেলায় এসে যোগ দিলেন।'

'তোদের ঐ দড়ির খেলায় যোগ দিলেন? অসম্ভব!'

'একটুও অসম্ভব নয়। আর জানো? খপ ক'রে ধ'রে চুমু খান।'

'নাস্তিয়া, তুই বানিয়ে বলছিস।'

'আমি একটুও বানাচ্ছি না। সমস্ত দিন তিনি আমাদের সঙ্গে কাটালেন। তাঁর কাছ থেকে চ'লে আসতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে আমাকে।'

'কিন্তু ওরা যে বলে সে নাকি কার প্রেমে প'ড়ে আছে, অন্য কারো দিকে নজরই নেই?'

'আমি বাপু সে-বিষয়ে কিছু জানি না। এটুকু জানি যে তিনি আমার দিকে বেশ নজর দিয়েছিলেন—গোমস্তার মেয়ে টানিয়া আর কোলবিনোর পাশার প্রতিও বেশ—। কিন্তু তা ব'লে অশোভন বা অভদ্র ব্যবহার করেছেন তা কিছুতেই বলা চলে না।'

'অসাধারণ না রে! বাড়ির লোকজনেরা তার সম্বন্ধে কী বললো?'

'ওরা তো বললো উনি খুব ভালো মনিব—এতো দয়ালু, এতো ফুর্তিবাজ। শুধু একটা দোষ মেয়েদের পেছনে ছুটতে একটু বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু

আমার মনে হয় এটা এমন কিছু একটা দোষ না—ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'ইশ্, আমার যে কি ইচ্ছে করছে না তাকে দেখতে!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো লিজ়া।

'এমন শক্তটা কি? এই তো দু-মাইলের পথ টুগিলোভো। ওই দিকে হাঁটতে যাও না কেন, কিংবা ঘোড়ায় চ'ড়েও যেতে পারো—নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। রোজ ভোরে উনি বন্দুক নিয়ে বেরোন।'

'না, না, তা হয় না। হয়তো ভাববে আমি ওর পেছনে ছুটছি। তা-ছাড়া বাবাদের মধ্যে তো ভালো সম্পর্ক নেই, আমিও তাই ওর সঙ্গে মিশতে পারি না।.... আ! এই নাস্তিয়া কী করবো জানিস? চাষী মেয়ে সাজবো।'

'ঠিক বলেছো। একটা মোটা জামা আর ঘাগরা প'রে নির্ভয়ে টুগিলোভোয় চ'লে যাও; আমি ব'লে দিতে পারি তোমাকে দেখলে বেরেস্টভ কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না।'

'আর আমি তো এখানকার চাষীদের ভাষা জানি-ই! আঃ নাস্তিয়া! নাস্তিয়া রে! কী দারুণ ফন্দি বের করেছি!'

নিজের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লিজ়া শুতে গেলো।

পরদিন সকাল থেকেই প্রস্তুতিপর্ব শুরু হ'লো। বাজার থেকে কিছু খাপি লিনেন, নীল সুতির কাপড় আর সীসের বোতাম আনানো হ'লো। তারপর নাস্তিয়ার সাহায্যে নিজেই জামা আর ঘাগরা ছেঁটে ফেললো লিজ়া। তার অন্যসব পরিচারিকাদের সেলাই করতে বসিয়ে দেওয়ায় বিকেলের মধ্যেই পোশাকটা তৈরি হ'য়ে গেলো। নতুন পোশাকটা প'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজের কাছেই স্বীকার না ক'রে পারলো না যে এতো আকর্ষণীয় তাকে আগে কখনো লাগেনি। তারপর একবার মহড়া দিয়ে নিলো সে। হাঁটতে-হাঁটতে একবার নিচু হ'য়ে অভিবাদন করলো, খেলার বেড়ালের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালো কয়েকবার, চাষাদের মতো গ্রাম্য ভাষায় কথা ব'লে জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে আস্তে হাসলো—এবং নাস্তিয়ার সম্পূর্ণ অনুমোদন পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো। শুধু একটিমাত্র কাজ অসুবিধাজনক লাগলো তার—উঠোনে খালি পায়ে চলা অভ্যেস করতে গিয়ে তার নরম পায়ে শুকনো ঘাস ফুটতে লাগলো, বালি-কাঁকর সইতে পারলো না। তক্ষুনি নাস্তিয়া লিজ়ার পায়ের মাপ নিয়ে মেষপালক ট্রোফিমের কাছে ছুটলো একজোড়া দড়ির জুতোর ফরমাশ নিয়ে।

পরদিন মোরগ-ডাকা ভোরে লিজা জেগে উঠলো। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে। শুধু নাস্তিয়া দরজায় অপেক্ষা করছে মেষপালকের জন্যে। শিঙের শব্দ শোনা গেলো, খামার থেকে ভেড়ার পাল বেরিয়ে এলো, আর ট্রোফিম যাবার পথে আধ রুব্‌ল দাম নিয়ে ছোট্ট একজোড়া রঙিন দড়ির জুতো দিলো নাস্তিয়ার হাতে। লিজা নিঃশব্দে চাষীর পোশাক গলিয়ে মিস জ্যাকসন বিষয়ে নাস্তিয়াকে ফিশ-ফিশ ক'রে কিছু নির্দেশ দিলো, তারপর পেছনের সিঁড়ি বেয়ে রান্নাঘরের বাগানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো পেছনদিককার মাঠে।

পুবের আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে, মেঘের সোনালি রেখায় সূর্যের অপেক্ষা, যেন সভাসদের অপেক্ষা সম্রাটের জন্যে। পরিষ্কার আকাশ, ঝকঝকে সকাল, শিশির, হাল্কা-হাওয়া আর পাখির গান ছেলেমানুষি আনন্দে লিজার মন ভ'রে দিলো। পাছে কোনো পরিচিতের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় সেই ভয়ে সে যেন পাখা পেলো, যেন সে হাঁটছে না, উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার বাবার জমিদারির সীমায় কুঞ্জবনের কাছে পৌঁছে গতি মন্থর হ'য়ে এলো লিজার। আলেক্সির জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবে ব'লে মনস্থ করলো সে। বুঝতে পারলো না কেন তার বুকের মধ্যে এমন প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে ; কিন্তু এই আশঙ্কাই কি আমাদের যৌবনের মত্ততার সবচেয়ে বড়ো রোমাঞ্চ নয় ? লিজা কুঞ্জবনের মধ্যে প্রবেশ করলো। ঘনসন্নিবিষ্ট, তরঙ্গায়িত শাখা মর্মর শব্দে সেই মেয়েটিকে অভ্যর্থনা জানালো। তার আনন্দের উচ্ছলতা আর নেই ; ধীরে-ধীরে সে এক মধুর স্বপ্নে নিজেকে ভাসিয়ে দিলো। সে ভাবলো···কিন্তু একটি সতেরো বছরের তরুণী বসন্তের সকালে একলা কুঞ্জবনে কী ভাবে, তা কে বলতে পারে ? আর তাই সে লম্বা গাছের ছায়া-ভরা পথ বেয়ে চলতে লাগলো একান্ত বিভোর হ'য়ে। হঠাৎ একটা চমৎকার শিকারী কুকুর তাকে দেখে চিৎকার ক'রে উঠলো। লিজা সভয়ে আর্তনাদ ক'রেই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, 'আয় আয় স্‌বোগার—এদিকে—' এবং সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ শিকারী বেরিয়ে এলো ঝোপের পেছন থেকে।

'ভয় পেয়ো না' লিজাকে বললো সে, 'আমার কুকুর কামড়ায় না।'

ইতিমধ্যেই লিজা ভয় সামলে নিয়েছিলো, এই সুযোগ সে বৃথা যেতে দিলো না।

'কিন্তু' ভীত চকিত ভঙ্গিতে বললো সে, 'আমার এতো ভয় করছে, কি ভয়ানক চেহারা ওর—এক্ষুনি আবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

আলেক্সি—পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তাকে চিনতে পেরেছেন—স্থির দৃষ্টিতে সেই অল্পবয়সী চাষী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার যদি ভয় করে আমি সঙ্গে যেতে পারি', সে তাকে বললো, 'সঙ্গে হাঁটলে আপত্তি নেই তো?'

'আপনাকে বাধা দেবে কে?' লিজ়া জবাব দিলো, 'একজন স্বাধীন মানুষ তার যা-ইচ্ছে করতে পারে, তাছাড়া রাস্তা তো সকলের।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'প্রিলুচিনোতে। ভাসিলি কর্মকারের মেয়ে আমি, ব্যাঙের ছাতা তুলতে এসেছি। (লিজ়ার হাতে একটা ঝুড়ি ছিলো) আর আপনার? নিঃসন্দেহে টুগিলোভোতে।'

'ঠিক তাই,' আলেক্সি বললো, 'আমি ছোট কর্তার কাছে কাজ করি।'

আলেক্সি নিজেকে তার সমপর্যায়ে আনতে চাইলো; কিন্তু লিজ়া তার দিকে তাকিয়ে হাসলো শুধু।

'বাজে কথা,' সে বললো, 'যতোটা ভাবছেন ততোটা বোকা আমি নই।'

'আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে আপনিই ছোট কর্তা স্বয়ং।'

'এরকম কেন ভাবছো?'

'অনেক কারণ আছে।'

'কিন্তু—'

'চাকর আর মনিবে তফাত করা যেন বড়ো শক্ত কথা! আপনার পোশাক-আশাক চাকরের মতো নয়, সে-রকম ভাবে কথা বলেন না, আর আমরা যে-ভাবে কুকুরকে ডাকি আপনি মোটেও সেভাবে ডাকেন না।'

আলেক্সির লিজ়াকে ক্রমশ বেশি ভালো লাগতে লাগলো। সুশ্রী চাষী মেয়েদের সঙ্গে শিষ্টাচার পালনের অভ্যেস ছিলো না তার; সে লিজ়াকে আলিঙ্গন করতে গেলো কিন্তু লিজ়া পেছনে স'রে গিয়ে এমন ঠাণ্ডা আর গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকালো যে আলেক্সির তাতে কিছুটা মজা লাগলেও, দ্বিতীয়বার অগ্রসর হ'তে সাহস পেলো না আর।

'আপনি চাইলে আমাদের বন্ধুতা থাকবে,' লিজ়া মর্যাদার সঙ্গে বললো, 'তবে আত্ম-বিস্মৃত না হবার মতো সৌজন্য রক্ষা করবেন।'

'এতো সুচতুর হ'লে কী ক'রে?' হাসিতে ফেটে পড়লো আলেক্সি। 'তোমার

দিদিমণির যে কাজ করে আমার বন্ধু সেই নাস্টেঙ্কার কাছ থেকে নয় তো? আলোকপ্রাপ্তি কি রকম ছড়িয়ে পড়ছে দেখছো তো?'

লিজ়া অনুভব করলো যে সে তার ভূমিকা বহির্ভূত ব্যবহার ক'রে ফেলেছে, তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলে।

'আপনি কী মনে করেন', সে বললো, 'যে আমি কখনোই জমিদারের খামারে যাই নি? ভয় পাবেন না; আমি অনেক কিছুই দেখেছি এবং শুনেছি·· কিন্তু,' সে আরো বললো, 'আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার ব্যাঙের ছাতা কুড়োনো হবে না। মাপ করবেন, আপনি আপনার পথে যান, আমিও আমার পথে যাচ্ছি।'

সে যেতে গেলো, কিন্তু আলেক্সি হাত চেপে ধরলো তার।

'তোমার নাম কী?'

'আকুলিনা,' তার মুঠো থেকে নিজের আঙুল ছাড়াতে ছাড়াতে জবাব দিলো সে: 'কিন্তু আমাকে যেতে দিন, বাড়ি ফেরবার সময় হ'য়ে গেছে।'

'বেশ। বন্ধু আকুলিনা তোমার বাবা ভাসিলি কর্মকারের সঙ্গে আমি অবশ্যই দেখা করতে যাবো।'

'কী বলছেন আপনি?' লিজ়া দ্রুতস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'ঈশ্বরের দোহাই, এমন কাজ করবার কথা ভুলেও ভাববেন না। বাড়িতে যদি জানতে পারে যে আমি একজন পুরুষমানুষের সঙ্গে একলা এই কুঞ্জবনে কথা বলেছি আমার খুব খারাপ অবস্থা হবে তা'হলে—আমার বাবা, ভাসিলি কর্মকার আমাকে মেরে ফেলবেন।'

'কিন্তু সত্যি, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'তেই হবে।'

'ঠিক আছে, আমি না হয় আবার একদিন ব্যাঙের ছাতা তুলতে আসবো এখানে।'

'কবে?'

'আপনার ইচ্ছে হ'লে—কাল।'

'আকুলিনা সোনা, তোমাকে আমার চুমু খেতে ইচ্ছে করছে, সাহস পাচ্ছি না। ·· কালকে তাহ'লে, এই সময়েই—তাই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে ঠকাবে না তো?'

'আমি আপনাকে ঠকাবো না।'

'প্রতিজ্ঞা করো।'

'বেশ। পবিত্র শুক্রবারের নামে শপথ করছি যে আমি আসবো।'

তরুণ যুগল বিচ্ছিন্ন হ'লো। লিজা বন থেকে বেরিয়ে মাঠ পার হ'য়ে লুকিয়ে বাগানে ঢুকলো, যেখানে নাস্তিয়া অপেক্ষা করছে তাড়াতাড়ি সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো। অন্যমনস্কভাবে অধীর সখীর প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতে পোশাক বদলালো সে—তারপর ঘরে এলো। জামা কাপড় সাজানোই ছিলো, প্রাতরাশের ব্যবস্থা প্রস্তুত।

মিস জ্যাকসন ইতিমধ্যে পাউডার ঘষে, জমকালো পোশাক এঁটে, সরু-সরু ক'রে রুটি মাখন কাটছিলেন। তাঁকে দেখতে ঠিক একটা মদের গেলাশের মতো লাগছিলো।

প্রাতঃভ্রমণ করবার জন্যে লিজার বাবা তাঁকে অনেক প্রশংসা করলেন।

'ভোরে ওঠার মতো,' তিনি বললেন, 'এতো স্বাস্থ্যকর আর কিছুই না।'

তারপর তিনি বিলিতি পত্রিকা থেকে পাওয়া কয়েকটি দীর্ঘায়ু মানুষের উদাহরণ স্থাপন করলেন, যারা সবাই প্রায় শতাধিক বছর বেঁচেছে ব্র্যাণ্ডি বর্জন ক'রে এবং শীতগ্রীষ্ম বারোমাস ভোরে উঠে।

লিজা তার কথা শুনছিলো না। সেদিন সকালে দেখা হওয়ার সমস্ত ঘটনা ভাবছিলো সে, ভাবছিলো যুবক শিকারীর সঙ্গে আকুলিনার সব কথাবার্তা; তার বিবেকদংশন হ'তে লাগলো। বৃথাই সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে তাদের কথাবার্তা শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করেনি, এই খেয়ালের ফলে সত্যি কোনো বিশেষ ব্যাপার ঘটবে না—তার বিবেক যুক্তির চেয়ে জোরালো হ'য়ে উঠলো। আগামীকালের যাবার প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে সবচেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগলো সে; সেই পবিত্র শপথ না-রাখতে প্রায় মনস্থ করলো। কিন্তু তাহ'লে আলেক্সি তার জন্যে অকারণে অপেক্ষা ক'রে হয়তো গ্রামের ভিতরে গিয়ে ভাসিলি কর্মকারের কন্যা প্রকৃত আকুলিনাকে খুঁজে বার করবে—মোটা বসন্তের দাগে-ভরা মুখের চাষী-মেয়ে—আর তক্ষুনি ধ'রে ফেলবে সে কি দুষ্টুমি করেছে তার সঙ্গে! এই চিন্তাতেই শিহরিত হ'য়ে উঠলো লিজা—স্থির ক'রে ফেললো পরদিন সকালে সেই ছোট্ট বনে আবার আকুলিনা সেজে যাবে।

আলেক্সি ওদিকে এক পরম আনন্দে ভাসছিলো। সারাদিন ভ'রে সে তার নব-পরিচিতার কথা ভেবেছে। রাত্রে সেই শ্যামল সৌন্দর্য তার স্বপ্নে ধরা

দিলো। যখন সবে আলো ফুটতে শুরু করেছে, তার ততোক্ষণে পোশাক আঁটা হ'য়ে গিয়েছে। বন্দুকে গুলি ভরবার সময়টুকু পর্যন্ত নষ্ট না ক'রে বিশ্বস্ত স্‌বোগারকে সঙ্গে নিয়ে সে মাঠের দিকে রওনা হ'লো; দ্রুতগতিতে তাদের নির্দিষ্ট মিলনক্ষেত্রে এসে পৌঁছলো সে। কোনোক্রমে আধঘণ্টা কাটলে দূর থেকে সে ঝোপের আড়ালে আড়ালে নীল ঘাগরার ঝিলিক দেখে ছুটে এগিয়ে এলো তার মনোহারিণী আকুলিনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। তার কৃতজ্ঞতার আতিশয্য দেখে আকুলিনা মৃদু হাসলো কিন্তু আলেক্সি তৎক্ষণাৎ তার মুখে বিষাদ এবং অস্বস্তির ছায়া লক্ষ্য ক'রে কারণ জানতে চাইলো। তার কাছে স্বীকার করলো যে সে নিজের চপল ব্যবহারের জন্যে অনুতপ্ত—আজকে সে তার শপথ ভাঙতে চায়নি, কিন্তু এই দেখাই শেষ দেখা। যে-পরিচয়ের ফল কখনো শুভ হবে না, সেই বন্ধন সে ভেঙে ফেলতে অনুরোধ করলো তাকে।

যদিও এই সব কথা গ্রাম্য ভাষায় বলা হয়েছিলো, এ-ধরনের চিন্তা এবং হৃদয়াবেগ একটি সরল নিম্নশ্রেণীর মেয়ের পক্ষে এতো অস্বাভাবিক যে আলেক্সি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। আকুলিনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্যে সে তার সমস্ত বাগ্মিতা ব্যয় করলো। তার উদ্দেশ্য সম্মানজনক ব'লে নিশ্চিন্ত করলো তাকে, প্রতিজ্ঞা করলো কক্ষনো সে কোনো অনুশোচনার কারণ ঘটাবে না, সর্বদা তার আদেশ মেনে চলবে—শুধু একান্ত অনুরোধ এই যে দিনে একবার, না হ'লে অন্তত সপ্তাহে মাত্র দু'বারও যদি হয়, সে যেন তাকে একান্তে দেখতে পাবার আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত না করে। প্রকৃত আবেগের ভাষায় সে কথা বললো এবং সেই মুহূর্তে সত্যিই সে তাকে ভালোবেসেছিলো। লিজা নিঃশব্দে শুনলো।

'আমাকে কথা দিন', অবশেষে সে বললো, 'কখনো আমার খোঁজে গ্রামে আসবেন না আর আমি নিজে স্থির না ক'রে দিলে কখনো দেখা করবার সুযোগ খুঁজবেন না।'

আলেক্সি পবিত্র শুক্রবারের নামে শপথ করতে গেলে সে তাকে মৃদু হেসে থামিয়ে দিলো।

'শপথ আমি চাই না', সে বললো, 'আপনার কথাই যথেষ্ট।'

তারপর থেকে বনের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে তারা বন্ধুর মতো গল্প করলো, যতক্ষণ না লিজা বললো, 'সময় হ'য়ে গেছে।'

লিজা চ'লে গেলে আলেক্সি যখন একা হ'লো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো

না কি ক'রে একটি সরল চাষীর মেয়ে মাত্র দু'বার দর্শনেই তার ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে পারলো। তার কাছে আকুলিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের অভিনত্বই ছিলো আকর্ষণের বস্তু, এই অদ্ভুত গ্রামের মেয়েটির সব নির্দেশই তার কাছে অত্যন্ত কঠোর মনে হ'লেও তার কথা অমান্য করবার চিন্তা কখনো তার মাথায় আসে নি। সত্যি কথা বলতে আলেক্সি এমন এক সৎ এবং আবেগপ্রবণ যুবক যে তার সাংঘাতিক আংটি, রহস্যময় পত্রালাপ এবং বিধুর নির্মোহ সত্ত্বেও পবিত্র হৃদয়ে বিমল আনন্দ অনুভব করে। •

আমার নিজের বাসনা এই দুই তরুণ-তরুণীর ক্রমবর্ধমান অনুরাগ, গোপন-কথা, ব্যবহার এবং কথাবার্তার একটি বর্ণনা দিই, কিন্তু আমি জানি অধিকাংশ পাঠকদেরই তাতে উৎসাহ নেই, কারণ সাধারণত এই সব খুঁটিনাটির বর্ণনা ক্লান্তিকর এবং একঘেয়ে ব'লে মনে হয়। অতএব আমি শুধু এটুকু ব'লে নিরস্ত হচ্ছি যে দু'মাস না যেতেই আলেক্সি নিদারুণ প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগলো— লিজ়াও অবশ্য তাই, শুধু বাইরে ততোটা প্রকাশ করতো না। আপাতত দু'জনেই সুখী, তবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুটা বিব্রত বোধ করতো তারা। অলঙ্ঘনীয় বাধার কথা প্রায়ই তাদের মনে হ'লেও, সে বিষয়ে কেউই কোনো আলোচনা করতো না। কারণ খুবই সহজ, আলেক্সি প্রিয়দর্শনা আকুলিনার প্রতি যতোই ঘনিষ্ঠতা অনুভব করুক না কেন অবস্থার তারতম্যের ফলে বিভেদের কথা ভুলতে পারতো না; আর লিজ়া উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে শত্রুতার কথা জানতো ব'লে পুনর্মিলনের চিন্তা করতেও সাহস পেতো না। উপরন্তু তার প্রেম গোপনে-গোপনে একটি সুদূর ভাবপ্রবণ আশা পোষণ করতো যে টুগিলোভোর মালিককে সে প্রিলুচিনোর কর্মকারের কন্যার পদতলে দেখবে। এমন সময়ে একটি বিশেষ ঘটনায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচলিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলো।

রাশিয়ার শরতকালের পক্ষে স্বাভাবিক এক উজ্জ্বল, শীতল সকালে ইভান পেট্রোভিচ বেরেস্টভ তিন জোড়া শিকারী কুকুর, একটি পেয়াদা এবং কয়েক-জন চাষী-বালক নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই সুন্দর আবহাওয়ার দ্বারা প্রলুব্ধ হ'য়ে গ্রিগরি ইভানোভিচ মুরোম্স্কি তার লেজ-ছাঁটা ঘোটকীকে প্রস্তুত করিয়ে বিলিতি প্রথার জমিদারির তদারক করতে বেরোলেন। বনের কাছে পৌঁছে তিনি তার প্রতিবেশীকে দেখতে পেলেন। শেয়ালের চামড়ার ঘের দেওয়া জামা প'রে সদম্ভে ঘোড়ার পিঠে ব'সে,

খরগোশের অপেক্ষা করছেন তিনি, ছেলেরা চীৎকার করতে করতে বাজনার শব্দ তুলে যেটাকে ধরতে ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে। গ্রিগরি ইভানোভিচ যদি দ্রষ্টা হতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি অন্য পথে অগ্রসর হতেন, কিন্তু এমন অকস্মাৎ বেরেস্টভের সামনে এসে পড়েছেন যে এখন তাদের মধ্যে একটি পিস্তলের লক্ষ্যভেদের ব্যবধানও নেই। কোনো উপায় নেই আর, মুরোম্স্কি সুসংস্কৃত এক য়ুরোপীয়ের মতো তার প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গিতে অভিবাদন করলেন। শেকলে বাঁধা ভাল্লুক যেমন মনিবের হুকুমে বাধ্য হ'য়ে জনতাকে নমস্কার ঠোকে বেরেস্টভ তেমনি কপট উৎসাহে তাঁকে প্রত্যাভিবাদন জানালেন।

সেই মুহূর্তে খরগোশটা বন থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটলো। কুকুর ছেড়ে দেবার জন্যে চীৎকার তুলে বেরেস্টভ আর তার পেয়াদা ঘোড়া ছুটিয়ে ধাওয়া করলো তাকে। মুরোম্স্কির ঘোড়া শিকারে অভ্যস্ত না থাকায় ভয় পেয়ে পালাতে গেলো। নিজেকে খুব ভালো চালক ব'লে গৌরব করতেন মুরোম্স্কি। পুরো লাগাম চেপে ধ'রে এই অপ্রিয় সঙ্গ ত্যাগ করতে পারছেন ভেবে ভেতরে ভেতরে—তিনি একটু খুশিই হ'লেন। কিন্তু ঘোড়াটা একটা খাদের কাছে পৌঁছে হঠাৎ একদিকে লাফিয়ে উঠতেই জিন থেকে প'ড়ে গেলেন তিনি। যথেষ্ট জোরে ঠাণ্ডা মাটিতে প'ড়ে তিনি তার লেজছাঁটা ঘোড়াকে শাপান্ত করতে লাগলেন আর চালকহীন হওয়ামাত্র ঘোড়া যেন আত্মস্থতা ফিরে পেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো হঠাৎ।

ইভান পেট্রোভিচ তাড়াতাড়ি কাছে এসে আঘাত পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলেন। ইতিমধ্যে সহিস অপরাধী ঘোড়াটাকে ধাতস্থ ক'রে লাগাম ধ'রে এগিয়ে এনে মুরোম্স্কিকে ঘোড়ায় উঠে বসতে সাহায্য করলো আর অকস্মাৎ বেরেস্টভ তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে বসলেন তাঁর বাড়িতে। মুরোম্স্কি এতো কৃতজ্ঞ বোধ করছিলেন যে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। খরগোশ শিকার ক'রে এবং যুদ্ধে বন্দীর মতো আহত প্রতিপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সগৌরবে বাড়ি ফিরলেন বেরেস্টভ।

দুই প্রতিবেশী একসঙ্গে ব'সে বন্ধুর মতো গল্প করতে করতে প্রাতরাশ সারলেন। মুরোম্স্কি বেরেস্টভের কাছে একটি ড্রশকি[*] চাইলেন কারণ তাকে

[*] নিচু, চারচাকার ঘোড়ায় টানা গাড়ি

স্বীকার করতে হ'লো যে আঘাতের দরুন তাঁর আর ঘোড়ায় চ'ড়ে বাড়ি ফেরবার মতো অবস্থা নেই। বেরেস্টভ তাঁকে সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিলেন এবং আলেক্সি ইভানোভিচকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পরদিন প্রিলুচিনোতে খেতে আসবেন এই কথা নিয়ে তবে বিদায় গ্রহণ করলেন মুরোম্‌স্কি। এইভাবে লেজছাঁটা ঘোটকীর শয়তানির ফলে দীর্ঘদিনের গভীর শত্রুতার এক আপাত সমাপ্তি ঘটলো।

গ্রিগরি ইভানোভিচের দিকে দৌড়ে গেলো লিজ়া।

'কী হয়েছে বাবা?' অবাক হ'য়ে বললো সে, 'খোঁড়াচ্ছো কেন? তোমার ঘোড়া কই? কাদের গাড়ি এটা?'

'তুই আন্দাজও করতে পারবি না।' গ্রিগরি ইভানোভিচ উত্তর দিলেন। তারপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন।

লিজ়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তাকে আত্মস্থ হবার সময় না দিয়েই, গ্রিগরি ইভানোভিচ জানালেন যে দুই বেরেস্টভ—পিতা এবং পুত্র পরদিন তাদের সঙ্গে খেতে আসছেন।

'কী বলছো তুমি?' মুখ শুকিয়ে গেলো তার। 'বেরেস্টভেরা—বাবা আর ছেলে—কাল আমাদের সঙ্গে খাবেন! না বাবা, তোমার যা খুশি তুমি করতে পারো, আমি কিন্তু বেরুবো না।'

'কী! তুই কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিস না কি?' তার বাবা উত্তর করলেন। 'কবে থেকে আবার এতো লাজুক হ'লি? নাকি রোমান্সের নায়িকাদের মতো বংশগত ঘৃণা উপভোগ করছিস? ঢের হয়েছে, আর বোকামি করিস না।'

'না বাবা জগতের কোনো কিছুর জন্যেই, কোনো সম্পদের বদলেই আমি বেরেস্টভদের সামনে বেরুবো না।'

গ্রিগরি ইভানোভিচ কাঁধ ঝাঁকালেন। যেহেতু জানতেন প্রতিবাদ ক'রে তাকে বোঝানো যাবে না, তাকে আর না-ঘাঁটিয়ে রোমাঞ্চকর অশ্বচালনার বাকিটা বলতে লাগলেন।

লিজ়াভেটা গ্রিগরিয়েভনা ঘরে ফিরে এসে নাস্তিয়াকে ডেকে পাঠালো। অবশ্যম্ভাবী আগমনের বিষয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললো। যদি এই বর্ধিষ্ণু পরিবারের মেয়েটিকেই তার আকুলিনা ব'লে চিনতে পারে, কি ভাববে তবে আলেক্সি? তার স্বভাব, ব্যবহার আর কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে কী ধারণা হবে

তার? অন্যদিকে এমন অকস্মাৎ দেখা হ'লে কিরকম অবস্থা হবে তার সেটা দেখতেও লিজার খুব ইচ্ছে করছে······ হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। সে নাস্তিয়াকে জানালো। দুজনেই দারুণ খুশি হ'য়ে সেটাকে কাজে খাটাবে স্থির ক'রে ফেললো।

পরদিন প্রাতরাশের সময় গ্রিগরি ইভানোভিচ লিজাকে জিগেস করলেন এখনো সে বেরেস্টভদের থেকে পালিয়ে থাকতে চায় কিনা!

'বাবা', লিজা বললো,'তুমি যদি চাও আমি তাদের অভ্যর্থনা করবো, কিন্তু এক শর্তে। আমি যেভাবে ইচ্ছে তাদের সামনে বেরোবো, যা খুশি ক'রবো, তুমি কিন্তু আমার ওপর রাগ করতে পারবে না, বিস্ময় বা বিরক্তির কোনো চিহ্নও দেখাতে পারবে না।'

'নতুন কোনো দুষ্টুমি বুঝি,' গ্রিগরি ইভানোভিচ হেসে উঠলেন, 'বেশ, বেশ, আমি রাজি; আমার কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা, তোমার যা-খুশি তাই ক'রো।'

এ-কথা ব'লে তিনি তার কপালে চুমু খেলেন আর লিজা তার পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবার জন্যে ছুটলো।

ঠিক দুটো বাজলে ছ'ঘোড়ায় টানা একটি গাড়ি এসে মাঠ ঘুরে উঠোনে ঢুকলো। বুড়ো বেরেস্টভ মুরোম্স্কি-ভবনের দুটি ভৃত্যের সাহায্যে সিঁড়িতে উঠলেন। তাঁর পুত্র পেছনে পেছনে ঘোড়ায় চ'ড়ে আসছিলো—দু'জনে একসঙ্গে খাবার ঘরে এসে ঢুকলেন, ইতিমধ্যেই সেখানে টেবিল সাজানো হ'য়ে গেছে। মুরোম্স্কি তার প্রতিবেশীদের সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানালেন, প্রস্তাব করলেন খাবার আগেই বাগান এবং পশুশালা দেখে আসার। সযত্নে রক্ষিত নুড়িফেলা পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের। অকারণ শখের জন্যে সময় এবং শক্তি দুটোই নষ্ট হচ্ছে ভেবে ভেতরে-ভেতরে ক্ষোভ হচ্ছিলো বুড়ো বেরেস্টভের কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মুখ সামলে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর পুত্র কিন্তু মিতব্যয়ী জমিদারের অনিচ্ছা বা গৌরবান্বিত ইঙ্গ-প্রেমিকের উৎসাহ কিছুতেই মনোযোগী ছিলো না; যার বিষয়ে সে অনেক শুনেছে নিমন্ত্রণ-কর্তার সেই কন্যার জন্যে অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করছিলো সে; যদিও আমরা জানি তার হৃদয় ইতিমধ্যেই দান করা হ'য়ে গেছে—তবু, তার কল্পনার ওপর যৌবনের সৌন্দর্যের সর্বদাই একটা দাবি আছে তো!

প্রাসাদে ফিরে এসে তাঁরা তিনজন একসঙ্গে বসলেন; আর যখন সেই দুই বৃদ্ধ বাল্যস্মৃতি মন্থন করতে লাগলেন, গল্প করতে লাগলেন চাকুরিজীবনের

নানা ঘটনার, আলেক্সি ভাবলো লিজ়ার সামনে তার কেমন ব্যবহার হওয়া উচিত। তার মনে হ'লো একটা ঠাণ্ডা ঔদাসীন্যের হাওয়া ছড়ানোই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে এ-ক্ষেত্রে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবার জন্যে সে প্রস্তুত হ'লো। দরজা খুলে গেলো ; সে এমন ঔদাসীন্য এবং নিদারুণ অনীহার সঙ্গে ঘাড় ফেরালো যে তাতে তেমন-তেমন ওস্তাদ মেয়েদেরও হৃদয় কেঁপে উঠবে। দুঃখের বিষয়, লিজ়ার বদলে ঘরে এলেন মিস জ্যাকসন, তিনি রঙ মেখে আঁটো জামা প'রে ভদ্রতাবশত চোখ নত ক'রে ছিলেন ব'লে আলেক্সির লক্ষণীয় সৈনিক ভঙ্গি ব্যর্থ হ'লো। আবার যখন দরজা খুললো তখনও সে নিজেকে ঠিক সামলে উঠতে পারেনি ; এবার যে ঢুকলো সে লিজ়া স্বয়ং।

সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো, অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করানো শুরু করতে গিয়েই তার বাবা হঠাৎ থমকে গিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।... লিজ়া, তার কালো মেয়ে লিজ়া কানের ডগা পর্যন্ত ফর্সা ক'রে ফেলেছে, এমনকি মিস জ্যাকসনের চেয়ে ভালো ক'রে সেজেছে, নকল কোঁকড়ানো চুল, তার নিজস্ব চুলের চাইতে অনেক বেশি সোনালি, চতুর্দশ লুইয়ের মতো তার সারা মাথা ঢেকে রয়েছে।

শরীরটা দেখাচ্ছে এক্স-এর মতো, তার মার যে-সব গয়নার কোনো গতি হয়নি সেগুলো আঙুলে, গলায়, কানে জলজল করছে।

এই জমকালো এবং ঝলমলে মেয়েটির মধ্যে আলেক্সি সম্ভবত তার আকুলিনাকে চিনতে পারেনি। তার বাবা মেয়েটির আঙুলে চুমু খেলেন, নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে-ও সেই উদাহরণ অনুসরণ করলো। ছোট-ছোট শাদা আঙুলগুলি স্পর্শ করার সময় তার মনে হ'লো তারা যেন কাঁপছে। ইতিমধ্যে অবশ্য সে সুযোগমতো মেয়েটির ছোট্ট পায়ের পাতাটুকু এক পলক দেখে নিয়েছিলো ; যথাসম্ভব চালিয়াত এক জুতো পরা পায়ের ডগাটুকু কায়দা ক'রে বাড়িয়ে দিয়েছিলো লিজ়া। আলেক্সির সরল হৃদয় প্রথম দর্শনে লিজ়ার পাউডার আর রঙের প্রলেপ ধরতে পারেনি, আর স্বীকার করতেই হবে, পরেও সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ হয় নি তার। গ্রিগরি ইভানোভিচ পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা মনে ক'রে বিস্ময় প্রকাশ করলেন না, কিন্তু মেয়ের কীর্তি-কলাপ দেখে তাঁর এতো মজা লাগছিলো যে, নিজেকে প্রায় দমন করতে পারছিলেন না। কিন্তু যে-ব্যক্তির সামান্যতম হাসিও পাচ্ছিলো না, তিনি হলেন কঠোর ইংরেজ গৃহশিক্ষয়িত্রী। একটা নিগূঢ় সন্দেহ হচ্ছিলো তাঁর যে প্রসাধন সামগ্রী সবই

তাঁর দেরাজ-আলমারি থেকে নেওয়া এবং তাঁর মুখের নকল ফর্সা রঙের মধ্যে থেকে রাগের গভীর ঝলক স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠছিলো। তিনি এই পাগল মেয়েটির দিকে সরোষ দৃষ্টিপাত ছুঁড়তে লাগলেন আর সে, পরে কী কৈফিয়ৎ দেবে তাই ভাবতে-ভাবতে কিছুই লক্ষ্য না-করার ভান করলো।

টেবিলে বসলেন তাঁরা। তার বানানো ঔদাসীন্য এবং অমনোযোগিতার অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলো আলেক্সি। লিজ়া ব্যবহারে স্নেহের হাওয়া এনে দাঁত চেপে চেপে মধুর কণ্ঠে ফরাশিতে কথা বলতে লাগলো। তার বাবা অনবরত তাকে লক্ষ্য করছিলেন। উদ্দেশ্য না-বুঝলেও সমস্তটাই অত্যন্ত কৌতুকের ব্যাপার মনে হ'চ্ছিলো তাঁর। ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা রাগে ফুলতে-ফুলতে একটি কথাও বললেন না। কেবলমাত্র ইভান পেট্রোভিচকে অত্যন্ত ঘরোয়া লাগছিলো; তিনি একাই প্রায় দু'জনের মতো খেলেন, প্রচুর মদ্যপান করলেন, এবং নিজের রসিকতা নিজেই উপভোগ ক'রে ক্রমশ আরো বাচাল আর ফুর্তিবাজ হ'য়ে উঠতে লাগলেন।

অবশেষে সবাই টেবিল ছেড়ে উঠলেন; অতিথিরা বিদায় নিলে গ্রিগরি ইভানোভিচ স্বাধীনভাবে হেসে উঠলেন এবং তাঁর প্রশ্নবাণ শুরু হ'লো।

'ওঁদের এমনি ক'রে বোকা বানাবার মতলব কেন মাথায় এলো?' তিনি লিজ়াকে বললেন, 'কিন্তু জানিস—এই সাজ তোকে অদ্ভুত মানিয়েছিলো। কোনো মহিলার প্রসাধনের রহস্য অবশ্য আমি জানতে চাই না, কিন্তু আমি যদি তুই হতাম তাহ'লে ঠিক রং মাখতে শুরু ক'রে দিতাম, অবশ্য খুব বেশি না—অল্প-অল্প।'

লিজ়া তার কায়দা সফল হওয়ায় আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিলো। বাবাকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর উপদেশ বিবেচনা করবার আশ্বাস দিলো সে। তারপর বিরক্ত মিস জ্যাকসনকে সান্ত্বনা দিতে ছুটলো, তিনি উদাসীন ভাবে দরজা খুলতে ব্যাপৃত হ'য়ে তার কৈফিয়ত শুনতে লাগলেন। অপরিচিতদের কাছে লিজ়ার কালো রং নিয়ে বেরোতে লজ্জা করে; তার জিগেস করতে সাহস হয় নি, সে নিশ্চয়ই জানে তার অতি প্রিয় লক্ষ্মী মিস জ্যাকসন তাকে ক্ষমা করবেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। লিজ়া তাঁকে নকল ক'রে তাকে হাস্যাস্পদ করতে চায় নি এ-কথা বুঝতে পেরে তিনি শান্ত হলেন; চুমু খেয়ে সন্ধির চিহ্ন হিশেবে বিলিতি প্রসাধনের বাক্স উপহার দিলেন; লিজ়া প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে সেটি গ্রহণ করলো।

পাঠক সহজেই কল্পনা করতে পারবেন যে, পরদিন ভোরে সেই ছোট্ট বনের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট মিলনক্ষেত্রে পৌঁছতে লিজ়া আর দেরি করেনি।

'তুমি বাবুদের বাড়ি গিয়েছিলে কাল,' আলেক্সিকে প্রথমেই বললো সে, 'আমাদের দিদিমণিকে কেমন লাগলো?'

আলেক্সি জানালো যে সে তাকে লক্ষ্যই করেনি।

'আহা—আপশোশের কথা।' লিজ়া বললো।

'কেন?' আলেক্সি জিগেস করলো।

'কারণ আমি জানতে চাইছিলাম ওদের কথাটা ঠিক কিনা—'

'কী বলে ওরা?'

'আমি নাকি একেবারে ওঁর মতো দেখতে—সত্যি নাকি?'

'কী বাজে! তোমার তুলনায় সে একেবারে উদ্ভট দেখতে।'

'ইশ্! এ-ভাবে বলা তোমার খুব অন্যায়। আমাদের দিদিমণি এতো সুন্দর, এতো কেতাদুরস্ত। আমার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না।'

আলেক্সি শপথ ক'রে বললো যে, জগতের সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে সুন্দর সে, এবং তাকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করবার জন্যে তার দিদিমণিকে এমন হাস্যকর ভাবে নকল করতে আরম্ভ করলো যে লিজ়া মন খুলে হাসলো।

'কিন্তু', লিজ়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, 'আমাদের দিদিমণি হাস্যকর হ'তে পারে, কিন্তু আমার মতো গরিব মূর্খ তো নয়।'

'ও!' আলেক্সি বললো, 'সেটা এমন কিছু হৃদয়বিদারক ব্যাপার নয়। যদি চাও, আমি দু'দিনে তোমাকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে দেবো।'

'নিশ্চয়ই,' লিজ়া বললো, 'চেষ্টা করি না কেন?'

'খুব ভালো, সোনা; এক্ষুনি শুরু করি এসো।'

তারা বসলো। আলেক্সি তার পকেট থেকে একটি নোটবই আর পেন্সিল বের করলো, আর আকুলিনা আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে অক্ষর চিনে ফেললো। আলেক্সি তার বুদ্ধির তারিফ ক'রে কূল পাচ্ছিলো না। পরদিন সকালে লিজ়া লিখবার চেষ্টা করতে চাইলো। প্রথমে সে পেন্সিল ঠিক বাগে আনতে পারলো না, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সহনীয় দক্ষতার সঙ্গে সে অক্ষরগুলো নকল করতে লাগলো। 'সত্যি আশ্চর্য!' আলেক্সি বললো, 'ল্যাংকাস্টার রীতির চেয়ে আমাদের পদ্ধতি নিশ্চয়ই দ্রুততর ফল দিচ্ছে।'

এবং বলা বাহুল্য, তৃতীয় পাঠের দিনেই আকুলিনা "বোয়ারের কন্যা নাটালিয়া"

গল্প বানান ক'রে পড়তে পারলো এবং পড়ার মাঝে-মাঝে এমন লক্ষ্যের পরিচয় দিতে লাগলো যে আলেক্সি সত্যিই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। একটা পুরো পাতা সে সেই গল্প থেকে নেওয়া নীতিকথাতে ভ'রে ফেললো।

এক সপ্তাহ কেটে গেলে তাদের মধ্যে একটি পত্রালাপের সূত্র স্থাপিত হ'লো। তাদের চিঠির বাক্স ছিলো একটি ওক গাছের গর্ত, দৌত্যগিরি করতো নাস্টিয়া। আলেক্সি গোল-গোল স্পষ্ট অক্ষরে চিঠি লিখে নিয়ে যেতো সেখানে এবং সাধারণ নীল কাগজে লেখা তার প্রেয়সীর আঁকা-বাঁকা অক্ষরের চিঠি পেতো। আকুলিনা প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি রপ্ত ক'রতে শুরু ক'রেছে এবং রীতিমতো পরিণত হ'য়ে উঠেছে তার মন।

ইতিমধ্যে ইভান পোট্রোভিচ বেরেস্টভ এবং গ্রিগরি ইভানোভিচ মুরোম্‌স্কির ইদানীং গড়ে-ওঠা সম্পর্ক রীতিমতো বন্ধুতায় পরিণত হয়েছে। মুরোম্‌স্কির প্রায়ই মনে হ'তো ইভান পেট্রোভিচের মৃত্যুর পর তার সব সম্পত্তি যদি আলেক্সি ইভানোভিচ পায় তবে তো সে এই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম হবে এবং তখন তার লিজাকে বিয়ে করবার কোনো বাধাই থাকবে না। অন্যদিকে বুড়ো বেরেস্টভ তার প্রতিবেশীর বাউণ্ডুলে স্বভাব সত্ত্বেও (যাকে তিনি বিলিতি কায়দা ব'লে অভিহিত করেন) সম্পূর্ণ স্বীকার করতেন যে তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী, তার মধ্যে একটি হ'লো তার দুর্লভ প্রভাবশীলতা। কাউন্ট প্রনস্কির মতো বিশিষ্ট এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সঙ্গে গ্রিগরি ইভানোভিচের সম্পর্ক রীতিমতো ঘনিষ্ঠ। এই কাউন্টকে দিয়ে আলেক্সির অনেক কাজ হবে, এবং মুরোম্‌স্কি (অন্তত ইভান পেট্রোভিচ তাই ভাবলেন) নিশ্চয়ই এইরকম সুবিধাজনক ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহ হ'লে খুশি হবেন। অনবরত এই চিন্তা করবার ফলে অবশেষে দুই বৃদ্ধ পরস্পরের কাছে নিজেদের ভাবনা প্রকাশিত করলেন। পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো এই ব্যবস্থা স্থির করবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হলেন; এবং যে-যার মতো তক্ষুনি কাজে লেগে গেলেন। মুরোম্‌স্কি ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তাঁর বেটসীর সঙ্গে আলেক্সির ঘনিষ্ঠতা ঘটাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। সেই স্মরণীয় ভোজের পর আর তাদের দেখা হয় নি। পরস্পরকে তারা বিশেষ পছন্দ করেছে ব'লে মনে হয় না; তারপরে আলেক্সি তো আর একদিনও প্রিলুচিনোতে বেড়াতে আসেনি, আর ইভান পেট্রোভিচ এ-বাড়িতে দেখা করতে এলেই লিজা তার নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

'কিন্তু,' গ্রিগরি ইভানোভিচ ভাবলেন, 'আলেক্সি যদি রোজ আমাদের কাছে আসে বেটসী তার প্রেমে না প'ড়ে পারবেই না। এই রকমই হ'য়ে থাকে—সময় সমস্ত ঠিক ক'রে দেয়।'

পরিকল্পনার সার্থকতা বিষয়ে ইভান পেট্রোভিচ কিন্তু অতোটা চিন্তিত হননি। সেইদিন বিকেলেই তার পড়বার ঘরে তিনি পুত্রকে ডেকে পাঠালেন, পাইপ জ্বালিয়ে একটু দ্বিধা ক'রে বললেন, 'তোমার সামরিক বাহিনীর কাজ সম্বন্ধে অনেকদিন তো কিছু বলো না, আলিয়শা। নাকি অশ্বারোহী সৈন্যদের পোশাকের আকর্ষণ আর অবশিষ্ট নেই?'

'না বাবা,' আলেক্সি সসম্ভ্রমে উত্তর দিলো, 'আমি দেখেছি আমার এই সৈন্যদলে ভর্তি হবার পরিকল্পনা আপনার মোটেই মনঃপূত হয়নি, আর আপনাকে মান্য করা আমার কর্তব্য।'

'চমৎকার', ইভান পেট্রোভিচ বললেন, 'সত্যিই তুমি আমার বাধ্য ছেলে, বড়ো তৃপ্তি পেলাম ...আমার দিক থেকে আমি তোমাকে কোনো কিছু নিয়ে জোর জবরদস্তি করতে চাই না; তোমাকে জোর ক'রে...সরকারি কাজে ঢোকাতে চাই না ... এক্ষুনি, কিন্তু, ইতিমধ্যে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই।'

'কার সঙ্গে বাবা?' আলেক্সি বিস্মিত হ'য়ে গেলো।

'লিজাভেটা গ্রিগরিয়েভ্না মুরোম্স্কির সঙ্গে,' ইভান পেট্রোভিচ জবাব দিলেন, 'চমৎকার বউ হবে নয়কি?'

'বাবা, আমি এখনো অবধি বিয়ের কথা ঠিক ভাবিনি।'

'তুমি ভাবো নি—আর তাই তোমার হ'য়ে আমি ভেবেছি।'

'আপনার যা ইচ্ছে, কিন্তু লিজা মুরোম্স্কি বিষয়ে আমার তিলতম আগ্রহ নেই।'

'ক্রমশ তাকে তোমার ভালো লাগবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভালোবাসা আসে।'

'আমি তাকে সুখী করবার উপযুক্ত নই।'

'তাকে সুখী করা নিয়ে তোমাকে অত ভাবতে হবে না। ও, এই? এইভাবেই তুমি পিতার ইচ্ছের সম্মান রাখো? ভালো।'

'তা আপনি যা মনে করেন। বিয়ে করবার বাসনা আমার নেই এবং আমি বিয়ে করবো না।'

'বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, নয়তো তোমাকে অভিসম্পাত করবো আমি। এবং আমার সব সম্পত্তি—যা স্বর্গের ঈশ্বরের মতো সত্য, বিক্রি ক'রে সমস্ত টাকা উড়িয়ে দেবো—তোমার জন্যে এক পয়সাও রেখে যাবো না। ভেবে

ছাখো—তিনদিন সময় দিচ্ছি। এই তিনদিনের মধ্যে আমার চোখের সামনে তুমি এসো না।'

আলেক্সি জানতো বাবার মাথায় কিছু ঢুকলে, সেই নাটকে[১] টারাস স্কোটিনিন যেমন বলেছিলো, 'পেরেক ঠুকেও তাকে বের করা যায় না।' কিন্তু আলেক্সিও ঠিক তেমনই হয়েছে—বাবার মতোই জেদী। ঘরে ফিরে গিয়ে সে পিতার কর্তৃত্বের সীমা কতখানি, সে-বিষয়ে ভাবতে বসলো। ক্রমশ তার চিন্তা লিজাভেটা গ্রিগরিয়েভনায় ফিরে এলো, অতঃপর তাকে ভিখারী বানাবার জন্যে বাবার গম্ভীর প্রতিজ্ঞা এবং সবশেষে আকুলিনা। এই প্রথম সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো কী তীব্রভাবে সে তাকে ভালোবাসে; চাষীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে হাতে খেটে দিন চালানোর রোমান্টিক ধারণা মাথায় এলো—আর যতোই সে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ভাবতে লাগলো ততোই এটা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কাজ ব'লে মনে হ'লো তার। বর্ষার জন্যে বনের মধ্যে দেখাশোনাটা কিছুদিন বন্ধ ছিলো। পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে, বন্য আগ্রহে তার ভীতিজনক দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে আকুলিনাকে একটি চিঠি লিখলো সে,—এবং সেই সঙ্গে তার পাণি-প্রার্থনা করলো। তক্ষুনি বনের মধ্যেকার সেই ডাকঘরে চিঠি ফেলে এসে, পরম তৃপ্তির সঙ্গে বিছানায় গা ঢেলে দিলো আলেক্সি।

পরদিন সকালে, সিদ্ধান্তে অটল আলেক্সি মুরোম্স্কিকে পরিষ্কারভাবে সব কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যে ঘোড়ায় চেপে তাদের বাড়ির দিকে রওনা হ'লো। মুরোম্স্কির ঔদার্য জাগিয়ে তুলে নিজের দিকে তাকে টানতে পারবে ব'লে সে আশা করছিলো।

'গ্রিগরি ইভানোভিচ বাড়ি আছেন?' প্রিলুচিনো-ভবনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে সে জিগেস করলো। 'আজ্ঞে, না হুজুর।' ভৃত্যটি উত্তর দিলো, 'গ্রিগরি ইভানোভিচ ভোরেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি।'

'কী বিরক্তিকর……' আলেক্সি ভাবলো একটু……'লিজাভেটা গ্রিগরিয়েভনা আছেন?' জিগেস করলো সে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো আলেক্সি। লাগামটা ভৃত্যটির হাতে দিয়ে কোনো খবর না পাঠিয়েই ভেতরে ঢুকে এলো।

১ ডেনিস ফন্ ভিজ্রিনের 'নাবালক' নাটকের চরিত্র।

'এক্ষুনি সব কিছু স্থির হ'য়ে যাবে,' বসবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে সে ভাবলো, 'স্বয়ং লিজ়াভেটাকেই আমি সমস্ত বুঝিয়ে বলবো।'

সে ঢুকলো……আর তারপর পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো! লিজ়া… না… আকুলিনা, প্রিয়, শ্যামল আকুলিনা, ঘাগরা নেই—সকালের শাদা পোশাক পরেছে, জানলার সামনে ব'সে তারই চিঠি পড়ছে; এতো গভীর মনোযোগে নিমগ্ন ছিলো সে যে আলেক্সির প্রবেশের কোনো শব্দই তার কানে ঢোকেনি। আলেক্সি আনন্দে চীৎকার না ক'রে পারলো না। লিজ়া তাকালো, মাথা তুললো, ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো সে, ইচ্ছে হ'লো উড়ে চ'লে যায় ঘর থেকে। কিন্তু সে পেছন থেকে তাকে ধ'রে ফেলেছিলো।

'আকুলিনা! আকুলিনা!'

লিজ়া তার মুঠোর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো।

'পাগল হ'লে নাকি! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বার-বার বলতে লাগলো।

'আকুলিনা! আকুলিনা, সোনা আমার!' তার হাতে চুমু খেয়ে আলেক্সি বার-বার ব'ললো।

এই দৃশ্যের একজন সাক্ষী মিস জ্যাকসন বুঝতে পারছিলেন না কী মনে করা উচিত। এমন সময় দরজা খুলে গেলো এবং গ্রিগরি ইভানোভিচ ঘরে ঢুকলেন।

'আহা!' মুরোম্স্কি বললেন, 'তোমরা দু'জনেই ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছো তাহ'লে!'

নাটকের শেষ অঙ্ক বর্ণনা করবার অপ্রয়োজনীয় বিড়ম্বনা থেকে আশা করি পাঠক আমাকে নিষ্কৃতি দেবেন।

অনুবাদ : দময়ন্তী বসু





দুই না এক

তেয়োফিল গোতিয়ে

গেলো শীতকালে আমার দুটি ভগ্নীর সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায়ই হ'তো। কোনোখানে তাঁদের একটিকে দেখলে নিশ্চিত ধ'রে নিতে পারা যেতো অন্যটি কাছে কোথাও আছে। তাই লোকে তাদের নাম দিয়েছিলো মানিকজোড়।

তাদের একজন গৌরবর্ণ, দ্বিতীয়টি শ্যামা। যদিচ যমক, তাদের দু'জনের ভিতর মিল শুধু এই একটুখানি যে, তাদের দেখবামাত্র ভালোবাসায় না প'ড়ে থাকবার জো ছিলো না। কারণ এমন দুটি পাগল-করা অথচ পরস্পরের সঙ্গে এত তফাত মেয়ে বোধহয় জগতে আর কখনো দেখা যায়নি। আশ্চর্য এই যে, তবুও দু'জনের গলায় গলায় ভাব ছিলো। জাত মেয়ে, সুতরাং সম্ভবত বিরোধ যে কি অলংকার, একের পাশে অপর যে কীরকম ফুটে উঠতো, তা তারা স্পষ্ট টের পেয়েছিলো। কিংবা হ'তে পারে যে, তাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয়টা বাস্তবিক; তবে যখন দু'জনে একত্র হ'লেই বৈলক্ষ্যের গুণে তাদের রূপটা বেশি রকম খুলতো, তখন আমার মতে তাদের জোড় বাঁধবার ভিতরকার মূল কারণই ঐ। কারণ সমান-বয়সী, সমানসুন্দরী দুটি বোন যে পরস্পর পরস্পরের চোখের বিষ ছিলো না,

এ-কথা মানা বড়ো কঠিন। কিন্তু ব্যবহারে তার উল্টোই প্রমাণ হয়। যেখানেই যাই দেখতে পেতুম দুটিতে অষ্টপ্রহর একসঙ্গে,—এ যেন ওর ছায়া, তিলমাত্র ছাড়াছাড়ি নেই; কখনো ঘরের একই কোণে দুই সখিতে অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ হচ্ছে—কখনো গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে একই শোফায় শোওয়া-বসার মাঝামাঝি একটা ভাবে বিরাজ করছে। আমার কাছে তো ব্যাপার বড়ো অদ্ভুত ঠেকতো। আমাদের নব-যুবকের দলও একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। কারণ নিশাকে এমন একটি কথা বলা যেতো না, যা দিবা না শুনতে পায়; আর নিশার চোখ এড়িয়ে দিবার হাতে দু'ছত্র লেখা গুঁজে দেয় কার সাধ্য?—আমাদের পাঁচজনের এই সব নিষ্ফল চেষ্টা দেখে তাদের ভারি মজা বোধ হ'তো, নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো হেসে কুটিকুটি হ'তো। তাদের নিত্য আমোদই এই ছিলো, আগে একজনকে নাচিয়ে, আর আশা বাড়িয়ে, শেষটা কখনো বা ঠাট্টা করা, কখনো বা মেয়েলি রাগ দেখিয়ে সেই আশা ভঙ্গ করা। এই গরিব বেচারারা যখন মুখছোপ খেয়ে আস্তে-আস্তে তাদের অনেক কষ্টে লেখা সনেট্ কিংবা প্রণয়পত্রিকা মুখ কাঁচুমাচু ক'রে পুনরায় পকেটজাত করতো, তখন তাদের চেহারা দেখবার মতো জিনিশ হ'তো। আমার একটি বন্ধুকে তারা এমনি অপদস্থ করেছিলো যে, তারপর হপ্তাখানেক ধ'রে তিনি বেশভূষায় এতই বীতরাগ হয়েছিলেন যে তাঁকে বিবাহিত ব'লে ভ্রম হ'তো। আর পাঁচজনের মতো আমিও তাদের কাছে প্রজাপতির ব্যবহার শুরু করি। একবার উড়ে দিবার কাছে যাই, আবার উড়ে নিশার কাছে আসি। কিন্তু সে-ওড়াই সার, ফল কিছু হ'লো না। কিছুদিন পরে এমনি খিজে গেলুম যে, মনে-মনে বন্ধু শ্রীযুক্ত—পাছে তার বেশভূষার চটকে কাজ গুছিয়ে নেন, এই ভয়ে তখন আর মরা হ'লো না। তাছাড়া আমার নতুন শখের পোশাকটা প'রে দু'দিন বাহার না দিয়েই বা কী ক'রে মরি।—কাজেই আমার আত্মহত্যা করাটা কিছুদিনের জন্য মুলতুবি রাখতে হ'লো। কিন্তু আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না কাজটা ঠিক হয়েছিল কী ভুল হয়েছিল।

একদিন নিজের মন খুঁজে-পেতে দেখি সর্বনাশ! আমি দু' বোনকেই একসঙ্গে ভালোবেসে ফেলেছি! কী লজ্জার কথা! কিন্তু কথাটা সত্যি, একজনকে নয় দু'জনকেই, সমানভাবে। শ্রীমতী—এ-কথা শুনলে নিঃসন্দেহে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবেন—'পাপিষ্ঠ!' কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন, আমার মতো নিরীহ বেচারা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তবে কি না পুরুষের মন

স্ত্রীজাতির মনের মতো অত বিচিত্র, অত অদ্ভুত না হ'লেও একটি অদ্ভুত জিনিশ। তার যে কখন কী অবস্থা হয়, তা কেউ বলতে পারে না। এমনকি শ্রীমতী-ও বলতে পারেন না। হয়তো এই আমি চাই কি একদিন তাঁরও প্রতি প্রণয়াসক্ত হ'য়ে পড়তে পারি।

নিশা দেখতে লম্বা ছিপছিপে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত লকলক করছে। আর চোখ! পৃথিবীতে সে-চোখের আর জোড়া নেই। ভ্রু দু'টি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। দিব্য তোলা নাক। রং শ্যাম, কিন্তু সে উজ্জ্বল উত্তপ্ত শ্যাম। হাত দু'খানি নিখুঁত। বাহুযুগল একটুখানি কৃশ, চমৎকার সুন্দর। আর বাহুর আশপাশ অত নতুন বয়সে যতদূর সম্ভব ততদূর পরিস্ফুট। যৌবনও দেহে ভরপুর হ'য়ে উঠতে একটু সময় নেয়। কে না জানে, সবুর না সইলে মেওয়া ভালো ক'রে ফলে না। এক কথায়, সে স্বর্গের দেবী।

এমন মেয়েকে ভালোবেসে কি ভুল করেছিলুম?

আগেই বলেছি দিবার রং ফরশা। ঢাকাই মলমলের মতো শুভ্র, স্বচ্ছ ও সুকুমার। চোখ দুটি জলের মতো পরিষ্কার ও গভীর। একমাথা চুল, ঘন, দীর্ঘ, রেশমের মতো ফুরফুরে। সে-চুল নিশ্বাসের ভর সইতে পারতো না, মুখের চারিদিকে উড়ে, ছড়িয়ে, ছাপিয়ে পড়তো। তাছাড়া দু'খানি কচি পা ও বোল্‌তার মতো বুক ও কোমর। হঠাৎ দেখলে পরী ব'লে ভ্রম হয়।

শুনে কী মনে হচ্ছে? ভালোবাসার উপযুক্ত পাত্রী নয় কি? আর একদিন, মনের ভিতর ভালো ক'রে তলিয়ে দেখলুম (কথা আরও ভয়ানক) যে দিবানিশা দু'জনের একজনকেও আমি ভালোবাসিনে। একলা দিবাতে আমার মন ওঠে না। বোন ছাড়া নিশা যেন আলাদা মানুষ,—একেবারে রসকষহীন। কিন্তু আবার দু'জনে একত্র হ'লেই উভয়ের প্রতি আমার ভালোবাসাও ফিরে আসতো। বুঝলুম আমার মন শ্যামার রূপেও ভোলেনি, গৌরীর রূপেও নয়; দুই বোনের দুটি বিভিন্ন রকমের সৌন্দর্যের মিলন আমার মোহের কারণ। আমি একটি মনগড়া যুবতীর উপাসনা করছি। সে দিবাও নয়, নিশাও নয়, কিন্তু এর আধখানা ওর আধখানা দিয়ে সে তৈরি। দুটি সুন্দরী যুবতীমিথুনের সহবাসজাত একটি বিচিত্র মানসী সৃষ্টি। একের কাছ থেকে তার হাসি সংগ্রহ, অপরার কাছ থেকে তীব্র কটাক্ষ। গৌরীর বিষাদ, শ্যামার প্রফুল্লতা তাতে একত্রে মিলিত। দু'জনে একত্র হ'লেই এই অপূর্ব অবর্ণনীয়া মায়া-সুন্দরী আমাকে ছলনা করতে আস্‌তো। দু' বোনে জোড়

ভাঙবামাত্র সে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতো। ক্রমে কল্পনায় দু' বোনকে ঢালাই ক'রে, এক ছাঁচে ফেলে একটি মেয়ে গ'ড়ে, তাকেই ভালোবাসতে আরম্ভ করলুম: যেদিন থেকে তারা আমার ভালোবাসার ধারা বুঝতে পারলে,—বলা বাহুল্য তা বুঝতে বেশি দেরি হয়নি,—সেইদিন থেকেই তাদের আমার প্রতি একটু বিশেষরকম টান দেখতে পেলুম। বেশ স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগলো যে, আর সকলের চাইতে আমি তাদের মনের কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছি।

ইতিমধ্যে দিবানিশার মার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব জমিয়ে নিয়েছিলুম। সময় নেই অসময় নেই, যখন আমার খুশি তাদের বাড়িতে যেতুম। আমাকে সেখানে সকলে নাম ধ'রে ডাকতো। মেয়েরা ছবি আঁকতো, আমি তার উপর আমার তুলি চালাতুম,—আমি না হ'লে তাদের গানবাজনা জমতো না। কিন্তু আমার অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, সঙ্গিনী আমার দুটি দেবকন্যা, কিন্তু বাসস্থান নরকে।

তাদের সঙ্গ আমার কাছে যেমন মিষ্টি লাগতো, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক। আমি ব'সে-ব'সে ছবি আঁকতুম, দুটি বোন দু'পাশ থেকে আমার ঘাড়ের উপর ঈষৎ ঝুঁকে একমনে তাই দেখতো। তাদের বুকের তোলপাড় শব্দ আমার পশ্চাতে, তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস আমার চুলের ভিতর অনুভব করতুম। জীবনে বোধহয় অত খারাপ ছবি আর কখনো আঁকিনি, কিন্তু তারা বলতো 'অতি চমৎকার।' কখনো বা ঘরের কোণে পরদার আড়ালে, একটি ডাইনে আর একটি বাঁয়ে, মধ্যে আমি, তিনজনে ব'সে কাকাতুয়ার মতো অনর্গল ব'কে যেতুম; মাথামুণ্ডু কী যে কথা হ'তো, তার কোনোই অর্থ নেই। তারা দু'জনে প্রায়ই একসঙ্গে কথা কইতো, আমি কখনো বা নিশার কথার জবাব দিবাকে দিতুম, দিবার কথার জবাব নিশাকে দিতুম। হাসির কথা যে বেশি কিছু হ'তো তাতো মনে হয় না, তবে থেকে-থেকেই আমরা হেসে লুটোপুটি খেতুম। এই অবসরে গৃহলক্ষ্মী আর এক কোণে পাঁচ বৎসরের পুরনো একখানা খবরের কাগজ একমনে পড়তেন, আর না হয় তো চেয়ারে ব'সেই আধঘুম ঘুমিয়ে নিতেন।

স্বীকার করতেই হবে আমার অবস্থা দেখে আর পাঁচজনের জিভে জল আসতো, অন্যে হিংসে করতো; আর এমন লোভনীয় অবস্থা কেউ কখনো স্বপ্নেও আনেনি। কিন্তু তবুও আমি ভিতরে-ভিতরে পুরোমাত্রায় সুখী ছিলুম না।

যদি কখনো আদর ক'রে দিবার মুখচুম্বন করতুম, মনে হ'তো একটা কি যেন অভাব থেকে গেলো, সে যেন ষোলো আনা চুম্বন নয়। যদি অমনি ফিরে নিশার মুখচুম্বন করি তো দেখি সে কেবল পূর্ব চুম্বনের পুনরুক্তি। দু'জনের মুখ এক ক'রে নিয়ে এক বাণে দু'টি পাখি না মারতে পারলে আর আমার পরিতৃপ্ত হবার সম্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু এ-ইচ্ছা হওয়া যত সহজ, চরিতার্থ করা তত সহজ নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দু'জনের ভেতর বোন সতিনের ভাবের লেশমাত্র ছিলো না। অবশ্য দু'জনে আমার কাছ থেকে সমান আদর যত্ন পেতো, আমার কোনো দিকে পক্ষপাতিতা ছিলো না।—তবুও! জানিনে তারা আমার উপর যে-রকম মোহ বিস্তার করতো, পরস্পর পরস্পরের উপরও তেমনি করতো কি না; কিন্তু তা' ছাড়া আর কী কারণে উভয়ের মধ্যে এমন সদ্ভাব সম্ভব হ'তে পারতো? একের বিরহে অন্যটি একেবারে মিইয়ে যেতো, এবং আমার বিশ্বাস তারা মনে-মনে স্থির জানতো পরস্পর পরস্পরের আধখানা মাত্র, দু'জনে একত্র হ'লেই তবে পুরোরকমের একটা জীব হ'য়ে উঠতো। বোধহয় যে-রাত্রে মাতৃগর্ভে তাদের জীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়, যমক হবে সে বিষয়ে ব্রহ্মা ওয়াকিবহাল না থাকায় দূতহস্তে একটি মাত্র আত্মা পাঠিয়ে দেন; এবং সে ভদ্রলোক পৃথিবীতে এসে যখন তার ভুল টের পেলে, তখন আবার অতদূর ব্রহ্মালোকে আর-একটা আত্মার খোঁজে কে ফিরে যায় ব'লে যেটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো সেইটিই আধাআধি ভাগ ক'রে দু'জনকে দিয়ে গেলো। অন্তত আমার মনে এই সংস্কার এমনি দৃঢ়মূল হয়েছিলো যে, আমি তাদের নাম বদলে একটিমাত্র নাম দিই।

দিবানিশারও মনের অবস্থা আমারই মতো অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো, তারাও বরাবর আমারি মতো যন্ত্রণা ভোগ ক'রে আসছিলো। একদিন, জানিনে যুক্তি ক'রে কিংবা অমনি আপনা হ'তেই, দু'জনে দু'পাশ থেকে নক্ষত্রের মতো খ'সে এসে আমার গললগ্ন হয়। আমি একদিকে একটু হেলে একজনকে আদর করবার উপক্রম করছি, এমন সময় দুই বোনে যুগপৎ আমার দুটি গণ্ডস্থলে দুটি অধর বিন্যাস করলে। সেদিন তাদের চোখ দিয়ে আগুন ছুটছিলো, বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা এমনি তোলপাড় করছিলো যে মনে হ'লো বুঝি ভেঙে যায়। তীরবেগে ছুটে এসেছিলো ব'লে খুব সম্ভবত এই সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো; কিন্তু সেদিন আমি অন্যরকম বুঝেছিলুম। এমন ফুর্তি, এমন অসংযমের ভাব তাদের মুখে পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। সেই দু'টি চুম্বনের

ফল একটিমাত্র অনুভূতি। ফলে সে-দুটি চুম্বন দুই নয়, দুয়ে মিলে এক ; এ-চুম্বন দিবারও নয় নিশারও নয়, কিন্তু উভয়ের মিলনে যে একটি মায়াকুমারী সৃষ্টি হ'তো তারই। আমি সেদিন খাঁটি সুখ কাকে বলে, অন্তত তিন সেকেণ্ডের জন্য তা অনুভব করেছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে আমি পুরুষ, এবং যে-পুরুষ কিছুমাত্র নিজের গুমর বোঝে সে কখনো স্ত্রীজাতির এমন উল্টো রীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। আমি তখন দিবার একখানি ও নিশার একখানি, দু'খানি হাত নিয়ে আঙুলে-আঙুলে গেঁথে তুলে ধ'রে টেনে আমার মুখের উপরে নিয়ে এলুম। এই উপায়ে আমি তাদের আদরের প্রতিদান দিলুম, দিবা ও নিশা একই মুহূর্তে নিজের হাতে আমার অধরের স্পর্শ অনুভব করলে।

আপনারা বোধ হয় মনে-মনে হাসছেন, ভাবছেন আমি নিতান্ত পাগল। আর দুটি ষোড়শী সুন্দরীর ভালোবাসা পাওয়া তেমন কিছু বিপদ নয়। আমি কিন্তু জীবনে অমন জ্বালায় আর জ্বলিনি। ইচ্ছা করলে দিবা আমার হ'তে পারতো, ইচ্ছা করলে নিশা আমার হ'তে পারতো, কিন্তু এদের একজনকেও নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারতুম না। যা অসম্ভব আমি তা-ই চাই,—দু'জনকে এক সঙ্গে এক সময়ে। দেখতে পাচ্ছেন আমার মাথার তখন ঠিক ছিলো না।

এই সময়ে ইউ-কি-লি নামক একখানা চীনে নভেল আমার হাতে আসে। প্রথম দু' চার ভল্যুম কোনো রকম কায়ক্লেশে পার করলুম। শুধু চার পেয়ালা, শুধু বক আর শুধু সারসের বর্ণনা প'ড়ে-প'ড়ে প্রায় এলে গেছলুম। তারপর যেখানে শ্রীযুক্ত সী-ইউপি, বি. এ. একটি খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো কিংবা মামাতো বোনের ভালোবাসায় অনেকদিন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, এমন সময় হ'ও-মু-লি নাম্নী আর একটি খুড়তুতো কিংবা মামাতো বোনেরও ভালোবাসায় প'ড়ে গেলেন, সেই যুগল প্রেমের উপাখ্যান আমার এমনি চমৎকার লাগলো যে বই আর ছাড়তে পারিনি। শেষ কী হয় জানবার জন্য আগ্রহ সহকারে এক নিশ্বাসে প'ড়ে যেতে লাগলুম। শেষে সী-ইউপির সঙ্গে দু'জনেরই একদম বিয়ে হ'য়ে গেলো। আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন তো বলতে পারি যে, হঠাৎ দেখি চীনেম্যান হবার ভয়ংকর সাধ গেছে—শুধু নির্বিবাদে দুটো বিয়ে করবার লোভে। এখন ইউ-কিয়োলো-লির মতো আর কোনো বই আমার ভালো লাগে না। একদণ্ডও সেখানা হাতছাড়া করিনে। অবস্থা আমার দিন-দিন আরো অসহ্য হ'য়ে উঠলো। শেষটা একদিন ইসপার কি উসপার যা-হয় একটা

হোক স্থির ক'রে, ও আপদ চুকিয়ে ফেলবার জন্য হয় দিবা না-হয় নিশা একজনকে বিয়ে করবো কৃতসংকল্প হ'য়ে তাদের বাড়ি গিয়ে উঠলুম। মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো। অমনি আমি আরম্ভ করলুম—'আমার ইচ্ছা আপনার একটি কন্যাকে বিবাহ করি, কিন্তু তাঁরা উভয়েই রূপে গুণে অতুলনীয়া,—তাই দু'জনের কাকে বিবাহ করি সেইটেই শুধু স্থির করতে পারিনি।'

'এ বিষয়ে আমিও ঠিক তোমারি মতো। আমিও জানিনে দু'জনের ভিতর কাকে আমি বেশি ভালোবাসি। তবে এখনো আমার মেয়েরা ছোটো, বিবাহ দু'দিন দেরিতে হ'লে ক্ষতি নেই। সময়ে আশা করি তুমি একজনের বিষয় মনস্থির করবে।'

সেদিন সেখানেই আমরা থেমে গেলুম। তিনমাস গেলো, চারমাস গেলো, আমার আর মনস্থির করা কিছুতে হ'লো না। বড়ো ফাঁপরেই পড়লুম। এমন হ'লো যে, যে-হয় একজনকে বিয়ে না করলে আর চলে না, অথচ কাকে করবো তাও স্থির করতে পারিনে। কাজেই দেশভ্রমণে স'রে পড়বার মনস্থ করলুম। মেয়েরা শুনে চোখের জল ছেড়ে দিলো। মা আমার দিকে শুধু করুণাদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। সে-চাউনি আমি জীবনে ভুলবো না। সে-চাউনির অর্থ—আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পেরেছি, বেচারা—তুমি কী বিপদেই পড়েছো। আমি যখন চ'লে আসি, তখন মেয়েরা আমার সঙ্গে দুয়োর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। এবং দু'জনে নিজের নিজের মাথা থেকে দু' গোছা চুল আমার হাতে দিলে। আমার চোখের জল কখনো পড়ে না, —সেদিনও পড়েনি, কিন্তু—যাক, সে-সব ইতিহাস আর ব'লে কী হবে? আমি যে ছ'মাস বিদেশে ছিলুম সেই চুল বুকে ধ'রে বেড়াতুম।

ফিরে এসে শুনি দু'জনেরই বিয়ে হ'য়ে গেছে। একজনের স্বামী বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের একটি জমিদার,—প্রকাণ্ড পুরুষ, যেমন লম্বা, তেমনি মোটা,—জজ কি ম্যাজিস্ট্রেট, কিংবা ঐরকমই আর কিছু একটি চিজের হাতে পড়েছেন। তাঁর শুনতে পাই চক্ষু আর নাসিকা জবা ফুলের মতো।

বলা বাহুল্য এই পশু দুটোর বিষয়ে যখন কথা কই, তখন ভাষা ঠিক ভদ্র গোছের হয় না। একটি আত্মা ও দুটি দেহতে গঠিত এই সুন্দরীযুগলকে বিচ্ছিন্ন করতে পাপিষ্ঠদের একটুমাত্র দ্বিধাও হয়নি। শেষকথা, ইহসংসারে কবিত্ব ব'লে জিনিশ আর নেই। পৃথিবীটে যত অরসিকের হাতে পড়েছে।

অনুবাদ : প্রমথ চৌধুরী



ডাক্তার

ইভান টুর্গেনিভ

তখন হেমন্তকাল। বহুদূর থেকে ঘরে ফেরার পথে ঠাণ্ডা লেগে অসুখে পড়লাম। তবু, ভাগ্য বলতে হবে, জ্বর যখন এলো তখন এক মফস্বল-শহরের সরাইখানায় ছিলাম; ডাক্তার ডেকে পাঠানো গেলো। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়লেন তিনি, ক্ষীণ দেহ, কালো চুল আর মাঝারি লম্বা শরীর। সেই চিরাচরিত ঘাম হবার ওষুধ দিলেন, বললেন কপালে সর্ষের প্রলেপ লাগাতে, সুনিপুণভাবে একটি পাঁচ রুব্‌লের নোট ঢুকিয়ে দিলেন আমার হাতায়, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুকনো একটু কাশলেন, তারপর চ'লে যেতে গিয়েও কেন যেন না গিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, গেলেন না। জ্বর আমার সব শক্তি নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিলো; আগেই বুঝতে পারছিলাম রাত্রে ঘুম হবে না, কাজেই সুখসঙ্গ এবং কিছু গালগল্পের সুযোগ পেয়ে খুশিই হলাম। চা এলো। বেশ মন খুলে কথা বলতে শুরু করলেন ডাক্তারবাবু। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, বেশ জোর দিয়ে এবং বেশ রস ক'রে নিজের কথা বলতে পারেন। অদ্ভুত সব কাণ্ড হয় এই পৃথিবীতে: এমন অনেক লোক আছে যাদের সঙ্গে বহুদিন একত্রে বন্ধুভাবে বাস ক'রেও আপনি প্রাণের কথা খুলে বলতে

পারবেন না ; আবার অনেকের সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ হওয়ার আগেই তাঁর কাছে আপনি—অথবা আপনার কাছে তিনি—যেন স্বীকারোক্তি করছেন এইভাবে সব গোপন কথা ব'লে ফেলবেন। জানি না কী ক'রে আমি আমার এই নতুন বন্ধুর বিশ্বাস পেলাম—যাই হোক, কিছুর মধ্যে কিছু না, তিনি আমাকে এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বললেন ; এখানে আমি ধৈর্যশীল পাঠকদের কাছে তাঁর গল্পটি যথাযথভাবে ব'লে যাবো। ডাক্তারের নিজের ভাষায় বলবার চেষ্টা করবো আমি।

"আপনি বোধহয় জানেন না," দুর্বল কম্পিত কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন (নির্ভেজাল বেরেজভ নস্যি-ব্যবহারের ফল) ; "আপনি বোধহয় এখানকার বিচারককে জানেন না, পাভেল লুকিচ ?·· জানেন না তো ?···অবশ্য তাতে কিছু ইতর বিশেষ হয় না।" (গলা ঝাড়লেন, চোখ ঘষলেন।) "যাক্, ব্যাপারটা ঘটেছিলো, বুঝলেন, একেবারে সঠিকভাবে বলতে গেলে, ঘটেছিলো লেণ্টে, ঠিক সেই ঝড়ের সময়টাতে। আমি তখন ব'সে আছি ওঁরই বাড়িতে—আমাদের বিচারকের বাড়িতে আরকি—তাস খেলছিলাম। আমাদের বিচারক মশাই লোক ভালো, তাস খেলতে খুব ভালোবাসেন। হঠাৎ, (ডাক্তার বাবু 'হঠাৎ' কথাটা খুব বেশি ব্যবহার করেন) "আমাকে ওরা বললে, 'একটি লোক আপনাকে ডাকছে।' আমি বললাম, 'কী চায় ?' ওরা বললো, 'একটা চিঠি নিয়ে এসেছে—নিশ্চয়ই কোনো রোগীর কাছ থেকে।' 'দেখি চিঠিটা' আমি বললাম। রোগীর কাছ থেকেই এসেছিলো—তা ভালো কথা—এই ক'রেই তো আমাদের খেতে হয় কিন্তু ব্যাপারটা হ'লো এই : একজন ভদ্রমহিলা একটি বিধবা আমাকে লিখছেন ; বলছেন : 'আমার মেয়ে মৃত্যু-শয্যায়। ভগবানের দোহাই, আপনি একবার আসুন !' বলছেন, 'ঘোড়া পাঠানো হ'লো।' সেতো বুঝলুম। কিন্তু ভদ্রমহিলা থাকেন শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে, বাইরে এখন মাঝরাত্রি নেমে এসেছে, আর হায় কপাল, রাস্তার যে অবস্থা ! ভদ্রমহিলার অবস্থা ভালো নয়, দুটো রুপোর রুব্‌ল ছাড়া আর-কিছু জুটবে এমন আশা নেই, এমনকি তাও জুটবে কিনা সন্দেহ ; হয়তো ক'গজ কাপড় আর এক থলি যবের দানা দিয়ে বিদায় করবে। যাই হোক, কর্তব্য, বুঝলেন, সবার আগে : আমারই মতো একজন মানুষ হয়তো মৃত্যু-পথে। তক্ষুনি স্থানীয় কমিশনের সদস্য কালিওপিনের হাতে তাস তুলে দিয়ে বাড়ি চ'লে এলাম। দেখি, জরাজীর্ণ একটা ছোট্ট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে

ঘোরগোড়ায়, চাষাদের ঘোড়া—মোটা—বড্ডো মোটারকমের জামার মতো ঝুলে পড়েছে তাদের গায়ের চামড়া—সেই ঘোড়া গাড়িতে জোড়া; গাড়োয়ান আমাকে সম্মান দেখিয়ে মাথা থেকে টুপি খুলে ব'সে আছে। নিজের মনে ভাবলাম, 'হায় বন্ধু, আমার রোগীরা যে টাকায় গড়াগড়ি দিচ্ছে না সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।'…আপনি হাসছেন; কিন্তু জানেন আমার মতো গরিব-গর্বাদের সব কথাই ভাবতে হয়। গাড়োয়ান যদি নবাবজাদার মতো ব'সে থাকে, টুপি না ছোঁয়, এমনকি আপনাকে দেখে দাড়ির আড়ালে নাক শিঁটকোয়, আর চাবুকের শব্দ করে—তাহ'লে আপনি বাজি রেখে ছয় রুব্‌ল আশা করতে পারেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একেবারে অন্য রকম। থাক, কী করা? কর্তব্য সবার আগে। সবচাইতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে রওনা হ'য়ে পড়লাম। বিশ্বাস করবেন! প্রাণ নিয়ে কোনোমতে গিয়ে পৌঁছলাম। জঘন্য রাস্তা: ঝর্না, বরফ, নালা, আর সবচাইতে বিশ্রী, এক জায়গায় আবার বাঁধ ভেঙে গেছে! যাই হোক শেষ পর্যন্ত তো পৌঁছনো গেলো। ছোট্ট বাড়ি, খড়ের চাল। জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, বোঝা গেলো আমার প্রতীক্ষায় আছেন সকলে। মাথায় টুপি পরা যে-বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এলেন তাঁর চেহারা দেখে শ্রদ্ধা হয়, 'ওকে বাঁচান!' বললেন তিনি, 'ও মারা যাচ্ছে।' আমি বললাম, 'দয়া ক'রে কাতর হবেন না—রোগী কোথায়?' 'এদিক দিয়ে আসুন।' দেখলাম পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একটি ঘর, এক কোনায় আলো জ্বলছে; বিছানায় অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে। গা পুড়ে যাচ্ছে, নিশ্বাস নিচ্ছে জোরে-জোরে—জ্বর হয়েছে। আরো দুটি মেয়ে, তার দুই বোন, ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। 'গতকাল' ওরা বললো, 'ও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো, খাওয়া দাওয়া সব ঠিক মতো করেছে, আজ সকালে বললো মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, আর তারপর সন্ধেবেলা একেবারে হঠাৎ এই রকম অবস্থা।' আমি আবার বললাম: 'ব্যস্ত হবেন না।' ডাক্তারের এটা কর্তব্য, জানেন তো—তার বিছানার কাছে গিয়ে প্রথমে রক্তপাত করালাম তারপর সর্বের মালিশ লাগাতে ব'লে একটা ওষুধ লিখে দিলাম। ইতিমধ্যে তাকে দেখে নিয়েছি আমি; তাকে দেখলাম, বুঝলেন—আর, ঈশ্বর! অমন মুখ আমি জীবনে কখনো দেখিনি!—এক কথায় বলতে গেলে মেয়েটি রূপসী! মনটা গ'লে গেলো আমার। কী সুন্দর তার মুখশ্রী; কী চোখ!… কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তার অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলো; ঘাম

হ'লো, মনে হ'লো যেন জ্ঞান ফিরে এসেছে, চারপাশে তাকিয়ে একটু হেসে সে মুখে হাত বোলালো · তার বোন ঝুঁকে পড়লে মুখের উপর। সবাই জিগেস করলো, 'কেমন আছো?' 'ভালো', ব'লে সে পিঠ ফিরিয়ে শুলো। আমি দেখলাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে। 'বেশ', বললাম আমি, 'এবার রোগীর একা থাকা দরকার।' সবাই বেরিয়ে এলাম পা টিপে-টিপে; কেবল একটি পরিচারিকা রইলো তার ঘরে, যদি কখনো কিছু দরকার হয়। বসবার ঘরে টেবিলের উপর সামোভার জ্বলছিলো, আর ছিলো এক বোতল রাম; আমাদের যা কাজ তাতে এ-সব ছাড়া চলে না। আমাকে ওঁরা চা এনে দিলেন; বললেন সেই রাতটা থেকে যেতে। আমি রাজি হলাম · ঐ রাত্রে কোথায়-ই বা যেতাম? বৃদ্ধা মহিলাটি সমানে কান্নাকাটি করছিলেন: 'ব্যাপার কী?' আমি বললাম; 'প্রাণহানির কোনো ভয় নেই; ভাববেন না; বরং যান একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে; রাত প্রায় দুটো বাজে।' 'কিন্তু কিছু যদি হয় তাহ'লে আমাকে ডাকবেন তো?' 'হ্যাঁ।' বৃদ্ধাটি চ'লে গেলেন, অন্য মেয়ে দুটিও গেলো নিজেদের ঘরে। আমিও শুয়ে পড়লাম কিন্তু আশ্চর্য— চোখে ঘুম এলো না আমার; অথচ খুবই তো ক্লান্ত ছিলাম! আমার রোগিনীটির চিন্তা মাথা থেকে সরাতে পারছিলাম না। শেষকালে আর না পেরে হঠাৎ উঠে বসলাম, মনে-মনে ভাবলাম, 'গিয়ে দেখি ও কেমন আছে।' বসার ঘরের ঠিক পাশেই ওর শোবার ঘর। উঠে পড়লাম, সন্তর্পণে দরজা খুললাম—কী দ্রুত লয়েই না বাজছিলো আমার হৃৎপিণ্ড! ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম পরিচারিকাটি ঘুমিয়ে পড়েছে, হাঁ হয়ে আছে মুখ, নাক পর্যন্ত ডাকছে অকর্মণ্য স্ত্রীলোকটার! আর আমার রোগিনী শুয়ে আছে দরজার দিকে মুখ ক'রে, দুই হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে—আহা বেচারি! কাছে গেলাম…হঠাৎ চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে! 'কে? কে?' আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'ভয় পাবেন না,' বললাম আমি: 'আমি ডাক্তার; আপনি কেমন আছেন দেখতে এসেছি।' 'আপনি ডাক্তার?' 'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার; আপনার মা আমাকে শহর থেকে ডাকিয়ে এনেছেন; আপনার রক্তপাত করা হয়েছে; এখন আমার অনুরোধ, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, দু'একদিনের মধ্যে ভগবানের কৃপায় আপনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার, আমাকে মরতে দিয়ো না।…দয়া ক'রো, দয়া ক'রো।' 'ও-কথা কেন বলছেন? ভগবান আপনার মঙ্গল

করুন!' মনে-মনে ভাবলাম, আবার জ্বর এসেছে; নাড়ি টিপে দেখলাম—ঠিক, জ্বর হয়েছে। সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, আমার হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। 'আপনাকে আমি বলবো কেন আমি মরতে চাই না; আমি বলবো আপনাকে · এখন আমরা একা; শুধু দয়া ক'রে আপনি · কাউকে না···শুনুন···' আমি ঝুঁকে পড়লাম; আমার কানের খুব কাছে তার ঠোঁট নড়লো; তার চুলের ছোঁয়া লাগলো আমার গালে—স্বীকার করছি আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো—তারপর ফিশফিশ করতে শুরু করলো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না—আহা, প্রলাপ বকছিলো সে! সে ফিশফিশ ক'রে সমানে কথা ব'লে গেলো, এত দ্রুত যে মনেই হচ্ছিলো না রুশ ভাষা বলছে; অবশেষে এক সময়ে সে চুপ করলো, কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি রাখলো বালিশের উপর, তর্জনী দেখিয়ে শাসন করলো আমাকে 'মনে রাখবেন, ডাক্তারবাবু, কাউকে না।' আমি কোনোমতে তাকে শান্ত করলাম, সামান্য কিছু পানীয় দিলাম তারপর স্ত্রীলোকটিকে জাগিয়ে দিয়ে চ'লে এলাম।"

এতটা ব'লে ডাক্তারের যেন সব শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে গেলো, আবার নস্যি নিলেন, তারপর যেন তার-ই ফলে মুহূর্তমাত্র ব'সে রইলেন স্তম্ভিতের মতো।

"যাই হোক," ডাক্তার ব'লে চললেন, "পরের দিন আমি যা ভেবেছিলাম তা হ'লো না : রোগিনীর অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা গেলো না। ভেবে-ভেবে এক সময় হঠাৎ মনস্থির করলাম যে আমি ওখানেই থেকে যাবো, যদিও জানি আমার অন্যান্য রোগীরা আমার অপেক্ষায় থাকবে । আর জানেন সেটা তুচ্ছ করবার মতো ব্যাপার নয়; আমার পশারের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। কিন্তু প্রথমত, আমার এই রোগিনীর অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক ছিলো; আর দ্বিতীয়ত, সত্যি কথা বলতে, আমি তার জন্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। তাছাড়া ওদের পরিবারটাকেই খুব ভালো লেগেছিলো আমার। অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ, পরিবারটি বিশেষ,—বলা যেতে পারে, বিশেষ শিক্ষিত · ওদের বাবা ছিলেন পণ্ডিত ও সাহিত্যিক; দারিদ্র্যের মধ্যেই মারা গেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু তার আগে কোনোক্রমে সন্তানদের চমৎকার শিক্ষা দিয়ে যেতে পেরেছেন; আর রেখে গেছেন প্রচুর বই। হয় আমি আমার রোগীকে অতিশয় যত্ন নিয়ে দেখছিলাম ব'লে, আর নয়তো অন্য কোনো কারণে, পুরো

পরিবারটিই আমাকে ঘরের লোকের মতো ভালোবাসতো ·। এদিকে ততদিনে রাস্তা আরো খারাপ হয়েছে; বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগ-সূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'য়ে গেছে বলতে গেলে; শহর থেকে ওষুধ আনা পর্যন্ত কষ্টকর ·। অসুস্থ মেয়েটির অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছিলো না ·। দিনের পর দিন ··কিন্তু···মানে···" (ডাক্তার এখানে একটু থামলেন।) "কী ক'রে আপনাকে বলবো জানি না" (আবার নস্যি নিলেন, কাশলেন, চা খেলেন এক চুমুক।) "ভণিতা না ক'রে ব'লেই ফেলছি। আমার রোগিনী ···কী ক'রে বলবো? মানে মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছিলো আর কি অথবা, না, ঠিক প্রেমে যে পড়েছিলো তা নয় যাইহোক সত্যি, কী ক'রে বলা যায়?" (ডাক্তার চোখ নিচু করলেন, লাল হ'য়ে উঠলেন।) "না," দ্রুত ব'লে চললেন ডাক্তার, "প্রেম আবার কী! নিজেকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সে ছিলো শিক্ষিত, চতুর, সুপঠিত একটি মেয়ে, আর আমি যে সামান্য ল্যাটিনটুকু জানতাম তা পর্যন্ত যাকে বলে একেবারে ভুলে গেছি। আর চেহারার কথা (ডাক্তার মৃদু হেসে নিজের শরীরের দিকে তাকালেন) তা নিয়েও আমার গর্ব করার কিছু নেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে বোকা ক'রে সৃষ্টি করেন নি; কালোকে আমি ভুল করি নি শাদা ব'লে; দু' একটা জিনিশ আমি সত্যিই জানি; আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে, আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা - তার নাম—আমাকে ভালোবাসেনি তবে, বলা যেতে পারে, বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখেছিলো—শ্রদ্ধা বা ঐ ধরনের একটা কিছু ছিলো আমার প্রতি। অবশ্য সে নিজেই এই মনোভাবকে ভুল বুঝেছিলো, কিন্তু সে যাই হোক, এই ছিলো তার মনোভাব, আপনি নিজে এবার বিচার করতে পারেন। কিন্তু," ডাক্তার যোগ করলেন, এইসব ছাড়াছাড়া বাক্যগুলি; ভদ্রলোক দম না নিয়ে ব'লে চলছিলেন—এবং স্পষ্টতই বিব্রত বোধ করছিলেন, "আমি বোধহয় অনেক আজেবাজে কথা এনে ফেলছি—ব্যাপারটা বোধহয় আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না আচ্ছা, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি গুছিয়ে বলছি সব।"

এক গেলাশ চা শেষ ক'রে অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় ভদ্রলোক শুরু করলেন। "আচ্ছা। আমার রোগিনীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকলো। আপনি তো আর ডাক্তার নন, মশাই; আপনি বুঝবেন না মনের যখন সন্দেহ জাগে যে অসুখটা আমাদের নাগালের বাইরে চ'লে গেছে তখন—অন্তত

করুন!' মনে-মনে ভাবলাম, আবার জ্বর এসেছে; নাড়ি টিপে দেখলাম— ঠিক, জ্বর হয়েছে। সে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, আমার হাত তুলে নিলো নিজের হাতে। 'আপনাকে আমি বলবো কেন আমি মরতে চাই না; আমি বলবো আপনাকে · এখন আমরা একা; শুধু দয়া ক'রে আপনি · কাউকে না···শুনুন···' আমি ঝুঁকে পড়লাম; আমার কানের খুব কাছে তার ঠোঁট নড়লো; তার চুলের ছোঁয়া লাগলো আমার গালে— স্বীকার করছি আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো—তারপর ফিশফিশ করতে শুরু করলো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না—আহা, প্রলাপ বকছিলো সে! সে ফিশফিশ ক'রে সমানে কথা ব'লে গেলো, এত দ্রুত যে মনেই হচ্ছিলো না রুশ ভাষা বলছে; অবশেষে এক সময়ে সে চুপ করলো, কাঁপতে কাঁপতে মাথাটি রাখলো বালিশের উপর, তর্জনী দেখিয়ে শাসন করলো আমাকে 'মনে রাখবেন, ডাক্তারবাবু, কাউকে না।' আমি কোনোমতে তাকে শান্ত করলাম, সামান্য কিছু পানীয় দিলাম তারপর স্ত্রীলোকটিকে জাগিয়ে দিয়ে চ'লে এলাম।"

এতটা ব'লে ডাক্তারের যেন সব শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে গেলো, আবার নস্যি নিলেন, তারপর যেন তার-ই ফলে মুহূর্তমাত্র ব'সে রইলেন স্তম্ভিতের মতো।

"যাই হোক," ডাক্তার ব'লে চললেন, "পরের দিন আমি যা ভেবেছিলাম তা হ'লো না: রোগিনীর অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা গেলো না। ভেবে-ভেবে এক সময় হঠাৎ মনস্থির করলাম যে আমি ওখানেই থেকে যাবো, যদিও জানি আমার অন্যান্য রোগীরা আমার অপেক্ষায় থাকবে । আর জানেন সেটা তুচ্ছ করবার মতো ব্যাপার নয়; আমার পশারের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। কিন্তু প্রথমত, আমার এই রোগিনীর অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক ছিলো; আর দ্বিতীয়ত, সত্যি কথা বলতে, আমি তার জন্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। তাছাড়া ওদের পরিবারটাকেই খুব ভালো লেগেছিলো আমার। অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ, পরিবারটি বিশেষ,—বলা যেতে পারে, বিশেষ শিক্ষিত · ওদের বাবা ছিলেন পণ্ডিত ও সাহিত্যিক; দারিদ্র্যের মধ্যেই মারা গেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু তার আগে কোনোক্রমে সন্তানদের চমৎকার শিক্ষা দিয়ে যেতে পেরেছেন; আর রেখে গেছেন প্রচুর বই। হয় আমি আমার রোগীকে অতিশয় যত্ন নিয়ে দেখছিলাম ব'লে, আর নয়তো অন্য কোনো কারণে, পুরো

পরিবারটিই আমাকে ঘরের লোকের মতো ভালোবাসতো। এদিকে ততদিনে রাস্তা আরো খারাপ হয়েছে; বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগ-সূত্রে সম্পূর্ণ ছিন্ন হ'য়ে গেছে বলতে গেলে; শহর থেকে ওষুধ আনা পর্যন্ত কষ্টকর। অসুস্থ মেয়েটির অবস্থার কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছিলো না। দিনের পর দিন ··কিন্তু···মানে···" (ডাক্তার এখানে একটু থামলেন।) "কী ক'রে আপনাকে বলবো জানি না" (আবার নস্যি নিলেন, কাশলেন, চা খেলেন এক চুমুক।) "ভণিতা না ক'রে ব'লেই ফেলছি। আমার রোগিনী ···কী ক'রে বলবো? মানে মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছিলো আর কি অথবা, না, ঠিক প্রেমে যে পড়েছিলো তা নয় যাইহোক সত্যি, কী ক'রে বলা যায়?" (ডাক্তার চোখ নিচু করলেন, লাল হ'য়ে উঠলেন।) "না," দ্রুত ব'লে চললেন ডাক্তার, "প্রেম আবার কী! নিজেকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। সে ছিলো শিক্ষিত, চতুর, সুপঠিত একটি মেয়ে, আর আমি যে সামান্য ল্যাটিনটুকু জানতাম তা পর্যন্ত যাকে বলে একেবারে ভুলে গেছি। আর চেহারার কথা (ডাক্তার মৃদু হেসে নিজের শরীরের দিকে তাকালেন) তা নিয়েও আমার গর্ব করার কিছু নেই। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে বোকা ক'রে সৃষ্টি করেন নি; কালোকে আমি ভুল করি নি শাদা ব'লে; দু' একটা জিনিশ আমি সত্যিই জানি; আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে, আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা – তার নাম—আমাকে ভালোবাসেনি তবে, বলা যেতে পারে, বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখেছিলো—শ্রদ্ধা বা ঐ ধরনের একটা কিছু ছিলো আমার প্রতি। অবশ্য সে নিজেই এই মনোভাবকে ভুল বুঝেছিলো, কিন্তু সে যাই হোক, এই ছিলো তার মনোভাব, আপনি নিজে এবার বিচার করতে পারেন। কিন্তু," ডাক্তার যোগ করলেন, এইসব ছাড়াছাড়া বাক্যগুলি; ভদ্রলোক দম না নিয়ে ব'লে চলছিলেন—এবং স্পষ্টতই বিব্রত বোধ করছিলেন, "আমি বোধহয় অনেক আজেবাজে কথা এনে ফেলছি—ব্যাপারটা বোধহয় আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না আচ্ছা, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি গুছিয়ে বলছি সব।"

এক গেলাশ চা শেষ ক'রে অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় ভদ্রলোক শুরু করলেন। "আচ্ছা। আমার রোগিনীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যেতে থাকলো। আপনি তো আর ডাক্তার নন, মশাই; আপনি বুঝবেন না মনের যখন সন্দেহ জাগে যে অসুখটা আমাদের নাগালের বাইরে চ'লে গেছে তখন—অন্তত

গোড়ার দিকে মনের কী অবস্থা হয়। আত্মবিশ্বাস চ'লে যায়। হঠাৎ কেমন ভিতু হ'য়ে পড়ে লোকেরা; অবস্থা বর্ণনা ক'রে বোঝানো যাবে না। আপনার তখন মনে হবে আপনি যা জানেন সব ভুলে গেছেন, অন্যান্য লোকেরাও আপনার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ করতে শুরু ক'রে ছায়, এবং রোগের লক্ষণগুলি কেমন যেন অনিচ্ছা নিয়ে বিবৃত করে আপনার কাছে; সকলে যেন আপনাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে, ফিশফিশ, করছে উঃ! ভয়ানক! আপনার মনে হয় এই অসুখের কোনো একটা প্রতিষেধক নিশ্চয়ই আছে, শুধু যদি লোকে সেটা জানতো! তাই নয় কি? আপনি চেষ্টা করেন না, তা নয়! একটা ওষুধ প্রয়োগ ক'রে তার কাজটা দেখার জন্য অপেক্ষা করেন না আপনি··· আপনি একবার এটা ধরেন, একবার ওটা ধরেন। কখনো হয়তো ওষুধের বই পড়তে শুরু করেন—ভাবেন এইখানেই উপায় লেখা আছে! কখনো বা, দৈবাৎ একটা কিছু বেছে নেন···মনে করেন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া যাক · কিন্তু ততক্ষণে আপনার মতোই আরেকটি মানুষ মারা যাচ্ছে, অন্য কোনো ডাক্তার হয়তো বাঁচাতে পারে তাকে। 'পরামর্শ করা দরকার,' তখন মনে হয়, 'আমি নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে রাজি নই।' আর এ-রকম সময়ে লোককে যে কী বোকার মতো দেখায় বলবার নয়! কিন্তু যত সময় যায় এ-সব ততই গা-সহা হ'য়ে যায়, বুঝলেন! তখন আর কিছুই মনে হয় না। একটি লোক মারা গেলো—কিন্তু সে তো আর আপনার দোষ নয়; আপনি তো নিয়মমাফিক চিকিৎসা-ই করেছিলেন! কিন্তু সবচাইতে যন্ত্রণা হয় যখন দেখেন আপনার উপর সকলের অন্ধ বিশ্বাস, আর অনুভব করেন যে আপনি কোনো কাজেই লাগবেন না। আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনাদের সারা পরিবারের ঐ অন্ধ বিশ্বাস ছিলো আমার উপর; তারা এ-কথা ভাবতে ভুলে গিয়েছিলো যে তাদের মেয়ের বিপদ আসন্ন। আমিও, কিছু নয় ব'লে তাদের আশ্বাস দিতাম, কিন্তু গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হতাম সঙ্গে-সঙ্গে। কষ্ট আরো বাড়লো যখন আমাদের গাড়োয়ান ওষুধ আনতে গিয়ে আটকে পড়লো কারণ রাস্তার যা অবস্থা! আমি একবারও রোগীর ঘর ছেড়ে বাইরে যেতাম না; নিজেকে সরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না; বুঝলেন, আমি ওকে মজার-মজার গল্প বলি, তাস খেলি। রাত জেগে ব'সে থাকি শিয়রে। তার বৃদ্ধা মা সজল চোখে আমাকে ধন্যবাদ দেন; কিন্তু আমি মনে-মনে ভাবতাম, 'আপনার কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়।' আমি আপনার কাছে স্পষ্টই স্বীকার

করছি আমার রোগিনীর প্রেমে পড়েছিলাম। আর আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনাও ভালোবেসেছিলো আমাকে; আমি ছাড়া অন্য কাউকে সে তার ঘরে ঢুকতে দেবে না। সে আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতো, প্রশ্ন করতো নানারকম; আমি কোথায় পড়াশুনো করেছি, কী ভাবে থাকি, আমার স্বজন বন্ধু কারা, আমি কাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি বুঝি যে তার কথা বলাটা উচিত হচ্ছে না; কিন্তু তাকে বারণ করতে—জোর দিয়ে বারণ করতে, জানেন—পারতাম না। মাঝে-মাঝে হাতে মাথা রেখে আমি নিজেকে জিগেস করতাম, 'কী করছো তুমি, শয়তান?' আর সে নিজের হাতে তুলে নিতো আমার হাত, দীর্ঘ, দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে, মুখ ঘুরিয়ে নিতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর বলতো, 'কত ভালো আপনি!' জ্বরের তাপ তার হাতে, কী বিশাল, কী অবসন্ন তার চোখ···'হ্যাঁ' সে বলতো, 'আপনি ভালো, আপনি দয়ালু; আপনি আমাদের প্রতিবেশীদের মতো নন না, আপনি ওদের মতো নন। কেন আরো আগে আমার আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি!' 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, শান্ত হোন,' আমি জবাবে বলি 'আমি অনুভব করছি, বিশ্বাস করুন, জানি না কী ক'রে আমার এ-সৌভাগ্য হ'লো ···কিন্তু শুনুন, শান্ত হোন সব ঠিক হ'য়ে যাবে; আপনি সেরে উঠবেন।'

"এটা আপনাকে বলা দরকার", সামনের দিকে ঝুঁকে, ভুরু তুলে ডাক্তার ব'লে চললেন, "যে ওরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব কম মিশতো, কারণ গরিব লোকেরা তাদের সমকক্ষ ছিলো না আর ধনীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ওদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগতো। আমি তো আপনাকে বলেইছি ওদের পরিবারটা ছিলো অসাধারণ শিক্ষিত, কাজেই আমার পক্ষে ওদের বন্ধুতাটা গর্বেরই বিষয়। আমি ছাড়া আর কারুর হাত থেকে ওষুধ খাবে না সে, আমার সাহায্যে সে অল্প একটু উঠবে, আহা বেচারি, ওষুধ খাবে, তাকাবে আমার দিকে···আমার মনে হ'তো যেন আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে। অথচ এদিকে তার অবস্থা ক্রমেই আরো, আ রো খারাপ হচ্ছে; ও মারা যাবে, আমি ভাবতাম; ও নিশ্চয়ই মারা যাবে। বিশ্বাস করুন, আমি নিজে মরতে রাজি ছিলাম; আর তার মা বোন দেখছে আমাকে, তাকিয়ে আছে আমার চোখের দিকে শিথিল হ'য়ে আসছে আমার প্রতি তাদের বিশ্বাস। 'কী? কেমন আছে ও?' 'সব ঠিক আছে, ঠিক আছে!' ঠিক আছে? আমার মন

ডুবে যাচ্ছিলো হতাশার অন্ধকারে। তারপর, একরাত্রে আমি একা জেগে আছি আমার রোগিনীর বিছানার পাশে। পরিচারিকাটিও ঘরে ছিল অবশ্য, কিন্তু সে তো তখন নাক ডাকাচ্ছে পুরোদমে; বেচারাকে দোষ দিতে পারি না: ওরও তো ক্লান্তি আছে। সারা সন্ধে আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনার শরীর খুব খারাপ ছিলো; খুব বেশি জ্বর এসেছিলো। মাঝরাত পর্যন্ত ছটফট করেছে; অবশেষে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো; অন্তত শান্ত হ'লো একটু। ঘরের এক কোনায় পবিত্র মূর্তির সামনে আলো জ্বলছিলো। আমি ব'সে রইলাম মাথা নিচু ক'রে; একটু বুঝি তন্দ্রাও এসেছিলো। হঠাৎ মনে হ'লো কেউ যেন হাত রেখেছে আমার গায়ে; ঘুরে তাকালাম ·· হা ঈশ্বর! সুগভীর দৃষ্টি মেলে আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা দু' চোখ ভ'রে আমাকে দেখছে ঈষৎ ফাঁক হ'য়ে আছে তার দুটি ঠোঁট, দুই গাল যেন পুড়ে যাচ্ছে। 'কী হয়েছে?' 'ডাক্তার, আমি কি মরতে চলেছি?' 'ঈশ্বর রক্ষা করুন।' 'না, ডাক্তার, না; দয়া ক'রে এ-কথা বলবেন না যে আমি বাঁচবো ···এ-কথা বলবেন না যদি জানতেন ···শুনুন! ঈশ্বরের দোহাই আমার অবস্থা গোপন করবেন না,' জোরে-জোরে তার নিশ্বাস পড়তে লাগলো। 'যদি আমি নিশ্চিত হ'তে পারি যে আমি মারা যাবো · তাহ'লে আমি বলবো আপনাকে সব!' 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, আমি মিনতি করছি।' 'শুনুন; আমি একটুও ঘুমোইনি ·· আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়েছিলাম আপনার দিকে ঈশ্বরের দোহাই! আপনাকে আমি বিশ্বাস করি; আপনি সৎব্যক্তি; পৃথিবীতে যা-কিছু পবিত্র তার নামে আমি প্রার্থনা করছি আমাকে সত্যটা বলুন। যদি জানতেন সেটা আমার কাছে কত জরুরি ··ডাক্তারবাবু, ঈশ্বরের দোহাই আমাকে বলুন আমার কি বিপদের সম্ভাবনা আছে?' 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, আমি কী বলবো, বলুন?' 'ঈশ্বরের দোহাই, আমি মিনতি করছি আপনাকে' 'আপনার কাছে লুকোতে পারবো না,' আমি বললাম, 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা; আপনার সত্যিই বিপদের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু ঈশ্বর করুণাময়।' 'আমি মরবো, আমি মরবো।' আমার মনে হ'লো সে যেন এতে খুশি হ'লো; উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার মুখ; আমি ভয় পেয়ে গেলাম। 'ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না। মরতে আমার কোনো ভয় নেই।' হঠাৎ কনুইয়ে ভর ক'রে সে উঠে বসলো। 'এখন · হ্যাঁ, এখন আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি···

বলতে পারি যে আপনি দয়ালু আপনি ভালো—বলতে পারি যে আমি আপনাকে ভালোবাসি!' আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে ভূতে-পাওয়ার মতো ক'রে; বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কী মর্মান্তিক! 'শুনতে পাচ্ছেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি!' 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, কী ক'রে আমার এই সৌভাগ্য—' 'না, না, আপনি পারছেন না—আমার কথা বুঝতে পারছেন না আপনি' আর হঠাৎ সে বাড়িয়ে দিলো তার হাত, তার হাতের মধ্যে আমার মাথা নিয়ে চুমু খেলো · বিশ্বাস করুন, আমি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছিলাম·· হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লাম আমি, বালিশে মুখ লুকোলাম। সে কথা বললো না; আমার চুলের ফাঁকে কাঁপতে থাকলো তার আঙুল; কান পেতে শুনলাম, সে কাঁদছে। আমি সান্ত্বনা দিতে শুরু করলাম, ভরসা দিলাম তখন যে কী বলেছিলাম জানি না। 'স্ত্রীলোকটি জেগে যাবে', তাকে বললাম, 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, আপনাকে ধন্যবাদ বিশ্বাস করুন শান্ত হোন।' 'যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে।' সে ব'লে চললো; 'ওদের নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না; সবাই জেগে যাক; সবাই ঘরে আসুক—কিছু এসে যায় না; দেখছেন না আমি মারা যাচ্ছি আর আপনার আবার ভয় কী? আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন? মাথা তুলুন কিংবা আপনি হয়তো আমাকে ভালোবাসেন না; হয়তো আমি ভুল করেছি তা যদি হয়, তাহ'লে আমাকে ক্ষমা করুন।' 'আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, কী বলছেন আপনি!··· আমি তোমাকে ভালোবাসি, আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা।' সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিলো। 'তাহ'লে আমাকে তুমি তোমার বুকে নাও।' সত্যি বলছি, সে-রাত্রে যে পাগল হ'য়ে যাই নি তাই আশ্চর্য। মনে হচ্ছিলো আমার রোগী যেন আত্মহত্যা করছে; বুঝতেই পারছিলাম যে সে কী করছে তা সে নিজেই জানে না; এও জানি যে সে যদি নিশ্চিতভাবে এ-কথা না জানতো যে সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাহ'লে কখনোই আমার কথা ভাবতো না; আর আপনি যাই বলুন না কেন প্রেম না জেনে কুড়ি বছর বয়সে মারা যাওয়াটা সত্যি বড়ো কঠিন ব্যাপার; তাকে এই চিন্তাই যন্ত্রণা দিচ্ছিলো; সেইজন্য, বেপরোয়া হ'য়ে আমাকে সে আঁকড়ে ধরেছিলো এবার বুঝলেন? সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো, কিছুতেই ছাড়বে না। 'দয়া করো আমাকে আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা, আর নিজেকেও দয়া করো,' আমি বললাম। 'কেন,' সে বললো, 'অত ভাববার কী আছে?

আপনি তো জানেন, আমি মরবোই ' অনবরত এই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলো সে।...'যদি জানতাম যে আমি বেঁচে উঠবো, আবার সুস্থ স্বাভাবিক এক ভদ্রমহিলার মতো জীবন ফিরে পাবো, আমি লজ্জিত হতাম · অবশ্যই লজ্জিত হতাম, কিন্তু এখন কেন?' 'কিন্তু কে বললে তুমি মরবে?' 'ওঃ, চুপ করো। নিশ্চয়ই আমাকে ঠকাবে না? কী ক'রে মিথ্যে বলতে হয় তা তো তুমি জানো না—মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়,'...'তুমি বাঁচবে আলেকজান্দ্রা আন্দ্রেইভনা; আমি তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবো; আমরা তোমার মায়ের আশীর্বাদ চাইবো·· মিলিত হবো আমরা আমরা সুখী হবো।' 'না, না, আমি তোমার কথা পেয়েছি; আমি নিশ্চয়ই মরবো·· তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো আমার কাছে·· তুমি বলেছো আমাকে,' আমার পক্ষে বড়ো নিষ্ঠুর ব্যাপারটা, অনেক কারণে নিষ্ঠুর। আর দেখুন সামান্য সামান্য জিনিশও মাঝে-মাঝে কী করতে পারে; ব্যাপারটা কিছুই না, কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার খেয়াল হ'লো আমার নাম জানবার, পদবি নয়, নাম। আমার কপাল মন্দ—নাহ'লে ট্রিফন কারো নাম হয়? হ্যাঁ, সত্যি; ট্রিফন ইভানিচ। ও-বাড়ির সকলেই আমাকে ডাক্তার ব'লে ডাকতো। কিন্তু উপায় কী? বললাম, 'ট্রিফন।' সে ভুরু কুঁচকোলো, মাথা ঝাঁকালো, তারপর ফরাশিতে কী যেন বললো—হায়, নিশ্চয়ই অপ্রীতিকর কিছু!—আর তারপর সে হেসে উঠলো—সেটাও খুব প্রীতিপ্রদ নয়। যাই হোক, এইভাবে সারাটা রাত আমি কাটালাম তার সঙ্গে।. সকাল হবার আগে যখন ঘরে গেলাম তখন আমার পাগলের মতো অবস্থা। সকালে চায়ের পর আবার তার ঘরে ঢুকলাম। হা ঈশ্বর! আমি প্রায় চিনতে পারছিলাম না তাকে; কবর দেবার সময়ও মানুষের এর চাইতে ভালো চেহারা থাকে। এ-কথা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। আমি বুঝতে পারি না, এখন আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না ওই অভিজ্ঞতার পরও আমি কী ক'রে বেঁচে রইলাম। আরো তিনদিন তিনরাত বেঁচেছিলো সে। ভয়ংকর সেই তিনরাত! কী-সব কথাই না সে আমাকে বলেছিলো! আর শেষ রাত্রে—কল্পনা করুন—তার পাশে ব'সে আমি সমানে ভগবানের কাছে একটাই প্রার্থনা করেছি: 'তাকে নাও,' আমি বলেছি, 'যত শিগগির হয়, আর সেই সঙ্গে নাও আমাকে।' হঠাৎ তার বৃদ্ধা মা ঘরে ঢুকলেন। আমি তার আগের সন্ধেতেই তাঁকে—মানে মাকে—বলেছিলাম যে আশা খুব কম, পুরোহিতকে খবর দিলে ভালো হয়। মাকে দেখে সেই

অসুস্থ মেয়ে ব'লে উঠলো : 'তুমি এসেছো, খুব ভালো হয়েছে ; আমাদের দিকে তাকাও, আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি—আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি।' 'ও কী বলছে ডাক্তারবাবু? ও কী বলছে?' আমি বিবর্ণ হ'য়ে গেলাম। 'ও ভুল বকছে,' বললাম আমি, 'জ্বর হয়েছে তো।' কিন্তু সে : 'চুপ, চুপ ; এইমাত্রই তো তুমি আমাকে অন্য কথা বললে, আমার আংটি আঙুলে পরলে। কেন ভান করছো? আমার মা খুব ভালো—মা ক্ষমা করবেন—মা বুঝবেন—আর আমি মারা যাচ্ছি। আমার তো মিথ্যে বলার কোনো দরকার নেই ; দয়া ক'রে তোমার হাত আমাকে দাও।' লাফিয়ে উঠে আমি ঘরের বাইরে চ'লে গেলাম। বৃদ্ধা অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন।

"আপনাকে আর বেশিক্ষণ কথা ব'লে বিরক্ত করবো না, আর আমার পক্ষেও এ-ঘটনার স্মৃতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার রোগিনী তার পরের দিন এই মাটি ছেড়ে চ'লে গেলো। ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন।" ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দ্রুত এই কথাটা যোগ করলেন। মৃত্যুর আগে সে তার বাড়ির সকলকে আমাদের একলা রেখে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে বললো।

'আমাকে ক্ষমা করো,' সে বললো ; 'আমি হয়তো তোমার প্রতি অন্যায় করেছি আমার অসুস্থতা কিন্তু বিশ্বাস করো, আর কাউকে আমি তোমার চাইতে বেশি ভালোবাসিনি·· আমাকে তুমি ভুলো না : আমার আংটিটা তুমি রেখে দিয়ো।'

ডাক্তার মুখ ফেরালেন ; আমি তাঁর হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে।

ডাক্তার বললেন, "আসুন অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক, নাকি অল্প কিছু বাজি ধ'রে এক হাত তাস খেলবেন? আমার মতো লোকের কি এ-ভাবে আকুল হওয়া সাজে? আমার এখন একটা কথাই ভাববার আছে ; কী ক'রে বাচ্চাদের কান্না আর স্ত্রীর বকুনি বন্ধ রাখা যায়। আমি তো আবার যাকে বলে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছি কিনা এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে গ্রহণ করেছি আমি, আর সেই সঙ্গে গ্রহণ করেছি সাত হাজার রুব্‌ল পণ। স্ত্রীর নাম আকুলিনা, ট্রিফনের সঙ্গে এই নামই মানায়। বদমেজাজি, এ-কথা বলতেই হবে, তবে ভাগ্যের কথা এই যে সারাদিনই ঘুমিয়ে থাকে·· যাক—কী, খেলবেন নাকি এক হাত?"

আধ পেনি বাজি রেখে আমরা তাস খেলতে শুরু করলাম। ইভানিচ আমার কাছ থেকে আড়াই রুব্‌ল জিতে নিলেন, তারপর সাফল্যের তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বেশ দেরি ক'রে।

অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত



একটি ভীরু হৃদয়

ফিয়োডোর ডস্টয়েভ্স্কি

আহা, যতক্ষণ সে এখানে আছে ততক্ষণ তো ঠিক আছে সব ; মিনিটে-মিনিটে উঠে গিয়ে আমি দেখে আসছি তাকে ; কিন্তু কাল ওকে নিয়ে যাবে সবাই—আমি একা থাকবো কী ক'রে ? এখন সে আছে বাইরের ঘরের টেবিলে, দুটো তাস খেলার টেবিল একসঙ্গে ক'রে জুড়ে দিয়েছে ওরা, শবাধার আসবে কাল—শাদা, ধবধবে শাদা "নেপ্‌লের বিপুল শবাধার"—কিন্তু তা নয়···

সামনে পাইচারি ক'রে চলেছি আমি, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছি। গত ছয় ঘণ্টা ধ'রে আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে নিতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কথাটা—পুরো ব্যাপারটা কিছুতেই ঠিকভাবে ভাবতেই পারছিনে।

কথাটা হচ্ছে, আমি সমানে পাইচারি করছি, আর পাইচারি করছি।

ব্যাপারটা হ'লো এই। আমি সহজভাবে গুছিয়ে বলছি ঘটনাটা। (গুছিয়ে !)

ভদ্রমহোদয়গণ, সাহিত্যের সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগ নেই, তবে তো বুঝতে আপনাদের অসুবিধেও হবে না ; কিন্তু যা-ই হোক, আমি নিজে যা

বুঝেছি তাই বলবো আপনাদের। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হ'লো এই যে আমি সবই বুঝতে পারছি!

ব্যাপারটা হ'লো, যদি শুনতেই চান, প্রথম থেকে যদি শুরু করি তাহ'লে ব্যাপারটা হ'লো এই যে, সে আমার কাছে আসতো শুধুমাত্র জিনিশ বাঁধা দিতে, 'ভ্রমণে, বাড়িতে পড়াতে, ইত্যাদি ইত্যাদিতে ইচ্ছুক' গর্ভনেসের যে-বিজ্ঞাপন 'স্বর' পত্রিকায় সে দিতো সেজন্যে তার টাকা দরকার হ'তো। সে-ই শুরু; আমি অবশ্য তার সঙ্গে অন্য কারুর কোনো তফাত করি নি: 'ও আসে,' আমি ভাবতাম, 'অন্য সকলের মতোই ও আসে,' এই রকম ভাবতাম আরকি।

কিন্তু কিছুদিন পরেই আমি তফাতটা লক্ষ করলাম। এমন চিকণ, সুন্দর ছোটো একটি মেয়ে, বেশ লম্বা, আমার সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতো, যেন লজ্জিত মনে হ'তো তাকে (আমি ভাবতাম সে বুঝি অন্য সব আগন্তুকের মতো, আর তার চোখেও,—অবশ্যই—আমি ছিলাম ঠিক আর পাঁচ-জনের মতোই একজন—মানে বন্ধকি কারবারি হিশেবে নয়, মানুষ হিশেবে)। টাকাটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে মুখ ঘুরিয়ে চ'লে যেতো। কোনো কথা বলতো না, চুপ ক'রে থাকতো সব সময়। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তর্ক করতো, অনুনয় করতো, জোর করতো আরো কিছু বেশি পয়সার জন্য; সে কিন্তু কোনোদিন একটা পয়সা বেশি চায়নি·· ···

মনে হচ্ছে সব গুলিয়ে ফেলছি।

হ্যাঁ; সে যে-সব জিনিশ আনতো তা দেখেই আমি প্রথমটায় অবাক হয়েছিলাম: গিল্টি করা ছোটো-ছোটো শস্তা কানের মাকড়ি, বাজে একটা ছোট্ট লকেট—এ-সব জিনিশের বোধহয় ছ' পেনিও দাম হবে না। সে নিজেই জানতো যে এ-সব জিনিশের কোনো দাম নেই, কিন্তু তার মুখ দিয়েই বুঝতে পারতাম যে তার কাছে জিনিশগুলি অতিশয় মূল্যবান এবং পরে জানতে পেরেছিলাম যে সে-সব জিনিশ তার মৃত পিতামাতার স্মৃতি।

শুধু একবার আমি ওর জিনিশ দেখে নাক শিঁটকেছিলাম। বুঝলেন অমনিতে আমি কখনো ও-রকম ব্যবহার করি না। আমি আমার মক্কেলদের সঙ্গে যথাসম্ভব ভদ্রলোকের মতো আচরণ করি: দু' একটা কথা, বিনয় এবং দৃঢ়তা। 'দৃঢ়তা দৃঢ়তা।'

কিন্তু একবার সে নিয়ে এসেছিলো তার শেষ সম্বল ছেঁড়াখোঁড়া একটা পুরোনো

খরগোশের চামড়ার তৈরি জামা, এবং আমি ঠাট্টার স্বরে দু' একটা মন্তব্য না-ক'রে পারি নি। হায় কপাল! কী ভাবে দপ্ ক'রে সে জ্ব'লে উঠলো! বড়ো-বড়ো দুটি চোখ ছিলো তার, নীল স্বপ্নময় দুটি চোখ, কিন্তু—কী আগুন খেলে গেলো সে-চোখে। অবশ্য একটা কথাও বললো না; তার 'ছেঁড়া ন্যাকড়া' কুড়িয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

সেই প্রথম আমি তাকে বিশেষভাবে লক্ষ করলাম, এবং তার ধরনের মেয়েদের কথা চিন্তা করলাম—মানে এক বিশেষ ধরনের মেয়েদের বিষয়ে কী-সব যেন ভাবলাম। হ্যাঁ, আর-একটা কথা মনে পড়ছে: সেটা বোধহয়,—আপনারা যদি শুনতে চান তো বলি—বোধহয় আমার মনে সবচাইতে বেশি ছাপ ফেলেছিলো এবং আগেকার সব ঘটনা একে-একে মনে পড়ছিলো আমার। সেটা হ'লো এই যে সে ছিলো ভয়ানক কমবয়সী, এত কমবয়সী যে আমার মনে হ'তো তার বুঝি বছর চোদ্দো বয়স। আসলে ষোলো পুরতে আর তিন মাস তখন বাকি ছিলো তার। অবশ্য এটা আমার বলার কথা নয়, এর জন্য আগেকার ঘটনাগুলি আমার একে-একে মনে পড়ে নি। পরের দিন সে আবার এলো। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে সে ডব্রনরাডভ আর মোজ়ারের কাছেও গিয়েছিলো জামাটা নিয়ে; কিন্তু তারা সোনাদানা ছাড়া অন্য কিছু বন্ধক রাখে না, অন্য কোনো জিনিশের কথা কানেও তোলে না পর্যন্ত। আমি একবার তার কাছ থেকে কিছু পাথর নিয়েছিলাম (আজে-বাজে সব ছোটো-ছোটো পাথর) আর পরে তা নিয়ে ভেবেছিলাম; ভেবেছিলাম: আমিও তো শুধু সোনারুপো রেখেই টাকা ধার দিই, অথচ ওর কাছ থেকে আমি পাথর রাখলাম। সে-ই হ'লো তার বিষয়ে আমার দ্বিতীয় চিন্তা; এটা আমার মনে আছে। সে-বার, মানে যখন সে মোজ়ারের কাছ থেকে ফিরে এলো, সে নিয়ে এসেছিলো একটা অ্যাম্বরের তৈরি সিগারেটের পাইপ। শমঝদারের কাছে তার মূল্য ছিলো: খারাপ ছিলো না জিনিশটা, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো দাম নেই; কারণ আমরা শুধু সোনারুপোর কারবার করি। সেটা ছিলো তার 'বিদ্রোহে'র পরের দিন, কাজেই খুব কড়া ব্যবহার করলাম। আমার কড়া ব্যবহার মানে কাঠখোট্টা ব্যবহার। দুই রুব্ল তার হাতে তুলে দিয়ে একটু বিরক্তি সহকারে এই কথা বলবার লোভ সামলাতে পারলাম না: 'আমি শুধু তোমার জন্যই এটা করলাম; মোজ়ার হ'লে এমন জিনিশ নিতো না।'

'তোমার জন্য' কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে একটা ইঙ্গিত আছে এ-কথা তাকে বুঝতে দিলাম। শ্লেষ ছিলো আমার কথায়। সে 'তোমার জন্য' কথাটা শুনেই আবার সেইরকম লাল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু একটা কথাও বললো না, ছুঁড়ে দিলো টাকা, গ্রহণ করলো অন্যটা—অর্থাৎ দারিদ্র্য। কিন্তু কী রেগে লাল হ'য়ে উঠলো সে! দেখলাম আমি তাকে দংশন করেছি। আর সে চ'লে যাবার পর আমি হঠাৎ নিজেকে জিগেস করলাম দুই রুব্‌লের বিনিময়ে তার উপর আমার এই জিত সার্থক কিনা। হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! মনে আছে দু' দুবার আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছিলাম, 'সার্থক কিনা? সার্থক কিনা?'

মনে মনে হেসে আমি নিজেকে জবাব দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, সার্থক। আর খুব আনন্দ হয়েছিলো আমার। কিন্তু আমার কোনো খারাপ মনোভাব ছিলো না; আমি একটা মতলব ক'রে ও-কথাটা বলেছিলাম, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে; আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম ওকে, কারণ ওর সম্পর্কে কয়েকটা কথা হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গিয়েছিলো। এই ওর সম্পর্কে তৃতীয় বার ভাবলাম আমি···মানে, সেই তখন থেকেই সব শুরু হ'লো আরকি। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই গোপনে তার পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সবকিছু জানবার চেষ্টা করছিলাম। তার জন্য তখন অধীর হ'য়ে প্রতীক্ষা করতাম। আমার কেমন যেন মনে হ'তো যে শিগগিরই একদিন সে আসবে। যখন এলো তখন নরম স্বরে কথাবার্তা শুরু করলাম, অসাধারণ বিনীত ব্যবহার করলাম। আমি তো আর ছোটোলোকের মতো মানুষ হই নি, আদব কায়দাও জানি। হুম্। তখনই বুঝেছিলাম কত কোমল কত ভীরু তার হৃদয়।

ভীরু এবং কোমল হৃদয়ের লোকেরা খুব বেশিক্ষণ সংযম ধ'রে রাখতে পারে না, নিজেদের কথা প্রকাশ করার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের অজান্তে কথোপকথনের ফাঁকে তাদের সব কথা আপনি প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে; তারা সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, কিন্তু সবকথার জবাব দেয়, যতো বেশি প্রশ্ন আপনি করবেন তাদের আগ্রহও তত বাড়বে। শুধু এ-কথাটা মনে রাখবেন যে যদি ওদের দিয়ে কথা বলাতে চান তাহ'লে কখনো নিজেকে জাহির করবেন না। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে সে তখন আমাকে স্পষ্ট ক'রে কিছুই বুঝিয়ে বলে নি। 'স্বর'-এর কথাটথাগুলো সব আমি পরে জেনেছিলাম। সেই মুহূর্তে সে তার শেষ কপর্দক খরচ করছিলো বিজ্ঞাপনের পিছনে: প্রথম-প্রথম অবশ্য বেশ

উদ্ধতভাবেই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। 'ভ্রমণে ইচ্ছুক গর্ভনেস। আবেদন-পত্রের সঙ্গে অন্যান্য শর্ত জানানো হবে,' কিন্তু পরে : 'যে-কোনো কাজ করিতে ইচ্ছুক ; পড়াইতে, সঙ্গিনী হইতে, সংসারের দেখাশুনা করিতে, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করিতে, সেলাই করিতে ইত্যাদি ইত্যাদি,'—সাধারণত যা দেখা যায় তাই আরকি ! অবশ্য এ-সব কথা একসঙ্গে বেরুতো না, এক-একবারে এক-একটা বেরুতো এবং শেষ পর্যন্ত যখন সে দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছেছে তখন বিজ্ঞাপনের ভাষাটা দাঁড়ালো : 'বিনা মাইনেতে থাকা খাওয়ার বদলে।' না, কোনো কাজ সে পায় নি। শেষবারের মতো তাকে পরীক্ষা করবো স্থির করলাম। হঠাৎ 'স্বর' কাগজটা তুলে নিয়ে তাকে একটা বিজ্ঞাপন দেখালাম। "স্বজনবন্ধুহীনা একটি তরুণী ছোটো-ছোটো বাচ্চাদের গর্ভনেসের কাজ করিতে ইচ্ছুক, মধ্যবয়স্ক বিপত্নীকের সংসার হইলে ভালো হয়। সংসারে শৃঙ্খলা আনিতে সক্ষম।'

"দেখো, ভদ্রমহিলা সকালে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, সন্ধের মধ্যে নিশ্চয়ই কাজ পেয়ে যাবেন। ঠিক ঐ ভাবেই তো ওরা বিজ্ঞাপন দেয় কিনা।"

আবার লাল হ'লো তার মুখ, চোখ জ্ব'লে উঠলো, তক্ষুনি ঘুরে সোজা বেরিয়ে গেলো সে। খুব খুশি হলাম আমি, যদিও তখন আমি সব বিষয়ে নিশ্চিত হ'য়ে গেছি, অন্য কোনো কিছু ঘটবে এমন আশঙ্কা আর নেই ; আর কেউ নেবে না ওর সিগারেটের নল, আমি ভাবলাম। তাছাড়া ও সব নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। এবং তাই হ'লো, দু'দিন পরে আবার এলো সে, সেই ম্লান ছোট্ট মেয়ে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে ছিলো সেদিন—দেখেই বুঝলাম বাড়িতে আজ কিছু একটা হয়েছে, সত্যিই তাই। কী হ'য়েছিলো তা পরে বলছি ; এখন আমি শুধু মনে করতে চাই চালাকি ক'রে আমি কেমন ওর নজরে অনেক বড়ো হ'য়ে গিয়েছিলাম সেই কথা। হঠাৎ স্থির করেছিলাম কাজটা। ব্যাপারটা হচ্ছে, সে একটা মূর্তি বাঁধা দিচ্ছিলো (সে নিজে সেটা বাঁধা দিতে এসেছিলো !)

· আ, শুনুন ! শুনুন ! এই হ'লো শুরু, এতক্ষণ আমার সব গুলিয়ে গিয়েছিলো। বুঝলেন আমি সব কথা মনে করতে চাই, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা, ছোটো-ছোটো কথা, সব মনে করতে চাই। আমি চাই সব একসঙ্গে ক'রে নিয়ে সমগ্রভাবে দেখতে আর—আমি পারিনে·· এইসব ছোটা-ছোটো জিনিশ

· মাতা মেরীর মূর্তি ছিলো সেটা। বাচ্চা কোলে মাতা মেরী, সেকেলে, সাদাসিধে, রুপোর গিল্টি করা সিংহাসনে বসানো—দাম : এই বড়ো জোর ছয়

রুব্‌ল। বুঝতেই পারছিলাম যে মূর্তিটার মূল্য তার কাছে অনেক ; সিংহাসন-সুদ্ধ সবটুকু বাঁধা দেবে সে, আমি তাকে বললাম—

'মূর্তিটা সিংহাসন থেকে খুলে নাও বরং, ওটা বাড়ি নিয়ে যাও তুমি ; ও তো বাঁধা দেবার জিনিশ নয়।'

'কেন, এ-সব বন্ধক রাখতে কি আপনাদের বারণ আছে ?'

'না, কোনো বারণ নেই, কিন্তু তুমি নিজেই হয়তো ’

'বেশ, খুলে দিন।'

'কথাটা কী জানো ? আমি মূর্তিটা খুলে নেবো না, এখানে অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে রেখে দেবো,' ভেবেচিন্তে আমি বললাম। 'ঐ ছোট্ট আলোটির তলায় রেখে দেবো' (দোকান খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা আলো আমি জ্বালিয়ে দিতাম সবসময়), 'তুমি দশ রুব্‌ল নিয়ে যাও।'

'দশ রুব্‌ল দেবেন না। আমার পাঁচ রুবল হ'লেই চলবে ; আমি এটা নিশ্চয় ছাড়িয়ে নেবো।'

'দশ রুব্‌ল চাও না ? কিন্তু মূর্তিটা যে দশ রুব্‌লের যোগ্য' তার চোখ আবার জ্ব'লে উঠেছে লক্ষ ক'রে আমি বললাম।

চুপ ক'রে রইলো। পাঁচ রুব্‌ল বের ক'রে দিলাম।

'কাউকে ঘৃণা কোরো না ; আমি নিজে অনেক অভাব সহ্য করেছি, এর চাইতে আরো অনেক বেশি অভাব, আর আজ যে দেখছো এই ব্যবসা ধরেছি শুধু অতীতে যা সইতে হয়েছে তার জন্য ’

'জগতের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন ? হ্যাঁ ?' হঠাৎ নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সে আমার কথায় বাধা দিলো ; কিছুটা সারল্যও ছিলো তার কথায় (মানে, সকলকে উদ্দেশ্য ক'রেই বলা কথাটা, কারণ তখনো তো সে আমাকে অন্যদের থেকে আলাদা ক'রে দেখে না, তাই এ-কথাটা সে প্রায় বিনা দ্বেষে বললো)।

'হু ?' ভাবলাম ; 'তাহ'লে তুমি এই ? চরিত্র আছে ; নতুন যুগের হাওয়া লেগেছে গায়ে।'

শোনো !' আমি তক্ষুনি কিছুটা ঠাট্টা কিছুটা রহস্য মিশিয়ে মন্তব্য করলাম, 'আমি সমগ্রের সেই অংশের অংশ যা মন্দ কাজ করতে চায়, কিন্তু ভালো করে ’

দ্রুত, পরম কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে আমার দিকে তাকালো, শিশুর সরলতা মাখা সেই দৃষ্টি।

'দাঁড়ান···কথাটা কী? কোথা থেকে পেলেন? কোথায় যেন শুনেছি···'
'অত মাথা ঘামিও না। এই কথা ব'লে মেফিসটোফেলিস নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ফাউস্টের কাছে। ফাউস্ট পড়েছো?'
'না ভালো ক'রে পড়ি নি।'
'মানে একেবারেই পড়ো নি। নিশ্চয়ই পড়বে। কিন্তু আবার তোমার মুখে বিদ্রূপের ভাব দেখতে পাচ্ছি। দয়া ক'রে এমন ভেবো না যে আমার রুচি এত কম যে তোমার কাছে নিজেকে তুলে ধরার জন্য মেফিসটোফেলিসকে ব্যবহার ক'রে মহাজনের ভূমিকাটাকে মহিমান্বিত ক'রে তুলবো। মহাজন মহাজনই থাকবে। আমরা তা জানি।'
'অদ্ভুত মানুষ আপনি···আমি তো ও-রকম কিছু বলতে চাইনি।'
সে বলতে চেয়েছিলো: 'তুমি যে শিক্ষিত লোক তা তো ভাবতে পারি নি,' কিন্তু তা সে বলল না; কিন্তু আমি জানি সে তা-ই বলতে চেয়েছিলো। আমাকে তার খুব ভালো লেগে গেছে।
'দেখো', আমি বললাম, 'লোকের যে-কোনো পেশা হ'তে পারে—আমি নিজের কথা বলছি না অবশ্য। ধ'রে নেওয়া যাক আমি লোকের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করি না, তবু···'
'নিশ্চয়ই, যে-কোনো পেশার মানুষ ভালো কাজ করতে পারে,' বিজ্ঞ দৃষ্টিতে চকিতে আমার দিকে তাকালো সে। 'হ্যাঁ, যে-কোনো পেশায়,' হঠাৎ সে যোগ করলো।
আহা, মনে পড়ে, মনে পড়ে সেইসব মুহূর্ত! এবং আমি এ-কথাটাও যোগ করতে চাই যে যখন এই রকম বাচ্চা মেয়েরা, এই রকম মিষ্টি বাচ্চা মেয়েরা যখন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞের মতো কোনো কথা বলে তখন কী আশ্চর্য সৎ ও সরলভাবে তাদের মুখে ছাপ পড়ে কথাগুলির। এই যে এবার আমি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীর মতো একটা কথা বলবো—আমার মতো তাদেরটা অহংকার-প্রসূত নয়, তবু এ-কথাটা বোঝা যায় যে তার কথাটা ভয়ংকর ভালো লেগেছে, সে নিজে এতে বিশ্বাস করে, এ নিয়ে অনেক ভাবে এবং কল্পনা ক'রে নেয় ঠিক ওরই মতো আপনিও অনেক ভাবেন এ-বিষয়ে। হায় সততা! ঐ সততা দিয়েই ওরা আমাদের জয় করে। কী অপরূপ ছিলো তার সেই সততা!
সব মনে আছে, আমি কিছু ভুলিনি! সে চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি মনস্থির ক'রে ফেললাম। আমার শেষ যা খোঁজ নেওয়ার ছিলো সেই দিনই

মিটিয়ে ফেললাম, সেই মুহূর্তেই জেনে গেলাম তার অবস্থার সামান্যতম খুঁটিনাটি; তার অতীত জীবন সম্বন্ধে সব খবর আমি এর আগেই জেনেছিলাম বাড়ির ঝি লুকারিয়ার কাছে, যাকে কয়েকদিন আগেই আমি কিছু ঘুষ দিয়েছি। তার অবস্থা এত খারাপ যে ভেবে পাইনে কী ক'রে সেদিন সে অমন হাসি হেসেছিলো, ঐ ভয়ংকর দুর্দশার মধ্যে কী ক'রে উৎসাহ বোধ করেছিলো মেফিসটোফেলিসের কথায়: কিন্তু—সেই তো যৌবন! গর্বে, আনন্দে তার সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম সেদিন; কারণ, বুঝলেন, এর মধ্যে দিয়ে আত্মার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়—এ-কথা বলতে পারার ক্ষমতায়, 'যদিও আমি মহাশূন্যের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, তবু গ্যেটের চমৎকার কথাগুলি আলোয় উদ্ভাসিত।' যৌবনে মানুষের আত্মা কিছু-না-কিছু মহত্ত্ব লাভ করে, হয়তো কণামাত্র, হয়তো বিকৃত, কিন্তু তবু। যদিও এখানে আমি তার কথা বলছি, শুধু তার কথা। এবং সর্বোপরি, তাকে আমি আমার ব'লেই জানতাম, নিজের ক্ষমতায় কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি আমার। জানেন তো, যে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন সেটা সত্যিই এক বিপুল পরিকল্পনা।

কিন্তু আমার হয়েছে কী? এ-ভাবে যদি এগোই তাহ'লে সব একসঙ্গে ক'রে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখবো কখন? তাড়াতাড়ি করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে—তাতে কিছু এসে যায় না, হা ঈশ্বর!

২

বিবাহের প্রস্তাব

তার বিষয়ে যা যা জেনেছিলাম সব এককথায় বলছি: মা-বাবা নেই, তিন বছর আগে কুখ্যাত দুই পিসির হাতে তার ভার দিয়ে তাঁরা মারা গেছেন: অবশ্য পিসিদের কুখ্যাত বললে কম বলা হয়। একজন হ'লেন বিধবা, বিশাল তাঁর পরিবার (ছোটো ছোটো ছটি ছেলেপুলে), আর অন্যজন এক বীভৎস কুমারী। দু'জনেই বীভৎস। বাবা সরকারি চাকুরে ছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য কেরানির কাজ ছিলো তাঁর, ভদ্রতা ক'রে তাঁকে ভদ্রলোক বলা যায়। সত্য বলতে কি সবই আমার পক্ষে। আমি যেন অনেক উঁচু এক জগৎ থেকে এসেছি; আর সত্যই তো আমি হলাম এক নামকরা সেনাবাহিনীর

অবসরপ্রাপ্ত লেফটান্যান্ট, ভদ্রবংশে আমার জন্ম, সম্পূর্ণ স্বাধীন, এবং আরো যা-যা দরকার সবই আছে ; আর আমার মহাজনী ব্যবসা ? পিসিদের চোখে সেটা অত্যন্ত সম্মানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এই তিন বছর ধ'রে পিসিদের ক্রীতদাসী হ'য়ে আছে সে, তবু কোথায় যেন, কী ক'রে যেন কী একটা পরীক্ষা পাশ করেছে · পাশ করেছে, প্রতিদিনের নির্দয় কাজের চাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সে পরীক্ষার জন্য ছিনিয়ে নিয়েছে একটু সময়, এবং তাতেও প্রমাণ হয় ভালোর জন্য, বড়োর জন্য একটা আর্তি তার আছে। কেন, আমি তাকে বিয়ে করতে চাইলাম কেন ? আচ্ছা, সে-কথা থাক ; পরে হবে·· যেন তাতে কিছু এসে যায় ! সে তার পিসির ছেলেপুলেদের পড়াতো ; তাদের জামা সেলাই করতো ; এবং শেষের দিকে কেবল যে কাপড় কাচতো তাই নয়, তার সেই দুর্বল শরীরে ঘর পর্যন্ত মুছতো। সোজা কথায় বলতে গেলে, তারা তাকে মারতো, খাওয়ার খোঁটা দিতো। শেষ পর্যন্ত পিসিরা তাকে বেচে দেবে ঠিক করলো ! ছেছা ! ও-সব নোংরা কথা বাদ দেওয়াই ভালো। সে পরে আমাকে এ-সব বলেছিলো।

এক প্রতিবেশী পুরো এক বছর ধ'রে সব লক্ষ করছিলো। লোকটি হ'লো এক মোটাসোটা দোকানদার, নিতান্ত নগণ্য নয়, কারণ ক'খানা মুদির দোকানের সে মালিক। দু' দুটো বৌ-এর সঙ্গে বদ ব্যবহার করবার পর এখন সে তৃতীয় জনকে খুঁজছে, নজর পড়েছে তার উপর। 'বেশ শান্ত সুস্থির আছে,' সে মনে করেছিলো ; 'দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তেমনি আমিও ওকে বিয়ে করছি আমার মা-মরা বাচ্চাকাচ্চাগুলোর জন্য।'

সত্যিই বাচ্চাকাচ্চা ছিলো লোকটার। পিসিদের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চালাতে লাগলো। পঞ্চাশ বছর বয়স। সে ভয়ে কাঁটা হ'য়ে গেলো। সেই সময়েই ও 'স্বরে' বিজ্ঞাপন দেবার জন্য আমার কাছে আসা শুরু করেছিলো। শেষ অবধি পিসিদের কাছে ভেবে দেখবার জন্য সে একটু সময় প্রার্থনা করলো। একটু সময় তারা তাকে দিয়েছিলো, কিন্তু আর বেশি সময় দিতে রাজি হ'লো না ; সব সময় তার উপর তারা মুখিয়ে থাকতো 'নিজেদের খাবার কোথা থেকে জোটাবো তা জানিনে, তার উপর আবার আরেকটা হাঁ ভরতে হবে ?'

এ-সব খবর আমি আগেই জেনেছিলাম, এবং সেই দিনই, সকালের ব্যাপারের পর, আমি মনস্থির ক'রে ফেললাম। সেদিন সন্ধ্যায় সেই দোকানদারটা তার কাছে এলো, দোকান থেকে এক পাউণ্ড মিষ্টি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো সে ; ও

তার সঙ্গে ব'সেছিলো, আমি লুকেরিয়াকে রান্নাঘর থেকে ডেকে বললাম ওকে চুপিচুপি ব'লে আসতে যে আমি দরজার কাছে আছি, এক্ষুনি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বেশ আত্মতৃপ্তি হচ্ছিলো তখন। আর সবটা মিলিয়ে এমনিতেই সেদিন দারুণ আত্মতৃপ্তি বোধ করছিলাম আমি।

সেখানে দাঁড়িয়ে, বাড়ির দরজার সামনে লুকেরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে, আমি তাকে ডেকে পাঠানোয় সে তার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই আমি তাকে জানালাম যে আমি নিজেকে সম্মানিত এবং সুখী ব'লে জানবো·· তারপর বললাম আমার বলার ভঙ্গিতে এবং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলাতে সে যেন অবাক না হয়, বললাম যে আমি সোজা কথার মানুষ এবং আমি তার অবস্থা সবই জেনেছি। এবং আমি যে সোজা কথার মানুষ সেটা মিথ্যে নয়। দুত্তোর, যাকগে ও-সব কথা। আমার আচরণে শুধু যে সুরুচি ছিলো তাই নয়, মানে আমার যে সৎবংশে জন্ম আমার ব্যবহারে তা বোঝা গিয়েছিলো—আমার কথার ভঙ্গিতে অভিনবত্ব ছিলো, এবং সেটাই আসল। কথাটা স্বীকার করতে আর ক্ষতি কী, আমি নিজেকে বিচার করতে চাই এবং করছিও। সপক্ষে বিপক্ষে যা-কিছু বলার আছে সব আমাকে বলতে হবে, এবং তাই আমি বলি। পরে মনে করতে আমার ভালো লেগেছিলো, —যদিও আসলে সেটা আমার মূর্খতা,—যে আমি সেদিন বিন্দুমাত্র লজ্জা না পেয়ে জাহির করেছিলাম যে, প্রথমত আমি বিশেষ কোনো দক্ষতা সম্পন্ন নই, বিশেষ রকমের বুদ্ধিমান নই, হয়তো আমার স্বভাবও বিশেষ ভালো নয়, আমি অত্যন্ত শস্তাধরনের অহংকারী মানুষ (কথাটা আমার মনে আছে, পথে আসতে-আসতে কথাটা ভেবে খুব তৃপ্ত লেগেছিলো আমার) এবং অন্যান্য বিষয়েও খুব সম্ভব আমার মধ্যে অনেক অপ্রীতিকর স্বভাব লুকিয়ে আছে। এক বিশেষ ধরনের গর্ব নিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছিলো—কী ভাবে এ-সব বলা হয় তা আমরা সবাই জানি। অবশ্য অতটুকু রুচিজ্ঞান আমার ছিলো যে নিজের দোষগুলি দেখিয়ে দেবার পর গুণের ফর্দ মেলে ধরবো না, বলবো না যে 'এ-সবের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমার এই-এই আছে।' দেখলাম সে তখনো ভয়ানক ভয় পেয়ে আছে, কিন্তু আমি স্বর নরম করলাম না; বরং সে ভয় পেয়েছে দেখেই আমি ইচ্ছে ক'রে আরো বাড়াবাড়ি করলাম, সোজাসুজি বললাম যে তার খাওয়ার অভাব হবে না, কিন্তু ভালো-ভালো জামা কাপড়, নাটক, নাচ—এ-সব কিছুই সে পাবে না, অন্তত আমার উদ্দেশ্য

পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নয়। এই কড়া সুরটা আমাকে পরম সন্তোষ দান করছিলো। যতটা ভাসাভাসাভাবে সম্ভব বললাম যে এই পেশা নেওয়ার—মানে বন্ধকি কারবারের দোকান পাতার—আমার একটাই উদ্দেশ্য, এক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিত করলাম কিন্তু, সত্যিই আমার ও কথা বলার অধিকার ছিলো: একটা উচ্চাশা ছিলো আমার এবং ও-রকম অবস্থাও ছিলো। এক মিনিট অপেক্ষা করুন ভদ্রমহোদয়েরা; এই বন্ধকি কারবার আমি চিরকাল ঘৃণা ক'রে এসেছি, কিন্তু জীবনে, যদিও নিজের সম্বন্ধে এ-রকম রহস্যজনক উক্তির ব্যবহারটা খুব হাস্যকর শোনায়, তবু বলছি, বুঝলেন, আমি সমাজের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছিলাম, সত্যিই নিচ্ছিলাম, নিচ্ছিলাম, নিচ্ছিলাম! কাজেই এই প্রতিশোধের উল্লেখে সেদিন সকালে তার বিদ্রূপ করাটা অনুচিত হয়েছিলো। মানে, বুঝলেন, আমি যদি পষ্টাপষ্টি ওর মুখের উপর বলতাম 'হ্যাঁ, আমি সমাজের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি,' সেদিন সকালে সে তাহ'লে এমন ক'রেই হেসে উঠতো এবং এ-কথা বলাটাও যে হাস্যকর হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইঙ্গিতে, রহস্যময় কথায় তার কল্পনাকে বিস্তৃত করা যায়। তাছাড়া তখন আমার কোনো ভয় ছিলো না: আমি জানতাম যে আর যাই হোক, মোটা দোকানদারটি ওর কাছে আমার চাইতেও বেশি ঘৃণ্য, এবং সেই দরজার সামনে দাঁড়ানো আমি, তার মুক্তিদাতারূপে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম এবং সে তো বুঝতে পারবোই। হায় খারাপ কথাটা মানুষ কী চমৎকার বুঝে ফেলে। কিন্তু খারাপ কোনটা? মানুষ কী ক'রে তার বিচার করবে? আমি কি সেই মুহূর্তেও তাকে ভালোবাসিনি?

দাঁড়ান একটু: আমি অবশ্য তার উপকার করছি এমন কথা উচ্চারণও করিনি; বরং উল্টোটা বলেছি, একেবারে উল্টো কথাটা; আমি তাকে বুঝিয়েছিলাম যে সে নয়, আমিই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। এ-কথাটা বলেছিলাম—না-বলে পারি নি—হয়তো বোকা-বোকা শুনিয়েছিলো, কারণ তার মুখের উপর যে একটা ছায়া পড়েছিলো সেটা লক্ষ করেছিলাম। কিন্তু সব মিলিয়ে সেদিন সর্বতোভাবে আমার জয় হয়েছিলো। একটু দাঁড়ান, সব নীচতার কথাই যদি আমাকে মনে করতে হয় তাহ'লে সবচাইতে পাশবিক ঘটনাটাই বলবো। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে যে-কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম তা হ'লো: 'তুমি লম্বা, শরীরের বাঁধুনি ভালো,

শিক্ষিত আর—একটুও অহংকার না ক'রে বলছি—সুন্দরী।' আমার মনে যা কাজ করছিলো তা হ'লো এই। বলাই বাহুল্য যে সেখানেই সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়েই সে "হ্যাঁ" বললো। কিন্তু কিন্তু আমার যোগ করা উচিত, বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে "হ্যাঁ" বলার আগে অনেকক্ষণ ভেবেছিলো। এতক্ষণ ধ'রে সে চিন্তা করেছিলো যে আমি তাকে বলেছিলাম, 'তাহ'লে?'—একটু বড়াই পর্যন্ত না ক'রে পারলাম না কথাটা বলবার সময়।

'একটু অপেক্ষা করুন, আমি ভাবছি।'

আর তার ছোট্ট মুখটি এত গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, এত গম্ভীর যে এমনকি আমিও সে-মুখের ভাষা বুঝতে পারলাম। অপমান বোধ হ'লো আমার: 'আমার সঙ্গে ঐ মুদিটার তুলনা করছে নাকি?' আমি ভাবলাম। হায়, তখন আমি বুঝিনি। কিছু বুঝিনি, কিছু না! আজকের আগে বুঝতে পারি নি! মনে আছে আমি যখন চ'লে যাচ্ছি লুকেরিয়া তখন ছুটে এসে আমাকে থামালো, রুদ্ধশ্বাসে বললো: 'আমাদের বড়ো সাধের দিদিমণিকে যে আপনি গ্রহণ করলেন সেজন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন, বাবু; শুধু একটা কথা, ওঁকে এ-কথা বলবেন না—খুব আত্মমর্যাদাবোধ ওঁর।'

আত্মমর্যাদাবোধ নাকি? 'যাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে তাদের আমি পছন্দ করি,' আমি ভাবলাম। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা বিশেষ ভালো হয় যখন···মানে, যখন তাদের উপর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না, কী বলেন? হায়রে নীচ, বুদ্ধিহীন মানুষ! হায়রে, কী খুশিই না আমি হয়েছিলাম! জানেন, সে যখন সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে "হ্যাঁ" বলবে কিনা ভাবছিলো আর সে কী বলে তাই নিয়ে আমি চিন্তা করছিলাম, তখন সে হয়তো ভাবছিলো: 'সর্বত্রই যদি দুঃখ থাকে তাহ'লে চরম দুঃখটাই বেছে নেওয়া ভালো'—অর্থাৎ, মোটা মুদি মাতাল হ'য়ে মারতে-মারতে তাকে না-হয় মেরেই ফেলুক! কী? আপনাদের কী মনে হয়, এরকম কি সে ভাবতে পারতো না?

আর সত্যি বলতে কি তখন আমি বুঝতে পারি নি, একেবারে বুঝতে পারি নি এখনো বুঝতে পারছি না। এইমাত্র বললাম যে সে হয়তো ভাবছিলো দুটো খারাপের মধ্যে চরম খারাপটাকেই বেছে নেবো—মানে মুদিটাকে। কিন্তু সেই মুহূর্তে কে তার কাছে চরম খারাপ ছিলো—মুদিটা কি আমি। মুদি নাকি সেই গ্যেটে-আওড়ানো সুদখোর। সেটা অন্য প্রশ্ন। কী প্রশ্ন!

এটাও তুমি বোঝো না : উত্তরটা তো টেবিলের উপর শুয়ে আছে এখন আর তুমি কিনা প্রশ্ন বলছো একে! যাকগে ও-সব কথায় কান দেবেন না। আমার ও-কথা তো হচ্ছে না আমার আর কী-ই বা রইলো এখন—আমার কথা হোক বা না হোক। এ-কথার কোনো জবাবই যে আমি ভেবে পাচ্ছিনে। বরং শুতে যাই। মাথা ধরেছে আমার…।

৩

মহত্তম ব্যক্তি—যদিও আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না

আমি ঘুমোতে পারলাম না। কী ক'রেই বা পারবো? মাথার শিরা দপদপ করছে। মানুষ সব কিছুর উপরই প্রভুত্ব করতে চায়—লজ্জাটা যে সেখানেই। আহা, লজ্জা! আহা, কী লজ্জার হাত থেকেই না আমি তাকে তখন বাঁচিয়েছিলাম! সে নিশ্চয়ই বুঝেছিলো, নিশ্চয়ই আমার এই কীর্তি তাকে মুগ্ধ করেছিলো। আমিও খুব খুশি ছিলাম, অনেক কথা ভেবে খুশি ছিলাম—যেমন, এই কথা যে আমার বয়স একচল্লিশ আর তার বয়স মাত্র ষোলো! এটা ভাবতে আমার ভালো লাগছিলো, অ-সমকক্ষতার এই অনুভূতিটা বড়ো মধুর, বড়ো মধুর!

যেমন ধরুন, আমি চেয়েছিলাম বিয়েটা a' l'anglaise হোক, মানে আমরা দু'জন ছাড়া আর যে দু'জন সাক্ষী দরকার তারা উপস্থিত থাকুক—একজন সাক্ষী হবে লুকেরিয়া—বিবাহসভা থেকে সোজা মস্কোর ট্রেনে (আমার কাজ ছিলো সেখানে) এবং পনেরো দিন মস্কোর হোটেলে। সে প্রতিবাদ করলো, রাজি হ'লো না, আর আমাকে ছুটতে হ'লো তার পিসিদের কাছে, এমন বিনীত ব্যবহার করতে হ'লো যেন তারা সেই সব আত্মীয় স্বজন যাদের হাত থেকে আমি তাকে নিচ্ছি। আমি দ্বিরুক্তি করি নি, পিসিরা যথাযথ সম্মান লাভ করেছিলেন। দু'জনকে আমি একশো রুবল ক'রে উপহার পর্যন্ত দিয়েছিলাম, কথা দিয়েছিলাম আরো দেবো—পাছে সে নিজের নোংরা পারিপার্শ্বিকের জন্য লজ্জিত বোধ ক'রে সেইজন্য তাকে এ-বিষয়ে আমি কিছু বলি নি। পিসিরা তৎক্ষণাৎ একেবারে মাখনের মতো গ'লে গেলেন। বিয়ের পোশাক নিয়েও একটু বাক্‌বিতণ্ডা হ'লো। কিচ্ছু ছিলো না তার, প্রায় আক্ষরিক অর্থে কিছু ছিলো না, কিন্তু কিছু সে নেবে না। আমি তাকে

বোঝালাম যে কিছু জামাকাপড় তার দরকার এবং নিজেই বিয়ের পোশাক তৈরি করলাম, কারণ আর কে তাকে কী দেবে? কিন্তু আমার কথা যথেষ্ট হয়েছে। আমি অবশ্য তাকে সুযোগ দিয়েছিলাম আমার দু' একটা মতামত বুঝে নেবার, যাতে তার সব জানা থাকে। হয়তো একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করেছিলাম আমি। সবচাইতে ভালো ব্যাপার হ'লো এই যে প্রথম থেকেই সন্ধেবেলা আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে সপ্রেমে ছুটে আসতে লাগলো, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো, কথায়-কথায় (তার নির্মল হৃদয়ের মনোমুগ্ধকর কথা) আমাকে বললো তার শৈশব, কৈশোর, তার পুরোনো বাড়ি, তার মা-বাবার গল্প। আমি কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলাম। এটা আমার আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো। তার সমস্ত উদ্দীপনার সামনে আমি চুপ ক'রে রইলাম, অবশ্য বন্ধুভাবেই। কিন্তু তবু তার বুঝতে দেরি হ'লো না যে আমরা আলাদা এবং আমি হলাম যাকে বলে হেঁয়ালি। এবং হেঁয়ালি হওয়াই ছিলো আমার সবচাইতে বড়ো উদ্দেশ্য। তা কেন, বোধহয় কেবল হেঁয়ালি হবার জন্যই আমি সর্বপ্রকার বোকামির দোষে দোষী হয়েছিলাম। প্রথম জিনিশ হ'লো কড়া হওয়া—বেশ কড়া একটা ভাব দিয়ে আমি তাকে নিজের ঘরে এনে তুলেছিলাম। সত্যি বলতে কি, সেই সময় বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে আমি একটা সম্পূর্ণ নিয়মাবলী ছ'কে ফেলেছিলাম। বিনা চেষ্টাতেই পেরেছিলাম সেটা। এ-ছাড়া অন্যকিছু আর হ'তোও না অবশ্য। এক অনিবার্য কারণে এ-নিয়মাবলী তৈরি করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম—নিজের সম্পর্কে মিথ্যে বলতে যাবো কেন? নিয়মাবলীটা খাঁটি ছিলো। হ্যাঁ, শুনুন, আপনারা যদি একজন মানুষকে বিচার করতেই চান, তাহ'লে তার সম্পর্কে সব কথা জেনে বিচার করাই ভালো, শুনুন।

কী ক'রে শুরু করি, শুরু করা অত্যন্ত কঠিন। নিজের সপক্ষে কিছু বলাটা অবশ্য আলাদা কথা। যেমন ধরুন, তরুণেরা সব টাকাপয়সা ঘৃণা করে—আমি কিন্তু প্রথমেই টাকাটাকে প্রধান বলে ভেবেছিলাম, টাকার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলাম আমি। এত জোর দিয়েছিলাম যে সে ক্রমশ আরো স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো। চোখ মেলে সে শুনে যেতো, তাকিয়ে থাকতো, কিছু বলতো না। বুঝলেন, অল্পবয়স্কদের বীরত্ব আছে, মানে তাদের মধ্যে যারা ভালো, তাদের বীরত্ব আছে আর আছে খেয়াল, কিন্তু সহ্যশক্তি নেই, সামান্য-

তম জিনিশটাও যদি ঠিক না হয় তা'হলেও নাক শিঁটকোয় তারা। আর আমি চেয়েছিলাম প্রসারতা, আমি চেয়েছিলাম তার অন্তরে প্রসারতা আনতে, চেয়েছিলাম প্রসারতাকে তার গভীরতম অনুভূতির অংশ করে ফেলতে, তাই নয় কি? একটা সামান্য উদাহরণ নেওয়া যাক: এ-রকম চরিত্রের একটি মেয়ের কাছে আমার বন্ধকি-কারবারের কি কৈফিয়ত দেবো? অবশ্য বলাই বাহুল্য যে সোজাসুজি কিছুই আমি বলিনি, তাহ'লে মনে হ'তো আমি বুঝি মাপ চাইছি, আমি যাকে বলে বিনা বাক্যে কথা বলেছিলাম, এবং এই বিনা বাক্যে কথা বলার ব্যাপারে আমি ওস্তাদ। সারা জীবন আমি বিনা বাক্যে কথা বলেছি, নিজের জন্যই আমি অনেক দুঃখ সহ্য করেছি বিনা বাক্যব্যয়ে। কেন, আমিও তো অসুখী ছিলাম। সকলে আমাকে পরিত্যাগ করেছিলো, পরিত্যক্ত, বিস্মৃত হ'য়ে আমার দিন কেটেছে, কিন্তু কেউ জানেনি, কেউ না! আর হঠাৎ এই ষোলো বছরের মেয়েটা আজেবাজে লোকের কাছ থেকে আমার জীবনের যত খুঁটিনাটি সংগ্রহ ক'রে ভাবলো, সে বুঝি আমার সব কথা জেনে ফেলেছে, অথচ এদিকে পরম মূল্যবান আমার গোপন সম্পদ লুকোনো রইলো এই হৃদয়ে। চুপ ক'রেই থাকতাম আমি, বিশেষ তার কাছে, এই তো গতকাল পর্যন্তও—কেন চুপ ক'রে থাকতাম? কারণ আমি দাম্ভিক ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সে নিজে সব কথা বার করুক, আমার সাহায্য ছাড়া, নিচু-স্তরের ঐ-সব লোকের গালগল্প ছাড়া, আমি চেয়েছিলাম সে নিজে উপলব্ধি করুক আমি কেমন মানুষ, আমাকে বুঝুক! তাকে ঘরে এনে আমি তার সমস্ত শ্রদ্ধা চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্য সে এখন কৃতাঞ্জলি হ'য়ে আমার সামনে দাঁড়াক—এবং সেটা আমার প্রাপ্যই তো ছিলো। হায়, চিরকালই আমি দাম্ভিক, হয় আমি সবটুকু নেবো, নয়তো কিছুই নেবো না। বুঝলেন, আমি কিছুতেই অর্ধেক সুখ গ্রহণ করবো না, সবটুকু আমার চাই ব'লেই আমি তখন ঐ-রকম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম, যেন বলা হয়েছিলো: "নিজে ছাখো আমাকে, প্রশস্তি করো!" কারণ এটা বুঝে দেখুন যে, আমি যদি তার কাছে ব্যাখ্যা করতে শুরু করতাম নিজের সম্পর্কে নিজেই নানা কথা, তার শ্রদ্ধা চাইতাম—তাহ'লে তাকে দয়া প্রার্থনা ছাড়া আর কী বলা যেতো……। কিন্তু··· কিন্তু ও-কথা কেন বলছি।

বোকা, বোকা, বোকা, বোকা! তখন আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম,

দুই কথায়, পষ্টাপষ্টি, নিষ্ঠুরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম (নিষ্ঠুরভাবে—এটার উপর জোর দিয়েছিলাম আমি) যে যৌবনের বীরত্ব মনোমুগ্ধকর হ'তে পারে —কিন্তু কানা কড়ি দাম নেই তার। কেন? কারণ, সেই বীরত্বের জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না তাদের, সমস্ত জীবন দিয়ে তারা সেটা অর্জন করে না; শুধু বললেই হ'লো: "অস্তিত্বের প্রথম স্বাক্ষর," কিন্তু তোমাদের কাজটা কী দেখাও তো বাপু! শস্তা বীরত্ব চিরকালই সহজ, এমনকি নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেওয়াটাও এমন কিছু শক্ত নয়; ওতো শুধু গরম রক্ত আর অতিরিক্ত শক্তির কথা আর অবশ্য সুন্দরের জন্য তীব্র একটা আর্তিও থাকা চাই। না, সেই বীরত্বই আসল যা পরিশ্রমসাপেক্ষ, রহস্যময়, নিঃশব্দ আর আড়ম্বরহীন, যা লাঞ্ছিত, যাতে অনেক আত্মত্যাগ দরকার অথচ যাতে সম্মানের ছিটেফোঁটাও কপালে জোটে না—যেখানে আপনি অতিশয় যোগ্য হ'য়েও লোকচক্ষুর সামনে লম্পটরূপে প্রকাশিত হবেন, অথচ আপনার মতো সৎ হয়তো আর কেউ নেই সে-রকম বীরত্বের চেষ্টা ক'রেই দেখুন না, ছেড়ে দিতে দেরি হবে না! আর আমি—সারা জীবন এই বোঝা ব'য়ে বেড়াচ্ছি। প্রথমে সে তর্ক করেছিলো—ওঃ, কী ভাবে তর্ক করেছিলো সে—কিন্তু তারপরে সে চুপ করে গেলো, একেবারে চুপ, সত্যি বলতে কি, সে শুধু বড়ো-বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে আমার কথা শুনে যেতো, কী বড়ো, কী বড়ো, কী মনোযোগী দুটি চোখ ছিলো তার। আর ···তার চেয়েও বেশি, হঠাৎ দেখেছিলাম মৃদু একটু হাসি, অবিশ্বাসী, নিঃশব্দ আর শয়তানি হাসি। মুখে সেই হাসি নিয়েই সে আমার ঘরে এলো। এ-কথা তো সত্যি যে তার আর যাবার জায়গা ছিলো না।

৪

পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা

আমাদের মধ্যে কে প্রথম শুরু করলো?

কেউ না। প্রথম থেকেই আপনি শুরু হ'য়ে গেলো ব্যাপারটা। আগেই বলেছি খুব কড়াভাবে তাকে বাড়িতে এনে তুলেছিলাম আমি। পরে একটু কোমল হলাম। বিয়ের আগেই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যে ভাকে জিনিশ বন্ধক নিয়ে টাকা বের ক'রে দিতে হবে, তখন সে কিছু বলে নি (এটা

লক্ষ করবেন)। আর তার চেয়েও যা আশ্চর্য তা হ'লো এই যে সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কাজ শুরু করলো। আমার বাড়ি ঘরদোর, আসবাবপত্র সবই পূর্ববৎ ছিলো। বাড়ি বলতে দু'খানা ঘর; একটা বড়ো ঘর অর্ধেক ক'রে কেটে নিয়ে দোকান হয়েছে; আর দ্বিতীয় ঘরটা—সেটাও বেশ বড়ো—হ'লো আমাদের শোবার ও বসবার ঘর। আসবাব খুব কম ছিলো আমার; ওর পিসিদেরও বোধহয় এর চাইতে ভালো কিছু জিনিশপত্র আছে। আলো-জ্বলা মূর্তিগুলি বসানো ছিলো বাইরে দোকান ঘরে; ভেতর দিকটায় ছিলো সামান্য কিছু বই নিয়ে একটি বইয়ের তাক আর একটি ট্রাঙ্ক—যার ভেতরে আমি আমার চাবি রাখতাম; অবশ্য খাট, টেবিল, চেয়ার ছিলো। তাকে বিয়ের আগে বলেছিলাম যে সংসার খরচ রোজ এক রুব্‌লের বেশি যেন না হয়—মানে আমার, তার আর লুকেরিয়ার (লুকেরিয়াকে আমি নিয়ে এসেছিলাম) খাওয়ার খরচ আর কি। 'তিন বছরের মধ্যে আমাকে তিরিশ হাজার জমাতে হবে,' আমি বলেছিলাম, 'এর বেশি খরচ করলে আমরা টাকা বাঁচাতে পারবো না।' সে তাতেই রাজি ছিলো, কিন্তু আমি দৈনিক তিরিশ কোপেক ক'রে বাড়িয়ে দিলাম। নাটক নিয়েও ঠিক এই এক ব্যাপার। বিয়ের আগে বলেছিলাম নাটক দেখতে যেতে পারবে না, অথচ পরে ঠিক করলাম মাসে একবার নাটক দেখতে যাবো, এবং বেশ ভালো ভাবে স্টলে ব'সে দেখবো। দুজনেই যেতাম। তিনবার গিয়েছিলাম, 'সুখের তৃষ্ণা' আর 'পাখির গান' দেখেছিলাম বোধহয়। (কী-ইবা এসে যায়!) নিঃশব্দে যেতাম, নিঃশব্দে ফিরে আসতাম। কেন, কেন প্রথম থেকে আমরা চুপ ক'রে থাকবো স্থির ক'রে নিয়েছিলাম? জানেন, প্রথম থেকে আমাদের কখনো ঝগড়া হয়নি, কিন্তু সব সময় ঐ এক নিস্তব্ধতা। মনে আছে, সে-সময়টায় সে সবসময় লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতো; সেটা লক্ষ করার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আরো চুপচাপ হ'য়ে গেলাম। এ-কথা সত্যি যে এই কথা না-বলার উপর যে জোর দিয়েছে সে আমি, সে নয়। সে বরং দু'একবার উচ্ছ্বসিত হয়েছে, ছুটে এসেছে আমাকে জড়িয়ে ধরতে কিন্তু তার সেই উচ্ছ্বাস হ'তো ঘোরের মতো, যন্ত্রণাদায়ক, আর আমি তার শ্রদ্ধা নিয়ে সুখী হ'তে চেয়েছিলাম ব'লে অত্যন্ত ঠাণ্ডাভাবে তার সেই উচ্ছ্বাস গ্রহণ করতাম। আসলে আমিই ঠিক করতাম; প্রত্যেকবার দেখতাম সেই উচ্ছ্বাসের পরদিনই আমাদের ঝগড়া হ'তো।

অবশ্য ঝগড়া যাকে বলে তাতো আমাদের কখনো হ'তো না, শুধু নেমে আসতো স্তব্ধতা, আর আরো বেশি বিদ্রোহীভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো তার মধ্যে। "বিদ্রোহ আর মুক্তি," এই ছিলো তার মনের ভাব, শুধু সেটা প্রকাশের ভাষা তার জানা ছিলো না। হ্যাঁ, সেই কোমল প্রাণীটি ক্রমেই আরো বেশি দুর্বিনীত হ'য়ে উঠছিলো। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করলো সে। সেটা আমি জানতে পেরেছিলাম। এবং এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে সে মাঝে-মাঝে পাগল হ'য়ে যেতো। যেমন, আমাদের দারিদ্র্য নিয়ে নাক শিঁটকোতো সে, ভাবুন একবার —ঐ নোংরা পরিবেশ আর অভাব থেকে আসার পর—ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে হ'তো তাকে! অভাব সত্যি ছিলো না, বুঝলেন; যা ছিলো তা হ'লো মিতব্যয়িতা। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিশের প্রাচুর্য ছিলো, এই যেমন বিছানার চাদর, আর ছিলো যথাসম্ভব পরিচ্ছন্নতা। আমি চিরকাল ভেবে এসেছি স্বামীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্ত্রীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সে যা-নিয়ে বিদ্রূপ করতো তা আমাদের দারিদ্র্য নয়, সংসার যাত্রায় আমার তথাকথিত কৃপণতা। 'ওর উদ্দেশ্য আছে,' মনে হ'তো সে যেন বলছে, 'ও নিজের মনের জোর দেখাচ্ছে।' হঠাৎ একদিন সে নাটক দেখতে যেতে রাজি হ'লো না। আর সেই বিদ্রূপ-মিশ্রিত দৃষ্টি আরো ঘন-ঘন তার চোখে ছায়া ফেলতে লাগলো…। আর আমি আরো নিঃশব্দ হ'য়ে গেলাম, আরো, আরো নিঃশব্দ।

তখন তো আর আমি নিজের সপক্ষে কৈফিয়ত দেওয়া শুরু করতে পারি না, পারি কি? সবকিছুর মূলেই ছিলো সেই সুদের কারবার। আমি স্বভাবতই ধ'রে নিয়েছিলাম যে ষোলো বছরের একটি মেয়ে সর্বতোভাবে পুরুষের অধীনস্থ থাকবে। স্ত্রীলোকের কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। এটা—এটা হ'লো একটা ধারণা। এখনো পর্যন্ত, এখনো পর্যন্ত, সেটা আমার ধারণা! বাইরের ঘরে সে শুয়ে থাকুক না, কী প্রমাণ হয় তাতে? সত্য হ'লো সত্য, স্বয়ং মিল সাহেবও এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না। আর যে-মেয়ে প্রেমে পড়েছে, হ্যাঁ, যে-মেয়ে প্রেমে পড়েছে সে তো তার প্রেমাস্পদের দোষ, তার লাম্পট্য পর্যন্ত আদর্শ ব'লে মনে করে। লোকটি নিজেও নিজের অন্যায়ের সে-রকম কৈফিয়ত খুঁজে বার করতে পারবে না, যেমনটি পারবে তার প্রেমিকা। এতে হৃদয়ের উদারতা প্রকাশ পায় কিন্তু স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায় না। এই স্বাতন্ত্র্যের অভাবই ওদের ধ্বংসের কারণ। আর, আমি

আবার বলছি, ঐ টেবিলটার দিকে বারবার আঙুল দেখিয়ে লাভ কী? কেন, ওর ঐ টেবিলে শুয়ে থাকাটায় নতুনত্বটা কী আছে? ও—ও—ওঃ! শুনুন। সে সময়টায় তার ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না আমার। কেন, সে-সব দিনে সে তো ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরতো। সে ভালোবেসেছিলো আমাকে; মানে, ঠিক ক'রে বলতে গেলে, সে ভালোবাসতে চেয়েছিলো। হ্যাঁ, আসলে তাই, সে ভালোবাসতে চেয়েছিলো; সে ভালোবাসতে চেষ্টা করছিলো। আর কথাটা এই যে এক্ষেত্রে এমন কোনো দোষ বা অন্যায় ছিলো না যার কৈফিয়ত তাকে খুঁজে বার করতে হবে। আপনারা বলবেন আমি সুদখোর ছিলাম; সকলেই ঐ এক কথা বলে। কিন্তু সুদখোর তো হয়েছেটা কী? পরম উদারচেতা এক ব্যক্তি যখন সুদখোর হয়েছে তখন স্পষ্টই বোঝা যায় এর পেছনে কিছু একটা বিশেষ কারণ আছে। বুঝলেন ভদ্রমহোদয়েরা, কিছু-কিছু ভাবনা আছে··· মানে যদি সে-সব ভাবনা কেউ মুখের ভাষায় প্রকাশ করে তাহ'লে বড়োই বোকামির মতো শোনায়। লজ্জা পেতে হয়। কারণটা কী? কোনো কারণ নেই। হয়তো এই কারণ যে আমরা সবাই অতি হতচ্ছাড়া, সত্যি কথা সইতে পারি না, আর তা যদি না হয় তাহ'লে কী কারণ তা আমার জানা নেই। এই মাত্র বললাম, "পরম উদারচেতা ব্যক্তি"—সেটা আজগুবি, কিন্তু তবু সেটাই সত্য! সেটা সত্য, মানে পরম, পরম সত্য! হ্যাঁ, নিজেকে নিরাপদ রেখে বন্ধকি-কারবারের দোকান খোলার অধিকার আমার অবশ্যই আছে: "তোমরা আমাকে প্রত্যাখান করেছো—মানে, জনগণ,—অবজ্ঞামিশ্রিত নীরবতায় তোমরা আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছো। তোমাদের জন্য আমার আকুল আর্তির বদলে আমি সারা জীবন শুধু অপমান লাভ করেছি। এখন আমার অধিকার আছে তোমাদের বিরুদ্ধে এক প্রাচীর খাড়া করবার, তিরিশ হাজার রুব্‌ল জমিয়ে দক্ষিণ উপকূলে ক্রিমিয়ার কোনো অংশে পাহাড় আর আঙুর খেতের মাঝখানে শেষজীবন কাটাবার; সেই তিরিশ হাজার রুব্‌ল দিয়ে কিনবো নিজের জমিদারি, বাস করবো তোমাদের থেকে অনেক দূরে, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দ্বেষ আর পুষবো না, একটি আদর্শ অন্তরে নিয়ে, একটি প্রিয় নারীকে বুকে বেঁধে, একটি পরিবার, যদি ঈশ্বর কাউকে পাঠান আমাদের কাছে, আর—চারপাশের সকল অধিবাসীকে সাহায্য ক'রে দিন যাপন করবো।"

এ-সব কথা নিজের কাছে বলার অর্থ আছে, কিন্তু তার কাছে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করার চাইতে বোকামি আর কী হ'তে পারে? আমার দাম্ভিক নীরবতার এটাই ছিলো কারণ, এই কারণেই চুপচাপ ব'সে থাকতাম আমরা। কারণ সে কী বুঝতো বলুন? ষোলো বছর বয়স, সবে যৌবনের দরজায় পা দিয়েছে—হ্যাঁ, আমার কৈফিয়তের, আমার বেদনার কতটুকু সে বুঝতে পারতো? নির্ভেজাল স্পষ্টতা, জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, যৌবনের শস্তা বিশ্বাস, এ-সব 'মহান হৃদয়ের' মুরগীর মতো অন্ধতা, আর সবচাইতে বেশি—বন্ধকি-কারবারের দোকান আর—যথেষ্ট হয়েছে! (আর সুদখোর ব'লে আমি কি লম্পট ছিলাম? সে কি দেখতে পায়নি আমার অভিনয়? আমি কি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করি নি?)

হায়, এই পৃথিবীতে সত্যটা যে কী জঘন্য! সেই অপরূপা, সেই ভীরু হৃদয়, সেই স্বর্গ—সে ছিলো স্বেচ্ছাচারিণী, সে ছিলো অসহ্য এক স্বেচ্ছাচারিণী, আমার আত্মার যন্ত্রণা ছিলো সে! এ-কথা না বললে নিজের প্রতি আমি অন্যায় করবো! আপনারা কি ভাবছেন আমি তাকে ভালোবাসিনি? কে বলে আমি তাকে ভালোবাসিনি? দেখতে পাচ্ছেন কি যে এটা হ'লো বিদ্রূপের ব্যাপার, ত্যাগ আর প্রকৃতির মহীয়ান বিদ্রূপ! অভিশাপ ছিলো আমাদের উপর, সব মানুষের জীবনেই আছে এই অভিশাপ! (বিশেষ ক'রে আমার জীবনে)। এখন অবশ্যই বুঝতে পারছি যে আমার একটু ভুল হয়েছিলো। কিছু-একটা গোলমাল হয়েছিলো কোথায়। সব তো স্পষ্ট ছিলো, আমার পরিকল্পনা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট ছিলো: "কড়া আর দাম্ভিক, কোনো নৈতিক শাস্তি চাই না, নীরবে সহ্য ক'রে যেতে চাই।" আর এই রকমই হয়েছিলো সব। আমি মিথ্যে বলিনি, আমি মিথ্যে বলিনি। "পরে সে নিজেই বুঝবে যে, এটা কত বড়ো বীরত্বের কথা, শুধু সে জানতো না কী ভাবে একে দেখতে হয়, আর যখন জানবে তখন আরো দশগুণ সে ফিরিয়ে দেবে আমাকে, ধুলোয় লুটিয়ে করজোড়ে আমাকে অর্চনা করবে সে"—এই ছিলো আমার পরিকল্পনা কিন্তু একটা কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অথবা সেটা বুঝি আমার নজরে আসেনি। একটা জিনিশ আমি ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে পারিনি। কিন্তু যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে! আর কার কাছেই বা ক্ষমা চাইবো এখন, যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে। আরো একটু সাহসী হও, আরো একটু দম্ভ রেখো! এ তো তোমার দোষ নয়।

যাক, সত্যি কথাটাই ব'লে ফেলি, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমি ভয় পাইনে, এ তো তার দোষ, তার দোষ! ...

৫

ভীরু হৃদয়ের বিদ্রোহ

ঝগড়াটা সে-ই শুরু করলো: হঠাৎ সে নিজে টাকা ধার দিতে লাগলো, সামান্য-সামান্য জিনিশের অনেক বেশি মূল্য ধার্য করতে থাকলো, আর দু'-দুবার আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করলো এ-নিয়ে। আমি রাজি হই নি। কিন্তু ক্যাপ্টেনের বিধবা স্ত্রী এসে উপস্থিত হ'লো ঠিক সেই সময়ে। সেই বৃদ্ধা বিধবা নিয়ে এসেছিলো তার মৃত স্বামীর দেওয়া একটা উপহার, একটা স্মৃতি। সেটা বন্ধক নিয়ে আমি তাকে তিরিশ রুব্‌ল ধার দিলাম। সে নানা কথা বলতে লাগলো, মিনতি করলো তার জিনিশটা রেখে দিতে—অবশ্য এমনিই আমরা জিনিশপত্র সব রেখে দিই। যাক, সংক্ষেপে বলি, সে আবার এলো একটা হাতের গয়না নিয়ে—তার দাম আট রুব্‌লও হবে না; আমি বলাই বাহুল্য, রাজি হলাম না। বৃদ্ধাটি আমার স্ত্রীর চোখ দেখে কিছু একটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছিলো, কিন্তু সে যাই হোক, সে আমার অনুপস্থিতিতে আবার এলো এবং আমার স্ত্রী তার হাতের গয়নাটা রেখে মেডেলটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

সেদিনই ধ'রে ফেললাম, মৃদু অথচ কঠিন ভঙ্গিতে যুক্তিযুক্তভাবে আমি তাকে বোঝালাম। সে বসেছিলো বিছানার উপর, মুখ নিচু ক'রে ডান পায়ের পাতা দিয়ে আস্তে-আস্তে বাড়ি মারছিলো কার্পেটের উপর (এটা ছিলো তার বিশিষ্ট ভঙ্গি); কুৎসিত একটা হাসি ভেসে ছিলো তার ঠোঁটে। তখন গলা একটুও না চড়িয়ে আমি অত্যন্ত শান্তভাবে বললাম যে টাকাটা আমার, নিজের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখার অধিকার আমার আছে, আর—আর তাকে যখন আমি স্বগৃহে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম তখন আমি তার কাছ থেকে কিছুই লুকোই নি।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো সে, হঠাৎ সারা শরীর থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো, আর—কী মনে করে—সে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে মেঝেতে পা ঠুকলো; যেন এক বন্য জানোয়ার, যেন বিকার, যেন বন্য জানোয়ারের

বিকার! বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম আমি; এরকম ব্যাপার আমার কল্পনার বাইরে। কিন্তু আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম। আমি এমনকি একটু নড়লাম না পর্যন্ত, এবং আবার সেই একরকম শান্ত গলায় সোজাসুজি বললাম যে এবার থেকে আমার কাজে সে যে-সাহায্য করতো সেটা আর তাকে করতে হবে না। আমার মুখের উপর হাসলো সে, তারপর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। সত্যি বলতে কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার তার ছিলো না। বিয়ের আগে চুক্তি হয়েছিলো আমাকে ছাড়া সে কোথাও যেতে পারবে না। সন্ধেবেলা সে ফিরে এলো; আমি একটা কথাও উচ্চারণ করলাম না।

পরের দিনও সে সকালে বেরিয়ে গেলো, তার পরের দিনও তাই। আমি দোকান বন্ধ ক'রে তার পিসিদের কাছে গেলাম। বিয়ের পর তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলাম—আমার সঙ্গে তারা দেখা করতে আসবে না, আমিও তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো না এই ঠিক ছিলো। কিন্তু দেখা গেলো সে পিসিদের কাছে যায় নি। সকৌতূহলে আমার কথা শুনলো তারা, তারপর আমার মুখের উপর হাসলো: 'উচিত শিক্ষা হয়েছে তোমার', তারা বললো। কিন্তু ওরা যে হাসবে তাতো আমি আগেই জানতাম। তখনই আমি একজন পিসিকে, অবিবাহিত জনকে কিনে নিয়েছিলাম একশো রুব্‌ল দিয়ে। আগাম দিলাম পঁচিশ রুব্‌ল। দু'দিন পরে সে আমাকে খবর দিলো: 'এফিমোভিচ নামে এক বড়ো চাকুরের সঙ্গে কিছু একটা যোগ আছে,' সে বললো; 'একজন লেফটান্যান্ট। সেনাবিভাগে নাকি তোমরা একসঙ্গে ছিলে।' ভয়ানক অবাক হলাম আমি। সেনাবিভাগে এই এফিমোভিচ আমার সকলের চাইতে বেশি ক্ষতি করেছিলো। মাসখানেক আগে নির্লজ্জটা দু'-একবার কিছু-একটা বাঁধা দেবার ছুতো ক'রে এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-মস্করা শুরু করেছে। আমি আমাদের সম্পর্কের কথা ওকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিলাম ভবিষ্যতে কখনো যেন সে আমার বাড়িতে আসার সাহস না করে; কিন্তু অন্য কোনো চিন্তা আমার মাথায় ঢোকে নি, শুধু ভেবেছিলাম যে লোকটার অত্যন্ত বেশি আস্পর্ধা। আর এখন কিনা পিসি এসে বলে যে আমার স্ত্রী ওর সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করেছে আর সব কিছু ব্যবস্থা করেছে পিসিদেরই এক প্রাক্তন বন্ধু, এক কলোনেলের বিধবা ইউলিয়া সাম-সোনোভনা। 'সেই স্ত্রীলোকটির কাছেই,' পিসি বললো, 'তোমার স্ত্রী এখন যায়।'

সংক্ষেপে বলি। তিনশো রুব্‌ল খরচ হয়েছিলো আমার, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা হ'য়ে গেলো যাতে আমি পাশের ঘরে বন্ধ দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে এফিমোভিচ আর আমার স্ত্রীর প্রথম গোপন মিলন, একান্ত কথোপ-কথন প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইতিমধ্যে, তার আগের দিন সন্ধেবেলা এক ক্ষণস্থায়ী কিন্তু স্মরণীয় দৃশ্যের অভিনয় হ'লো।

সন্ধের দিকে ফিরে এসে সে বিছানার উপর বসলো ; পা দিয়ে কার্পেটে বাড়ি মারতে-মারতে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকালো আমার দিকে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মনে হ'লো যে, গতমাস, অথবা গত পনেরো দিন ধ'রে তার চরিত্র তার নিজের আর নয় ; প্রায় বলা যেতে পারে যে একেবারে তার চরিত্রের বিপরীত ; হঠাৎ যেন বিদ্রোহী, উদ্ধত হ'য়ে উঠেছে সে ; নির্লজ্জ বলতে পারিনে, কিন্তু ভব্যতার ধার ধারে না আর গোলমাল বাধাবার জন্য যেন উদগ্রীব হ'য়ে থাকে। গোলমাল বাধাবার জন্য সে যেন অতিরিক্ত সচেষ্ট। কিন্তু তবু তার সহজাত কোমলতা কোথায় যেন তাকে বাধা দেয়। ওর মতো কোনো মেয়ে যখন বিদ্রোহ করে তার ব্যবহার যতই উদ্ধত হোক না কেন, স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে জোর ক'রে করছে, নিজেকে বাধ্য করছে ঐ ব্যবহার করতে, এবং তার স্বাভাবিক বিনয় আর কুণ্ঠা দূর করা তার পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্যই এই ধরনের মানুষেরা এতদূর চ'লে যায় এক-এক সময় যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়। যারা স্বভাবতই অসৎ তারা বরং সর্বদাই সব ব্যাপার একটু নরম ক'রে নেবার চেষ্টা করে, আরো অসহ্য হয় তাদের ব্যবহার, কিন্তু তাতে একটা লোক দেখানো সভ্যতা-ভদ্রতার ছাপ রেখে তারা অন্যদের চাইতে নিজেদের বড়ো ব'লে দাবি করে।

'একি সত্যি যে তুমি ডুয়েল লড়তে ভয় পেয়েছিলে ব'লে তোমাকে সৈন্যদল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো ?' কিছুর-মধ্যে-কিছু-না হঠাৎ সে জিগেস করলো —আর চোখ জ্ব'লে উঠলো তার।

'এ-কথা সত্যি যে অফিসারদের কথায় কাজ ছেড়ে দেবার হুকুম হয়েছিলো আমার উপর, যদিও সত্যি বলতে, আমি তার আগেই আমার কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কাপুরুষ ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছিলো তোমাকে ?'

'হ্যাঁ, ওদের বিচারে আমি কাপুরুষ ব'লে ধার্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমি ডুয়েল লড়তে যে রাজি হই নি তার কারণ এই নয় যে আমি ভয় পেয়েছিলাম,

আমি শুধু ওদের নিষ্ঠুর অত্যাচার মেনে নিতে রাজি হইনি, অপমানিত না হ'য়েও লড়াই-এর বার্তা পাঠাতে রাজি হইনি আমি।' 'জানো,' আমি যোগ না ক'রে পারলাম না, 'এইরকম অত্যাচারের প্রতিরোধ ক'রে তার সকল ফলাফল মাথা পেতে নেওয়ার মধ্যে যে-কোনো রকম ডুয়েল লড়ার চাইতে বেশি পৌরুষ আছে।'

না-ব'লে পারলাম না কথাটা। যেন নিজের সপক্ষে কৈফিয়তের মতো শোনালো, আর সে যা চেয়েছিলো তা ঠিক এই, আমার নতুন অবমাননা।

বিদ্বেষে-ভরা হাসি খেলে গেলো তার ঠোঁটে।

'আর এ-কথা কি সত্যি যে তারপর তিন বছর ধ'রে তুমি পিটার্সবার্গে রাস্তায়-রাস্তায় ভিখারির মতো একটি পয়সার জন্য লোকের কাছে হাত পেতে ঘুরে বেড়িয়েছো, আর রাত কাটিয়েছো বিলিয়ার্ড ঘরে?'

'আমি হে বাজারে ভিয়াজেমস্কির ঘরে পর্যন্ত রাত কাটিয়েছি। হ্যাঁ, সব সত্যি; সৈন্যদল ছাড়বার পর থেকে অনেক লজ্জা আর অপমান আমাকে সইতে হয়েছে, কিন্তু আমার বিবেক কোথাও অপমানিত হয়নি, কারণ এমনকি সেই সময়েও আমি নিজেকে অন্য সকলের চাইতে বেশি ঘৃণা করেছি। কিন্তু সেই মর্মান্তিক অবস্থায় অপমানিত হয়েছে আমার মন, আমার হৃদয়। কিন্তু সে তো চুকেবুকে গেছে ··'

'হ্যাঁ, এখন তুমি এক বিশেষ ব্যক্তি—মহাজন!'

সুদের কারবারের প্রতি ইঙ্গিত। কিন্তু ততক্ষণে নিজের মনের শক্তি আমি ফিরে পেয়েছি। দেখলাম ও এমন সব কৈফিয়তের জন্য তৃষিত হ'য়ে আছে যাতে আমার নিজেকে ছোটো মনে হয় আর—আমি সে-সব কোনো কৈফিয়ত দিলাম না। ভাগ্যক্রমে এক খদ্দের এসে ঘণ্টা বাজালো, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দোকানে চলে গেলাম। এক ঘণ্টা বাদে বেরুবার পোশাক প'রে সে নিঃশব্দে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো, বললো, 'বিয়ের আগে তো এ-সব কথা আমাকে বলোনি?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না, সে চ'লে গেলো।

আর তাই পরের দিন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেই ঘরে, দরজার ওপিঠে, শুনতে লাগলাম নিজের ভাগ্যনির্ধারণ; পকেটে রিভলভার ছিলো আমার। রোজ-কার চাইতে বেশি সেজে সে বসেছিলো টেবিলের ধারে আর এফিমোভিচ সুযোগ পেয়ে ওর সামনে খুব চাল দেখাচ্ছিলো। এবং (নিজের সপক্ষে এটুকু

বলবো) আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হ'লো, যদিও তখন সচেতন ছিলাম না আমি কী ভেবেছিলাম আর কী ধ'রে নিয়েছিলাম সে সম্বন্ধে। নিজেকে ঠিকমতো বোঝাতে পারছি কিনা জানি না।

ব্যাপারটা হ'লো এই।

পুরো একঘণ্টা ধ'রে শুনলাম। পুরো একঘণ্টা আমি উপস্থিত রইলাম। এক মহৎ, স্বর্গীয় নারী আর এমন একটি পুরুষের ডুয়েল যার আত্মা পার্থিব, সংকীর্ণ আর নির্বোধ। আর কী বিস্ময় নিয়েই না আমি দেখলাম,—কী ক'রে সেই সরল, কোমল, নিঃশব্দ মেয়েটি এত কথা জানলো? দেশের সবচাইতে চোখা লেখকও তো পারতো না ঠাট্টা, সরল হাসি আর অধর্মের প্রতি ধর্মের অবজ্ঞার এই চমৎকার দৃশ্য তৈরি করতে। আর কী উজ্জ্বল তার কথা, তার বাক্যবিন্যাস: কী চতুর তার দ্রুত উত্তর, আর কী সত্য তার অবজ্ঞা। আর সেই সঙ্গেই আছে প্রায়-বালিকার মতো সারল্য। লোকটার প্রণয়-নিবেদন, অঙ্গভঙ্গি আর কথার জবাবে সে তার মুখের উপরই হাসতে লাগলো। অত্যন্ত স্থূলভাবে বিনা দ্বিরুক্তিতে সে একেবারে আসল কথায় চ'লে এসেছিলো, বাধা পাবে এমন কথা ভাবেওনি ব'লে লোকটা হকচকিয়ে গেলো। প্রথমটায় হয়তো ভাবতে পারতুম যে একটু ঢঙ করছে ও—

'একটি চতুর অথচ চরিত্রহীন মেয়ে নিজের দর বাড়াচ্ছে।' কিন্তু না, যে-সত্য সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট হ'য়ে প্রতিভাত হ'লো, তাকে সন্দেহ করা অসম্ভব। আমার প্রতি অতিরিক্ত ঘৃণার ঝোঁকেই কেবল সে-অনভিজ্ঞ মেয়েটি, এই মিলনের ব্যবস্থা করেছিলো, কিন্তু, যখন সত্যি সে-মুহূর্ত উপস্থিত হ'লো—তক্ষুনি খুলে গেল তার চোখ। আমাকে অপদস্থ করার জন্য বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছিলো সে, কিন্তু এতটা নিচে নেমে এসেও সে অসভ্যতা সইতে পারলো না। আর সেই পবিত্র, পুণ্যময়ী, যার হৃদয় একটি আদর্শে স্থির, তার উপর বলাৎকার করবে ঐ এফিমোভিচ অথবা অন্য কোনো অপদার্থ? সে তো তাদের দেখে কৌতুক অনুভব করবে। তার সবটুকু ভালোত্ব জেগে উঠবে, এবং বিরক্তি-বিদ্রূপ ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে এদের দেখতে দেবে না। আবার বলছি, নিজের সপক্ষে এইটুকু বলবো যে ভাঁড়টা একেবারে হকচকিয়ে গেলো এবং শেষকালে ভুরু কুঁচকে এমনভাবে ব'সে পড়লো চোখ বুজে যে আমার ভয় হ'তে লাগলো প্রতিশোধ নেবার জন্য লোকটা না ওকে অপমান করার চেষ্টা করে। আর আবার বলছি: সমস্তটা দৃশ্য আমি দেখেছিলাম

বিনা বিস্ময়ে। যেন সব আমি খুব ভালো ক'রে জানতাম। আমি ইচ্ছে ক'রেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিলাম, একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি নি, তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বিশ্বাস হয় নি আমার। যদিও পিস্তলটা যে নিয়েছিলাম পকেটে পুরে—এটা খাঁটি কথা। আর আমি কী ক'রেই বা পারবো তাকে অন্যরকম কল্পনা করতে? কেন আমি ভালোবেসেছিলাম, কেন আমি ওকে মূল্য দিতাম, কেন আমি ওকে বিয়ে করলাম? আঃ, ও যে আমাকে ঘৃণা করে তাতো আমি জানতামই, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতাম তার পবিত্রতার কথা। হঠাৎ দরজা খুলে দৃশ্যটার পরিসমাপ্তি ঘটালাম। লাফিয়ে উঠলো এফিমোভিচ। আমি গিয়ে আমার স্ত্রীর হাত ধ'রে বললাম আমার সঙ্গে বাড়ি যাওয়াই বোধহয় এখন তার উচিত। এফিমোভিচ সামলে নিলো নিজেকে, তারপর হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো।

'ওঃ, পবিত্র বিবাহবন্ধনের কোনো বিরোধিতা আমি করবো না; নিয়ে যাও ওকে, নিয়ে যাও। আর তুমি তো জানোই,' সে আমার পিছনে চ্যাঁচাতে লাগলো, 'যদিও কোনো ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে লড়বে না তবু তোমার স্ত্রীর সম্মানার্থে আমি রাজি আছি।···যদি অবশ্য তুমি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকো।'

'শুনছো,' দরজার কাছে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড় করিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম।

তারপর বাড়ির পথে আর একটা কথাও আমরা বলি নি। আমি তার হাত ধ'রে চলছিলাম, সেও বাধা দেয়নি। বরং সে বেশ চমৎকৃতই হয়েছিলো, এবং বাড়ি ফেরার পরেও এই মনোভাবটা তার কাটে নি। বাড়ি গিয়ে সে একটা চেয়ারে ব'সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। অসম্ভব ম্লান দেখাচ্ছিলো তাকে; বিদ্রূপের ভঙ্গিতে দুই ঠোঁট চেপে ছিলো সে, কিন্তু আমার দিকে চেয়েছিলো গম্ভীর আর কঠিন বিদ্রোহের ভঙ্গিতে; আমি যে এক্ষুনি তাকে গুলি ক'রে মারবো সে-বিষয়ে প্রথমটায় তাকে একেবারে নিশ্চিত ব'লে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আমি আমার পকেট থেকে পিস্তলটা বের ক'রে একটা কথাও না ব'লে সেটা টেবিলের উপর রাখলাম। সে একবার আমার দিকে একবার পিস্তলের দিকে তাকালো। (মনে রাখবেন যে পিস্তলটা তার পরিচিত। দোকান খোলার পর থেকে আমি সর্বদা ওতে গুলি ভ'রে রাখতাম। দোকান যখন পেতেছিলাম তখনই স্থির করেছিলাম যে বিশাল কুকুর অথবা শক্তিধর ভৃত্য, এই—মোজার যেমন করে ধরুন—এর কোনোটাই

রাখবো না। মক্কেল এলে আমার রাঁধুনীই দরজা খুলে দেয়। কিন্তু এই ব্যবসায় বিপদের সময় আত্মরক্ষার কোনো-একটা উপায় মজুত না রাখলে চলে না, তাই আমি গুলি ভরা পিস্তল রাখতাম। প্রথম-প্রথম, যখন সে সবে এসেছে আমার বাড়িতে তখন পিস্তলটা সম্পর্কে খুব আগ্রহ দেখাতো সে, অনেক প্রশ্ন করতো, আমি এমনকি পিস্তলটা কী ভাবে তৈরি এবং কী এর কাজ তাও ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। একবার একটা লক্ষ্য ঠিক ক'রে ওকে দিয়ে গুলিও ছুঁড়িয়েছিলাম। এ-সব কথা মনে রাখবেন)। ওর ভয়ার্ত দৃষ্টির দিকে নজর না দিয়ে আমি দু'একটা জামা ছেড়েই কোনো মতে শুয়ে পড়লাম। ভয়ানক শ্রান্ত বোধ করছিলাম; তখন রাত প্রায় এগারোটা হবে। আরো এক ঘণ্টা একটুও না ন'ড়ে সে ঠিক ঐ ভাবে ব'সে রইলো। তারপর মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সেও জামা কাপড় না ছেড়েই দেয়াল ঘেঁষে পাতা সোফায় শুয়ে পড়লো। এই প্রথম সে আমার সঙ্গে শুলো না · এটাও মনে রাখবেন···

৬

ভয়ংকর স্মৃতি

এখন সেই ভয়ংকর স্মৃতি···

পরদিন যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন প্রায় আটটা, দিনের আলো ফুটেছে। আমি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় চোখ খুললাম। সে টেবিলের পাশে হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি যে জেগে উঠে তার দিকে তাকিয়ে আছি সেটা সে দেখতে পায়নি। তারপর হঠাৎ দেখলাম সে পিস্তল হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চট্‌ ক'রে চোখ বুঁজে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে রইলাম। বিছানার কাছে এসে আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম; মৃত্যুর মতো যে-স্তব্ধতা নেমেছিলো, তাও আমি শুনতে পেলাম। তারপর একেবারে হঠাৎ একটা শব্দে আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোখ খুলে ফেললাম। সে সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, পিস্তলটা আমার কপালে এসে লেগেছে। কিন্তু মুহূর্তমাত্র আমরা তাকিয়ে থাকলাম পরস্পরের দিকে। চেষ্টা ক'রে আমি আবার চোখ বুঁজলাম, এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্থির ক'রে ফেললাম যে কপালে যাই থাকুক আমি নড়বো না, চোখ খুলবো না।

এ-রকম তো হয় যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষও অনেক সময় হঠাৎ চোখ খোলে, এমনকি মাথা তুলে এক মুহূর্তের জন্য ঘরের চারপাশে তাকায়, তারপর কিছুই না-বুঝে এক পলকের মধ্যেই আবার বালিশে মাথা রেখে অচেতন নিদ্রায় ঢ'লে পড়ে। তার চোখে চোখ পড়ার পর, এবং কপালে পিস্তলের স্পর্শ অনুভব করার পর আমি যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছি এমনভাবে চোখ বুঁজে রইলাম—সে অবশ্যই মনে করতে পারতো যে আমি সত্যিই ঘুমিয়ে আছি, এবং কিছুই দেখিনি, বিশেষত এটা সত্যিই একেবারে অবিশ্বাস্য যে ঐ দৃশ্য দেখার পরও আমি ঐ-রকম একটা মুহূর্তে চোখ বুঁজে পড়ে থাকবো।

হ্যাঁ, সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু কে জানে, সে হয়তো আসল কথাটা বুঝে ফেলেছিলো—এ-কথাটা হঠাৎ সেই একই মুহূর্তে আমার মনে চকিতে ভেসে উঠলো। হায়রে, কত চিন্তা আর অনুভূতির ঘূর্ণাবর্তই না এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আমার মনের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিলো। চিন্তার সেই বিদ্যুৎগতিকে সাবাস! তা যদি হয় তাহ'লে (আমি তাই অনুভব করলাম) —সে যদি সত্যি কথাটা বুঝে ফেলে আর জানতে পারে যে আমি জেগে আছি তাহ'লে মরবার জন্য আমার এই প্রস্তুতিতে সে ভেঙে পড়বে, তার হাত হয়তো কেঁপে যাবে। নতুন, সব-কিছু-ছাপানো এক অনুভূতি তার দৃঢ়তাকে দুর্বল ক'রে ফেলবে। লোকে বলে, অনেক উঁচু কোথাও দাঁড়ালে নাকি নিচে ঝাঁপ দেবার ঝোঁক আসে। আমার মনে হয় অনেক খুন আর আত্মহত্যা হয়েছে শুধুমাত্র পিস্তলটি হাতে নেওয়া হয়েছিলো ব'লে। এ যেন এমন এক তুঙ্গস্থান যার ৪৫ ডিগ্রি ঢালু গা বেয়ে না গড়িয়ে প'ড়ে উপায় নেই; অব্যাহতি নেই বন্দুকের ঘোড়া না টিপে। কিন্তু আমি দেখেছি, আমি সব জানি, এবং বিনাবাক্যব্যয়ে তার হাত থেকে মৃত্যু বরণ ক'রে নিতে রাজি আছি -এটা ভেবে সে হয়তো নিজেকে সংযত করতে পারে।

স্তব্ধতাটা বেড়েই চললো, এবং সেই সঙ্গেই আমি আমার কপালে, চুলে লোহার স্পর্শ অনুভব করলাম। আপনারা জিগেস করবেন: আমি কি নিশ্চিত ছিলাম যে বেঁচে যাবো? ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি আমার কোনো আশা ছিলো না একশোর মধ্যে একটা দৈব ঘটনা ঘ'টে যাবার সম্ভাবনাটুকু ছাড়া। কেন আমি মৃত্যু বরণ ক'রে নিতে রাজি হয়েছিলাম? কিন্তু আমি জিগেস করবো, আমার প্রিয়তমা যখন আমাকে মারবার জন্য বন্দুক তুলেছে তখন বেঁচে থেকে লাভ কী? তাছাড়া,

আমি আমার সত্তার সবটুকু শক্তি দিয়ে অনুভব করছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটা লড়াই চলছে, এক ভয়ংকর লড়াই জীবন আর মৃত্যুর জন্য, সহকর্মীরা যাকে পরিত্যাগ করেছিলো গতকালের সেই ভীরু কাপুরুষের লড়াই। আমি সেটা জানতাম এবং সেও জানতো শুধু যদি বুঝতে পারতো যে আমি জেগে আছি।

হয়তো তা নয়, হয়তো আমি তখন তা ভাবিনি, কিন্তু তবু নিশ্চয়ই তাই, সচেতন চিন্তা যদি না ক'রেও থাকি তবু তাই, কারণ তারপর থেকে চিন্তা ছাড়া আর তো কিছুই আমি করি নি।

কিন্তু আপনারা আবার জিগেস করবেন: এই রকম মন্দ কাজের থেকে তুমি তাকে বাঁচালে না কেন? হায়! তারপর থেকে নিজেকে আমি সহস্রবার এই প্রশ্ন করেছি—প্রত্যেক বার, যতবার আমি সেই মুহূর্তের কথা ভাবি ততবার এক অদ্ভুত শিহরণ আমার মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে ব'য়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘন অন্ধকারে ভ'রে গিয়েছিলো আমার আত্মা! আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, আমি নিজেই হারিয়ে গিয়েছিলাম—আমি কেমন ক'রে অপরকে বাঁচাবো? আর আমি কাউকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম কিনা তাই বা কী ক'রে জানলেন? তখন আমার কী মনে হচ্ছিলো তা কে বলতে পারে!

তবুও, উত্তেজনায় যেন জ্বলছিলাম আমি; মুহূর্তের পর মুহূর্ত চ'লে গেলো; সে তখনো আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে—আর হঠাৎ আমি আশায় কেঁপে উঠলাম! তাড়াতাড়ি চোখ মেললাম। সে ঘরে নেই: বিছানা থেকে নামলাম: আমি জিতেছি—তার উপর চিরদিনের মতো আমি বিজয়ী হয়েছি।

গেলাম সামোভারের কাছে। সামোভারটা সবসময় বাইরের ঘরে এনে নিতাম আমরা, সে চা ঢালতো। একটাও কথা না ব'লে আমি টেবিলে ব'সে তার হাত থেকে চায়ের গেলাশ নিলাম। পাঁচ মিনিট বাদে তাকালাম তার দিকে। ভয়াবহ রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো তার মুখ, আগের দিনের চাইতেও ফ্যাকাশে, আর সে তাকালো আমার দিকে। আর হঠাৎ… হঠাৎ আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে তার চোখে একটি ভীরু প্রশ্ন নিয়ে, তার ফ্যাকাশে ঠোঁটে ম্লান হাসলো। তাহ'লে এখনো সন্দেহ আছে? ভাবছে, ও জানে কি জানে না, ও দেখেছে কি দেখে নি? আমি নিরাসক্ত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। চা খাওয়া হ'লে আমি দোকান বন্ধ ক'রে

বাজারে গেলাম ; কিনে আনলাম একটা লোহার খাট আর পর্দা। বাড়ি ফিরে আমি নির্দেশ দিলাম যে, খাটটা সামনের ঘরে থাকবে পর্দার আড়ালে। খাটটা তার জন্য, কিন্তু তাকে আমি একটা কথাও বললাম না। কিন্তু কিছু না বললেও, সেই খাটটা দেখেই সে বুঝতে পারলো যে, আমি 'সব দেখেছি, আর সব জানতে পেরেছি', এবং সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই। রোজকার মতোই টেবিলের উপর পিস্তলটা রেখে দিলাম। রাত্রে বিনা বাক্য-ব্যয়ে সে তার নতুন বিছানায় শুতে গেলো : ছিন্ন হ'লো আমাদের বিবাহবন্ধন, 'সে পরাজিত হ'লো কিন্তু ক্ষমা পেলো না।' রাত্রে বিকারের ঘোর এলো তার, আর সকালে দেখা গেলো তার সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছে। তাকে ছয় সপ্তাহ বিছানায় প'ড়ে থাকতে হ'লো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দম্ভের স্বপ্ন

লুকেরিয়া এইমাত্র জানিয়ে গেলো যে সে আর এখানে থাকতে পারবে না, তার মালিকানের অন্ত্যেষ্টি হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে চ'লে যাবে। আমি হাঁটু গেড়ে ব'সে পাঁচ মিনিট প্রার্থনা করলাম। একঘণ্টা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেবল ভাবতে লাগলাম, ভাবতে লাগলাম, বারবার সেই এক অসুস্থ চিন্তা, মাথা ব্যথা করে আমার—প্রার্থনা ক'রে লাভ কী ?—সে তো পাপ ছাড়া আর কিছু নয়! আশ্চর্য এই যে আমার একটুও ঘুম পায় না : বড়ো, খুব বড়ো শোকের প্রথম ধাক্কার 'পর সকলের ঘুম পায়। মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত মানুষ নাকি তার চরম শাস্তির আগের রাত্রে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। আর তা তো হ'তেই হবে, তাই তো প্রকৃতির নিয়ম, তা না হ'লে তাদের শক্তি যে সব যাবে ফুরিয়ে…আমি শুয়ে থাকি সোফার উপর, ঘুমোই না…

যে ছয় সপ্তাহ সে অসুস্থ ছিলো, দিনরাত আমরা তার সেবা করেছি—লুকেরিয়া, আমি, আর তাছাড়া হাসপাতাল থেকে নার্স এনেছিলাম। টাকা খরচ করতে কসুর করিনি—সত্যি বলতে কি তার জন্য টাকা খরচ করতে আমি ব্যগ্র ছিলাম। দশ রুব্‌ল দিয়ে ডাঃ শ্রেভেরকে আনলাম। সে যখন

একটু ভালোর দিকে গেলো তখন আমার চাল-মারাটা একটু কমালাম। কিন্তু এ-সব বলছি কেন? বিছানা ছেড়ে ওঠার পর সে চুপ ক'রে শান্তভাবে ব'সে থাকতো আমার ঘরে এক বিশেষ টেবিলে, সেই সময়ে তার জন্য আমি কিনেছিলাম টেবিলটা হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আমরা একেবারে নিঃশব্দ ছিলাম; মানে, কথা বলতে শুরু করলাম পরে, কিন্তু দৈনন্দিন কর্ম-তালিকা ছিলো আমাদের কথোপকথনের একমাত্র বিষয়। আমি ইচ্ছে ক'রেই খোলাখুলিভাবে কথা বলাটা এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু লক্ষ করতাম যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতে না হ'লে সেও খুশি হয়। তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ব'লে আমার মনে হ'তো। "অত্যন্ত বেশি ভেঙে পড়েছে ও, অত্যন্ত বেশি পরাজিত।" আমি ভাবতাম, "ও যাতে সব ভুলে যায় এবং এই জীবনে অভ্যস্ত হয় সেটা দেখতে হবে আমার।" এই ভাবে চুপ ক'রে থাকতাম আমরা, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমি নিজেকে তৈরি করতাম ভবিষ্যতের জন্য। আমার মনে হ'তো সে তো তাই করছে, এবং নিজের সম্বন্ধে সে কী ভাবছে সেটা আন্দাজ করতে ভয়ানক ভালো লাগতো আমার।

আরো বলবো: হায়! কেউ জানে না তার অসুখের সময় কী-ভাবে আমার সময় কেটেছে। আমার দুঃখকে আমি লুকিয়ে রেখেছি নিজের হৃদয়ে, লুকেরিয়ার কাছে পর্যন্ত গোপন করেছি। আমি কল্পনা করতে পারি না, আমি ভাবতে পর্যন্ত পারি না যে সত্যটা না-জেনেই সে চ'লে যাবে। যখন তার বিপদ কেটে গেলো, শরীর একটু-একটু ক'রে সুস্থ হ'তে লাগলো, মনে আছে আমি অতি সত্বর সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেলাম আমার শান্তি। তার চেয়েও বেশি, আমি স্থির করলাম যে ভবিষ্যৎটা যথাসম্ভব পিছিয়ে দিয়ে সব কিছু যেমন আছে তেমনি রেখে দেবো। হ্যাঁ, অদ্ভুত এবং অনন্য কিছু একটা তখন ঘটেছিলো আমার মধ্যে, অন্য কিছু তাকে বলা যায় না: আমি জিতেছি, এবং সেই সচেতনতাটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই ভাবে কেটে গেলো পুরো শীতকালটা। আহা! জীবনে আর কখনো আমি ওরকম তৃপ্ত বোধ করি নি, সারা শীত ঐ-ভাবে আমার কেটেছিলো।

বুঝলেন, এক ভয়ংকর পারিপার্শ্বিক ছিলো আমার জীবনে, যা তখনো পর্যন্ত— মানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেই ভয়ানক ব্যাপারটা ঘ'টে যাওয়ার আগে পর্যন্ত— প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় আমার উপর ভার হ'য়ে চেপে থাকতো। মানে, সমস্ত মানসম্মান খুইয়ে সেনাবাহিনী পরিত্যাগ ক'রে আসার কথা বলছি। এক

কথায়, নিষ্ঠুর অবিচার করা হয়েছিলো আমার উপর। এ-কথা সত্যি যে আমার অসহজ স্বভাবের জন্য সহকর্মীরা আমাকে ভালোবাসতে পারেনি, হয়তো আমার অস্বাভাবিক স্বভাবের জন্য—যদিও এরকম প্রায়ই হ'য়ে থাকে যে একজনের কাছে যা দামী এবং মূল্যবান কোনো কারণে তার সঙ্গীদলকে তা আমোদের খোরাক জোগায়। হায়রে, কোনোদিনই কেউ আমাকে পছন্দ করে নি, এমনকি স্কুলেও না! সর্বদা এবং সর্বত্র সকলে আমাকে অপছন্দ করেছে। এমন কি লুকেরিয়াও আমাকে পছন্দ করে নি। বাহিনীতে যা হয়েছিলো তা আমার প্রতি সকলের বিরাগের ফল হ'লেও এক হিশেবে একটা আকস্মিক ঘটনা। এ-কথার উল্লেখ করলাম এইজন্য যে আকস্মিক কোনো ঘটনায় ধ্বংস হ'য়ে যাওয়ার চাইতে লজ্জাকর ও অসহ্য আর কিছু নেই, বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের অদ্ভুত সমাবেশে যা ঘটতেও পারতো, নাও ঘটতে পারতো, মেঘের মতো যা ভেসে চ'লে যেতে পারতো। বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এ-চিন্তাও লজ্জাকর। ব্যাপারটা হ'য়েছিলো এই।

একবার এক নাটকের বিরতির সময় আমি চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছিলাম। ক নামে অশ্বারোহী দলের একটি সৈন্য এসে অন্যান্য অফিসার এবং সমস্ত লোকজনের সামনে জোরে-জোরে তার দলেরই অন্য দু'জন সৈন্যের সঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো, তারা বললো আমাদের বাহিনীর ক্যাপ্টেন বেজুমৎসেভ গলির মধ্যে লজ্জাকর সব কাণ্ড করছেন এবং তিনি, তার মনে হয়, মাতাল। কথোপকথনটা বেশি দূর এগোয় নি কথাটা নিতান্ত ভুল কারণ ক্যাপ্টেন বেজুমৎসেভ মাতাল ছিলেন না আর লজ্জাকর কাণ্ডটা লজ্জাকর ছিলো না। তারপর তারা অন্য বিষয়ে কথা পাড়তে সে ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়লো। কিন্তু পরের দিন গল্পটা ছড়িয়ে পড়লো আমাদের বাহিনীতে এবং সকলে বলতে লাগলো যে আমাদের বাহিনীর আমিই একমাত্র অফিসার যে সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং যখন ক—নামক সৈন্যটি, ওরকম বিশ্রীভাবে ক্যাপ্টেন বেজুমৎসেভ সম্পর্কে কথা বলছিলো তখন আমি তার কাছে উঠে গিয়ে জোর ক'রে তাকে থামাই নি। কিন্তু তা আমি কী ক'রে করি? লোকটির যদি বেজুমৎসেভের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকে তাহ'লে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কেন মাথা গলাতে যাবো? এদিকে, অফিসাররা সব বলতে শুরু ক'রে দিলেন যে ব্যাপারটা মোটেও ব্যক্তিগত নয়, আমাদের বাহিনী ওর সঙ্গে জড়িত, এবং যেহেতু আমাদের বাহিনীর

আমিই একমাত্র অফিসার সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সেহেতু আমি নাকি সব অফিসার এবং অন্যান্য লোকজনদের দেখিয়েছি যে আমাদের বাহিনীতে এমন অফিসারও থাকতে পারে যারা তাদের নিজেদের এবং সমস্ত বাহিনীর সম্মান বিষয়ে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর নয়। তাদের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি নি। তারা আমাকে জানালো যে দেরি হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো ইচ্ছে করলে ক—র কাছে একটা কৈফিয়ত তলব ক'রে আমি সব কিছু ঠিক করে দিতে পারি। আমার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিলো না এবং বিরক্ত হয়েছিলাম ব'লে সদম্ভে আমি তাদের আমার আপত্তি জানিয়েছিলাম। এরই ফলে আমাকে বাহিনী পরিত্যাগ করতে হয়। সদম্ভে বাহিনী ছেড়ে এলেও আহত হয়েছিলো আমার আত্মা। ইচ্ছাশক্তিতে, মনের জোরে আমি দুর্বল হ'য়ে গিয়েছিলাম। ঠিক এই সময়েই মস্কোতে আমার ভগ্নিপতি আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির সবটুকু, আমার অংশটুকুও, উড়িয়ে দিলেন, সম্পত্তি সামান্য হ'লেও ওর ফলে আমাকে গৃহহীন, নিষ্কপর্দক হ'তে হ'লো। কোনো সওদাগরি দপ্তরে চাকরি নিতে পারতাম, কিন্তু নিলাম না। একবার সৈনিকের পোশাক গায়ে তোলার পর তো আর রেল অফিশে কাজ নিতে পারি না। সুতরাং—লজ্জার কাজই যদি করতে হবে তাহ'লে সত্যিই তাই হোক; অবমাননাকে যদি মেনে নিতেই হয় তাহ'লে সত্যিকার অপমানই মাথা পেতে নেবো; যদি নিচে নামতেই হয় তাহ'লে সত্যিকারের নিচেই নামি—(যত নিচে হয় ততই ভালো) এই ছিলো আমার মত। তারপর তিন বছরের সেই নিরানন্দ স্মৃতি, ভিয়াজেম্স্কির বাড়ি পর্যন্ত। দেড় বছর আগে আমার ধাত্রী-মা, এক ধনী মহিলা, মস্কোতে মারা যান; আমি সবিস্ময়ে জানতে পারলাম তাঁর উইলে তিনি আমাকে তিন হাজার রুব্‌ল দিয়ে গেছেন। একটু চিন্তা ক'রেই আমি টাকাটা নিয়ে কী করবো স্থির ক'রে ফেলেছিলাম। বন্ধকি কারবার করবো মনস্থির করলাম, এবং সেজন্য কারু কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমি রাজি নই: টাকা, তারপর বাড়ি, অতীতের দিকে তাকিয়ে এখন যতটা মনে পড়ছে, এই ছিলো আমার পরিকল্পনা। কিন্তু তবু, আমার সেই আনন্দ-বিহীন অতীত, আর আমার বদনাম আমাকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অস্থির করেছে। তারপর বিয়ে করলাম। সেটা দৈবাৎ হ'লো কিনা বলতে পারি না। কিন্তু তাকে যখন বাড়িতে এনেছিলাম তখন ভেবেছিলাম আমার বন্ধু ঘরে আসছে, আর বন্ধুর সত্যিই খুব দরকার ছিলো আমার জীবনে।

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে বন্ধুটিকে গ'ড়ে পিটে নিতে হবে, এমনকি জয় ক'রে নিতে হবে। ষোলো বছরের একটি সংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েকে আমি কী নিজের কথা বোঝাতে যাবো? এই যেমন দৈবক্রমে ঐ পিস্তলের ভয়ানক ঘটনাটা না ঘটলে আমি কী ক'রে ওকে বিশ্বাস করাতাম যে আমি কাপুরুষ নই, এবং বাহিনীতে আমাকে ভুল ক'রে কাপুরুষ আখ্যা দেওয়া হয়েছিলো; কিন্তু সেই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটেছিলো একেবারে ঠিক সময়ে। পিস্তলের সামনে দাঁড়ানোর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আমার সেই আনন্দহীন অতীতকে আমি মুছে ফেলতে পেরেছিলাম। এবং আর কেউ না জানলেও, সে জানতো, আর আমার কাছে তার জানাই সব, কারণ সে-ই তো আমার যথাসর্বস্ব, স্বপ্নে আমি যে ভবিষ্যৎ আশার জাল বুনেছি তাতো সে-ই! একমাত্র মানুষ যাকে আমি নিজের জন্য তৈরি করেছি, আর কাউকে আমার দরকার নেই—আর এখন সে সব জানে; অন্তত এটুকু জানে যে অনাবশ্যক তৎপরতার সঙ্গে সে আমার শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো। এই চিন্তা আমাকে আবিষ্ট করতো। তার চোখে আমি আর এখন বদমাইশ নই, বড়ো অদ্ভুত একটি মানুষ, এবং এত সব ঘটনার পর এই চিন্তাটা আমাকে আনন্দ দিতো; অদ্ভুত হওয়াটা তো পাপ নয়—বরং উল্টো, মাঝে-মাঝে অদ্ভুত চরিত্র মেয়েদের আকর্ষণই করে। সত্যি বলতে, সেই চরম মুহূর্তটা আমি কেবলই পিছিয়ে দিচ্ছিলাম: ইতিমধ্যে যা ঘ'টে গেলো, আমার মনের শান্তির পক্ষে তাই ছিলো যথেষ্ট, আমার স্বপ্নের অনেক খোরাক তারা জোগাতো। ভুল ছিলো সেখানেই, আমি স্বপ্ন দেখতাম: আমার স্বপ্নের অনেক খোরাক ছিলো, আর তার বিষয়ে—আমি মনে করতাম সে এখন অপেক্ষা করতে পারে।

কাজেই সারা শীতকাল প্রতীক্ষায় কেটে গেলো। সে যখন তার ছোটো টেবিলে ব'সে থাকতো তখন চুরি ক'রে তাকে দেখতে আমার ভালো লাগতো। সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতো সে, সন্ধেবেলায় কখনো-কখনো আমার আলমারি থেকে বই নিয়ে পড়তো। বইয়ের আলমারিতে যে-সব বই সাজানো ছিলো তাও আমার পক্ষেই রায় দিতো। কখনোই প্রায় বাইরে যেতো না সে। সন্ধের ঠিক আগে, খেয়ে উঠে আমি তাকে নিয়ে রোজ হাঁটতে যেতাম। বেড়াতাম একসঙ্গে, আগের মতো নিঃশব্দে না। আমি দেখাতে চাইতাম যে আমরা কথা বলছি। আমরা একস্বরে কথা বলতাম, কিন্তু আগেই বলেছি, একটাও বেফাঁস কথা বলতাম না কখনো। আমি সেটা ইচ্ছে ক'রেই করতাম,

মনে করতাম তাকে একটু সময় দেওয়া দরকার। অবশ্য এটা সত্যিই আশ্চর্য যে শীত প্রায় শেষ হ'য়ে আসার আগে পর্যন্ত এ-কথাটা আমার একবারও মনে হয়নি যে আমি যদিও লুকিয়ে-লুকিয়ে তাকে দেখতে ভালোবাসি, সারা শীতে তাকে আমি একবারও আমার দিকে তাকাতে দেখিনি। ভেবেছিলাম এ-বুঝি তার ভীরু স্বভাবের জন্য। তাছাড়া এমন ভীরু কোমলতা, অসুখের পর এমন এক দুর্বলতা তাকে ঘিরে থাকতো! হ্যাঁ অপেক্ষা করাই ভালো আর—"সে একদিন হঠাৎ নিজেই তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে……"

এই চিন্তা আমাকে যে-ভাবে আবিষ্ট করেছিলো তা কথায় বোঝানো যাবে না। একটা কথা যোগ করছি; মাঝে-মাঝে যেন ইচ্ছে ক'রে আমি নিজেকে দিয়ে জোর ক'রে বিশ্বাস করাতাম যে সে আমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। আর সেই ভাবটা চলতো বেশ কিছুদিন। কিন্তু আমার রাগ কখনো সত্য অথবা তীব্র হতো না। আমি নিজেই অনুভব করতাম যে আমি যেন অভিনয় করছি। এবং যদিও আলাদা খাট ও পর্দা কিনে আমি আমার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেছি তবু কখনো আমি তাকে অপরাধী ব'লে ভাবতে পারিনি। তার মানে এই নয় যে তার কাজটার গুরুত্ব আমি স্বীকার করি নি, কিন্তু তাকে সর্বতোভাবে ক্ষমা করার বুদ্ধিটুকু আমার ছিলো, প্রথম দিন থেকে, খাট কেনার আগে থেকেই আমি তাকে ক্ষমা করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমার পক্ষে এটা একটু অদ্ভুত, কারণ নৈতিকভাবে আমি খুব কড়া। কিন্তু আমার চোখে তাকে এমন পরাজিত, অপমানিত এবং ভগ্নহৃদয় ব'লে মনে হ'তো যে মাঝে-মাঝে তার জন্য তীব্র ব্যথা অনুভব করতাম আমি, যদিও মাঝে-মাঝে তার এই অপমান আমাকে সত্যিকার সুখ দিতো। আমরা যে সমান নই এ-কথা ভেবে ভালো লাগতো আমার ···।

সেই শীতে আমি ইচ্ছে ক'রেই কিছু দয়া দেখালাম। দুটো দেনা মাপ ক'রে দিলাম, এক গরিব স্ত্রীলোককে বিনা বন্ধকে টাকা ধার দিলাম। আমার স্ত্রীকে আমি কিছু বলি নি এ-বিষয়ে, তাকে জানাবার জন্যও কিছু করি নি। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি নিজেই এলো আমাকে ধন্যবাদ দিতে, প্রায় হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো। এইভাবে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো; আমার মনে হয়েছিলো যে স্ত্রীলোকটির বিষয়ে এ-কথা শুনতে ভালো লেগেছিলো তার।

কিন্তু বসন্ত এসে পড়লো, এপ্রিলের মাঝামাঝি তখন, জানালা খুলে দিলাম আমরা, সূর্য তার উজ্জ্বল রোদে আমাদের নিঃশব্দ ঘরে আলো জেলে দিলো।

কিন্তু আমার চোখের সামনে যেন এক পর্দা ঝুলছিলো, মন ছিলো অন্ধ হ'য়ে। এক সর্বনাশা ভয়ংকর পর্দা! কী ক'রে এমন হ'লো যে হঠাৎ দূর হ'য়ে গেলো সব বাধা, আমি দেখলাম আর সব বুঝলাম? সে কি দৈবক্রমে হ'লো, নাকি সময় হয়েছিলো, নাকি আমার মৃত মনে রৌদ্রালোক ঢুকিয়ে দিলো সেই চিন্তা, সেই ভাবনা! কিন্তু হঠাৎ একটা স্বর বেজে উঠলো, বহুদিনের মৃত এক অনুভূতি হঠাৎ নাড়া খেয়ে বেঁচে উঠলো, আলোর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আমার তিমিরাবৃত আত্মা আর শয়তানের কাছ থেকে পাওয়া দম্ভ। যেন হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে গেলাম আমার জায়গা থেকে। আর সত্যিই, একেবারে হঠাৎ, খাপছাড়াভাবে ঘটেছিলো ব্যাপারটা। সন্ধের দিকে পাঁচটা নাগাদ, খাওয়াদাওয়া হ'য়ে যাবার পর ঘটলো

২

যবনিকা উত্তোলন

প্রথমে দু'টি কথা। একমাস আগে এক অদ্ভুত বিষাদ লক্ষ করেছিলাম তার মধ্যে, শুধুমাত্র নীরবতা নয়, বিষাদ। সেটাও হঠাৎই লক্ষ করেছিলাম। সে বসেছিলো কাজ হাতে নিয়ে, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছিলো মাথা, দেখতে পায়নি যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হ'লো কী পাতলা, রোগা হ'য়ে গেছে সে, মুখখানা ম্লান, শাদা ঠোঁট। তার বিষাদের সঙ্গে মিশে এ সব-কিছু যেন হঠাৎ ধাক্কা দিলো আমাকে। শুকনো কাশির আওয়াজ শুনতে পেতাম, বিশেষ ক'রে রাত্রে। আমি তক্ষুনি উঠে গিয়ে শ্রেভেরকে আসতে ব'লে এলাম, তাকে কিছু জানালাম না।

শ্রেভের এলো তার পরের দিন। সে ভীষণ অবাক হ'য়ে গিয়ে প্রথমে শ্রেভের ও তারপর আমার দিকে তাকালো।

'কিন্তু আমি তো ভালো আছি,' অনিশ্চিত হাসি হেসে সে বললে।

শ্রেভের বিশেষ যত্ন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করে নি (এইসব ডাক্তাররা মাঝে-মাঝে অসম্ভব দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়), অন্য ঘরে গিয়ে আমাকে শুধু বললো যে অসুখের পর তার শরীর দুর্বল হয়েছে, এই বসন্তে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে, কিংবা সম্ভব হ'লে গ্রীষ্মকালে শহরে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকলে ওর পক্ষে ভালো হয়। সত্যি বলতে কি, দুর্বলতা আছে, কিংবা ঐ ধরনের

একটা কিছু বলেছিলেন ডাক্তার। শ্রেভের চ'লে যাবার পর সে আমার দিকে অত্যন্ত একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললে—

'আমি বেশ ভালো আছি, বেশ ভালো আছি।'

কিন্তু কথাটা ব'লেই সে হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠলো, আপাত দৃষ্টিতে মনে হ'লো লজ্জায়। আপাতদৃষ্টিতে সেটা লজ্জা। হায়! এখন আমি বুঝতে পারি: তার লজ্জা ছিলো এইজন্য যে আমি এখনো তার স্বামী, প্রকৃত স্বামীর মতোই আমি তার দেখাশুনো করছি। কিন্তু তখন আমি ভেবেছিলাম এ-বুঝি তার বিনয় (সেই পর্দা!)।

আর তাই, একমাস পরে, এপ্রিলের এক উজ্জ্বল রোদে-ভরা সকালে আমি দোকানে ব'সে হিশেব দেখছিলাম। হঠাৎ তার গলা পেলাম, আমাদের ঘরে, টেবিলের ধারে ব'সে সেলাই করতে-করতে নরম, নরম গলায় সে···গান গাইছে। এই নতুনত্বটুকু আমাকে অসম্ভব নাড়া দিলো, কেন তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি। এ পর্যন্ত আমি তাকে কখনো গান গাইতে শুনি নি, অবশ্য একেবারে প্রথম দিকে ছাড়া, যখন আমরা খুশি থাকতে পারতাম, গুলি ছুঁড়তাম লক্ষ্য ঠিক ক'রে। তখন তার গলায় বেশ জোর ছিলো, প্রতিধ্বনি বাজতো তার স্বরের; একেবারে সঠিক না হ'লেও সুস্থ এবং অত্যন্ত মধুর গলা ছিলো তার। এখন তার ছোট্ট গানটিই এত মৃদু—বিষণ্ণ হয়তো নয় (কোনো একটা লোকসঙ্গীত গাইছিলো সে), কিন্তু তার গলায় কী যেন ছিলো যা শ্রুতিকটু, ভাঙা, তার গলা যেন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না, গানটাই যেন অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে। নিচু স্বরে সে গাইছিলো, তারপর হঠাৎ একটু চড়ায় উঠতেই ভেঙে গেলো তার গলা—কী করুণভাবেই না ভেঙে গেলো তার সেই নরম ছোটো স্বর, একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে সে আবার শুরু করলো, নরম, নরম গলায় শুরু করলো।

আমার আবেগ নিয়ে হয়তো হাসাহাসি হবে, কিন্তু কেন আমি অত বিচলিত হয়েছিলাম তা কেউ বুঝবে না। না, তখনো তার জন্য দুঃখ হয় নি আমার, সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো। একেবারে প্রথমে, প্রথম মিনিটটুকুতে অন্তত আমি হঠাৎ যেন বুঝতে পারছিলাম না কী করবো, ভয়ংকর এক বিস্ময় আমাকে অভিভূত করেছিলো—ভয়ংকর আর অদ্ভুত, যন্ত্রণাময় আর প্রায় প্রতিশোধের মতো এক বিস্ময়: 'ও গান গাইছে, আমার সামনে গান গাইছে; ওকি আমার কথা ভুলে গেলো?'

সম্পূর্ণরূপে অভিভূত আমি যেখানে ব'সে ছিলাম সেখানেই ব'সে রইলাম, তারপর উঠে দাঁড়ালাম হঠাৎ, কিছু না-ভেবেই টুপিটা প'রে নিলাম যেন বেরিয়ে যাবো। জানি না কেন, কোথায় আমি যাচ্ছিলাম। লুকেরিয়া আমার গায়ের বড়ো কোট পরিয়ে দিতে শুরু করলো।

'ওকি গান গাইছে?' হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো প্রশ্নটা। লুকেরিয়া কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো; এবং সত্যিই আমাকে বোঝা শক্ত ছিলো।

'ওকি এই প্রথম গান গাইছে?'

'না, আপনি বাইরে গেলে উনি মাঝে-মাঝে গান করেন?' লুকেরিয়া জবাব দিলো।

সব মনে আছে আমার। নিচে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে লাগলাম এলোমেলোভাবে। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। লোকজন চলাফেরা করছিলো, আমাকে ধাক্কা দিয়ে গেলো তারা। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করলাম না। একটা গাড়ি ডাকলাম, জানি না কেন গাড়োয়ানকে বললাম পলিটসেইস্কি ব্রিজে যেতে। তারপর হঠাৎ মত বদল ক'রে কুড়ি কোপেক তুলে দিলাম লোকটির হাতে।

'তোমাকে অকারণে বিরক্ত করলাম ব'লে,' ব'লে অকারণ একটা অনর্থক হাসি হাসলাম আমি, কিন্তু অকস্মাৎ এক স্বর্গীয় আনন্দ জ্ব'লে উঠলো আমার অন্তরে।

দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। সেই করুণ, ছোটো ভাঙা গলার স্বর আমার হৃদয়ে বেজে উঠলো। দম বন্ধ হ'য়ে এলো আমার। স'রে যাচ্ছিলো সেই যবনিকা, স'রে যাচ্ছিলো আমার চোখের সামনে থেকে। আমার সামনে যখন গান গেয়েছে তখন সে আমাকে ভুলে গেছে—সেটা স্পষ্ট এবং সেটা বড়ো ভয়ানক। সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তা অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার পুলকিত আত্মা আমাকে সব ভয় ভুলিয়ে দিলো।

হায়রে! হায়রে ভাগ্যের খেলা! কেন, সারা শীত ভ'রে এই পুলকে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে পারতো আমার আত্মা, থাকতে পারতো শুধু এই পুলক, এবং তা ছাড়া আর কিছু না—কিন্তু সারাটা শীত আমি কোথায় ছিলাম? আমার আত্মা কি ছিলো আমার সঙ্গে? ছুটে উঠলাম উপরে, জানি না ভিতরে ভয়ে-ভয়ে ঢুকেছিলাম কিনা। শুধু এটুকু মনে আছে যে আমার মনে হচ্ছিলো সমস্ত

বাড়িটা যেন দুলছে, আমি যেন ভাসছি নদীর জলে। ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। ঠিক সেই এক জায়গাতেই সে ব'সে আছে, মাথাটি ঝুঁকে আছে সেলাইয়ের উপর, কিন্তু গান আর গাইছে না। নিস্পৃহ এবং দ্রুত দৃষ্টি তুলে সে একবার আমাকে দেখলো। ঠিক দৃষ্টি বলা যায় না, কেউ ঘরে এলেই ঐরকম নিস্পৃহ একটা ভঙ্গি করাটা আমাদের অভ্যেস।

সোজা তার কাছে গিয়ে খাপছাড়াভাবে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লাম পাগলের মতো। চট্ ক'রে একবার দেখলো আমাকে, যেন ভয় পেলো সে; তার একটি হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে, মনে নেই কী বলেছিলাম তাকে —মানে, বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ তখন গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না আমার। গলা ভেঙে গেলো, কিছুতেই স্বর বের করতে পারলাম না, তাছাড়া কী বলবো তাই আমি জানতাম না। শুধু নিশ্বাস নিচ্ছিলাম জোরে-জোরে।

'এসো আমরা কথা বলি···জানো আমাকে কিছু বলো তুমি!' বোকার মতো কী যেন আমি বিড়বিড় করলাম। কিন্তু বোকা না হ'য়ে আমি করবো কী? সে আবার চমকে উঠলো, ভয়ে পিছিয়ে গেলো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু হঠাৎ তার চোখে কঠিন বিস্ময় ফুটে উঠলো। হ্যাঁ, বিস্ময় আর কাঠিন্য। বড়ো-বড়ো চোখে সে আমার দিকে তাকালো। তার সেই কাঠিন্য, সেই কঠিন বিস্ময় আমাকে তৎক্ষণাৎ দমিয়ে দিলো: 'ও, তুমি তাহ'লে এখনো প্রেমের আশা রাখো? প্রেম?' তার সেই বিস্ময় যেন আমাকে জিগেস করছিলো, সে যদিও মুখ ফুটে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু সব আমি পড়লাম, সব আমি পড়লাম। আমার ভেতরে-ভেতরে সব-কিছু যেন কেঁপে উঠলো থরথর ক'রে, তার পায়ের উপর প'ড়ে গেলাম আমি। হ্যাঁ, তার পায়ে পড়লাম। তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলো সে, আমি দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে রাখলাম তাকে।

আমি খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারলাম আমার কোনো—আমি বুঝতে পারলাম! কিন্তু, বিশ্বাস করবেন? বন্য আনন্দ এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো আমাকে যে আমার মনে হচ্ছিলো আমি বুঝি আর বাঁচবো না। বিকার-গ্রস্তের মতো, অপরিমিত পুলকে আমি তার পায়ে চুমু খাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, অপরিমিত, অন্তহীন পুলকে, অথচ সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম যে আমার কোনো আশা নেই। আমি কাঁদতে লাগলাম, কী যেন বললাম, কিন্তু বলতে

পারলাম না। তার ভয় আর বিস্ময় ডেকে নিয়ে এলো অস্বস্তিকর আশঙ্কা, আর প্রশ্ন, সে অদ্ভুত—হয়তো বন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে; তাড়াতাড়ি কী যেন বলতে গেলো সে, একটু হাসলো। তার পায়ে চুমু খেতে সাংঘাতিক লজ্জা পেয়ে সে পা সরিয়ে নিলো (লোকে যখন লজ্জা পেয়ে হাসে তখন কী রকম লাগে জানেন নিশ্চয়ই)। পাগলের মতো হ'য়ে গেলো সে, দেখতে পেলাম তার হাত কাঁপছে—তখন ও নিয়ে কোনো ভাবনা না ক'রে আমি বিড়বিড় ক'রে ব'লে চললাম যে আমি তাকে ভালোবাসি, আমি উঠবো না। 'তোমার গায়ের জামায় আমাকে চুমু খেতে দাও···সারা জীবন তোমাকে এই ভাবে পুজো করতে দিও।' আমি জানি না, আমার মনে নেই · কিন্তু হঠাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়লো, সারা শরীর কেঁপে উঠলো তার। এক ভয়ংকর বিকারের ঘোর এলো তার। আমি তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি।

তাকে তুলে নিয়ে গেলাম বিছানায়। ঘোর কেটে গেলে, ভয়াবহ শ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে বিছানার ধার ঘেঁষে ব'সে সে আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে মিনতি জানালো শান্ত হ'তে। 'এসো, এসো, নিজেকে কষ্ট দিও না, শান্ত হও!' ব'লেই সে আবার কাঁদতে শুরু করলো। সেদিন সারা সন্ধ্যা আমি তাকে ছেড়ে যাইনি। সমানে বলতে থাকলাম যে আমি তাকে সমুদ্রে স্নান করাতে বোলোনে নিয়ে যাবো, এক্ষুনি, পনেরো দিনের মধ্যে, আজ সন্ধ্যায় আমি শুনেছি, তার গলা এমন ভেঙে গেছে, যে আমি দোকান বন্ধ ক'রে দেবো, ডব্রন্‌রাডভের কাছে বেচে দেবো, সব শুরু করবো নতুন ক'রে আর সবচাইতে বড়ো কথা, বোলোন, বোলোন! সে শুনলো, তখনো ভয় যায়নি তার। ক্রমেই আরো বেশি ভয় পাচ্ছিলো সে। কিন্তু তাতে আমার তেমন এসে যাচ্ছিলো না তখন : যাতে এসে যাচ্ছিলো তা হ'লো আবার তার পায়ে পড়ার জন্য তীব্রতর বাসনা, আবার আমি চুম্বন করতে চাইছিলাম, চুম্বন করতে চাইছিলাম তার পায়ের তলার মাটি, চাইছিলাম তাকে পুজো করতে ; আর—'আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না,' আমি বারবার বলছিলাম, 'আমার কথার জবাব দিও না, আমাকে তুমি গ্রাহ্য কোরো না, শুধু আমার নিজের জায়গা থেকে আমাকে দেখতে দাও তোমাকে, তোমার কুকুর ব'লে মনে করো আমাকে, তোমার সম্পত্তি ·····' সে কাঁদছিলো।

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ঐ ভাবেই ফেলে রাখবে।' হঠাৎ অচেতন ভাবে বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে, এতই অচেতন যে সে হয়তো লক্ষও

করলো না সে কী বললো, কিন্তু তবু—আহা, তার এই কথাটিই সেই সন্ধ্যায় ছিলো সবচাইতে অর্থপূর্ণ, চরম কথা, আমার পক্ষে সবচাইতে সহজবোধ্য—এই কথাটি যেন ছোরার মতো বিঁধে গেলো আমার বুকে! সব বুঝিয়ে দিলো আমাকে, সব, কিন্তু সে যখন আমার পাশে আছে, আছে আমার চোখের সামনে, তখন আমি আশা না ক'রে, ভয়াবহ রকম সুখী বোধ না ক'রে পারলাম না। সব বুঝতে পারলাম, কিন্তু ভাবতে লাগলাম যে সব আমি বদলে ফেলবো। অবশেষে, রাত নেমে এলে, তার সব শক্তি ফুরিয়ে গেলো। আমি তাকে ঘুমোতে যাবার জন্য জোর করলাম, আর সে সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। ভয় হচ্ছিলো তার সেই ঘোর তখনো কাটেনি, কিন্তু একেবারে কেটে না গেলেও সে ভালোই ছিলো। প্রতি এক মিনিট অন্তর উঠে-উঠে আমি সেই রাত্রে চটি পরা পা টিপে-টিপে তাকে গিয়ে দেখে আসছিলাম। সেই তিন রুব্‌ল দামের কদর্য লোহার খাটে শায়িত সেই শীর্ণ দেহটি দেখতে দেখতে নিজের হাত নিজে কামড়াচ্ছিলাম আমি। হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ছিলাম, কিন্তু তার ঘুমের মধ্যে তার পায়ে (তার বিনা অনুমতিতে) চুমু খাবার সাহস হচ্ছিলো না আমার। প্রার্থনা শুরু করলাম, কিন্তু লাফিয়ে উঠলাম তক্ষুনি। লুকেরিয়া আমার উপর নজর রাখছিলো, বারবার আসা যাওয়া করছিলো রান্নাঘর থেকে। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে শুতে পাঠিয়ে দিলাম, বললাম যে আসছে কাল 'সব কিছু অন্য রকম হ'য়ে যাবে।'

এবং তখন আমি অন্ধের মতো, পাগলের মতো বিশ্বাস করছিলাম এ-কথা। হায়, হৃদয়ের একূল-ওকূল আনন্দে ভেসে যাচ্ছিলো আমার, আনন্দে, আনন্দে! পরের দিনের জন্য আকুল হ'য়ে ছিলাম আমি। স্পষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে কোনো গোলমাল হ'তে পারে। চোখের সামনে থেকে পর্দা স'রে গেলেও বিবেচনাবোধ সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসে নি তখনো, অনেকদিন পর্যন্ত ফিরে আসে নি—এখনো পর্যন্ত আসে নি, এই আজকেও নয়! হ্যাঁ, আর তখন কী ক'রেই বা আসবে: কেন, সে যে তখনো বেঁচে ছিলো; কেন, সে তো ছিলো, ছিলো আমার চোখের সামনে, আমি ছিলাম তার চোখের সামনে. 'কাল সে জেগে উঠবে, আমি তাকে বলবো এ-সব কথা, সে সব বুঝতে পারবে।' এইভাবে আমি চিন্তা করছিলাম তখন, সহজভাবে, পরিষ্কারভাবে, কারণ তখন যে আনন্দের বান ডেকেছে আমার হৃদয়ে! আমার সবচাইতে বড়ো পরিকল্পনা হ'লো বোলোনে যাওয়া! কেন

জানি আমি খালি ভাবছিলাম যে বোলোনই সব, সেখানে এমন কিছু আছে যা পরম ও চরম। 'বোলোনে, বোলোনে!'····· উন্মত্তের মতো আমি অপেক্ষা করছিলাম পরদিন সকালের জন্য।

৩

আমি অতিরিক্ত ভালো ক'রে বুঝলাম

কিন্তু এটা ঘটেছিলো মাত্র কয়েকদিন আগে, পাঁচদিন, মাত্র পাঁচদিন আগে, এই গত মঙ্গলবার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি আর একটু সময় হ'তো, সে যদি আর একটু অপেক্ষা করতো—আর আমি সরিয়ে দিতাম ঐ অন্ধকার!—সে যে তার মনের শান্তি ফিরে পায় নি তা ঠিক নয়। ঠিক তার পরের দিনই সব ভালোমতো বুঝতে না পারলেও আমার কথা শুনেছিলো হাসি মুখে। এই পাঁচদিন ধ'রে সে হয় বুঝতে পারছিলো না, নয় লজ্জিত বোধ করেছে। ভয়-ও পেয়েছিলো সে, খুব ভয় পেয়েছিলো। সে-কথা অস্বীকার করি নি, এর প্রতিবাদ করার মতো অতটা পাগল আমি নই। ভীতি জন্মেছিলো তার মনে, কিন্তু ভয় না পেয়ে তার উপায়? দীর্ঘ দিন আমরা পরস্পরের কাছে আগন্তুক হ'য়ে থেকেছি, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম আমরা, আর হঠাৎ এই···কিন্তু আমি তার ভয়ের দিকে তাকাই নি। এই নতুন জীবনের আরম্ভ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো! সত্য, নিঃসন্দেহে সত্য যে আমি ভুল করেছিলাম। হয়তো একাধিক ভুল হয়েছিলো আমার। পরদিন যখন ঘুম থেকে উঠলাম, সকালে উঠে প্রথমেই (সেদিন ছিলো বুধবার) একটা ভুল করলাম: হঠাৎ তাকে বন্ধু ক'রে নিলাম। বড়ো বেশি তাড়া করেছিলাম আমি, বড়ো বেশি তাড়া, কিন্তু একটা স্বীকারোক্তি প্রয়োজন ছিলো, অনিবার্য ছিলো স্বীকারোক্তির চাইতেও বেশি। সারা জীবন নিজের কাজ থেকেও যে কথা লুকিয়ে রেখেছি তাও আমি লুকোলাম না। আমি তাকে স্পষ্টই বললাম যে, সে আমাকে ভালোবাসে কিনা, এ-ছাড়া সারা শীত আমি আর কিছু ভাবি নি। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে এই টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় আমার আত্মার অবমাননা হয়েছে।

বললাম যে সেই খাবার দোকানে আমি সত্যি কাপুরুষের মতো আচরণ করেছিলাম, কিন্তু আমার মেজাজ, আমার আত্মসচেতনতা তার কারণ।

আমার পারিপার্শ্বিক, সেই নাটক, সব কিছুই চমকপ্রদ ব'লে মনে হয়েছিলো আমার: আমি জিততে পারবো নাকি কাজটা বোকার মতো হবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ডুয়েল লড়তে ভয় পাই নি আমি, কিন্তু বোকা বনতে রাজি ছিলাম না কিন্তু পরে আমি সেটা অস্বীকার ক'রে সবাইকে যন্ত্রণা দিয়েছি, এর জন্য তাকেও যন্ত্রণা দিয়েছি, তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যই বিয়ে করেছি। সত্যি বলতে সমস্তটা সময় আমি যেন জ্বরের ঘোরে কথা বলছিলাম। সে নিজে আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে চুপ করতে বললো। 'তুমি বাড়িয়ে বলছো · নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো তুমি,' তারপর আবার নামলো চোখের জল, আবার সেই বিকার। সে আমাকে সমানে অনুনয় করলো এ-সব কথা না-বলতে, এ-সব কথা মনে না-করতে।

কিন্তু আমি তার অনুরোধ গ্রাহ্য করলাম না, কিংবা যতটুকু করলাম সেও না করার সামিল। 'বসন্ত, বোলোন! সেখানে আছে সূর্যালোক, সেখানে আমাদের নতুন সূর্যালোক,' ব'লে চললাম আমি। দোকান বন্ধ ক'রে ডব্রনরাভভের হাতে তুলে দিলাম। তারপর হঠাৎ তার কাছে প্রস্তাব করলাম যে আমাদের সব টাকা গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবো। আমার ধাত্রী মা-র কাছ থেকে পাওয়া তিন হাজার শুধু রেখে দেবো, বোলোনে যাবার জন্য সে টাকা খরচ করবো, যখন ফিরে আসবো তখন সত্যিকার কাজ নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো আমরা। তাই স্থির হ'লো, কারণ সে কিছু বললো না। · সে তবু একটু হাসলো। আর আমার বিশ্বাস সে হেসেছিলো শুধুমাত্র ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে, আমাকে হতাশ না-করার জন্য। আমি অবশ্য বুঝতেই পারছিলাম যে আমি তার কাছে একটা বোঝা হ'য়ে উঠছি, মনে করবেন না আমি অত বোকা, কিংবা আত্মকেন্দ্রিক। সব বুঝতে পারছিলাম আমি, তুচ্ছতম খুঁটিনাটিটুকুও আমার চোখ এড়ায় নি, অন্য সকলের চাইতে বেশি দেখেছি আমি; আবার কোনো আশা যে নেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে আমার দৃষ্টিতে।

আমার বিষয়ে. এবং তার বিষয়ে সব কথা আমি তাকে বললাম। আর লুকেরিয়া বিষয়ে। তাকে বললাম যে আমি কেঁদেছিলাম অবশ্য কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিছু-কিছু বিষয়ে কথা না-বলার চেষ্টাও করেছিলাম। এবং সত্যিই দু'-একবার সে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠেছিলো—আমার মনে আছে, আমার মনে আছে! এ-কথা কেন বলছেন যে তার দিকে তাকিয়েও আমি

কিছু দেখতে পাই নি, তবু যদি এই ঘটনাটা না ঘটতো তাহ'লে সবই জেগে উঠতো আবার। কেন, এইতো গত পরশুদিনই আমরা যখন বই নিয়ে আর এই শীতে সে কী পড়লো তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমাকে কী যেন বললো, গিল ব্লাস আর গ্রানাডার আর্চ-বিশপের কাহিনীর দৃশ্য মনে ক'রে কথা বলতে-বলতে সে হাসলো। আর কী মধুর, শিশুর মতো তার সেই হাসি! সেই প্রথমদিকে আমাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর যেমন হাসি সে হাসতো (এক মুহূর্ত! এক মুহূর্ত!); কী খুশিই না আমি হয়েছিলাম? যদিও আর্চবিশপের গল্প শুনে ভয়ানক ধাক্কা খেয়েছিলাম; তাহ'লে ঐ শীতে চুপচাপ ব'সে ঐ শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের মধ্যেই সে হাসবার মতো যথেষ্ট সুখ খুঁজে পেয়েছিলো! তাহলে তখন থেকেই সে পরিপূর্ণ শান্তি পেতে শুরু করেছে, বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে আমি তাকে ঐ ভাবেই ফেলে রাখবো। 'ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ঐ ভাবে ফেলে রাখবে,' ঠিক এই কথাগুলি সে উচ্চারণ করেছিলো মঙ্গলবার! হায়রে! দশ বছরের শিশুর চিন্তা! আর জানেন, সে এ-কথা বিশ্বাস করেছিলো, সে বিশ্বাস করেছিলো যে সত্যিই সবকিছু ঐরকম থাকবে: সে তার টেবিলে আমি আমার টেবিলে, ষাট বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে দিন কাটাবো আমরা। আর হঠাৎ—আমি এগিয়ে এলাম, তার স্বামী, যে-স্বামী ভালো-বাসতে চায়! হায় ভ্রান্তি! হায়রে আমার অন্ধতা!

তার দিকে ঐ আনন্দ-আকুল দৃষ্টিতে তাকানোটাও আমার ভুল হ'তো। নিজেকে সংযত করা উচিত ছিলো আমার, আমার আনন্দই যখন তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু সত্যি, আমি নিজেকে সংযত করেছিলাম, আর আমি তার পায়ে চুমু খাই নি। আমি কখনো এমন কোনো আচরণ করি নি যাতে··· মানে, স্বামীর মতো কোনো আচরণ-ই করি নি, আমার চিন্তাতেও সে-সব কথা আসে নি; আমি শুধু পূজো করেছি তাকে! কিন্তু জানেন, আমি চুপ ক'রে থাকতে পারতাম না, কথা না-ব'লে পারতাম না আমি। হঠাৎ একদিন তাকে খুলেই বলেছিলাম যে তার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে, এবং আমার ধারণা যে সে আমার চাইতে অনেক বেশি শিক্ষিত আর পরিণত—আমার সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হ'তে পারে না। সে টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো, হকচকিয়ে গিয়ে বললো, আমি বাড়িয়ে বলছি। তখন, বোকার মতো, আমি তাকে না ব'লে পারলাম না যে দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে

সেদিন কী ভালো আমার লেগেছিলো তার যুদ্ধ দেখতে, নিষ্পাপ একটি প্রাণ আর নীচ, ইতর একটা জীবের যুদ্ধ, কী উপভোগ করেছিলাম তার চতুরতা, তার ঝকঝকে বুদ্ধি আর সেই সঙ্গে তার শিশুর মতো সরলতা। মনে হ'লো সে যেন কেঁপে উঠলো সারা শরীরে, আবার বললো মৃদু কণ্ঠে যে আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু হঠাৎ কালো হ'য়ে গেলো তার মুখ, দুই হাতের পাতায় মুখ লুকিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়লো··· । তখন আমি আর সংযম রাখতে পারলাম না, আবার চুমু খেতে লাগলাম তার পায়ে, আর আবার এর শেষ হ'লো তার বিকারে, ঠিক সেই মঙ্গলবারের মতো। এটা হ'লো গত সন্ধ্যার কথা—আর—সকালে

সকালে! উন্মাদ! কেন এ তো আজকের সকাল, এক্ষুনি, এই এক্ষুনি!

শুনুন, বোঝার চেষ্টা করুন : কেন, সামোভারের ধারে যখন আমাদের দেখা হ'লো (গতকালের সেই বিকারের পর), তার শান্তভাব আমাকে সত্যিই অবাক করেছিলো, সেটা একেবারে সত্যি কথা! আর সারারাত আমি গতকালের ঘটনার কথা মনে ক'রে ভয়ে কেঁপেছি। কিন্তু হঠাৎ সে আমার কাছে এলো, দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে (আজ সকালে, আজ সকালে!) আমাকে বলতে লাগলো যে সে অপরাধী, সে জানে সে-কথা, তার অপরাধ-বোধ তাকে সারা শীত যন্ত্রণা দিয়েছে, এখন যন্ত্রণা দিচ্ছে সে বললো সে আমার উদারতার জন্য কৃতজ্ঞ 'আমি তোমার অনুগত স্ত্রী হবো, আমি তোমাকে সম্মান করবো···'

তখন আমি লাফিয়ে উঠে উন্মত্তের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলাম। চুমু খেলাম তাকে, তার মুখে, দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানের পর স্বামীর চুম্বন এঁকে দিলাম তার ঠোঁটে। কেন বাইরে গিয়েছিলাম আজ সকালে, মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য···বাইরে যাবার পাসপোর্ট!·· হা ঈশ্বর! পাঁচ মিনিট আর পাঁচ মিনিট আগে যদি ফিরে আসতাম!· আমাদের দরজার সামনে সেই ভিড়, সকলের চোখ আমার উপর ছিলো! হা, ঈশ্বর!

লুকেরিয়া বলে (ওঃ! কিছুতেই আমি যেতে দেবো না লুকেরিয়াকে। সে সব জানে, সারা শীত সে এখানে ছিলো, সে আমাকে সব বলবে!) সে বলে যে আমি তো বেরিয়ে গেলাম, আমার ফেরার মিনিট কুড়ি আগে—সে হঠাৎ কেন যেন কী জিগেস করতে তার ঘরে ঢুকেছিলো, কী তা আমার মনে নেই, দেখে যে তার মূর্তিটা (মাতা মেরীর সেই মূর্তি) নামিয়ে তার

টেবিলের উপর রাখা আছে, আর সে তার সামনে দাঁড়িয়ে,—মনে হ'লো যেন প্রার্থনা করছে। "কী করছেন, দিদিমণি?" "কিছু-না, লুকেরিয়া, তুমি যাও।" "একটু দাঁড়াও, লুকেরিয়া।" এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেলেন। "আপনি সুখী তো, দিদিমণি?" আমি বললাম। "হ্যাঁ, লুকেরিয়া!" "বাবুর অনেক আগেই আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিলো, দিদিমণি · ভগবানকে ধন্যবাদ যে আপনাদের মিটমাট হ'য়ে গেছে।" "আচ্ছা, লুকেরিয়া" সে বলেছিলো। "চ'লে যাও, লুকেরিয়া," আর সে হেসেছিলো, কিন্তু অদ্ভুত ভঙ্গিতে। এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে যে দশ মিনিট বাদে লুকেরিয়া আবার ঘুরে এসেছিলো তাকে দেখে যেতে।

"দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন জানলার কাছে, একটি হাত দেয়ালের উপর রাখা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিলেন। এমন গভীরভাবে ডুবে ছিলেন নিজের ভাবনায় যে আমি যে অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছি তা পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। মনে হচ্ছিলো হাসছেন—দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবছেন আর হাসছেন। আমি তাঁকে দেখে পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম নানা চিন্তা করতে-করতে, হঠাৎ জানলা খুলে যাবার শব্দ কানে এলো। আমি তক্ষুনি এ-কথা বলবার জন্য ছুটে গেলাম যে: নতুন হাওয়া, দেখবেন ঠাণ্ডা না লাগে; হঠাৎ দেখলাম উনি জানলার উপর উঠে টানটান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই খোলা কপাটের সামনে, আমার দিকে পিঠ ফেরানো, হাতে সেই মূর্তি। ভয়ে হিম হয়ে আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম 'দিদিমণি, দিদিমণি।' উনি শুনতে পেলেন, আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াবার মতো একটা ভঙ্গি করলেন, কিন্তু তা না-ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এক-পা, বুকে চেপে ধরলেন সেই মূর্তি, জানলা দিয়ে নিচে ছুঁড়ে দিলেন নিজেকে।"

আমার শুধু এটুকু মনে আছে যে আমি যখন সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখনো উষ্ণ ছিলো তার দেহ। সবচাইতে বিশ্রী ব্যাপার হ'লো এই যে সকলে তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে। প্রথমে চীৎকার কর ছিলো ওরা, তারপর হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো, তারপর সকলে স'রে যেতে লাগলো আমার কাছ থেকে আর সে শুয়ে রইলো মূর্তি বুকে চেপে। আমার মনে আছে সেই অন্ধকারে আমি নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে বহুক্ষণ ধ'রে তাকে দেখলাম। কিন্তু সকলে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো, কী যেন বললো।

লুকেরিয়াও ছিলো সেখানে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাইনি। সে বলে, সে নাকি আমাকে কী বলেছিলো। তবু মনে আছে সেই শ্রমিকটির কথা। সে সমানে আমার উদ্দেশে চীৎকার করছিলো, "মাত্র একমুঠো রক্ত বেরিয়েছে মুখ থেকে, একমুঠো, একমুঠো!" আর পাথরের গায়ের রক্ত দেখাচ্ছিলো আঙুল দিয়ে। বোধহয় সেই রক্ত আমি স্পর্শ করেছিলাম আঙুল দিয়ে, আঙুলে রক্ত মেখেছিলাম, তাকিয়ে ছিলাম আমার আঙুলের দিকে (সেটা তা নয়। আসলে, আমার সঙ্গে তাকে সৎ হ'তে হ'তো—আমাকে যদি সে ভালোবাসতো তাহ'লে সত্যি-সত্যি ভালোবাসতে হ'তো, সেই মুদিকে যে-ভাবে ভালোবাসতো সে-ভাবে ভালোবাসলে চলতো না। আর সে ছিলো বড়ো বেশি নিষ্পাপ, বড়ো বেশি শুদ্ধ, তাই সেই মুদি যে ভালোবাসা চেয়েছিলো তা দিতে সে রাজি হ'তে পারেনি, সে ঠকাতে চায় নি আমাকে। অর্ধেক প্রেম দিয়ে ঠকাতে চায় নি আমাকে, দিতে চায় নি নকল প্রেম, অথবা প্রেমের সিকি অংশ। ওরা সৎ, বড়ো বেশি সৎ, মুশকিলটা সেখানেই। আর মনে আছে, সেই প্রথম-প্রথম আমি তার চিত্তে প্রসারতা আনার চেষ্টা করেছিলাম? অদ্ভুত পরিকল্পনা।

জানতে ভয়ানক কৌতূহল হয়: সে আমাকে শ্রদ্ধা করতো কি করতো না? সে আমাকে ঘৃণা করতো কি করতো না তাও আমি জানি না। সে আমাকে ঘৃণা করতো এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। এটা বড়ো আশ্চর্য; সারা শীত এ-কথাটা কেন একবারও মাথায় ঢোকেনি যে সে আমাকে ঘৃণা করতে পারে? সে সেই কঠিন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি উল্টোটাই বিশ্বাস করতাম। কঠিন ছিলো সেই বিস্ময়। তক্ষুনি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে আমাকে ঘৃণা করে। চিরদিনের মতো করুক, সারা জীবন সে ঘৃণা করুক আমাকে, শুধু বেঁচে থাকুক সে। এই গতকাল পর্যন্তও সে ঘুরে বেরিয়েছে, কথা বলেছে। কেন সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পাঁচ মিনিট আগে আমি কি কল্পনাও করতে পারতাম? আমি লুকেরিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি কিছুর বিনিময়েই লুকেরিয়াকে চ'লে যেতে দিতে পারি না।

হায়, এখনো হয়তো পরস্পরকে বোঝার সময় চ'লে যায়নি। এই শীতে আমরা ভয়ানকভাবে স'রে এসেছিলাম পরস্পরের কাছ থেকে, কিন্তু আবার কি দু'জনে দু'জনের অভ্যেসে পরিণত হ'তে পারতাম না? কেন, কেন,

পারতাম না আবার মিলিত হ'তে, নতুন জীবন শুরু করতে? আমি উদার-চেতা, সেও তাই ছিলো—এখানেই তো ছিলো আমাদের মিল; শুধু আর দু' একটা কথা, আর দুটো দিন—আর কিছু চাই না, সে সব বুঝতে পারতো। সবচাইতে অপমানজনক হ'লো এই যে সবটা ঘ'টে গেলো নিতান্ত দৈবে—বর্বর, পশ্চাদনুসারী দৈব। সেটাই সবচাইতে অপমানজনক। পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিটের জন্য আমার দেরি হ'য়ে গেলো! আর পাঁচমিনিট আগে আসতাম যদি, মেঘের মতো স'রে যেতো সেই ক্ষণ, আর কখনো এ-কথা তার মাথায় আসতো না। আর শেষ পর্যন্ত সব বুঝতে পারতো সে। কিন্তু এখন আবার শূন্য ঘর, আমি একা। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ: ও গ্রাহ্য করে না, ও দয়া করে না কেউ নেই সেই তো দুঃখ।

আমি পায়চারি ক'রে চলেছি আর পায়চারি ক'রে চলেছি। আমি জানি, আমি জানি, আমাকে বলার কোনো দরকার নেই; আপনাদের মজা লাগে, আপনারা মনে করেন যে আমার পক্ষে দৈব আর পাঁচমিনিটের দোহাই দেওয়াটা নিতান্তই হাস্যকর। কিন্তু ও তো বলাই বাহুল্য। একটা কথা মনে রাখবেন: সে এমন একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে রেখে যায় নি যে, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়," লোকেরা সর্বদাই যা ক'রে থাকে। সে কি একবার এ-কথা ভাবতে পারতো না লুকেরিয়া বিপদে পড়তে পারে? "ও ছাড়া আর কেউ ছিলো না," লোকে বলতে পারতো "ও-ই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।" আর কিছু না হোক পুলিশ তো হেনেস্তা করতে পারতো ওকে, যদি না উঠোন থেকে চারজন লোক মূর্তি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং বাইরে লাফিয়ে পড়তে দেখতো। কিন্তু ওদের ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা এবং ওকে দেখতে পাওয়া—সেটাও তো দৈব। না, একটা মুহূর্তের জন্য, শুধু একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মুহূর্তের জন্য। একটা আকস্মিক ঝোঁক, কল্পনা। মূর্তির সামনে আমার মনে আছে), আর সে সমানে ব'লে চললো: "একমুঠো, একমুঠো!" "একমুঠো মানে? তুমি কী বলতে চাও?" সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি আর্তনাদ ক'রে দুই হাত তুলে ছুটে গিয়েছিলাম লোকটির দিকে।

হায় বন্যতা! বন্যতা! ভ্রান্তি! আসুরিক! অসম্ভব!

তাই নয় কি? তা কি সম্ভব? কেউ কি সত্যি ক'রে বলতে পারে যে তা সম্ভব? কেন, কেন মরলো এই মেয়ে?

বিশ্বাস করুন, সে কেন মরলো সেটা এখনো একটা প্রশ্ন। আমার প্রেমকে সে ভয় পেয়েছিলো, নিজেকে প্রশ্ন করেছিলো এই প্রেম সে গ্রহণ করবে কি করবে না, প্রশ্নটা সইতে না পেরে মৃত্যু বরণ ক'রে নিলো। আমি জানি, আমি জানি, ভেবে ভেবে মাথার চুল শাদা করার দরকার নেই: বড়ো বেশি প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছিলো সে, ভয় পেয়েছিলো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে না—এ তো স্পষ্ট! এর পেছনে যে-সব ব্যাপার আছে তা বড়ো বিশ্রী।

কারণ, কেন সে মরলো? সেটা এখনো একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা আমার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে, হাতুড়ির বাড়ি মারছে। সে যদি চাইতো তাহ'লে ঐ ভাবেই আমি তাকে রেখে দিতাম। সে সেটা বিশ্বাস করে নি, সেটাই হ'লো কথা। না না। আমি বাজে বকছি, আসলে সে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলো তো হয়েছে কী? তার মানেই এই নয় যে সে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে! এই ঝোঁকটা ছিলো হয়তো মাত্র দশমিনিট; হাতের উপর মাথা রেখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে সে যখন হাসছিলো তখনই বোধ হয় সে মনস্থির করেছে। এই পরিকল্পনাটা হঠাৎ এসেছে তার মাথায়, শরীর তার অবশ হ'য়ে গেছে আর আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে নি। কাজেই আপনারা যাই বলুন, স্পষ্টতই ভুলবোঝাবুঝির ব্যাপার এটা। আমার সঙ্গে বাস করা তার পক্ষে সম্ভব হ'তো। রক্তশূন্যতার জন্য নয় তো? রক্তাল্পতা, শক্তিহীনতা? সারা শীত ধ'রে সে শুধু ক্লান্ত হয়েছে, তাই হয়তো

আমার বড়ো দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো !!!

শবাধারে শায়িত তাকে কী রোগাই না দেখাচ্ছে, কী তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে তার নাক। তীরের মতো সোজা হ'য়ে আছে তার চোখের পক্ষ্ম। আর জানেন, যখন পড়লো তখন তার শরীরের কিছু ভাঙে নি, কিছু পিষে যায় নি! "একমুঠো রক্ত" ছাড়া আর কিছু না। মানে বড়ো চামচের এক চামচে। আঘাত লেগেছিলো ভেতরে। অদ্ভুত এই চিন্তা: তাকে কবর না দেওয়া যদি সম্ভব

হ'তো! কারণ ওরা যদি নিয়ে যায় তাকে, তাহ'লে···না, না, ওকে কেউ নিয়ে যাবে এ-চিন্তাও অবিশ্বাস্য। আমি পাগল নই, আমি প্রলাপ বকছি না—বরং উল্টো, আমার মন এত শান্ত কখনো থাকে নি—কিন্তু আমার এই বাড়ি যখন আবার শূন্য হবে, থাকবে শুধু দুটো ঘর আর অসংখ্য বন্ধকি জিনিশ নিয়ে আমি একা? পাগলামি, পাগলামি, পাগলামি! আমিই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি, আসল কথাই হ'লো তাই।

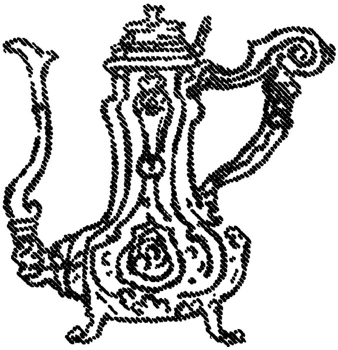
এখন কী নিয়মে আমাকে বাঁধবেন আপনারা? আপনাদের আচার, আপনাদের নীতি, আপনাদের জীবন, আপনাদের রাজত্ব, আপনাদের বিশ্বাস—কিছুই আমি গ্রাহ্য করি না! করুক, আপনাদের বিচারক বিচার করুক আমাকে, নিয়ে যাক বিচারালয়ে, জুরীরা জেরা করুক, আমি বলবো যে আমি কিছুই স্বীকার করি না। বিচারকেরা চীৎকার করবেন, "চুপ করুন, চুপ করুন।" আর আমি চীৎকার করবো তার মুখের উপর, "এমন কী ক্ষমতা এখন আপনার আছে যাতে আমি চুপ করবো? অন্ধ আর জড় শক্তি কেন ধ্বংস করলো তাকে যে ছিলো আমার সবচাইতে প্রিয়। এখন আর আপনাদের আইনে আমার কী এসে যায়? আমার কাছে তার কোনো মূল্য নেই।" ওঃ, আমি গ্রাহ্য করি না।

অন্ধ ছিলো সে, অন্ধ! সে এখন মৃত, সে শুনতে পাবে না। তুমি কি জানো কী স্বর্গসুধা দিয়ে আমি তোমাকে ঘিরে রাখতাম? স্বর্গ ছিলো আমার অন্তরে, তোমাকে ঘিরে আমি ফুটিয়ে তুলতাম সেই স্বর্গকে। তুমি হয়তো ভালোবাসতে না আমাকে—কিন্তু তাতে কী? তবুও সবই একরকম থাকতো, সবই একরকম থাকতো। শুধু যদি তুমি বন্ধুর মতো কথা বলতে আমার সঙ্গে—দু'জনে দু'জনকে দেখে আনন্দ পেতাম আর আনন্দে হাসতাম আমরা। ঐ ভাবে দিন কাটতো আমাদের। আর তুমি যদি অন্য কাউকে ভালোবাসতে—তাহ'লে, তাহ'লে তাই, তাহ'লে তাই! হেসে-হেসে তুমি কথা বলতে তার সঙ্গে, আর রাস্তার ওপার থেকে তোমাকে দেখতাম। হায়, সব, সব আমি দিতাম, শুধু যদি একবার সে চোখ খুলতো! এক মুহূর্তের জন্য, একটিমাত্র মুহূর্ত! শুধু যদি সে একবার তাকাতো আমার দিকে, যেমন ক'রে তাকিয়েছিলো আজ সকালে, যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে অনুগত স্ত্রী হবার শপথ নিয়েছিলো সে! হায়রে, একবার তাকালেই সে সব বুঝে যেতো।

হায়রে অন্ধ শক্তি! হায় প্রকৃতি! এই পৃথিবীতে মানুষ একেবারে একা—

সেটাই সবচাইতে ভয়ংকর! রুশ নায়ক বলেন, "দেশে কি জীবিত মানুষ কেউ আছে?" আমিও সেই আর্তনাদ করি, যদিও আমি বীর নই, আর আমার কথার জবাব দেয় না কেউ। সবাই বলে এই প্রাণদান করে সূর্য। সূর্য উঠছে আর—দেখুন, মৃত নয়? সব মৃত, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মৃতেরা। মানুষ একেবারে এক—তাদের ঘিরে আছে স্তব্ধতা- সেই স্তব্ধতা হ'লো পৃথিবী! "হে মানুষ, পরস্পরকে ভালোবেসো"—কে বলেছিলো কথাটা? কার আদেশ? উদাসীন, হৃদয়হীন ঘড়ির কাঁটা টিকটিক ক'রে চলেছে। এখন রাত দুটো। ছোট্ট বিছানাটির ধারে তার ছোট্ট জুতোজোড়া যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে না, সত্যি, কাল যখন ওকে নিয়ে যাবে ওরা তখন আমার কী উপায় হবে?

অনুবাদ . মীনাক্ষী দত্ত





শয়তান

লিও টলস্টয়

ইউজিন ইরটেনেভের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানুষের যা-কিছু কাম্য তার প্রত্যেকটাই তার আছে: প্রশংসার যোগ্য শিক্ষা পেয়েছে, আইনের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে; আর তাছাড়া স্বর্গত পিতার সূত্রে সমাজের সর্বোচ্চ মহলের সঙ্গে তার যোগা-যোগ; জনৈক মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যেই সরকারি দপ্তরে সে একটি কাজ পেয়েছে। তদুপরি তার পৈতৃক বিত্ত আছে; প্রচুর সম্পত্তি, যদিও তেমন সুরক্ষিত নয়। তার বাবা বাইরে-বাইরে থাকতেন, মাঝে-মাঝে, পিটার্সবার্গে আসতেন, ইউজিন আর অ্যাণ্ড্রু (অ্যাণ্ড্রু ইউজিনের চেয়ে এক বছরের বড়ো, রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে) দুই ভাইকে তিনি বছরে ছ' হাজার রুব্‌ল হাত-খরচ দিতেন, সস্ত্রীক নিজেও খরচ করতেন দু'হাতে। গ্রীষ্মকালে মাত্র কয়েক-মাসের জন্য আসতেন জমিদারিতে, কোনো ব্যাপারেই মাথা ঘামাতেন না। এক বিবেকহীন নায়েবের হাতে সব কিছু ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি, সে-ও কিছুই দেখতো না, কিন্তু তবু তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিলো লোকটির উপর। পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাই সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতে গিয়ে এত দেনা

আবিষ্কার করলো যে এই উত্তরাধিকার প্রত্যাখ্যান ক'রে কেবল তাদের পিতামহীর সূত্রে পাওয়া একটা অংশ রাখার উপদেশ দিলেন তাদের উকিল। বছরে সেই অংশটুকু থেকে তাদের আয় হবে একশো হাজার রুব্‌ল। কিন্তু প্রতিবেশী জমিদার যিনি বৃদ্ধ ইরটেনেভের সঙ্গে প্রচুর কাজ-কারবার করেছেন, অর্থাৎ যিনি ইরটেনেভের দেওয়া প্রত্যর্থ-পত্রের প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পিটার্সবার্গে এসেছিলেন, তিনি বললেন যে দেনা সত্ত্বেও ওরা এমনভাবে গুছিয়ে নিতে পারে যাতে বেশ কিছু লাভ হয়, (অবশ্য বনটা, এবং আশেপাশের কিছু জমি বেচতেই হবে, থাকবে শুধু চারহাজার বিঘে উর্বর জমি, চিনির কল আর দুশো বিঘে জোড়া বিল নিয়ে সুজলা সুফলা সেমেনভ) কিন্তু তার জন্য নিজেকে প্রায়-উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে সম্পত্তি দেখাশুনোর কাজে, থাকতে হবে ওখানেই, বুদ্ধি এবং বৈষয়িক বিবেচনা খাটিয়ে চাষ করতে হবে।

অতএব বসন্ত এলে পর ইউজিন জমিদারিতে এসে সব দেখেশুনে নিলো। জমিদারির প্রধান অংশটা টিঁকিয়ে রাখারই ইচ্ছে তার; তাই সরকারি কাজ ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে দেশে সংসার পাতবে স্থির ক'রে সে জামিদারির ভার নিজের হাতে তুলে নিলো। দুই ভাইয়ে সম্পর্কটা ছিলো বন্ধুর মতো। ঠিক হ'লো ভাইকে হয় বছরে চার হাজার রুব্‌ল নয়তো থোক আশি হাজার রুব্‌ল ধ'রে দেবে ইউজিন, আর তার বদলে অ্যাণ্ড্রু তার নিজের অংশটা হস্তান্তরিত করবে।

এইভাবে সব ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে দেশের বড়ো বাড়িতে মাকে নিয়ে ইউজিন ঘর বাঁধলো। তারপর শুরু হ'লো জমিদারির কাজ—সোৎসাহে, কিন্তু সাবধানে কাজ শুরু করলো ইউজিন।

সাধারণত রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ বয়স্ক হ'য়ে থাকেন, তরুণেরা থাকেন পরিবর্তনের পক্ষে। কিন্তু সবসময় তা হয় না। অনেক সময়ই রক্ষণশীল হন সেইসব অল্পবয়স্করা যাঁরা জীবন কাটান, কী ভাবে জীবন কাটাতে হয় না-ভেবে, ভাববার মতো সময়ই তাঁদের নেই, তাই জীবনযাপনের যে-পদ্ধতি আশৈশব দেখে এসেছেন তাকেই আদর্শরূপে সামনে রাখেন।

ইউজিন ছিলো সেইরকম এক ব্যক্তি। গ্রামে বসবাস শুরু করার পর তার উচ্চাশা আর আদর্শ হ'লো প্রাচীন জীবনের ধারা ফিরিয়ে আনা—তার বাবার আমলে যেমন ছিলো তেমন নয়, কারণ তিনি সু-শাসক ছিলেন না—যেমন ছিলো তার পিতামহের আমলে। পিতামহের জীবনযাত্রা পদ্ধতির সাধারণ

ধারাটাই সে চালু করার চেষ্টা করলো বাড়িতে, বাগানে, জমিদারি শাসনে (অবশ্য কালোপযোগী কিছু-কিছু অনিবার্য পরিবর্তন করতেই হ'লো), সবই হবে বেশ বড়ো মাপের, আসবে সুশৃঙ্খলা, নিয়ম, সন্তুষ্ট থাকবে সকলে। কিন্তু এ-সব কাজ প্রচুর শ্রমসাপেক্ষ। দেনাদারের আর ব্যাঙ্কের পাওনা শোধ করা দরকার, আর সেজন্য কিছু জমি বিক্রি করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে নতুন ঋণের। তাছাড়া টাকা চাই চারশো বিঘে চাষের জমি আর চিনির কল সমেত সেমেনভ জমিদারির বিপুল কার্য নির্বাহের জন্য— কিছুটা করতে হবে জমি চাষ ক'রে আর কিছুটা মজুর ভাড়া ক'রে। তাছাড়া বাগানটাও আছে— সেটা যাতে অবহেলিত অথবা নষ্ট না হয় সেদিকেও নজর রাখা দরকার।

কাজ অনেক আছে—তেমনি ইউজিনের শক্তিও ছিলো প্রচুর, শারীরিকও বটে, মানসিকও বটে। বয়স তার ছাব্বিশ, মাঝারি আকার, শক্তপোক্ত গড়ন, নিয়মিত ব্যায়ামে দৃঢ় মাংসপেশী। শরীরে রক্তের অভাব নেই, গলার রঙ টুকটুকে লাল, ঝকঝকে দাঁত আর উজ্জ্বল ঠোঁট, নরম ঢেউতোলা চুল, খুব বেশি ঘন নয়। তার একমাত্র শারীরিক খুঁত হ'লো তার ক্ষীণ দৃষ্টি— যেটা চশমা ব্যবহার ক'রে-ক'রে সে নিজেই সৃষ্টি ক'রেছিলো, আর এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ফিতে বাঁধা একটি চশমা ছাড়া মোটে চলেই না তার ; নাকের উপর ইতিমধ্যেই দাগ প'ড়ে গেছে চশমার।

শরীরের কথা গেলো। মনের বিষয়ে একমাত্র কথা এই বলা যেতে পারে যে লোকে তাকে যত দেখতো তত বেশি পছন্দ করতো। চিরকালই সে মায়ের সবচাইতে আদরের ছেলে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এই ছেলেকে তিনি শুধুমাত্র সবটুকু ভালোবাসা নয়, সারা জীবন সঁপে দিয়েছেন। স্কুলে-কলেজে বন্ধুরা তাকে কেবল পছন্দই করে নি, শ্রদ্ধাও করেছে। প্রত্যেকের মনোভাব তার সম্পর্কে এক। ওর কথা বিশ্বাস না করাটাই অসম্ভব ছিলো ; যার ওরকম অকপট, সৎ মুখ, বিশেষত ওই রকম চোখ তার মধ্যে কোনো কূট, ছলনা বা মিথ্যাভাষণ সন্দেহ করাও অসম্ভব।

কাজেই, তার ব্যক্তিত্ব তার সহায় হয়েছিলো। যে-সব দেনাদার অন্যকে প্রত্যাখ্যান করতো, তারা তাকে অবিশ্বাস করলো না। কেরানি, কি গ্রামের মোড়ল মশাই, কি সাধারণ চাষারা যে-কোনো লোকের সঙ্গেই অত্যন্ত নোংরা কোনো চালাকি করার, কি ঠকানোর চেষ্টা চালায় তারা ; কিন্তু এই

কোমল, সহাস্য আর, সবচাইতে যা বড়ো কথা, পক্ষপাতিত্ববিহীন এই লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের এত ভালো লাগতো যে তারা ঠকাতে ভুলে যেতো।

মে মাসের শেষ হ'য়ে আসছে। শহরে গিয়ে ইউজিন কোনোমতে ব্যবস্থা করেছে ফাঁকা যে-জমিটা বাঁধা দেওয়া ছিল সেটা ছাড়িয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার। সেই একই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করছে সে যাতে ঘোড়া, বলদ, গাড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র কেনা যায়; অর্থাৎ চাষ শুরু করার ব্যবস্থা সে পাকা করতে চায়। সবই স্থির। কাঠের চালান শুরু হয়েছে, মিস্ত্রিরা ইতিমধ্যেই লেগে গেছে কাজে, আশি গাড়ি সার আসছে জমিদারির জন্য, কিন্তু তবু সব ব্যাপারটাই যেন এখনো ঝুলে আছে একটা সরু সুতোর উপর।

২

এই সব ঝামেলার মধ্যে আবার এক নতুন ব্যাপার এসে জুটলো। সেটা যদিও তেমন প্রয়োজনীয় নয়, তবু তা ইউজিনকে মাঝে-মাঝেই যন্ত্রণা দেয়। অন্য যে-কোনো সুস্থ সবল যুবকের মতোই সে জীবনযাপন করে,—মানে, নানা ধরনের মেয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছিলো তার। স্বেচ্ছাচারী নয়, কিন্তু সে নিজেই যেমন বলে, সন্ন্যাসীও সে নয়। সে বলে, মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিতান্তই শরীর সুস্থ এবং মন মুক্ত রাখার খাতিরে। ষোলো বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো গোলমাল বাধেনি—মানে, কখনো উচ্ছৃঙ্খল হয় নি, প্রেমে পড়ে নি, এবং রোগের ছোঁয়াচমুক্ত থেকেছে। পিটার্সবার্গে একটি মেয়ে দরজির সঙ্গে যোগ ছিলো তার, কিন্তু মেয়েটি মাথায় চ'ড়ে বসার চেষ্টা করার সঙ্গে-সঙ্গে সে অন্য ব্যবস্থা করেছিলো; এ-সব ব্যাপার তার এত নিরাপদ ছিলো যে কখনো কোনো গোলমাল হয় নি।

গ্রামে এই তার দ্বিতীয় মাস হ'লো, কিন্তু কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিলো না ইউজিন। বাধ্যতামূলক আত্মসংযমের ফল ভালো হচ্ছিলো না তার উপর।

শুধু কি এইজন্য শহরে যেতে হবে তার? কোথায় যাবে? কেমন ক'রে? এই একমাত্র সমস্যা তাকে পীড়িত করছিলো; তার দৃঢ় ধারণা ছিলো যে, এটা

তার পক্ষে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন, এবং ব্যাপারটা সত্যিই অনিবার্য হ'য়ে দাঁড়ালো, তার মনে হ'লো সে যেন এই বাসনার কাছে সম্পূর্ণ পরাধীন, যে-কোনো অল্পবয়সী মেয়ে দেখলেই তার দৃষ্টি অচেতনভাবে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। বিবাহিত অথবা তার নিজের গ্রামের কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করার তার ইচ্ছে নেই। শুনেছে তার বাবা এবং ঠাকুর্দা দু'জনেই এই ব্যাপারে সমসাময়িক অন্যান্য জমিদারদের থেকে পৃথক ছিলেন। স্বগৃহে তাঁরা কখনো কোনো কৃষক রমণীকে আহ্বান করেন নি, সে-ও তাঁদের ধারা বজায় রাখবে ব'লেই স্থির করেছিলো; কিন্তু প্রয়োজন তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠলো, পাশের মফস্বল শহরে গিয়ে এবার তার কি অবস্থা হবে কল্পনা করতেও ভয় করতে লাগলো তার; অতএব ক্রীতদাসত্বের যুগ শেষ হ'য়ে গেছে বিবেচনা ক'রে সে ঠিক করলে গ্রামের মধ্যেই ব্যবস্থা করা যায়। তবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কেউ কিছু না জানতে পারে; এবং তার কথা হ'লো এই যে, এটা শুধুমাত্রই স্বাস্থ্যের খাতিরে, উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য নয়—এটা ভাবার পর থেকে সে আরো অস্থির হ'য়ে উঠলো। গ্রামের মোড়ল, চাষা, অথবা ছুতোরদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অচেতনভাবে সে মেয়েদের বিষয়ে কথা তুলতো, এবং একবার শুরু করলে আর থামতে পারতো না। মেয়েদের প্রতি তার মনোযোগ ক্রমেই বেড়ে চললো।

৩

নিজের মনে স্থির করা এক কথা, আর সেটা কাজে পরিণত করা আরেক কথা। নিজে গিয়ে কোনো মেয়ের কাছে প্রস্তাব করাটা একেবারে অসম্ভব। কার কাছে যাবে? কোথায়? অন্য কারুর সাহায্য দরকার, কিন্তু এ-সব কথা সে বলে কার কাছে?

ঘটনাচক্রে বনের মধ্যে এক পাহারাওলার ঘরে সে জল খেতে গেলো। পাহারাওলাটি ছিল তার বাবার শিকার-সঙ্গী, ইউজিন ইভানিচ খুব গল্প জুড়ে দিলো তার সঙ্গে, শিকারের গল্প শুরু করলো লোকটি। ইউজিনের মনে হ'লো, এই ঘরে, কিংবা বনের মধ্যে কোথাও ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু কী ক'রে ব্যবস্থা করবে? আর বুড়ো ড্যানিয়েল রাজিই বা হবে কিনা কে জানে। 'ও হয়তো ভয় পেয়ে যাবে আমার প্রস্তাবে, আমার লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না;

কিংবা কে জানে, ও হয়তো সহজেই রাজি হবে।' ড্যানিয়েলের গল্প শুনতে-শুনতে কেবল এই এক কথাই সে ভাবতে থাকলো। ড্যানিয়েল বলছিলো কী ভাবে একবার এক পোড়ো জমির ধারে কবরখননকারীর স্ত্রীর বাড়িতে সে ফিয়োডর প্রিয়ানিশনিকভের জন্য একটি স্ত্রীলোক জোগাড় ক'রে দিয়েছিলো। ইউজিন ভাবলে, 'ঠিক আছে, চলবে।'

'তোমার বাবা, ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে স্থান দিন, এ-সব দিকে মতি ছিল না তাঁর।'

'চলবে না,' ইউজিন ভাবলো। কিন্তু তবু পরীক্ষা করার জন্য সে বললে 'আচ্ছা বলো তো এ-সব বাজে কাজে তোমাকে লাগানো হ'লো কী করে?'

'বাজে কেন · মেয়েটাও খুশি হ'লো, আর ফিয়োডর জাখারিচও সন্তুষ্ট হলেন, খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। এক রুব্‌ল লাভ হ'লো আমার। কেন, উনি করবেন কী বলুন? ওঁর তো মানুষেরই শরীর, মদটদ খেতেন তাছাড়া।'

'হ্যা, একে বলতে পারি,' ইউজিন ভাবলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করলো।

'জানো ড্যানিয়েল, কী করে সহ্য করবো জানিনে—' স্পষ্ট অনুভব করলো তার গাল লাল হ'য়ে উঠলো।

ড্যানিয়েল মৃদু হাসলো।

'আমি তো সন্ন্যাসী নই—এ যে আমার অভ্যেস।'

নিজেকে কেমন যেন বোকা-বোকা লাগলো, কিন্তু ড্যানিয়েলের সম্মতি পেয়ে খুশিও হ'লো সেই সঙ্গে।

'সেই তো, বটেই তো, আপনার অনেক আগেই বলা উচিত ছিলো আমাকে। সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে,' সে বললে: 'শুধু বলুন কাকে আপনার পছন্দ।'

'আমার কাছে সবই এক। অবশ্য খুব কুৎসিত যেন না-হয়, আর সুস্থ হওয়া চাই।'

'বুঝলাম।' ড্যানিয়েলের সংক্ষিপ্ত জবাব। সে চিন্তা করতে লাগলো।

'হ্যাঁ, সত্যিকার রসালো মাল আছে,' শুরু করলে সে। ইউজিন আবার লাল হ'লো। 'রসালো মাল। বুঝলেন, গত বছর হেমন্তের সময় ওর বিয়ে হয়,' ড্যানিয়েল ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কিন্তু লোকটা এখনো কিছুই করতে পারেনি। ভেবে দেখুন যে চায় তার কাছে এর মূল্য কতখানি।'

লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'লো ইউজিন।

'না, না,' সে বললে। 'ও-সব কিছুই আমি চাইনে। আমি বরং উল্টোটাই চাইছি,' (উল্টোটা কী হ'তে পারে; সে ভাবলে) 'উল্টোটা মানে—মানে মেয়েটি যেন সুস্থ হয় আর এ নিয়ে যত কম গোল হয় ততই ভালো—এমন কোনো মেয়ে যার স্বামী যুদ্ধে গেছে বা এই রকম কিছু।'

'আরে জানি জানি। ঐ স্টেপানিভাকেই জোগাড় করতে হবে আপনার জন্য। স্বামীটা আছে শহরে, ঐ যুদ্ধে যাওয়ার মতোই হ'লো আর কি। চমৎকার মেয়ে, তাছাড়া খুব পরিচ্ছন্ন। খুশি হবেন আপনি। সেদিনই তো আমি বলছিলাম ওকে—আপনি যাবেন, কিন্তু ও '

'তাহ'লে কবে হবে?'

'যদি চান কালই হ'তে পারে। আমি তামাক কিনতে যাবার পথে খবর দিয়ে দেবো। দুপুরে খাবার সময় চ'লে আসবেন এখানে—অবশ্য রান্নাঘরের বাগানের পিছনে স্নানের ঘরেও হ'তে পারে। কেউ থাকবে না তখন। কারণ খেয়ে-দেয়ে উঠে সকলেই একটু ঘুমোয়টুমোয় তো।'

'বেশ, ঠিক আছে।'

বাড়ি যাবার পথে ভয়ংকর এক উত্তেজনা আচ্ছন্ন করলো ইউজিনকে। 'কী হবে? চাষী স্ত্রীলোকেরা কেমন হয় কে জানে? যদি বদ, কুৎসিৎ হয়? ভয়ংকর হয়? না, সুন্দর হবে।' যে দু'-একজনকে সে লক্ষ করেছে তাদের মনে করে সে নিজেকে বোঝালো। 'কিন্তু আমি কী বলবো? কী করবো?' সারাদিন সে যেন আর সে রইলো না। পরের দিন দুপুরে সে বনরক্ষকের কুঁড়েতে গেলো। ড্যানিয়েল দরজায় দাঁড়িয়েছিলো, অর্থপূর্ণভাবে সে বনের দিকে ইঙ্গিত করলো। ইউজিন অনুভব করলো তার হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে যাচ্ছে রক্তের চাপে, রান্নাঘরের বাগানে চ'লে গেলো সে। কেউ নেই। স্নানের ঘরে ঢুকলো—সেখানেও কেউ নেই, ভেতরটা দেখে বেরিয়ে এলো, তারপর হঠাৎ কানে এলো গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ। ঘুরে তাকালো সে—খাদের ওপারে ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। ইউজিন খাদ পার হ'য়ে ঝোপের ধারে ছুটলো—সেখানে যে বিছুটি আছে সেটা আগে সে লক্ষ করে নি। বিছুটির কামড় খেয়ে একেবারে প্রান্তের ঢালু জমিতে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে চোখ থেকে চশমা খুলে এলো তার। মেয়েটি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, শাদাসুতোর কাজ করা জামা, আর বাদামি-লাল ঘাঘরা পরা, মাথায় উজ্জ্বল লাল রুমাল বাঁধা, খালি পা, ঋজু দেহটি; সুন্দর মুখে সলজ্জ হাসি।

'ওদিক দিয়ে একটা পথ আছে—ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল আপনার।' সে বললে। 'আমি অনেকক্ষণ এসেছি, অনেক, অনেকক্ষণ।'

কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ভালো ক'রে দেখলো সে, তারপর গায়ে হাত দিলো। সোয়া ঘণ্টা পরে তারা বিচ্ছিন্ন হ'লো ; চশমা খুঁজে পেল সে, ড্যানিয়েলকে ডাকলো, আর ড্যানিয়েলের 'খুশি হয়েছেন তো বাবু?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে এক রুব্ল দিয়ে বাড়ি গেলো।

সে খুশি হয়েছিলো। শুধু প্রথমটায় লজ্জা-লজ্জা করেছিলো একটু, তারপর কেটে গেলো। সব চললো ঠিকমতো। সবচাইতে ভালো কথা এই যে, অনেক সহজ, শক্ত আর উদ্দীপ্ত বোধ করছে সে। মেয়েটিকে বোধহয় ভালো ক'রে দেখেওনি। এটুকু শুধু তার মনে আছে যে মেয়েটি পরিষ্কার, অমলিন, সুশ্রী এবং সরল—কোনো ভানের ধার ধারে না। 'কার বৌ?' মনে-মনে সে ভাবলে। 'পেচনিকভের' ড্যানিয়েল বলছিলো। কোন পেচনিকভ? ঐ একই নামে দু'টি পরিবার আছে। বুড়ো মাইকেলের ছেলের বৌ নাকি? হ্যাঁ, তাই হবে। ওর ছেলে তো মস্কোতে থাকে। ড্যানিয়েলকে জিগেস করতে হবে একদিন।

এরপর থেকে গ্রামীণ জীবনের এতদিন যে একটিমাত্র, কিন্তু বিশেষ অসুবিধে ছিলো—বাধ্যতামূলক আত্মসংযম—তাও দূর হ'য়ে গেলো। ইউজিনের মনের মুক্তি আর ব্যাহত হ'লো না, স্বাধীনভাবে আবার জমিদারির দেখাশুনোয় মন দিতে পারলো সে। যে কাজের ভার ইউজিন হাতে নিয়েছে তা অত্যন্ত শক্ত : একটা গর্তের মুখ ভরতে-না ভরতে সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে আর একটা নতুন গর্ত হাঁ করে ; মাঝে-মাঝে তার মনে হয় শেষ পর্যন্ত সে চালিয়ে যেতে পারবে না, তার সকল প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং অকৃতকার্যতাতেই এর পরিণতি। এই ভবিষ্যৎ-চিন্তাই তাকে সব চাইতে পীড়িত করে আজকাল।

এদিকে তার বাবার আরো অনেক নতুন ঋণের কথা জানা গেলো। স্পষ্টতই শেষ জীবনে যত্র তত্র ধার করেছিলেন তিনি। মে মাসে বিলি ব্যবস্থার সময় ইউজিন ভেবেছিলো বুঝি অবশেষে সব জানতে পেরেছে, কিন্তু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি হঠাৎ এক চিঠি এলো যাতে জানা গেলো বিধবা এসিপোভার কাছে বারো হাজার রুব্ল দেনা করেছিলেন তার বাবা। কোনো প্রত্যর্থ-পত্র নেই, আছে সাধারণ একটি রশিদ, যেটা, ইউজিনের উকিল বললেন, অনায়াসে মিথ্যা প্রমাণিত করা যায়। কিন্তু সন্দেহের অবকাশ আছে ব'লে

পিতার ঋণ পরিশোধ না-করার কথাটা ঠিক মাথায় ঢুকলো না ইউজিনের। সে শুধু নিশ্চিন্ত হ'তে চায় সত্যিই তার বাবা এই ধার করেছিলেন কি না।

'মা! কালেরিয়া ভ্লাভিমিরোভনা এসিপোভা কে?' খাবার টেবিলে সে তার মাকে জিগেস করলো।

'এসিপোভা? তোর ঠাকুর্দা তাকে মানুষ করেছিলেন। কেন?'

ইউজিন মাকে চিঠির কথা জানালো।

'ধারশোধ চাইতে লজ্জা করলো না ওর, আশ্চর্য বটে। কী না করেছেন তোর বাবা ওর জন্য।'

'কিন্তু সত্যি কি আমাদের ধার আছে?'

'মানে কী করে বোঝাই বল তো? ঠিক ধার নয়। তোর বাবার অপরিসীম দয়া ব'লে .....'

'হ্যাঁ, কিন্তু বাবা কি এটাকে ধার ব'লে ভাবতেন?'

'তা বলতে পারিনে। আমি জানিনে কিছু। শুধু এইটুকু জানি যে তোর অবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট সঙ্গীন।'

ইউজিন দেখলো মেরি পাভলোভনা কী যে বলবেন বুঝতে পারছেন না, তাকে যেন বাজিয়ে দেখছেন উনি।

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে টাকাটা দিতেই হবে।' সে বললে। 'কাল ওঁর কাছে গিয়ে বরং কথা ব'লে আসি, দেখি যদি কিছু সময় পাওয়া যায়।'

'আহা রে! তোর জন্য আমার যে কী দুঃখ হয় কেমন ক'রে বলি। তবে সেটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হবে।' স্পষ্টতই মনের শান্তি ফিরে পেয়ে পুত্রগর্বে গর্বিত হ'য়ে কথা বললেন মেরি পাভলোভনা।

ইউজিনের অবস্থাটা তার মায়ের জন্যই বিশেষ কষ্টের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; কারণ তিনি তার সঙ্গে বাস ক'রেও তার অবস্থাটা একেবারেই বুঝতেন না। সারা জীবন দু'হাতে খরচ ক'রে তাঁর এমন অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে ছেলের অবস্থাটা তিনি এমনকি কল্পনাও করতে পারেন না, ভাবতেও পারেন না যে আজকালের মধ্যেই এমন হ'তে পারে যে তাঁদের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না, সব বেচে ফেলে শুধুমাত্র চাকরির টাকায় মাকে প্রতিপালন করতে হবে ইউজিনের, এবং সে টাকা খুব বেশি হ'লে হবে দু' হাজার রুব্‌ল। তিনি এ-কথাটা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সর্বক্ষেত্রে খরচ কমানো, তাই ভেবে পেতেন না ছোটো-ছোটো ব্যাপারেও ইউজিন কেন

এত সাবধানী—মালি, গাড়োয়ান, ভৃত্য—এমনকি খাবার-দাবারের খরচও কেন সে কমাতে চায়। এবং বেশির ভাগ বিধবার মতো তাঁরও বৈধব্যদশায় মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি যে মনোভাব জন্ম নিয়েছে স্বামী বেঁচে থাকতে তা ছিল না, তাই মৃত ব্যক্তি যা-কিছু ব্যবস্থা ক'রে গেছেন তা ভুল কি পরিবর্তন-সাপেক্ষ এ-কথাটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতেন না।

বাগান আর কনসারভেটারিটা দু'জন মালির সাহায্যে এবং আস্তাবলটা দু'জন গাড়োয়ানের সাহায্যে বহু কষ্টে কোনো মতে টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিলো ইউজিন। মেরি পাভলোভনা মনে করতেন বুড়ো রাঁধুনির রান্নার বিরুদ্ধে, কি পার্কের পথগুলি ঝাঁট দিয়ে তকতকে করা হয় না বলে, কি ফুটম্যানের বদলে তাদের মাত্র একটি ছোকরা আছে ব'লে কোনো অভিযোগ না ক'রে তিনি ছেলের জন্য আত্মত্যাগ করছেন। আদর্শ মাতার যোগ্য ব্যবহার হচ্ছে তাঁর। এই ধারের ব্যাপারেও মেরি পাভলোভনার কাছে যা উদ্ঘাটিত হ'লো তা তাঁর পুত্রের চরিত্র-মাহাত্ম্য, জানলেন না যে এটা ইউজিনের সব প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করলো। তাছাড়া, ইউজিনের অবস্থা নিয়ে তিনি বেশি মাথা ঘামাতেন না এইজন্য যে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ইউজিনের খুব ভালো বিয়ে হবে এবং তাতেই ঠিক হ'য়ে যাবে সব। তার যে খুবই ভালো বিয়ে হবে এ নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিলো না: ইউজিনের হাতে মেয়ে দিতে পারলে সুখী হয় এমন একশো পরিবারের কথা উনি জানেন এবং তাঁর ইচ্ছে, ব্যাপারটা যথাশীঘ্র সমাধা হয়।

৪

ইউজিন নিজেও বিয়ের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু তার মায়ের মতো ক'রে নয়। তার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটা উপায় হিশেবে বিয়েটাকে দেখতে ঘৃণা বোধ হয় তার। সে চায় সসম্মানে ভালোবাসার জন্য বিয়ে করতে। যে-সব মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয় বা যাদের সে চেনে, তাদের খুব খুঁটিয়ে লক্ষ ক'রে, মনে-মনে নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করে, কিন্তু এখনো কিছু স্থির করতে পারে নি। এদিকে স্টেপানিভার সঙ্গে তার যোগ কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়নি, সে যা ভেবেছিলো তা না হ'য়ে ব্যাপারটা বেশ কায়েমী হ'য়ে এসেছে। উচ্ছৃঙ্খল নয় ইউজিন, এই অনিবার্য প্রয়োজনটা এমন সঙ্গোপনে মেটানোটা

তার পক্ষে এতই কঠিন ছিলো যে নিজে সে কোনো ব্যবস্থা করতে পারে নি। প্রথমবারের পরও তার আশা ছিল আর কখনো স্টেপানিডাকে দেখবে না; কিন্তু এমন হ'লো যে কয়েক্‌দিনের মধ্যেই আবার সেই এক অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসলো (কারণ যে একটাই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই)। কিন্তু এবার তার অস্থিরতা আর নৈর্ব্যক্তিক নয়, বার-বার তার মনে পড়তে লাগলো সেই উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, সেই গভীর কণ্ঠের, 'অনেক, অনেকক্ষণ,' তাজা এবং সবল শরীরের সুবাস, জামার ফাঁকে সেই দুটি নিটোল স্তন—হেজেল আর মেপ্‌ল ঝোপের ধারে উজ্জ্বল সূর্যালোকে সেই স্নান।

লজ্জা করলো, কিন্তু তবু আবার তাকে ড্যানিয়েলের দ্বারস্থ হ'তে হ'লো। আবার ভরা দুপুরে বনের মধ্যে গোপন মিলন হ'লো তাদের। এবার ইউজিন মেয়েটিকে খুব ভালো ক'রে দেখলো। তার শরীরে যা-যা আকর্ষণীয় ব'লে মনে হ'লো যত্নসহকারে লক্ষ করলো। তার সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করলো সে, তার স্বামীর কথা জিগেস করলো। সত্যিই ওর স্বামী মাইকেলের ছেলে, মস্কোতে গাড়োয়ানের কাজ করে।

'তা'হলে তুমি কী ক'রে—' ইউজিন জিগেস করতে চাইলো কী ক'রে সে এ-রকম অবিশ্বাসের কাজ করছে।

'কী করে আবার কী?' মেয়েটি জিগেস করলে। বেশ চালাক-চতুর মেয়েটি, কোনো কথা বুঝতে বেশি সময় লাগে না।

'মানে, তাহ'লে কী ক'রে তুমি আমার কাছে আসো?'

'এই দ্যাখো', ফুর্তির সুরে মেয়েটি বললে, 'ও-ও যে ওখানে বেশ আমোদে আছে, এ-কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আমিই বা কেন ঠকতে যাই?'

এই প্রগল্‌ভতা এবং অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় যে ইচ্ছাকৃত এ-কথা বুঝতে অসুবিধে হ'লো না, কিন্তু সেইজন্যই ইউজিনের তাকে আরো বেশি ভালো লাগলো। কিন্তু তবু ইউজিন নিজে থেকে এর পরের দেখা করার দিন ধার্য ক'রে দিলো না। মেয়েটি নিজেই যখন বললে যে তারা ড্যানিয়েলের সহায়তা বিনাই মিলিত হ'তে পারে (ড্যানিয়েলকে মেয়েটি বিশেষ পছন্দ করতো না) তখনো সে রাজি হ'লো না। তার আশা ছিল এখানেই শেষ হবে। মেয়েটিকে তার ভালো লেগেছিলো। সে মনে করতো এই মিলন তার পক্ষে প্রয়োজনীয়, এবং এতে খারাপ মনে করার কিছু নেই, কিন্তু তার আত্মার গভীরে আরো

কড়া বিচারকের আসন পাতা ছিল। সে এটা পছন্দ করতো না, প্রতিবার আশা করতো এবারই শেষ, কিংবা আশা যদি বা না-ও করতো, অন্তত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলো না সেই বিচারক।

অতএব সারা গ্রীষ্ম ভ'রে অন্তত বারো চোদ্দবার একত্রিত হ'লো তারা, প্রত্যেকবারই ড্যানিয়েলের সাহায্যে। একবার এমন হ'লো যে মেয়েটির স্বামী আসাতে সে আসতে পারলো না ব'লে ড্যানিয়েল অন্য একজনের নাম করলো, কিন্তু ইউজিন ঘৃণাভরে নাকচ ক'রে দিলো সেই প্রস্তাব। তারপর স্বামীটি চ'লে গেলো, পূর্ববৎ মিলিত হ'তে থাকলো তারা, প্রথমে ড্যানিয়েলের সাহায্যে, কিন্তু তার পর থেকে ইউজিন নিজেই সময় ঠিক ক'রে দিতো, আর প্রোখোরোভা নামে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সে আসতো— চাষী-বৌরা তো একা কোথাও যায় না!

একবার ঠিক তাদের দেখা করার সময়ে একটি পরিবার মেরি পাভলোভনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তাঁদের সঙ্গে সেই মেয়েটিও এসেছে যার সঙ্গে পাভলোভনা ইউজিনের বিয়ে দিতে চান, কাজেই ইউজিনের পক্ষে চ'লে আসা সম্ভব হ'লো না কিছুতেই। যে মুহূর্তে ছুটি পেলো সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চ'লে গেলো সে বনের মধ্যে তাদের মিলন-স্থলে। মেয়েটি সেখানে নেই, কিন্তু সাধারণত যেখানে তাদের দেখা হয় তার চারপাশে নাগালের মধ্যে যা কিছু ছিলো সব ছত্রখান হ'য়ে আছে—কালো অভার আর হেজেল গাছের ডাল, এমনকি খুঁটির সমান মোটা একটি কাটা মেপ্‌ল্‌ গাছ ভেঙে রেখে গেছে সে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে, উত্তেজিত হয়েছে, রেগে গেছে, তাই দুষ্টুমি ক'রে নিজের চিহ্ন রেখে গেছে ইউজিনের জন্য। ইউজিন অপেক্ষা ক'রে রইলো, তারপর ড্যানিয়েলের কাছে গিয়ে ব'লে এলো তাকে পরের দিন আসতে বলার জন্য। ঠিক আগের মতো ক'রেই সে এলো।

গ্রীষ্ম কাটলো এইভাবে। সব সময় বনের মধ্যেই দেখা হ'তো তাদের, শুধু হেমন্তকালে একবার মেয়েটির বাড়ির পেছনের উঠোনের ছাউনিতে তারা মিলিত হয়েছিলো।

এই সম্পর্কের যে কোনো মূল্য থাকতে পারে ইউজিনের জীবনে, এমন কথা ইউজিনের মাথাতেও ঢোকে নি। মেয়েটির কথা সে, এমনকি ভাবতো না পর্যন্ত। তাকে সে টাকা দিতো এবং টাকা ছাড়া আর কিছু দিতো না। প্রথমে সে জানতো না যে ব্যাপারটা গ্রাম ভ'রে সবাই জানে এবং সবাই

মেয়েটিকে হিংসে করে, আত্মীয়স্বজন মেয়েটার কাছ থেকে টাকা নেয়, এ-বিষয়ে উৎসাহ দেয়, এবং এ-ব্যাপারে মেয়েটির মনে যদি বা কিছু পাপবোধ থেকেও থাকতো তাহ'লে টাকা এবং পরিবারের উৎসাহ তা দূর ক'রে দিয়েছে। মেয়েটির ধারণা হ'য়েছিল যে লোকে যদি তাকে হিংসে করে তাহ'লে সে যা করছে ভালোই করছে।

'এটা আমার স্বাস্থ্যের জন্য দরকার,' ইউজিন ভাবলো 'মানছি, যে এটা ঠিক উচিত নয় এবং যদিও কেউ কিছু বলে না, সকলে অথবা অনেকেই সব কথা জানে। যে স্ত্রীলোকটি ওর সঙ্গে আসে সে তো জানেই। আর একবার যখন সে জেনেছে সে কি আর পাঁচ কান না ক'রে ছাড়বে? কিন্তু উপায় কী?'

'কাজটা ভালো করছি না আমি' ইউজিন ভাবলো, 'কিন্তু কী করা যায়? যাকগে, মাত্র তো কয়েকদিনের ব্যাপার।'

ইউজিনের সবচাইতে খারাপ লাগতো মেয়েটির স্বামীর কথা ভেবে। প্রথমে কী জানি কেন ইউজিনের ধারণা হয়েছিলো যে সে লোকটি মোটেও সুবিধের নয়, এবং একথা ভেবে নিজের আচরণটা তত অন্যায় ব'লে মনে করে নি। কিন্তু পরে স্বামীটির চেহারা দেখে অবাক হ'য়ে গেলো সে: কায়দা-দুরস্ত পোশাক-পরা সুশ্রী একটি ছেলে, কোনো দিক থেকেই সে ইউজিনের থেকে খারাপ নয় বরং অনেক ভালো। এর পর যেদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা হ'লো, ইউজিন তাকে বললে যে তার স্বামীকে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে, এবং সে রীতিমতো অবাক হ'য়ে গেছে। 'সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই,' মেয়েটি সগর্বে বললে।

ইউজিন এতে খুব অবাক হ'লো; স্বামীটির চিন্তা তাকে এরপর থেকে আরো বেশি যন্ত্রণা দিতে লাগলো। একদিন কী কারণে ড্যানিয়েলের ঘরে যেতে হয়েছিলো তাকে। কথা বলতে-বলতে একসময়ে সে বেশ খোলাখুলি বললে:

'আর মাইকেল সেদিন আমাকে জিগেস করছিলো: 'মালিক নাকি আমার বৌ-এর সঙ্গে থাকেন, সত্যি নাকি?' আমি বললাম, আমি কিছু জানি না। তবে, কোনো একটা চাষার সঙ্গে থাকার চাইতে মালিকের সঙ্গে থাকাটা নিশ্চয়ই অনেক ভালো।'

'তা, সে কী জবাব দিলে?'

'সে বললো: দাঁড়াও। আমি জানতে পারবোই সব কথা। আর বৌকেও দেখাবো মজাটা।'

'হ্যাঁ, ওর স্বামী যদি এখানে চ'লে আসে তাহ'লে আমি ওর কাছে যাবো না,' ইউজিন ভাবলে। কিন্তু স্বামী শহরেই রইলো এবং তাদের মিলনও তখনকার মতো অব্যাহত গতিতে চলতে থাকলো।

'দরকার হ'লেই বন্ধ ক'রে দেবো, কোনো চিহ্নও থাকবে না,' সে ভাবতো। এবং বন্ধ যে করতেই হবে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিলো না। সারাটা গ্রীষ্ম ভ'রে কত কাজ যে তাকে ব্যস্ত ক'রে রেখেছে তার ঠিক নেই: নতুন গোলাবাড়ি তৈরি হচ্ছে তাছাড়া চাষ দেখতে হয়, দেখতে হয় বাড়ির কাজ, আর সর্বোপরি ঋণশোধ এবং বাড়তি জমি বিক্রির ব্যবস্থা করতে হয়। এই সব কাজই তাকে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন ক'রে রাখতো। শয়নে-স্বপনে এই সব বিলিব্যবস্থার কথাই সে চিন্তা করতো। এই-ই ছিলো তার আসল জীবন। আর তার প্রণয়চারণ—এই সূত্রে তার স্টেপানিভার কথা মনে পর্যন্ত পড়তো না—সে কোনো প্রাধান্য দিতো না। এ-কথা অবশ্য সত্যি যে স্টেপানিভাকে দেখার বাসনা যখন তাকে পেয়ে বসতো তখন এত প্রবল হ'তো তার আর্তি যে অন্য কোনো কথা সে ভাবতে পর্যন্ত পারতো না। কিন্তু তাও টিঁকলো না বেশিদিন। একটা দিন স্থির হ'লো হয়তো, কিন্তু তারপর পুরো এক সপ্তাহ কি পুরো একমাস তাকে ভুলে থাকতো সে।

হেমন্ত এলো। ইউজিন এই সময়ে প্রায়ই শহরে যেতো, সেখানে আমনেসারাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'লো তার। সে বাড়ির মেয়েটি শহরের প্রতিষ্ঠান[1] থেকে বেরিয়েছে। একসময় মারি পাভলোভনার দুঃখের কারণ ইউজিন লিজা আন্নেনস্কায়ার প্রেমে প'ড়ে, তার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে নিজেকে শস্তা ক'রে ফেললো তার মায়ের ভাষায়। স্টেপানিভার সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লো তার।

৫

লিজা আন্নেনস্কায়াকে কেন ইউজিন পছন্দ করলো তা বলা অসম্ভব। একটি মেয়ের বদলে অন্য একটিকে কেন মানুষ বেছে নেয় সে-কথা বলা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। অনেক কারণ হয়তো ছিলো—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।

[1] প্রতিষ্ঠান হ'লো বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রীদের আচারব্যবহার এবং অন্যান্য নানারকম বিদ্যার প্রতি এখানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হ'তো।

একটা কারণ এই যে মেয়েটির বিশেষ কিছু সম্পত্তি ছিলো না; অন্তত তার মা যেমন চেয়েছিলেন তেমন তো নয়-ই, আরেকটা কারণ মেয়েটির সারল্য, তাছাড়া মেয়েটির মার ব্যবহারের জন্য করুণা হ'তো তার উপর, আরো একটা এই হয়তো যে মনোযোগ কাড়বার মতো রূপ ছিলো না তার, অথচ কুশ্রীও নয়। কিন্তু প্রধান কারণ এই যে ইউজিনের সঙ্গে তার আলাপ ঠিক সেই সময়ে যখন ইউজিন বিবাহের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত। বিয়ে করবে স্থির ক'রেই প্রেমে পড়েছিলো সে।

প্রথমে লিজাকে শুধুমাত্র ভালো লাগতে তার, তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করবে স্থির করবার পর থেকে তার মনোভাব আরো বেশি তীব্র হ'লো। মনে হ'লো মেয়েটিকে ভালোবেসেছে সে।

দীর্ঘকায় ঋজু আর লম্বা চেহারা লিজা আন্নেনস্কায়ার। সব কিছুই তার লম্বা: মুখ, নাক (উঁচু নয় বরং নিচের দিকে), তার আঙুল আর পা। হাল্কা তার রঙ—ঈষৎ পীতাভ শাদা আর হাল্কা গোলাপি; লম্বা, নরম ঢেউ-তোলা হাল্কা বাদামি চুল, সুন্দর দুটি চোখ, স্বচ্ছ, মৃদু, সমর্পিত দৃষ্টি। এই চোখ দুটিই বিশেষ ক'রে টেনেছিলো ইউজিনকে, লিজার কথা ভাবলেই সেই স্বচ্ছ, মৃদু সমর্পিত দুটি চোখের কথা তার মনে পড়তো।

এই গেলো তার চেহারার কথা; মনের কথা ইউজিন কিছু জানতো না, সে শুধু দেখেছে এই চোখ দুটি। আর সেই যেন তাকে সব কথা জানিয়ে দিতো। সেই দৃষ্টি তাকে কী যেন বলতে চাইতো।

পনেরো বছর বয়সে, যখন সে প্রতিষ্ঠানে ছিলো যে-কোনো মনোহরণকারী যুবককে দেখে তার চিত্তচাঞ্চল্য হ'তো, ক্রমাগত প্রেমে পড়তো সে এবং শুধুমাত্র যখন প্রেমে পড়তো তখনই উজ্জীবিত আর সুখী থাকতো সে। প্রতিষ্ঠান ছাড়ার পরও সে একইভাবে সমানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সঙ্গেই প্রেমে পড়েছে এবং বলাই বাহুল্য ইউজিনের সঙ্গেও আলাপ হওয়া মাত্রই প্রেমে প'ড়ে গেছে সে। এই প্রেমে পড়ার দরুনই তার চোখে ঐ বিশেষ দৃষ্টি এসেছিলো, যা মুগ্ধ করেছিলো ইউজিনকে। সেই শীতে একই সঙ্গে দু'টি যুবকের প্রেমে পড়েছিলো সে, তাদের আগমনেই নয়, তাদের উল্লেখমাত্রে সে লাল হ'য়ে উঠতো। কিন্তু পরে, তার মা যখন ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন ইউজিনের ইচ্ছের কথা, তক্ষুনি ইউজিনের প্রতি এত প্রবল হ'য়ে উঠলো তার ভালোবাসা যে পূর্ববর্তী অন্য আকর্ষণটি প্রায় তুচ্ছ হ'য়ে

গেলো। তারপর ইরটেনেভ যখন তাদের বলনাচের আসরে যোগ দিতে শুরু করলো, অন্য সকলের চাইতে বেশি ক'রে নাচলো তার সঙ্গে, এবং যখন কোনো সন্দেহ রইলো না যে লিজা তাকে ভালোবাসে কিনা জানতে সে উৎসুক, তখন লিজার প্রেম প্রায় যন্ত্রণায় পরিণত হ'লো। ঘুমিয়ে সে তার স্বপ্ন দেখে, জেগে উঠে অন্ধকার ঘরে সে তাকে দেখতে পায়, অন্য সকলে যেন মুছে গেলো তার মন থেকে। তারপর ইউজিন প্রস্তাব করলে পর তারা যখন পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'লো, চুম্বন করলো পরস্পরকে, প্রতিষ্ঠিত হ'লো বাগদত্ত যুগল হিশেবে, তখন ইউজিন ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা রইলো না তার, রইলো না ইউজিনের সান্নিধ্য ছাড়া অন্য কোনো কামনা; তার একমাত্র বাসনা হ'লো ইউজিনকে ভালোবাসা, ইউজিনের ভালবাসা পাওয়া। প্রেমিককে নিয়ে গর্বও ছিলো তার, তার বিষয়ে, নিজের বিষয়ে, নিজের প্রেম বিষয়ে আবেগে আপ্লুত হ'য়ে যেতো সে, যেন গ'লে যেতো, প্রেমে যেন সে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে গেলো।

আর ইউজিন তাকে যতই দেখলো ততই বেশি ক'রে ভালোবাসলো। এই প্রেম তার আশার অতীত। লিজার প্রেম তার নিজের অনুভূতিকেও দৃঢ় ক'রে তুললো।

৬

বসন্ত এগিয়ে এলো; ইউজিন সেমেনভোস্কতে তার জমিদারি দেখতে গেলো, নানান নির্দেশ দেওয়ার ছিল, বিয়ের জন্য জমিদার বাড়িটা মেরামত হচ্ছিলো —সেটা দেখাই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো তার।

ছেলের পছন্দটা মনোমতো হয় নি মারি পাভলোভনার, শুধু আরো ভালো বিয়ে হ'তে পারতো বলেই নয়, ইউজিনের ভবিষ্যৎ শ্বশ্রুমাতা ভারভারা আলেক্সিভনাকে একটুও ভালো লাগতো না তাঁর। ভদ্রমহিলা ভালো কি মন্দ তিনি জানেন না, জানরা বুঝতে পারেন না, কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পরেই তিনি বুঝেছিলেন যে উনি ঠিক মার্জিত নন, অভিজাত বলা যায় না ওঁকে। মনটা তাঁর খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। মন খারাপ হয়েছিলো কারণ ভব্যতায় তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, জানতেন যে এই ব্যাপারে ইউজিনও খুব সচেতন। এবং এ নিয়ে পরে যে ওকে ভুগতে হবে সেটা উনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।

তবে মেয়েটিকে তাঁর অপছন্দ হয় নি। অপছন্দ হয় নি, তার প্রধান কারণ এই যে ইউজিন তাকে পছন্দ করেছে। মেয়েটিকে ভালো না বেসে পারা যায় না, আর মারি পাভলোভনা তাকে ভালবাসতে উন্মুখ হ'য়ে ছিলেন।

ইউজিন এসে দেখলো মার মনমেজাজ বেশ ভালোই আছে। বাড়ি গুছোচ্ছেন তিনি, নতুন বৌ-এর আগমন হওয়ামাত্রই যাতে চ'লে যেতে পারেন এমন ব্যবস্থাও করছেন সেই সঙ্গে। ইউজিন তাঁকে তখনকার মতো থেকে যেতে মত করালো, পরের কথা রইলো অনিশ্চিত।

সন্ধেবেলা চায়ের পর মারি পাভলোভনা তাঁর চিরাচরিত নিয়মে পেসেন্স খেলতে শুরু করলেন। পাশে বসে ইউজিন তাঁকে সাহায্য করছিলো। এই সময়টা তারা তুলে রাখে তাদের যত প্রাণের কথা বলবার জন্য। এক হাত খেলে অন্যটা সাজাতে-সাজাতে মারি পাভলোভনা ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন, একটু ইতস্তত ক'রে বললেন :

'আমি বলছিলাম কি, জেনিয়া—অবশ্য আমি কিছুই জানিনে, কিন্তু তবু তোমাকে বলতে চাইছিলাম আর কি—যে বিয়ের আগে ঐ সব ব্যাপার একেবারে চুকিয়ে ফেলাটা নিতান্ত দরকার, যাতে ভবিষ্যতে তোমার স্ত্রীর বা তোমার অশান্তির কোনো কারণ না হয়। ঈশ্বর করুন যেন না হয়। আমার কথা তুমি বুঝেছ নিশ্চয়ই।'

মারি পাভলোভনা স্টেপানিভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ করছিলেন; কিন্তু গতবছর হেমন্তের সময়েই সে-সব চুকেবুকে গেছে; সমস্ত নিঃসঙ্গ মহিলার মতো ইউজিনের মা-ও এ-সব ব্যাপারকে অযথা প্রাধান্য দিতেন। ইউজিন একটু লাল হ'লো, লজ্জায় ততটা নয়, যতটা বিরক্তিতে: ভালোমানুষ মারি পাভলোভনা মাথা ঘামাচ্ছেন ভেবে—অবশ্য তিনি ভালো মনে ক'রেই করছেন, তবু - বিরক্তি লাগলো তার, এ-বিষয়ে তিনি জানেনই বা কি আর বোঝেনই বা কি। সে জবাব দিলে যে লুকোনোর মতো কোনো ব্যাপার তার নেই, এবং কখনোই সে এমন কোনো কাজ করেনি যা তার বিয়ের পক্ষে বাধা হ'তে পারে।

'ঠিক আছে বাবা, সে তো খুব ভালো কথা। শুধু, জেনিয়া···আমার উপর রাগ করিস নে,' মারিয়া পাভলোভনা কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

ইউজিন বুঝতে পারলো যে তাঁর বক্তব্য এখনোও শেষ হয়নি এবং তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটাই বলা হয় নি এখনো। একটু পরেই বুঝলো যে সে

ভুল বোঝে নি, কারণ তার মা বলতে শুরু করলেন যে ইউজিনের অনুপস্থিতি-কালে কবে, কখন তাঁকে ধর্ম-মা হবার জন্ম ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো পেচনিকভরা।

ইউজিন আবার লাল হ'লো। এবার বিরক্তি অথবা লজ্জায় নয়, যে-কথা তাকে জানানো হলো তার গভীর অর্থপূর্ণতার এক অদ্ভুত সচেতনতায় সে লাল হ'য়ে উঠলো—তার সিদ্ধান্তের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বতঃস্ফূর্ত সচেতনতা তাকে আচ্ছন্ন করলো। সে যা আশঙ্কা করেছিলো তাই হ'লো। মারি পাভলোভনা কথায়-কথায় উল্লেখ করলেন যে এ-বছর শুধু ছেলে জন্মাচ্ছে—স্পষ্টতই আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত। ভাসিন আর পেচনিকভ দুই বাড়িতেই নতুন বৌদের প্রথম সন্তান ছেলে। মারি পাভলোভনা কথার ছলেই বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিজেই লজ্জিত বোধ করলেন, যখন দেখলেন ছেলের মুখের রঙ অমন গাঢ় হ'চ্ছে, চোখের চশমাটা একবার সরাচ্ছে একবার পরছে, সিগারেট ধরাচ্ছে অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি। চুপ ক'রে গেলেন তিনি। ইউজিনও চুপ ক'রে রইলো, ভেবে পেলো না কী ক'রে এই স্তব্ধতা ভাঙবে। স্পষ্টতই দু'জনে দু'জনের কথা বুঝতে পারলেন তাঁরা।

'হ্যাঁ আসল কথাটা হ'লো এই যে গ্রামে যেন সুবিচার থাকে এবং কোনো-রকম পক্ষপাতিত্ব যেন না হয় · তোমার ঠাকুর্দার আমলে যা রীতি ছিলো।'

'মা,' হঠাৎ ইউজিন বললে, 'এ-কথা কেন বলছো তা জানি। কিন্তু দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন আমার কাছে এত পবিত্র যে আমি তাতে কোনো কাঁটা থাকতে দেবো না। আমার অবিবাহিত অবস্থায় আমার জীবনে যা ঘটেছিলো তার সবই শেষ হ'য়ে গেছে। কারুর সঙ্গে আমি কখনো যুক্ত হইনি, কারুর কোনো অধিকার নেই আমার উপর।'

'শুনে সুখী হলাম,' মা বললেন। 'তোমার সৎ স্বভাবের কথা তো আমার অজানা নয়।'

পরের দিন প্রেস্কসীর কথা চিন্তা করতে-করতে শহরের দিকে রওনা হ'লো সে; স্টেপানিভার ছাড়া অন্য সব রকম চিন্তাই তার মাথায় ঘুরছিলো। কিন্তু যেন ইচ্ছে ক'রে, যেন তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্ম, গির্জের দিকে এগোতে-এগোতে সে দেখলো লোকেরা কেউ ঘোড়ায় চড়ে কেউ পায়ে হেঁটে গির্জে থেকে ফিরছে। দেখলো বুড়ো মাটভেই আসছে সাইমনের সঙ্গে, কয়েকটি

ছেলেমেয়ে এলো, তারপর এলো দু'জন স্ত্রীলোক—একজন বয়স্ক আর অন্য একজনের চেহারা চেনা-চেনা লাগলো তার, দুরন্ত পোশাক পরনে, টকটকে লাল রুমাল বাঁধা। কোলে বাচ্চা নিয়ে হাল্কা পায়ে সাবলীল ভঙ্গিতে সে হাঁটছে। সে তাদের কাছাকাছি এলে বয়স্কটি পুরোনো কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ে অভিবাদন করলো, কিন্তু বাচ্চা কোলে অল্পবয়সী মেয়েটি একটু মাথা নিচু করলো, আর রুমালের তলা থেকে চকচক্ ক'রে উঠলো তার পরিচিত হাসি-খুশি দুটি চোখ।

'হ্যাঁ, সে, কিন্তু সব তো শোধ হ'য়ে গেছে, এখন ওর দিকে তাকিয়ে লাভ কী।'

'বাচ্চাটা আমারও হ'তে পারে,' এ-কথাটা চকিতে খেলে গেলো তার মনে।

'ধ্যাঃ কী বাজে! ওর স্বামী আছে, স্বামীর সঙ্গে দেখাও তো হ'তো।' তার মনে এ-কথাটা এমন গেঁথে বসেছিলো যে ও-সব তার স্বাস্থ্যের জন্য দরকার সে কথাটা নিয়ে একটু চিন্তা পর্যন্ত সে করলো না।

—মেয়েটিকে সে টাকা দিয়েছে, তাহ'লে আর বলবার কী থাকতে পারে। তাদের দু'জনের মধ্যে মিলনের কোনো প্রশ্ন ছিলো না, থাকতে পারে না। এমন নয় যে সে বিবেককে গলা টিপে মারলো, তার বিবেক তাকে কিছু বললো না এ-বিষয়ে। মার সঙ্গে সেই আলোচনা হবার পর এবং মেয়েটিকে দেখার পর তার কথা আর ভাবলো না সে। আর কখনো দেখাও হ'লো না মেয়েটির সঙ্গে।

ইস্টারের এক সপ্তাহ পরে শহরে বিয়ে হ'লো ইউজিনের এবং বিয়ের পরেই নতুন বৌকে নিয়ে জমিদারিতে রওনা হ'লো। বর-কনের জন্য বাড়ি সাজানো হয়েছে। মারি পাভলোভনা চ'লে যেতে চাইলেন কিন্তু ইউজিন, এবং ইউজিনের চেয়েও বেশি ক'রে লিজা তাকে অনুনয় করলো থেকে যাবার জন্য; শুধু বাড়ির অন্য এক মহলে চ'লে গেলেন তিনি।

এরপর থেকে এক নতুন জীবন শুরু হ'লো ইউজিনের।

৭

বিয়ের পর প্রথম বছরটা ইউজিনের খুব কষ্টে কাটলো। কষ্টে কাটলো কারণ প্রেম আর পূর্বরাগের সময়টাতে যে সব কাজ সে অবহেলা করেছে, এখন বিয়ের পরে সে-সব এক যোগে যেন তাকে আক্রমণ করলো।

ঋণশোধ থেকে পালানো অসম্ভব। জমিদারির একটা বাইরের অংশ বিক্রি ক'রে সবচাইতে জরুরি প্রয়োজনগুলো মেটানো গেলো, কিন্তু আরো অনেক বাকি রইল, এদিকে টাকা নেই। জমিদারির খাজনা বেশ ভালোই পাওয়া যায়, কিন্তু তার টাকা পাঠাতে হয় ভাইকে, বিয়ে করেছে—সেজন্য খরচ বেড়েছে, কাজেই হাতে কিছুই থাকতো না তার, অর্থাভাবে কারখানাটা বন্ধ হবার দশা। বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিলো স্ত্রীর টাকা নেওয়া; স্বামীর বিপদ বুঝে লিজ়া জোর করতে লাগলো টাকাটা কাজে লাগাবার জন্য। ইউজিন রাজি হ'লো বটে কিন্তু শর্ত করলো যে জমিদারির অর্ধেকটা স্ত্রীর কাছে বাঁধা থাকবে। তাই হ'লো। অবশ্য এটা সে করলো স্ত্রীর জন্য নয় - লিজ়া বরং এতে অত্যন্ত আহতই হ'লো কিন্তু শাশুড়িকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

সার্থকতা এবং ব্যর্থতার বিচিত্র ওঠাপড়া নিয়ে সেই প্রথম বছরটা ইউজিনের জীবন তিক্ত ক'রে তুললো। আর একটা চিন্তার কারণ হ'লো স্ত্রীর স্বাস্থ্যহীনতা। সেই প্রথম বছরেই হেমন্তকালে, তাদের বিয়ের সাত মাস পরে লিজ়ার ভাগ্যে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো। শহর প্রত্যাগত স্বামীকে স্বাগত জানাবার জন্য সে যাচ্ছিলো, এমন সময় হঠাৎ শান্তশিষ্ট ঘোড়াটি খেয়ালিপনা শুরু করতে ভয় পেয়ে সে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লো। এক হিশেবে লাফিয়ে প'ড়ে সে ভালোই করেছিলো তা নাহ'লে হয়তো চাকায় জড়িয়ে যেতো—কিন্তু তখন সে অন্তঃসত্ত্বা, সেই রাত্রেই ব্যথা উঠলো; সন্তান নষ্ট হ'য়ে গেলো এবং এই চোট সামলে উঠতে অনেক দিন লাগলো তার। যে-সন্তানের অপেক্ষায় ছিলো তাকে হারানো, স্ত্রীর অসুস্থতা, তার উপর জমিদারির অব্যবস্থা, এবং সর্বোপরি তার শাশুড়ির উপস্থিতি (লিজ়া অসুস্থ হ'য়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আগমন হয়েছিলো) সব মিলিয়ে বছরটা ইউজিনের বিশেষ কষ্টে কাটলো।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও বছরের শেষ দিকটায় খুব ভালো লাগছিল ইউজিনের। প্রথমত নিজের ভাগ্য ফেরাবার এবং নতুনভাবে তার পিতামহের আমলের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা করার আশা সে ছাড়েনি; এবং কষ্টের সঙ্গে হ'লেও তার আশা আস্তে-আস্তে পূর্ণ হ'তে চলেছিলো। ঋণ পরিশোধের জন্য সমস্তটা জমিদারি বিক্রি করার আর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। প্রধান জমিদারিটা, স্ত্রীর নামে হ'য়ে গেলেও টি'কে গেছে, এবং এবছর যদিও শুধু বীট-চাষটা ভালো হয়েছে, দামও বেড়েছে বাজারে, সামনের বছর আসতে-আসতে এই

দৈন্য দারিদ্র্য কাটিয়ে সে হয়তো সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রাচুর্যের মধ্যে গিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। এই হ'লো একটা কথা।

আর একটা সুখের কথা হ'লো এই যে স্ত্রীর কাছে আর যাই আশা ক'রে থাকুক না কেন, যা পেয়েছে ইউজিন তা কল্পনাতেও আশা করেনি। সে যা আশা করেছিলো তার চাইতে অনেক বেশি তার স্ত্রী তাকে দিলো। প্রেমের উচ্ছ্বাস—তার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও—এলো না তাদের জীবনে, কিংবা এলেও সে খুবই সামান্য, কিন্তু ইউজিন সম্পূর্ণ নতুন একটা ব্যাপার আবিষ্কার করলো, দেখলো সে অনেক বেশি হাসিখুশি থাকে, সুখী বোধ করে, দেখলো যে বেঁচে থাকা তার কাছে অনেক সহজ হ'য়ে গেছে। কেন এরকম হ'লো তা সে জানে না, শুধু জানে যে এরকম হয়েছে।

এরকম হ'তে পেরেছিলো তার কারণ বিয়ের পরই তার পরিণীতা ধ'রে নিয়েছিলো যে ইউজিন ইরটেনেভ এ-পৃথিবীর অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—সব চাইতে প্রাজ্ঞ, নিষ্পাপ এবং মহৎ, অতএব তাঁর জন্য কাজ করা এবং তাঁকে খুশি রাখা সকলের কর্তব্য। কিন্তু সকলকে ঠিক এ-কথা বোঝানো সম্ভব নয় ব'লে তাকে একাই যথাসাধ্য করতে হবে। এবং তাই কর্তো সে; স্বামীর পছন্দ, অপছন্দ বোঝবার জন্যে মনের সকল শক্তি দিয়ে সে মনোযোগী ছিলো; স্বামী যা চাইতেন তাই সে করতো, যাই হোক না কেন, যত দুঃসাধ্য হোক না কেন!

প্রণয়শীলা নারী—সঙ্গের প্রধান আনন্দ সে দিতে পারতো স্বামীকে ভালোবেসে স্বামীর মনের ভাব বুঝে নিতে অসুবিধে হ'তো না তার। ইউজিনের মনের সব কথা বুঝতে পারতো সে—ইউজিনের মনে হ'তো তার থেকেও বেশি ভালো বুঝতো—এবং সেই অনুযায়ী চলতো; সর্বদা সচেতন থাকতো যাতে স্বামী কখনো ব্যথিত না হয়, তাঁর হৃদয়ের ভার সে লঘু করতো, মন ভালো ক'রে দিতো। স্বামীর মন কিসে ভালো থাকে তাও তার অজানা ছিলো না। স্বামীর আদর্শ বুঝে নিতেও দেরি হয়নি লিজার, সেটা পূর্ণ করার চেষ্টা করতো সে, এবং বাড়িঘরের ব্যবস্থা এবং গুছোনোতে ইউজিন যা চায় তাই সে করে ছিলো। একটা অভাব ছিলো, তাদের সন্তান হয়নি। কিন্তু তারও আশা আছে। শীত পড়লে পর লিজা গেলো পিটার্সবার্গে এক বিশেষজ্ঞকে দেখাতে, তিনি আশ্বাস দিলেন যে তার কোনোরকম অসুস্থতা নেই, সন্তানধারণ অবশ্যই সে করতে পারবে।

সে বাসনাও পূর্ণ হ'লো। সে-বছর শেষের দিকে সে আবার সন্তানসম্ভবা হ'লো।

শুধু একটা জিনিশ যা তাদের সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে বিঁধেছিলো—জীবন বিষাক্ত ক'রে তুলেছিলো তা হ'লো লিজার ঈর্ষা—যদিও নিজেকে সংযত করতো সে, কখনো মনের ভাব বুঝতে দিতো না, কিন্তু প্রায়ই এই ঈর্ষা-পরায়ণতা তাকে যন্ত্রণা দিতো। ইউজিন যে কেবল অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারবে না তাই নয়—কারণ কোনো মেয়েই তার যোগ্য নয়—(সে নিজে যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন কখনো তার মনে ওঠে নি)—অন্য কোনো মেয়েও ভালোবাসতে পারবে না তাকে।

৮

তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা ছিলো এইরকম: ইউজিন তার পুরোনো অভ্যেসমতো খুব ভোরে উঠে চাষ এবং কারখানার কাজ দেখতে যেতো, ক্ষেতেও যেতো কখনো কখনো। দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বারান্দায় বসে কফি পান: তার সঙ্গে তখন বসতেন মারি পাভলোভনা, তাদের এক কাকা (যিনি তার সঙ্গেই থাকতেন) আর লিজা। কিছুক্ষণ কফি সহযোগে সোৎসাহ কথোপকথনের পর তারা যে-যার কাজে মনোনিবেশ করতো, আবার দেখা হ'তো সেই দুপুরে খাবার সময়। দুটো নাগাদ খেয়ে উঠে তারা পায়ে হেঁটে কি গাড়িতে ক'রে একটু ঘুরতে বেরুতো। সন্ধেবেলা কাজ থেকে ফিরে চা-পানের পর ইউজিন হয়তো কখনো কিছু পড়তো, লিজা সেলাই করতো, বাইরের কেউ যদি আসতো তাহ'লে একটু গান-বাজনা হ'তো, কিংবা গল্প করতো তারা। কাজের খাতিরে বাইরে যেতে হ'লে রোজ সে স্ত্রীকে চিঠি লিখতো এবং জবাব পেতো। মাঝে-মাঝে লিজাও যেতো তার সঙ্গে, তখন খুব ভালো লাগতো তাদের। ইউজিনের নামকরণ দিবসে লোক ডাকতো তারা, লিজা এমন সুন্দর ব্যবস্থা করতো যে ইউজিন খুশি হ'য়ে দেখতো সবাই তার বাড়ির উৎসবে এসে সুখী হয়েছে। ইউজিন দেখতো, এবং শুনতোও, যে সবাই তার স্ত্রী সম্বন্ধে সপ্রশংস—তরুণী, সুভাষিণী এই গৃহকর্ত্রীকে সবাই ভালোবাসে—এবং তাতে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা আরো তীব্র হ'তো তার।

সবই খুব ভালো। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তেমন কষ্ট হ'লো না লিজার, দু'জনেরই মনে-মনে একটু ভয় ছিলো যদিও, তবু আসন্ন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা অনেক জল্পনা-কল্পনা করতো। কী ভাবে তাকে লেখাপড়া শেখানো হবে সেটা ইউজিনই ঠিক করতো, লিজার একমাত্র বাসনা স্বামীর ইচ্ছা পূরণ করা। স্বামীটি তো এদিকে ডাক্তারি বইটই পড়তে শুরু ক'রে দিলো, সন্তানকে সে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষ করবে। লিজা, বলাই বাহুল্য সব ব্যাপারেই একমত হ'তো স্বামীর সঙ্গে ; ছেলের জন্য গরম ঠাণ্ডা নানারকম কাঁথা সেলাই করতে শুরু ক'রে দিলো সে, দোলনাও বানিয়ে ফেললো একটি। এইভাবে তাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকীর তারিখ এগিয়ে এলো, এগিয়ে এলো তাদের জীবনের দ্বিতীয় বসন্ত।

ত্রিত্ব রবিবারের ঠিক আগে। লিজার তখন পাঁচমাস, যথেষ্ট কাজকর্ম করে সে এখনো—অবশ্য খুব সাবধানে। দু'জনের মা-ই আছেন তাদের সঙ্গে, লিজাকে দেখাশুনো করার সূত্রে তাঁদের মতান্তরটা লিজার পক্ষে শুভ হয় না। ইউজিন বিস্তৃতভাবে বীট-চাষের নতুন এক পরীক্ষা নিয়ে মগ্ন।

ত্রিত্ব রবিবারের ঠিক আগে লিজার মনে হ'লো পুরো বাড়িটা একবার পরিষ্কার করা দরকার, কারণ ইস্টারের পর থেকে আর হাত-ই লাগানো হয়নি। দু'জন স্ত্রীলোককে সে নিয়োগ করলো, ঘরের মেঝে ও জানলা-দরজা ধোওয়া, আসবাব আর গালিচা ঝাড়া এবং আসবাবে নতুন ঢাকনা পরাতে তারা ভৃত্যদের সাহায্য করবে। ভোরবেলা এসে পাত্রগুলি গরম ক'রে নিয়ে তারা কাজে লেগে যেতো। এদের মধ্যে একজন হ'লো স্টেপানিভা, তার ছেলে সম্প্রতি বুকের দুধ ছেড়েছে, তাই আপিশের যে কেরানিটির সঙ্গে তার ভাবসাব চলছিলো তাকে ব'লে ক'য়ে সে এই ঘর ধোওয়ার কাজটা জোগাড় ক'রে নিলো। নতুন কর্ত্রীকে ভালো ক'রে দেখার ইচ্ছে ছিলো তার। স্বামী এখনো বাইরেই আছে কাজেই সে একা-একাই থাকে। প্রথমে ড্যানিয়েল বুড়োর সঙ্গে (কাঠচুরি করতে গিয়ে একবার তার হাতে সে ধরা পড়েছিলো) তারপর স্বয়ং মালিকের সঙ্গে আর বর্তমানে তরুণ কেরানিটির সঙ্গে প্রণয় হয়েছে তার। মালিককে নিয়ে আর মাথা ঘামায় না আজকাল। 'তার এখন বিয়ে-করা বৌ হয়েছে,' মনে-মনে বলে। কিন্তু সেই বৌকে এবং তার সংসারকে একবার দেখতে পারলে মন্দ কী : শোনা যায় খুব গুছোনো সংসার তার।

সেই একবার বাচ্চা কোলে দেখা হয়েছিলো—তারপর ইউজিন আর দেখেনি

স্টেপানিভাকে। বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হ'তো ব'লে সে এতদিন বাইরে কোনো কাজ নেয় নি, আর ইউজিন কচিৎ গ্রামের পথে হাঁটে। ত্রিত্ব রবিবার সকালে ভোর পাঁচটায় উঠে সে সেই অনাবাদী জমিটা দেখতো গেলো যাতে ফস্‌ফেট ছড়াতে হবে। স্টেপানিভারা এসে পৌছোনোর আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু যখন ফিরলো তখন তারা কাজ করছে।

খুব খুশি মনে, তৃপ্ত চিত্তে ক্ষুধার্ত হ'য়ে ইউজিন প্রাতরাশের জন্য বাড়ি ফিরলো ; সদর দরজায় ঘোড়া থেকে নেমে মালির হাতে ঘোড়া দিয়ে দিলো সে। লম্বা-লম্বা ঘাসে চাবুকের বাড়ি মারতে-মারতে আর—সে প্রায়ই যা করে—কিছু-একটা কথা আওড়াতে আওড়াতে সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। এখন সে বলছিলো 'ফস্‌ফেটই সব দোষ মাপ করে,'—কী বা কার দোষ তা সে জানেও না, তা নিয়ে সে চিন্তাও করে না।

ওরা তখন ঘাসের উপর কার্পেট ঝাড়ছিলো। আসবাবপত্র সব নিয়ে আসা হয়েছে ঘরের বাইরে।

'ঘ্যাখো কাণ্ড! কী ভাবে বাড়ি পরিষ্কার করছে লিজা।...ফসফেটই সব দোষ মাপ করে...সত্যি ও কাজের লোক। কাজের লোক। হ্যাঁ, কাজের লোক।' শাদা কাপড় জড়ানো হাস্যময়ী লিজার তৃপ্ত মুখখানা মনে-মনে দেখার চেষ্টা করলো সে—এ-ছাড়া অন্য কোনোরকম ভাবে লিজাকে সে কখনো দেখেনি। 'হ্যাঁ, আমার জুতোটা বদলাতে হবে, তা না হ'লে 'ফসফেট সব দোষ মাপ করে' মানে, সারের গন্ধ, আর আমার কাজের লোকটির এখন যা অবস্থা! কেন, 'এখন যা অবস্থা' কেন? কারণ ওর শরীরের অন্তরালে ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠছে ছোট্ট এক ইরটেনেভ,' সে ভাবলো। 'হ্যাঁ, ফসফেট সব দোষ মাপ করে,' নিজের ভাবনায় মগ্ন হয়ে সে ঘরের দরজায় হাত রাখলো।

কিন্তু সে দরজায় ধাক্কা দেবার আগেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেলো, খালি পা, জামার হাতা গুটোনো,—বালতি হাতে একটি মেয়ের একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গেলো সে। তার যাবার পথ ক'রে দেবার জন্য ইউজিন স'রে দাঁড়ালো, ভেজা হাতে মাথার রুমাল ঠিক ক'রে মেয়েটিও স'রে দাঁড়ালো একপাশে।

'যাও তুমি, আমি ভেতরে যাবো না যদি—' বলতে-বলতে হঠাৎ মেয়েটিকে চিনতে পেরে ইউজিন থমকে গেলো।

খুশি মুখে, চোখ-ভরা হাসি নিয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে জামাটা গায়ে টেনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো স্টেপানিভা।

'যত সব ··অসম্ভব,' বললো ইউজিন, মেয়েটিকে এইভাবে লক্ষ করার জন্য নিজের উপর বিরক্ত বোধ করলো সে। যেন মাছি তাড়াচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে হাত নাড়লো, বিরক্ত হ'লো, কিন্তু তবু চোখ সরাতে পারলো না। না, স্টেপানিভার তৎপর পদক্ষেপে সঞ্চালিত সবল দেহ, তার উন্মুক্ত পা, বাহু, কাঁধ, হাঁটুর উপরে তুলে ভাঁজ করা তার সুন্দর ঘাগরার তলায় শাদা গোড়ালিতে তার দৃষ্টি থেমে রইলো।

'আমি আমি ওকে দেখছি কিসের জন্য?' মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে ভাবলো। 'আর তাছাড়া জুতো বদলাতে ভেতরে যেতে হবে না আমার?' নিজের ঘরে যাবার জন্য সে পিছন ফিরলো, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই কী করছে, কেন করছে না ভেবেই আবার ফিরে তাকালো। স্টেপানিভাও পথের বাঁক নিতে-নিতে ঠিক সেই সময় মুখ ঘোরালো।

'উঃ, কী করছি আমি?' সে ভাবলো। 'ও হয়তো ভাবতে পারে · ও তো ভাবছেই যে···'

সে নিজের স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটিতে ঢুকে পড়লো। বুড়ো মতো, চামড়া-সর্বস্ব চেহারার একটি স্ত্রীলোক তার ঘর ধুচ্ছিলো। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর ক'রে নোংরা জলে ভেজা মেঝের উপর দিয়ে জুতোর তাকের দিকে এগিয়ে গেলো ইউজিন, কিন্তু সে ঘর ছেড়ে যাবার আগেই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেলো।

ও চ'লে গেলো; এবার অন্যজন, স্টেপানিভা, সে একা এ-ঘরে আসবে, কে যেন ব'লে উঠলো তার মনের মধ্য থেকে।

'হা ঈশ্বর, এ-সব আমি কী ভাবছি, কী করছি আমি?' জুতো হাতে নিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে সে হলঘরে চ'লে গিয়ে নিজেই জুতো বুরুশ করতে বসলো তারপর বারান্দায় গেলো; দুই মা তখন সেখানে ব'সে কফি পান করছিলেন। লিজা, বোঝাই গেলো, স্বামীর জন্যই অপেক্ষা করছিলো, তক্ষুনি অন্য দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে।

'ভগবান! যদি ও জানতো! যে আমাকে এত শ্রদ্ধার্হ, শুদ্ধচিত্ত আর নিষ্পাপ ব'লে মনে করে সে যদি জানতো!' ইউজিন মনে-মনে বললো।

লিজা রোজকার মতো হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু সেদিন কেন জানি তাকে ইউজিনের বিশেষ রকম ফ্যাকাশে, হলুদ, লম্বাটে আর দুর্বল ব'লে মনে হ'লো।

কফি খেতে-খেতে প্রায়শই যা হ'তো, নিতান্ত অর্থহীন এক ধরনের মেয়েলি কথাবার্তা চলতে লাগলো।

দুই বৃদ্ধা মহিলা পরস্পরকে খোঁচাচ্ছিলেন, আর লিজা নিপুণভাবে মধ্যস্থতা করছিলো।

'তুমি ফেরার আগে তোমার ঘরটা পরিষ্কার করা হ'য়ে ওঠেনি, এত বিরক্ত লাগছিলো,' লিজা বললো তার স্বামীকে। 'কিন্তু আমার ইচ্ছে সব ব্যবস্থা ঠিকমতো হয়।'

'আমি উঠে যাবার পর তোমার ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?'

'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছিলাম; বেশ ভালো লাগছে।'

'ওর মতো অবস্থায় একজন মেয়ের পক্ষে এই অসহ্য গরমে কী করে ভালো থাকা সম্ভব শুনি? ওর ঘরের জানলাগুলো তো একেবারে রোদের মুখে,' বললেন ভারভারা আলেক্সিভনা—লিজার মা—'আর এদিকে খড়খড়ি বা চাঁদোয়া বলতে কিছু নেই। আমি তো বাপু কখনো এভাবে থাকি নি।'

'কিন্তু দশটার পর থেকে তো বাড়িতে রোদ আসে না।' বললেন মারি পাভলোভনা।

'তাতেই তো জ্বর হয়, বেশি স্যাঁতস্যাঁতে হ'লে জ্বর হবেই,' নিজেরই আগের কথার প্রতিবাদ করা হ'লো সেটা খেয়াল না ক'রে ভারভারা আলেক্সিভনা ব'লে চললেন, 'আমার ডাক্তার তো সব সময় বলছেন রোগীকে না দেখে রোগ নির্ণয় করা অসম্ভব। এবং উনি নিশ্চয়ই ঠিক কথাই বলেন। কারণ উনি হলেন একজন নামী ডাক্তার, ভিজিটই তো একশো রুব্‌ল। আমার স্বর্গত স্বামীর কথা বলছি—উনি তো ডাক্তারে বিশ্বাসই করতেন না। কিন্তু আমাকে কখনো কোনো ব্যাপারে বাধা দেন নি।'

'একজন পুরুষ কী ক'রে একজন মেয়েকে বাধা দেবে, বিশেষত যখন মেয়েটির এবং তার সন্তানের জীবন তার উপর নির্ভর করছে⋯'

'হ্যাঁ, যদি স্ত্রীর নিজের সামর্থ্য থাকে তবে তাকে স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না। আদর্শ স্ত্রীরা সর্বদাই স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে।' বললেন ভারভারা আলেক্সিভনা—

'তবে লিজ়া তো সেই অসুখের পর থেকে অত্যন্ত বেশি দুর্বল হ'য়ে আছে কিনা।'

'না, সে কি মা, আমি তো বেশ ভালোই আছি। কিন্তু তোমাকে ক্ষীর দেয় নি কেন?'

'আমার চাইনে, একটু সর পেলেই আমার চলবে।'

'ভারভারা আলেক্সিভনাকে আমি ক্ষীর দিয়েছিলাম, উনি নিলেন না।' মারি পাভলোভনা যেন কৈফিয়ত দিলেন।

'না, আজ আমার ও-সব কিছুর দরকার নেই।' তারপর যেন অপ্রীতিকর একটা আলোচনায় জের টেনে অন্য প্রসঙ্গ আনছেন এইরকম ভাবে ইউজিনের দিকে ঘুরে বললেন, 'তারপর ফসফেট ছড়ালে?' লিজ়া ক্ষীর আনতে ছুটলো।

'কিন্তু আমি চাইনে। চাইনে আমি।'

'লিজ়া, লিজ়া সাবধানে যাও,' মারি পাভলোভনা ব'লে উঠলেন—'এইভাবে দৌড়োনো খুব খারাপ।'

'মনে যদি শান্তি থাকে তাহ'লে কিছুই খারাপ না,' ভারভারা আলেক্সিভনা যেন কিছু ইঙ্গিত করছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন কথাটা, যদিও তিনি নিজেই জানতেন তার এমন ইঙ্গিত করার কোনো কারণই নেই।

লিজ়া ক্ষীর নিয়ে এলো, বিষণ্নচিত্তে ওদের কথা শুনতে-শুনতে কফি খেয়ে উঠলো ইউজিন। এ-ধরনের কথাবার্তায় অভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো তার; কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আজ তাকে বিশেষভাবে পীড়িত করলো। নিজের ব্যাপারটা মনের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে ছিলো তার, কিন্তু ওঁদের কথাবার্তা তার ব্যাঘাত ঘটালো। কফি শেষ ক'রে খারাপ মেজাজ নিয়ে চ'লে গেলেন ভারভারা আলেক্সিভনা। মারি পাভলোভনা র'য়ে গেলেন, লিজ়া আর ইউজিনের সঙ্গে বেশ সহজ এবং খুশি মনে কথাবার্তা বললেন তিনি। কিন্তু স্পর্শকাতর লিজ়া সহজেই বুঝতে পারলো যে ইউজিনের কিছু একটা হয়েছে। সে জিগেস করলো কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছে কিনা। এই প্রশ্নের জন্যে ইউজিন ঠিক তৈরি ছিলো না, 'কিছু হয়নি,' এই জবাবটা দেবার আগে সে একটু ইতস্তত করলো। তার জবাবে লিজ়া আরোও চিন্তিত বোধ করলো। কিছু একটা যে হয়েছে ইউজিনের, কিছু-একটা কষ্ট দিচ্ছে তাকে, এটা তার কাছে দুধে মাছি পড়ার মতোই স্পষ্ট, তবু ইউজিন কিছু বলছে না? কী হতে পারে?

১১

প্রাতরাশের পর সবাই উঠে পড়লো। ইউজিন অভ্যেসমতো পড়ার ঘরে ঢুকলো, কিন্তু পড়া কিংবা চিঠি লেখার বদলে সে বসে-বসে একটার পর একটা সিগারেট খেলো, আর ভাবতে লাগলো। বিয়ের পর যে-অশুভ মনোভাব থেকে সে নিজেকে মুক্ত মনে করেছিলো তার এই অভাবিত পুনঃ প্রকোপে সে ভেতরে-ভেতরে বিস্মিত এবং অস্থির বোধ করছিলো। বিয়ের পর থেকে স্টেপানিভা কিংবা পরিচিত অন্য কোনো মেয়ের জন্য এই অনুভূতি তার মনে জাগে নি, সব ছিলো তার স্ত্রীর জন্য। এইজন্য সুখের তার শেষ ছিলো না। আর এখন হঠাৎ আপাত দৃষ্টিতে অর্থহীন এই আকস্মিক দেখা হওয়াটা তাকে বুঝিয়ে দিলো যে সে মুক্ত নয়। যে-চিন্তা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিলো তা অবশ্য এই নয় যে সে তার এই প্রবৃত্তির দাস হয়ে স্টেপানিভাকে কামনা করছে— তা সে কল্পনাও করতে পারে না। সে কষ্ট পাচ্ছিলো এই ভেবে যে এই রকম মনোভাব তার মনে জন্ম নিয়েছে; তাই সতর্ক হ'য়ে থাকতে হবে। নিজেকে যে সে দমন করতে পারবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ তার ছিলো না।

একটা চিঠির জবাব দেওয়ার দরকার ছিলো। কিছু লেখার কাজ ছিলো। সে টেবিলে ব'সে লিখতে শুরু করলো। লিখতে-লিখতে নিজের অশান্তির কথা ভুলে গেলো, কাজ শেষ করে সে আস্তাবলে যাবার জন্য বাইরে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এমনই কপাল যে আবার—ইচ্ছে ক'রেই হোক, কি দৈবাৎ-ই হোক বাড়ির বাইরে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ বেরিয়ে এলো সেই লাল ঘাগরা আর লাল রুমাল; তাকে পাশ কাটিয়ে সে চলে গেলো হাত দুলিয়ে শরীর নাচিয়ে। শুধু তাকে পাশ কাটিয়েই গেলো না, তার একটু দূরে গিয়েই যেন খেলাচ্ছলে ছুটতে শুরু করলো সহকর্মী ভৃত্যাটিকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য।

আবার সেই উজ্জ্বল দ্বিপ্রহর; সেই—ড্যানিয়েলের কুঁড়ের পেছনের সেই বন, আর গাছের ছায়ায় দাঁতে পাতা কাটতে-কাটতে স্টেপানিভার স্মিত মুখ —সব তার কল্পনায় ভেসে উঠলো।

'না' এ-ভাবে চলা অসম্ভব; সে ভাবলো; তারপর মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে চ'লে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তার আপিশে গেলো।

দুপুরের খাবার সময় তখন, কাজেই তার কর্মচারিকে তখন সেখানে পাবে আশা করেছিলো, এবং তাকে পাওয়াও গেলো। লোকটি তখন সবে মধ্যাহ্ন

তন্দ্রা সেরে উঠে আশিপাশে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে, আড়মোড়া ভাঙছে। একটি রাখাল সেখানে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছিলো।

'ভাসিলি নিকোলেইচ,' ইউজিন ডাকলো।

'আজ্ঞে বলুন?'

'তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'আজ্ঞে বলুন।'

'তোমার কথা শেষ ক'রে নাও।'

'আরে ভিতরে নিয়ে এসো না?' রাখালকে উদ্দেশ ক'রে বললো ভাসিলি নিকোলেইচ।

'বড্ডো ভারি ভাসিলি নিকোলেইচ।'

'কী ব্যাপার?' ইউজিন জিগেস করলো।

'ঐ-মাঠে একটা গোরু বাচ্চা দিয়েছে। বেশ, ঠিক আছে; আমি এক্ষুনি ঘোড়া জুততে বলছি। নিকোলাস লিস্থকে স্লেজ বের করতে বলো।'

রাখালটি বেরিয়ে গেলো।

'জানো,' ইউজিন কথা আরম্ভ করেই বুঝতে পারলো যে সে লাল হ'য়ে উঠেছে, 'জানো ভাসিলি নিকোলেইচ; আমার যখন বিয়ে হয় নি তখন আমি একটু বিপথে চ'লে গিয়েছিলাম···তুমি হয়তো শুনে থাকবে···'

ভাসিলি নিকোলেইচের করুণা হ'লো তার মালিকের জন্য। চোখ দিয়ে হেসে সে বললো 'স্টেপানিভার কথা বলছেন?'

'কেন···মানে হ্যাঁ! দেখো, দয়া ক'রে ওকে এবাড়িতে কাজ করার জন্য ডেকো না। বুঝতেই তো পারো, আমার পক্ষে সেটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়।'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়···ঐ কেরানিবাবু ব্যবস্থা ক'রে কাজ দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, দয়া ক'রে আর বাকি ফসফেটটাও ছড়িয়ে দিলে ভালো হ'তো না?' লজ্জা চাপা দেবার চেষ্টা করলো ইউজিন।

'বেশ, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি।'

অতএব ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হ'লো। ইউজিন এই আশা ক'রে শান্তি পেলো যে পুরো একবছর যখন ওকে না-দেখে থাকতে পেরেছে তখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। 'তা ছাড়া ভাসিলি নিকোলেইচ আইভান কেরানির সঙ্গে কথা বলবে; আইভান ওকে বলবে এবং ও বুঝবে যে আমি এসব আর

চাইনে,' ইউজিন নিজেকে বোঝালো এবং এই ভেবে খুশি হ'লো যে ভাসিলি নিকোলেইচের সঙ্গে কথা বলাটা তার কাছে কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও সে দ্বিরুক্তি করেনি ; 'হ্যাঁ, এই ভালো হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে—ঐ সংশয়, ঐ লজ্জার চাইতে।' নিজের পাপের চিন্তাতেই সে শিউরে ওঠে।

১২

লজ্জা কাটিয়ে ভাসিলি নিকোলেইচের সঙ্গে কথা বলার নৈতিক-প্রচেষ্টা ইউজিনকে শান্ত করলো। তার মনে হ'লো আর কোনো গোলমাল নেই। লিজ়ারও বুঝতে দেরি হ'লো না যে সে অনেক শান্তিতে আছে এমন কি আগের চাইতে অনেক সুখী। দুই মায়ের কথা কাটাকাটির জন্যই ওর মন খারাপ হয়েছিলো। 'সত্যি, বড্ড বিশ্রী লাগে ; বিশেষত ওর মতো কোমল, মহৎ মানুষের তো অসভ্যের মতো ইঙ্গিত খারাপ লাগবেই,' সে ভাবলো।

তার পরের রবিবার ছিলো ত্রিত্ব রবিবার। দিনটি বড়ো সুন্দর হয়েছিলো। চিরাচরিত প্রথা মতো চাষী বৌ-মেয়েরা বনে মালা গাঁথতে যাবার আগে জমিদারের বাড়িতে নাচগান করতে এলো। মারি পাভলোভনা আর ভারভারা আলেক্সিভনা কেতাদুরস্ত পোশাক প'রে রোদের ছাতা হাতে গায়িকাদের দলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন চীনে সিল্কের জামা পরিহিত কাকা, যিনি সেই গ্রীষ্মটা ইউজিনের কাছে কাটাচ্ছিলেন, মোটা-সোটা, স্বেচ্ছাচারী এবং মাতাল।

প্রত্যেক বারের মতো এবারেও উজ্জ্বল বহুবর্ণের এক বৃত্ত রচনা করেছে অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা, সব ব্যাপারেরই যারা মধ্যমণি ; তাদের চারদিকে কক্ষচ্যুত ঘূর্ণায়মাণ তারার মতো মেয়ের দল নাচছে হাতে-হাত দিয়ে। খস্-খস্ শব্দ তুলছে তাদের নতুন ছাপা ঘাগরা। ছোট্ট হাসিতে হাসতে-হাসতে তারা ছুটোছুটি করছে ; যুবকেরা ঘন নীল অথবা কালো রঙের টুপি প'রে সমানে সূর্যমুখী ফুলের বিচির খোসা ফেলছে মুখ থেকে, ভৃত্যরা আর বাইরের লোকেরা এক পাশে দাঁড়িয়ে নাচ দেখছে। দুই মা-ই নাচের বৃত্তের একেবারে কাছে এগিয়ে গেলেন। লিজ়াও গেলো তাঁদের সঙ্গে। হাল্কা নীল রঙের জামা পরেছে সে, মাথায় বেঁধেছে হাল্কা নীল ফিতে, জামার ঢোলা হাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার লম্বা শাদা বাহু আর কোনাচে কনুই।

বেরিয়ে আসার ইচ্ছে ছিলো না ইউজিনের, কিন্তু লুকিয়ে থাকাটা নিতান্ত হাস্যকর। সেও বেরিয়ে এলো, সিগারেট মুখে পুরুষ আর ছেলেদের অভিবাদন জানালো, কথাও বললো কারো কারো সঙ্গে। এদিকে মেয়েরা সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার ক'রে নাচের গান শুরু করলো, নাচতে লাগলো; তুড়ি মেরে আর হাতে তালি দিয়ে।

'ওরা মালিককে ডাকছে,' ইউজিনের স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে একটি ছোটো ছেলে বললে; লিজা এতক্ষণ ডাকটা লক্ষ করেনি, সে ইউজিনকে ডেকে নাচ এবং যে-সব নর্তকীকে তার বিশেষত ভালো লেগেছে তাদের মধ্যে একজনকে দেখতে বললো। মেয়েটি স্টেপানিভা। হলুদ রঙের ঘাগরা পরেছে, মখমলের হাতাকাটা জামা গায়ে, মাথায় বাঁধা রেশমী রুমাল—চওড়া, প্রাণোচ্ছল, খুশি দেখাচ্ছে তাকে। ও যে ভালো নাচে তাতে সত্যিই সন্দেহ নেই। ইউজিনের চোখের সামনে থেকে সব মুছে গেলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' চশমাটা একবার খুললো একবার পরলো ইউজিন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললো আবার। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে ওর হাত থেকে আমার আর নিষ্কৃতি নেই।' তার মনে হ'লো। ওর সেই অদম্য আকর্ষণের ভয়ে সে ভালো ক'রে তাকাতে পারলো না স্টেপানিভার দিকে। আর ঠিক সেইজন্যই যেটুকু তার দৃষ্টিতে পড়লো সেটুকু তার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ব'লে বোধ হ'লো। তা ছাড়া স্টেপানিভার চকচকে চোখের দৃষ্টি ইউজিনকে বুঝিয়ে দিলো যে সে মুগ্ধ ইউজিনকে দেখেছে। যতক্ষণ দাঁড়ালে ভদ্রতা রক্ষা হয় শুধু সেই সময়টুকু এখানে থাকলো সে। ভারভারা আলেক্সিভনা মূর্খের মতো এবং স্পষ্টতই কপট স্নেহে তাকে 'লক্ষ্মী মেয়ে' ব'লে ডেকে কথা বলছেন দেখে সে মুখ ঘুরিয়ে চ'লে গেলো।

বাড়ি ঢুকলো যাতে আর তাকে দেখতে না হয়, কিন্তু উপরতলায় পৌঁছেই সে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, জানলো না কেমন ক'রে বা কেন—আর যতক্ষণ মেয়ের দল রইল ওখানে সেও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো; দেখতে লাগলো তাকে, তার দেহের ভোজে তৃপ্তি পেলো তার চোখ।

সকলের চোখ এড়িয়ে সে ছুটলো; তারপর পা টিপে-টিপে গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায় আর সেখান থেকে যেন বাগানে পায়চারি করতে যাচ্ছে এমনভাবে সিগারেট খেতে-খেতে স্টেপানিভা যেদিকে গেছে সে-দিকে এগোতে থাকলো। বাগানের পথ দিয়ে দু'পা যেতে-না-যেতেই চোখে পড়লো গাছের পিছনে

মখমলের হাতকাটা জামা, গোলাপি হলুদে মেশা ঘাগরা, আর লাল রুমাল। অন্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে যেন কোথায় যাচ্ছিলো। 'কোথায় যাচ্ছে ওরা?' আর হঠাৎ বাসনা জেগে উঠলো তার মনে, যেন কেউ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো তার হৃদয়। যেন অন্য কারুর ইচ্ছার বশে সে মুখ ঘুরিয়ে তাঁর ঈপ্সিতার দিকে তাকালো।

'ইউজিন ইভানিচ! ইউজিন ইভানিচ! মালিক! আমার একটা কথা ছিলো আপনার সঙ্গে।' পিছন থেকে কার গলার স্বর শোনা গেলো, ইউজিন দেখলো বুড়ো সামোখিনকে কুয়ো খুঁড়তে, দেখে নিজেকে সামলে নিলো চট্‌ ক'রে; ঘুরে সেদিকে এগিয়ে গেলো। তার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ইউজিন মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো, সে আর তার সঙ্গের স্ত্রীলোকটি ঢালু জমি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে, বোধ হয় কুয়োতলায়, কিংবা হয়তো কুয়োতলায় যাওয়াটা অজুহাত মাত্র। তারপর সেখানে একটু অপেক্ষা ক'রে তারা আবার ছুটতে-ছুটতে ফিরে এলো নাচের দলে।

১৩

সামোখিনের সঙ্গে কথা ব'লে ইউজিন যখন বাড়ি ফিরলো তখন তার মনে হচ্ছে এইমাত্র খুন ক'রে এলো সে। প্রথমত স্টেপানিভা সব বুঝতে পেরেছে এবং মেয়েটি নিজেও ইচ্ছুক। দ্বিতীয়ত অন্য স্ত্রীলোকটি, আনা প্রখোরোভা, সেও যে সব জানে তাতেও সন্দেহ নেই।

আর সব চাইতে বড়ো কথা সে পরাজিত, সে আর নিজের ইচ্ছার প্রভু নয়, তার মধ্যে কাজ করছে অন্য এক শক্তি, শুধুমাত্র কপালজোরে রক্ষা পেয়েছে বটে, কিন্তু আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু তার ধ্বংস অনিবার্য। হ্যাঁ, ধ্বংস, এছাড়া আর একে কী বলা যায় তা সে জানে না। গ্রাম্য এক কৃষক রমণীর জন্য নিজের তরুণী প্রেমিকা স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী হওয়াকে ধ্বংস ছাড়া আর কী বলে? সমূলে ধ্বংস। যারপর বেঁচে থাকা অসম্ভব। না কিছু একটা করতেই হবে। 'হা ভগবান, হা ভগবান! কী করি? এই ভাবে নিজেকে ধ্বংস করবো?' সে নিজের মনে বললো। 'কিছুই কী করা সম্ভব নয়? কিন্তু কিছু-একটা যে করতেই হবে!' 'ওর কথা ভেবো না', নিজেকে সে আদেশ করলো। 'ভেবো না',—আর সঙ্গে-সঙ্গে সে ভাবতে শুরু

করলো,—তাকে সে দেখতে পেলো নিজের চোখের সামনে, দেখতে পেলো সেই গাছের ছায়া। তার মনে পড়লো সেই যে এক সন্ন্যাসীর গল্প পড়েছিলো, যিনি রোগমুক্ত করার জন্য একটি রমণীর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে কামার্ত হ'য়ে পড়েছিলেন ব'লে নিজের আঙুল পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, হাত কেটে ফেলেছিলেন। গল্পটা ভাবতে লাগলো সে। 'হ্যাঁ, আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দিয়ে আঙুল পুড়িয়ে ফেলতে রাজি আছি।' ঘরের চারপাশে তাকিয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিলো যে কেউ কোথাও নেই; তারপর মোমবাতি জ্বালিয়ে তার আগুনে ধরলো নিজের আঙুল। এইবার ভাবো ওর কথা, নিজেকে সে বিদ্রূপ করলে। যন্ত্রণা শুরু হ'লো, ধোঁয়ার দাগ মাখা আঙুল সরিয়ে নিয়ে দেশলাইটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো; হাসি পেলো তার, কী বাজে! এ-সব ক'রে লাভ কী? কিন্তু কিছু-একটা করা দরকার; ওকে যাতে দেখতে না-হয় তার জন্য—হয় সে নিজে চলে যাবে নয় তাকে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ, ওকে পাঠিয়ে দেবে। ওর স্বামীকে টাকা দেবে—শহরে কিংবা অন্য কোনো গ্রামে। পাঁচকান হবে, লোকে কথা বলবে এ-নিয়ে। তাতে কী? এই বিপদের চেয়ে তো ভালো? হ্যাঁ, তাই করতে হবে, অথচ সেই মুহূর্তে ইউজিন নিষ্পলক হ'য়ে তাকিয়ে ছিলো স্টেপানিভারই দিকে। 'কোথায় যাচ্ছে ও?' হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগলো। আর সে, তার মনে হ'লো, সে তাকে দেখেছে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এখন অন্য একটি মেয়ের হাতে-হাত দিয়ে হাত দোলাতে-দোলাতে যাচ্ছে বাগানের দিকে। কেন বা কোথায় যাচ্ছে না-জেনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আপিশে গেলো।

ভাসিলি নিকোলেইচ ছুটির পোশাকে তেলচকচকে চুলে স্ত্রী এবং পূর্বদেশীয় রুমাল বাঁধা এক অতিথির সঙ্গে চা খেতে বসেছিলো।

'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিলো, ভাসিলি নিকোলেইচ।'

'দয়া ক'রে বলুন। আমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে।'

'না, তুমি আমার সঙ্গে একটু বাইরে এসো।'

'এক্ষুনি আসছি, শুধু টুপিটা প'রে নেবো। তানিয়া, সামোভার নিভিয়ে দাও।' ব'লে হাসিখুশি ভাসিলি নিকোলেইচ বেরিয়ে এলো। ইউজিনের মনে হ'লো ভাসিলি মদ খাচ্ছিলো।

কিন্তু কী করা? বরং ভালোই—সে তার অসুবিধেটা আরো সহানুভূতির সঙ্গে দেখবে।

'ঐ একই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি, ভাসিলি নিকোলেইচ,' বললো ইউজিন—'ঐ স্ত্রীলোকটির বিষয়ে।'

'কী হ'লো ওর? কখনো কোনো কারণেই ওকে কাজে নিতে তো আমি বারণ ক'রে দিয়েছি।'

'না, আমি এমনিই এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম, তোমার উপদেশ চাই। ওদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না, পুরো পরিবারটাকেই অন্য কোথাও পাঠানো যায় না?'

'কোথায় পাঠাবেন বলুন?' ভাসিলি নিকোলেইচ যেন একটু অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে (ইউজিনের মনে হ'লো যেন, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে) জিগেস করলো।

'আমি ভাবছিলাম কি, ওদের যদি কিছু টাকা বা দেওয়া যায়—মানে ও যাতে এখানে না থাকে।'

'কিন্তু কী ক'রে পাঠানো যায় বলুন? কোথায় যাবে লোকটা! সব শিকড়-বাকড় উপড়ে কোথায় যাবে? আর আপনিই বা সেটা কেন চাইছেন। ও আপনার কী ক্ষতি করবে বলুন?'

'আহা ভাসিলি নিকোলেইচ, তুমি কী বোঝো না আমার স্ত্রী শুনলে কী কাণ্ড হবে?'

'কিন্তু কে বলবে ওঁকে।'

'এই ভয় নিয়ে আমি কী ক'রে দিন কাটাই বলো তো? সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখদায়ক।'

'কিন্তু সত্যি বলতে আপনার দুশ্চিন্তার কী আছে? পুরোনো কথা নিয়ে যে ঘোঁট পাকাবে চোখ উপড়ে ফেলবো না তার!'

'কিন্তু তবু, ওদের সরিয়ে দেওয়াই ভালো। ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বলো না।'

'কিন্তু কথা ব'লে লাভ কী? আরে, ইউজিন ইভানিচ আপনার হ'লো কী? ও-সব পুরোনো কথা সবাই ভুলে গেছে। এ তো সবসময় হয়। আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে পারে এমন কে আছে বলুন দেখি? সবাই তো দেখছে আপনাকে।'

'কিন্তু তবু তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো।'

'বেশ, বলবো।'

কোনো লাভ নেই জেনেও ইউজিন একটু স্বস্তি বোধ করলো এতে, তাছাড়া এও মনে হ'লো যে নিজের উত্তেজনার বশেই সে বিপদটাকে বাড়িয়ে দেখেছে।

সেকি আর আগের থেকে ঠিক ক'রে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো? অসম্ভব! সে শুধু হাঁটতে গিয়েছিলো বাগানে, ঠিক সেই সময় ও হঠাৎ সেখানে এসে পড়েছিলো।

১৪

সেই রবিবারেই খাওয়া-দাওয়ার পর লিজাকে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাগান থেকে জমির দিকে যাচ্ছিলো ইউজিন তার শাকক্ষেত দেখানোর জন্য; হঠাৎ একটা নালা পার হ'তে গিয়ে পা হড়কে লিজা কাত হ'য়ে প'ড়ে গেলো। অবশ্য আস্তেই পড়লো। কিন্তু চীৎকার ক'রে উঠলো সে; আর তার স্বামী দেখলো তার মুখে শুধু ভয়-ই নয় যন্ত্রণার চিহ্নও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। সে লিজাকে তুলতে যাচ্ছিলো; কিন্তু লিজা হাত নেড়ে বারণ করলো। 'না না, একটু দাঁড়াও ইউজিন,' ম্লান হেসে, আর ইউজিনের মনে হ'লো অপরাধী দৃষ্টি তুলে, সে বললে 'পা'টা শুধু ফস্‌কে গিয়েছে।'

'এই তো, আমি তো বলি-ই,' ভারভারা আলেক্সিভনা মন্তব্য করলেন, 'ওর অবস্থায় কী কেউ ও-রকম ঝাঁপাঝাপি করতে পারে?'

'কিন্তু আমার কিছু হয় নি, মা। আমি এক্ষুনি উঠতে পারবো,' স্বামীর সাহায্যে সে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো তার মুখ; ভয়ার্ত দেখালো তাকে।

'হ্যাঁ, আমার শরীর ভালো নেই।' লিজা তার মার কাছে ফিশফিশ ক'রে কী বললো।

'হায় কপাল, কী করেছো তুমি! আগেই বলেছিলাম ওখানে তোমার যাওয়া উচিত না,' ভারভারা আলেক্সিভনা চীৎকার শুরু করলেন—'দাঁড়াও আমি চাকরবাকরদের ডাকছি। ও যেন কিছুতেই না-হাঁটে, ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

'ভয় পেয়ো না, লিজা, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি; গলা ধরো। এই রকম ক'রে।' নিচু হ'য়ে সে তার ডান হাত লিজার হাঁটুর তলায় দিয়ে তাকে তুলে ধরলো। স্ত্রীর সেই যন্ত্রণায় ভরা মধুর মুখচ্ছবি সে জীবনে কখনো ভুলতে পারে নি।

'তোমার পক্ষে আমি বড্ড ভারি গো,' একটু হেসে লিজা বললে। 'মা ছুটে

যাচ্ছেন, ওঁকে বারণ করো।' মুখ বাড়িয়ে লিজা স্বামীর মুখে চুমু খেলো। তার ইচ্ছে তাকে ইউজিন কেমন ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা তার মা দেখেন।

ভারভারা আলেক্সিভনার উদ্দেশে চেঁচিয়ে ইউজিন জানালো যে তিনি যেন ব্যস্ত না হন, সে-ই লিজাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা থেমে পড়লেন এবং আরো তীব্র স্বরে চীৎকার করতে লাগলেন।

'তুমি ওকে ফেলে দেবে, তুমি নিশ্চয়ই ওকে ফেলে দেবে। তুমি ওকে ফেলে দেবে। তুমি ওকে মারতে চাও। বিবেক ব'লে কিছু নেই তোমার?'

'কিন্তু আমি তো চমৎকার নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমার মেয়েকে তুমি মারবে তা আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবো না, দেখতে পারবো না।' পথের মোড় ঘুরে উনি ছুটতে লাগলেন।

'গ্রাহ্য ক'রো না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে,' একটু হেসে লিজা বললো।

'হ্যাঁ, শুধু গতবারের মতো যেন না হয়।'

'না আমি সে-কথা বলছিনে। সে ঠিক আছে। আমি মার কথা বলছি। তুমি ক্লান্ত বোধ করছো, একটু বরং বিশ্রাম নাও।'

কিন্তু ভারি লাগলেও ইউজিন তার বোঝা সগর্বে এবং সানন্দে বহন ক'রে নিয়ে গেলো বাড়িতে, ভারভারা আলোক্সিভনা প্রেরিত পরিচারক-পরিচারিকার হাতে তুলে দিলো না। শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ইউজিন তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

'এবার তুমি যাও,' ব'লে লিজা তার হাত টেনে নিয়ে চুমু খেলো। আন্নুশ্কা আর আমি এবার সব ঠিক ক'রে নেবো।'

মারি পাভলোভনাও ছুটে এলেন তাঁর ঘর থেকে। লিজাকে জামা ছাড়িয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'লো বিছানায়। ইউজিন একটি বই হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে ব'সে অপেক্ষা করতে থাকলো। ভারভারা আলেক্সিভনা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় এমন অভিযোগপূর্ণ নীরস এক দৃষ্টি দিলেন যে সে ভয় পেয়ে গেলো।

'কি কেমন আছে?' সে জিগেস করলো।

'কেমন আছে এ-কথা জিগেস ক'রে লাভ কী, বৌকে দিয়ে যখন লাফ দিইয়েছিলে তখন এই ইচ্ছেই বোধ হয় ছিলো তোমার।'

'ভারভারা আলেক্সিভনা!' সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। 'উঃ অসম্ভব। আপনি

যদি মানুষকে এইভাবে যন্ত্রণা দিয়ে তাদের জীবন বিষাক্ত ক'রে তুলতে চান তাহ'লে,' (সে বলতে যাচ্ছিলো অন্য কোথায় গিয়ে করুন) কিন্তু সামলে নিলো।

'আপনার মনে কী একটু বেদনাবোধও নেই ?'

'এখন আর তার সময় নেই।'

ব'লে বিজয়ী ভঙ্গিতে টুপি নাড়তে-নাড়তে তিনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সত্যিই খুব বিশ্রীভাবে পড়েছিলো লিজা, তার পাটা দুমড়ে গিয়েছিলো, আর একবার সন্তান নষ্ট হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সবাই বলছিলো যে চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া আর-কিছু তার করার নেই। তবু ডাক্তার ডাকাই স্থির হ'লো।

'প্রিয় নিকোলে সেমেনিচ,' ইউজিন লিখলো ডাক্তারকে, 'আপনি সর্বদাই আমাদের সব ব্যাপারে সহায়স্থল, তাই আশা করি এবারও আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আপত্তি করবেন না। আমার স্ত্রী ' ইত্যাদি । চিঠিটা লিখে সে আস্তাবলে গেলো ঘোড়া এবং গাড়ির ব্যবস্থা করতে। ডাক্তারকে আনতে হ'লে তাঁর আসা এবং যাওয়ার জন্য ঘোড়া চাই। বড়ো জমিদার না হ'লে এই সব জিনিশ চটপট ঠিক করা যায় না। ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয়। সব ব্যবস্থা ক'রে গাড়োয়ানকে পাঠিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরলো তখন ন'টা বেজে গেছে। লিজা শুয়ে আছে। সে জানালো যে তার ভালো লাগছে এখন, ব্যথা নেই। কিন্তু ভারভারা আলেক্সিভনা আলোর সামনে ব'সে আছেন, লিজা আর তাঁর মাঝখানে একটি স্বরলিপির কাগজ ঝুলছে পর্দার মতো; এক বিশাল লাল ঢাকনা বুনছেন ব'সে-ব'সে। তাঁর মুখে এমন একটা ভাব যে যা ঘটে গেছে তার পরে সন্ধি অসম্ভব হ'লেও তিনি তাঁর কর্তব্য ক'রে যাবেন—আর কেউ করুক আর না-করুক। ইউজিন বুঝেও না-বোঝার ভাণ করলো, শান্ত এবং ফুর্তির ভঙ্গিতে বর্ণনা করলো কেমন ক'রে সে ঘোড়া বেছেছে এবং তার কাবুশকা ঘোড়াটি কেমন ক'রে ট্রয়কা গাড়ির ঘোড়া হ'য়ে টগবগ ক'রে এগিয়ে গেছে। 'তাইতো! ঠিক দরকারের সময়টাতেই তো ঘোড়ার খেলা দেখানোর জন্য! ডাক্তারকেও বোধহয় নালায় ফেলে দেবে ?' ভারভারা আলেক্সিভনা তাঁর বোনাটা আলোর তলায় ধ'রে চশমার তলা দিয়ে দেখতে-দেখতে মন্তব্য করলেন।

'কিন্তু ব্যবস্থা তো করতেই হ'তো এবং আমার যথাসাধ্য করেছি।'

'হ্যাঁ, আমার খুব ভালো ক'রেই মনে আছে সিংদরজা দিয়ে ঢোকবার সময় তোমার ঘোড়ারা আমাকে নিয়ে কী লাফালাফিই না করেছিলো।' এটা ওঁর খুব পুরোনো কথা, কিন্তু ইউজিন মস্ত বড়ো মূর্খতা ক'রে ব'লে ফেললো 'সে-কথাটা বোধ হয় ঠিক সত্য নয়।'

'আমি কি শুধু-শুধু রাতদিন বলছি আর কুমার বাহাদুরকেও তো কতদিন বলেছি যে মিথ্যাবাদী আর কপট লোকের সঙ্গে বাস করা হ'লো সব চাইতে কষ্টকর। এ-ছাড়া সব আমি সহ্য করতে পারি।'

'তা কষ্ট যদি সত্যি কাউকে করতে হয় তো সে আমি।' ইউজিন বললে, 'কিন্তু আপনি······ ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তো স্পষ্ট।'

'কী ?'

'কিছু না, আমি আমার ঘর গুণছি।'

ইউজিন তখন বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে ; লিজা তার দিকে তাকিয়েছিলো ; একটি ভিজে হাত চাদরের বাইরে বের ক'রে দিলো সে, ইউজিনের হাতে হাত রেখে সে মৃদু চাপ দিলো। 'আমার খাতিরে তুমি মাকে সহ্য ক'রো। আমাদের ভালোবাসা তো উনি বন্ধ করতে পারেন না,' তার দৃষ্টি যেন এই আবেদন জানাচ্ছিলো।

'আমি আর এ-রকম করবো না। ও কিছু-না।' সে স্ত্রীর কানে-কানে বললো, তার ভেজা লম্বা হাতে সে চুমু খেলো, প্রেমে-ভরা চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে চুমু খেলো।

'আবার কি ঐ রকম হ'লো ?' লিজা জিগেস করলো—

'তোমার কেমন লাগছে ?'

'বলতে ভয় করে, যদি ভুল হয় আমার ? কিন্তু আমি অনুভব করছি যে ও বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে,' লিজা বললো নিজের পেটের দিকে তাকিয়ে।

'উঃ ভয় করে, ভাবতে ভয় করে।'

লিজার অনেক বারণ অগ্রাহ্য ক'রে সে সেই রাত্রে তার কাছে থাকলো। স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য সদাচকিত থাকার ফলে একবারের জন্যও বোধহয় চোখ বুজতে পারলো না। লিজা কিন্তু ভালোভাবেই রাতটা কাটালো। ডাক্তারকে খবর না-পাঠালে সে হয়তো উঠে পড়তো বিছানা ছেড়ে।

ডাক্তার যখন এলেন তখন তাদের খাবার সময় ; তিনি, বলাই বাহুল্য, বললেন

যে, যদি আবার ব্যথা হয় তাহ'লে ভয়ের কারণ আছে, তবে সত্যি বলতে কি কোনো দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কোনো বিপরীত লক্ষণও নেই ব'লে, ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে এক দিকে এবং অন্য দিকে......। অতএব শুয়ে থাকাই ভালো, এবং 'যদিও আমি ওষুধপত্র দিতে বিশেষ পছন্দ করি না, তবু এই মিক্সচারটা খেয়ে শুতে পারেন।' এ-ছাড়া ডাক্তার ভারভারা আলেক্সিভনাকে একটা বক্তৃতা দিলেন মেয়েদের শারীরতত্ত্বের উপর, এবং ভারভারা আলেক্সিভনা খুব অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়তে-নাড়তে শুনলেন বক্তৃতাটি। চিরাচরিত ভঙ্গিতে হাতের পিছন দিক দিয়ে ফি গ্রহণ ক'রে ডাক্তার চ'লে গেলেন আর রোগিনীর উপর এক সপ্তাহ শুয়ে থাকার হুকুম হ'লো।

ইউজিন তার অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগলো স্ত্রীর বিছানার পাশে, তার সঙ্গে কথা ব'লে, বই প'ড়ে, আর সবচাইতে কষ্টসাধ্য কর্ম—ভারভারা আলেক্সিভনার আক্রমণ মুখ বুজে সহ্য ক'রে, এমন কি তা ঠাট্টায় রূপান্তরিত ক'রে। কিন্তু সব সময় বাড়িতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হ'তো না। প্রথমত, তার স্ত্রীই তাকে পাঠিয়ে দিতো, বলতো সবসময় ঘরে ব'সে থাকলে সে নিজেও অসুখে পড়বে, এবং দ্বিতীয়ত, তার কৃষিব্যবস্থা যে-ভাবে এগোচ্ছিলো তাতে প্রতি পদক্ষেপে তার উপস্থিতি অনিবার্য। বাড়িতে থাকলে তার চলে না, তাকে থাকতে হয় ক্ষেতে, বনে, বাগানে, ফসল মাড়াই করার ঘরে। সর্বত্র তাকে ধাওয়া ক'রে স্টেপানিভার চিন্তা; শুধু চিন্তা নয়, স্টেপানিভার মূর্তি স্পষ্ট ভেসে ওঠে তার চোখে। ইউজিন কচিৎ তাকে ভুলে থাকে। হয়তো কিছু এসে যেতো না, ইউজিন হয়তো নিজেকে জয় করতে পারতো কিন্তু সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হ'লো এই যে এর আগে মাসের পর মাস তাকে একদিনও দেখে নি, এখন সমানে তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাচ্ছিলো তার, স্টেপানিভা বুঝতে পেরেছিলো যে ইউজিন তার সঙ্গে সেই পুরোনো সম্বন্ধ ঝালাই করতে ইচ্ছুক। তাই সদাসর্বদা তার পথের সামনে এসে দাঁড়াতো। দুজনের কেউই কোনো কথা বলতো না, তাই ইউজিন বা স্টেপানিভা কোনো গোপন মিলনের কথা ঠিক করতো না। শুধু দেখা হওয়ার সুযোগ খুঁজতো।

দেখা হওয়ার সবচাইতে বেশি সম্ভাবনা ছিলো বনে, সেখানে চাষী স্ত্রীলোকেরা গোরুর ঘাস আনতে যেতো থলি নিয়ে। ইউজিন সেটা জানতো; এবং সেইজন্য রোজ যেতো সেখানে। রোজই ভাবতো যাবো না? এবং রোজই শেষ পর্যন্ত

বনের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে এগোতো, ঝোপঝাড়ের পিছনে গলার স্বর শুনলে দাঁড়িয়ে পড়তো, কম্পিত হৃদয়ে দেখার চেষ্টা করতো স্টেপানিভা সেখানে আছে কিনা।

স্টেপানিভা সেখানে আছে কিনা তা জানার চেষ্টা সে কেন করতো তা সে নিজেও জানে না। যদি সত্যিই স্টেপানিভা হ'তো এবং একা থাকতো তাহ'লে —অন্তত তার ধারণা—তাহ'লে সে যেতো না তার কাছে। সে ছুটে পালাতো, কিন্তু স্টেপানিভাকে না-দেখে সে থাকতে পারতো না।

একদিন দেখা হ'লো। সে বনে ঢুকছে, স্টেপানিভা বেরিয়ে এলো অন্য দু'জন মেয়ের সঙ্গে ঘাস বোঝাই থলি পিঠে বেঁধে। একটু আগে হ'লে বনের মধ্যে তাদের দেখা হ'তো। এখন, অন্যদের সামনে স্টেপানিভা তার সঙ্গে চ'লে যেতে পারলো না। কিন্তু সেটা অসম্ভব জেনেও, চাষী মেয়ে-বৌদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে জেনেও ইউজিন হেজেল ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। স্টেপানিভা অবশ্য ফিরে এলো না, কিন্তু সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। আর, হা ঈশ্বর, তার কল্পনায় কী মনোমোহিনী রূপেই না ধরা দিলো স্টেপানিভা। একবার নয়, পাঁচ ছ'বার সে তাকে পেলো, প্রত্যেকবার তীব্র থেকে তীব্রতর হ'লো তার কামনা। এত আকর্ষণীয় তাকে কখনো লাগে নি, এমনভাবে নিজেকে আর কখনো তার হাতের পুতুল ব'লে মনে হয় নি ইউজিনের।

বুঝতে পারলো যে নিজের উপর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে, শুধু পাগল হ'তে বাকি। নিজের সম্পর্কে যে কড়া মনোভাবটা তার ছিলো সেটা অবশ্য একটুও শিথিল হয় নি; বরং নিজের ইচ্ছে, এমন কি নিজের কাজটা—কারণ বনে যাওয়াটা একটা কাজই তো বটে—যে নীতিবহির্গত সেটা সে খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারছিলো। সে জানতো যে যদি অন্ধকারে তার কাছে সে যেতে পারে, যদি ছুঁতে পারে তাকে, তাহ'লে নিজেকে সে মুহূর্তে হারিয়ে ফেলবে। সে জানতো যে আর কিছুই না, শুধু লজ্জা, লোকের কাছে, স্টেপানিভার কাছে, আর নিজের কাছেও, লজ্জা। আর এও জানতো যে এমন পরিবেশ সে খোঁজে যেখানে লজ্জা চাপা পড়বে—খোঁজে অন্ধকার, নিভৃত অন্তরঙ্গতা, পশুর আবেগ যেখানে লজ্জার গলা টিপে ধরবে। এবং সেইজন্যই সে নিজেকে জানে নোংরা পাপী ব'লে; সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সে নিজেকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। নিজেকে ঘৃণা করে, কারণ এখনো সে মাথা নোয়ায় নি: প্রতিদিন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায় তাকে শক্তি দিতে, তাকে ধ্বংস

থেকে রক্ষা করতে, প্রতিদিন সে স্থির করে যে আজ থেকে সে তাকে দেখার জন্য এক পা-ও বাড়াবে না, ভুলে যাবে তাকে। প্রতিদিন নিজেকে এই মোহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করার নানান উপায় বের ক'রে কাজে লাগায় সে।

কিন্তু সব বৃথা।

একটা উপায় হ'লো ক্রমাগত কাজে ডুবে থাকা; আরেকটা উপায় প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম ও উপবাস, তৃতীয় উপায় হ'লো এ-ব্যাপারটা সবাই জানলে —তার স্ত্রী শাশুড়ি গ্রামবাসীরা সবাই জানলে 'যে লজ্জা তাকে ঢেকে দেবে' সেটা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে চেষ্টা করা। সবই সে করলো; মনে হ'তো বুঝি এবার সফল হচ্ছে; কিন্তু দুপুর হ'য়ে এলেই—এই সময়ই আগে দেখা হ'তো তাদের, এই দুপুর বেলায়ই সে তাকে দেখেছিলো ঘাস নিয়ে যেতে—বেরিয়ে পড়তো সে। এইভাবে কেটে গেলো যন্ত্রণাময় পাঁচটি দিন। তাকে সে দেখতো কেবল দূর থেকে; এর মধ্যে তাদের একবার দেখা হয় নি।

১৫

লিজা আস্তে-আস্তে সেরে উঠছিলো; বেশ ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারে এখন। তাকে যা এখন পীড়া দিচ্ছে তা তার স্বামীর দুর্বোধ্য পরিবর্তন।

ভারভারা আলেক্সিভনা কিছুদিনের জন্য চ'লে গেছেন, ইউজিনের কাকা-ই বাড়িতে একমাত্র অতিথি। মারি পাভলোভনা অবশ্য আছেন। ইউজিনের যখন এই অর্ধউন্মাদ অবস্থা, তখন একবার দু'দিন ধ'রে সমানে বৃষ্টি হ'লো, কালবৈশাখী ঝড়ের পরে অনেক সময়ই যা হয়। বৃষ্টির জন্য সব কাজ বন্ধ রইলো। স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া আর ময়লার জন্য গাড়িতে সার তোলা পর্যন্ত বন্ধ। চাষিরা ঘরে ব'সে আছে। রাখালের দল গোরুর পাল তাড়িয়ে ঘরে বন্ধ করেছে। গোরু ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে চাষের জমিতে; দড়িছাড়া হ'য়ে ছোটাছুটি করছে খেতের উপর। চাষী মেয়ে-বৌরা খালি পায়ে, চাদর গায়ে কাদা ভেঙে ছুটে ছুটে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঘরছাড়া গোরুর দলকে। সর্বত্র পথে-পথে জলের ঢল নেমেছে, গাছের পাতা আর ঘাস জলসিক্ত, অন্তহীন জলধারা ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

স্ত্রীর সঙ্গে বাড়িতে ব'সে রইলো ইউজিন; সেদিন স্ত্রীকে বিশেষ ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিলো তার। বেশ কয়েকবার সে ইউজিনকে তার অসন্তোষের কারণ

জিগেস করেছে ; ইউজিন বিরক্ত হয়েই জবাব দিয়েছে যে তার কিছু হয়নি। লিজা আর কিছু জিগেস করে নি, কিন্তু উদ্বিগ্ন বোধ করেছে। প্রাতরাশের পর বসবার ঘরে এসে বসেছিলো তারা। ইউজিনের কাকা বোধহয় শততম বার উচ্চসমাজের পরিচিত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা করছিলেন। লিজা একটা জামা বুনতে-বুনতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো, অভিযোগ করছিলো আবহাওয়া এবং শরীরের ব্যথা নিয়ে। কাকা তাকে উপদেশ দিলেন গিয়ে শুয়ে পড়তে, এবং নিজে একপাত্র ভদকা চাইলেন। বাড়িতে থাকতে ভয়ানক একঘেয়ে বোধ করছিলো ইউজিন। সবই যেন ম্লান আর একঘেয়ে। একবার বই, একবার পত্রিকা পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু এক বর্ণও মাথায় ঢুকলো না।

'আমাকে একবার বেরুতে হবে ; গতকাল যে নতুন করাত কলটা এলো সেটা দেখে আসা দরকার,' ব'লে উঠে প'ড়ে সে বাইরে চ'লে গেলো।

'একটা ছাতা নিয়ে যাও।'

'না-না চামড়ার কোট আছে। আর ঐ জ্বালের ঘর অবধি তো যাবো।'

জুতো আর চামড়ার কোট প'রে ইউজিন কারখানায় গেলো ; এবং কুড়ি পা যাবার আগেই তাকে দেখলো, হাঁটুর উপরে ঘাগরা তুলে সে এগিয়ে আসছে। মাথা আর কাঁধ চাদরে ঢেকে আর সেই চাদর হাতে জড়িয়ে সে হাঁটছে।

'কোথায় চললে ?' প্রথমটায় তাকে না-চিনতে পেরে ইউজিন প্রশ্ন করলো। যখন চিনলো তখন অনেক দেরি হ'য়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে পড়লো, হাসলো, অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইলো ইউজিনের দিকে। 'আমি একটা বাছুর খুঁজছি। এই বাদলায় আপনি কোথায় চলেছেন ?' সে এমনভাবে বললো যেন রোজই তাদের দেখা হচ্ছে।

হঠাৎ ইউজিন বললো, 'ছাউনিতে এসো,' কী বলছে না-জেনে, যেন অন্য কেউ তার মুখ দিয়ে বললো কথাটা।

স্টেপানিভা তার চাদর দাঁতে কামড়ে চোখ টিপলো ; তারপর বাগান থেকে ছাউনির দিকে যে-পথটা চ'লে গেছে সেটা ধ'রে ছুট দিলো। আর ইউজিন যে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো সে-দিক দিয়েই এগোলো, ঠিক করলো লাইলাক ঝোপের পিছন দিয়ে ঘুরে যাবে।

'বাবু,' পিছনে একটা ডাক শুনলো। 'গিন্নীমা আপনাকে ডাকছেন, এক মিনিটের জন্য যদি আসেন খুব ভালো হয়।'

তার পরিচারক মিশা।

'ভগবান! এই দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে বাঁচালে,' ইউজিন তক্ষুনি ফিরে গেলো। তার স্ত্রী তাকে মনে করিয়ে দিলো যে এক অসুস্থ স্ত্রীলোকের কাছে তার কী একটা ওষুধ নিয়ে যাবার কথা ছিলো দুপুরের খাবার সময়, সে বরং এখনি সেটা সঙ্গে নিয়ে যাক।

ওষুধ আনতে-আনতে মিনিট পাঁচেক চ'লে গেলো; তারপর ওষুধ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা ছাউনিতে যেতে ইতস্তত করলো—পাছে বাড়ি থেকে দেখা যায় এই ভয়ে। কিন্তু বাড়ি ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়েই সে চট ক'রে ঘুরে সেদিকে এগোলো। কল্পনায় ইতিমধ্যেই সে তাকে দেখতে পাচ্ছে, সহাস্য আনন্দে উদ্ভাসিত সেই মুখ। কিন্তু সে ছিলো না সেখানে, সে যে এসেছিলো এমন কোনো চিহ্নও নেই। ইউজিন প্রায় মনে করেছিলো যে সে আসে নি, শোনে নি অথবা বোঝে নি ইউজিনের কথা—যেন তার শুনে ফেলার ভয়ে নাকের মধ্য দিয়ে বিড়বিড় ক'রে এমনভাবে বলেছিলো কথাটা—কিংবা হয়তো তার আসার ইচ্ছে ছিলো না। 'আর আমিই বা এমন কথা কেন ভাবলাম যে ও ছুটে আসবে আমার কাছে? ওর নিজের স্বামী আছে, আমার মতো লম্পট তো সবাই নয় যে নিজের স্ত্রী থাকতে, অমন ভালো স্ত্রী থাকতে, অন্যের পিছনে ঘুরবে।' ছাউনির তলায় ব'সে, সে এ-সব ভাবতে লাগলো, খড়ের ছাদের ফুটো চুঁইয়ে জল পড়তে লাগলো তার গায়ে। 'কিন্তু কী ভালোই না হ'তো যদি আসতো ও—এই বৃষ্টিতে একা, শুধু যদি আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম তাহ'লে কিছুতে কিছু এসে যেতো না আমার। কিন্তু পায়ের ছাপ দেখেই তো বোঝা যাবে ও এসেছিলো কিনা।' এই মনে ক'রে ইউজিন ছাউনির আশেপাশের বহুপদচিহ্নিত মাটি আর ঘাসে ঢাকা পথে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো; স্পষ্ট বোঝা গেলো এইমাত্র মাড়িয়ে যাওয়া স্টেপানিভার খালি পায়ের দাগ; একটা পা যে হড়কে গিয়েছিলো তা-ও বোঝা গেলো। 'হ্যাঁ, ও এসেছিলো এখানে। তাহ'লে তো বোঝাই যাচ্ছে। যখনই ওকে দেখবো তখনই সোজা চ'লে যাবো ওর কাছে। রাত্রে আমি যাবো ওর কাছে।' অনেকক্ষণ সে ব'সে রইলো সেই ছাউনির তলায়—অবসন্ন, নিঃশেষিত মনে হ'লো নিজেকে। ওষুধটা পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো, নিজের ঘরে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো খাবার সময়ের জন্য।

খাবার আগে লিজ়া এলো তার কাছে। স্বামীর অসন্তোষে উদ্বিগ্ন লিজ়া বলতে লাগলো যে তার মনে হচ্ছে প্রসবের জন্য তার মস্কো যাওয়াটা ইউজিনের মনঃপূত হচ্ছে না। তাই সে স্থির করেছে সে আর মস্কো যাবে না, বাড়িতেই থাকবে। ইউজিন জানতো লিজ়া তার আসন্ন প্রসব নিয়ে কী পরিমাণ চিন্তিত, জানতো সে ভয় পাচ্ছে পাছে সুস্থ সন্তান না জন্মায়, তাই স্বামীর জন্য তার এই ত্যাগস্বীকারে ইউজিন বিচলিত বোধ না-ক'রে পারে না। তার সংসারে সবই কত ভালো, কত প্রীতিপ্রদ, কত পরিচ্ছন্ন; যা-কিছু নোংরা, ঘৃণ্য আর কালিমাময় তা তার অন্তরে। সারা সন্ধে এই চিন্তা তাকে যন্ত্রণা দিলো. নিজের দুর্বলতার প্রতি এই ঘৃণা, মোহমুক্ত হবার প্রাণপণ ইচ্ছা সত্ত্বেও কাল আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হবে। 'না, এ অসম্ভব।' ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করতে-করতে সে ভাবতে লাগলো, 'মুক্তির উপায় নিশ্চয়ই আছে। ভগবান! আমি কী করি?' বিদেশী কায়দায় কে দরজায় টোকা দিলো, সে বুঝলো তার কাকা ছাড়া আর কেউ নয়। 'ভেতরে এসো,' সে বললো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাকা এসেছেন লিজ়ার দৌত্য-কার্য করতে। 'জানো, সত্যিই আমি লক্ষ করছি তোমার মধ্যে একটা বদল এসেছে,' কাকা বললেন—'আর লিজ়া, বুঝতে তো পারি বেচারি কী কষ্ট পাচ্ছে। এও বুঝি যে এমন গুছিয়ে শুরু করা কারবার ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে কী কঠিন। কিন্তু তুমি কোনটা চাও সেই হ'লো কথা। আমি তো চ'লে যাবার পরামর্শ দেবো তোমাকে। তোমার এবং লিজ়ার দু'জনের পক্ষেই সেটা ভালো হবে। আর বুঝলে, তুমি ক্রিমিয়ায় চ'লে যাও। ওখানে আবহাওয়া খুব ভালো, তা ছাড়া চমৎকার acconcheur আছে; এখন যদি যাও তাহ'লে একেবারে ঠিক সময়ে গিয়ে পড়বে।'

'কাকা,' হঠাৎ ব'লে উঠলো ইউজিন। 'কাউকে যদি না-বলো তাহ'লে আমার একটা গোপন কথা শুনবে? অতিশয় ভয়ানক, অতিশয় লজ্জাজনক।'

'আ-রে, তুমি আমাকে সন্দেহ করো?'

'কাকা, আমাকে তুমিই পারো সাহায্য করতে। শুধু সাহায্য না, আমাকে রক্ষা করো তুমি,' ইউজিন বললো, যাকে সে মোটেও শ্রদ্ধা করে না সেই কাকার কাছে নিজের গোপন কথাটা ফাঁস করার চিন্তা, নিজেকে তার কাছে

অত্যন্ত বিশ্রীভাবে, অত্যন্ত ছোটো ক'রে আঁকার কল্পনা তার কাছে পরম প্রীতিপ্রদ ব'লে বোধ হ'লো। নিজেকে ঘৃণ্য আর অপরাধী মনে করলো সে। ইচ্ছে করলো নিজেকে শাস্তি দিতে।

'বলো না বাবা, তুমি তো জানোই আমি কত ভালোবাসি তোমাকে,' কাকা বললেন। বোঝা গেলো একটা কিছু গোপনীয় আছে; লজ্জাকর কোনো একটা ব্যাপার এবং সেটা তাকে বলা হবে এবং তিনি কারো কাজে লাগবেন, এই চিন্তায় পরম সন্তোষ লাভ করেছেন তিনি।

'কাকা, আমি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, আমি অকালকুষ্মাণ্ড, লম্পট—সত্যিকারের লম্পট।'

'তুমি যা বলছো তা……' কাকা এমনভাবে শুরু করলেন যেন দারুণ আঘাত পেয়েছেন।

'কী! লম্পট নই? অথচ আমি লিজার স্বামী—লিজার! সেই পবিত্র, প্রেমময়ী লিজা—আর আমি তার স্বামী, আমি কিনা এক কৃষক রমণীর জন্য তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাই।'

'তার মানে? কী করতে চাও—মানে তুমি কি ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছো?'

'হ্যাঁ, তাই বলতে হবে, কারণ আমি তো আমাতে ছিলাম না। আমি অন্যায় করতে প্রস্তুত ছিলাম। বাধা পেলাম, তা নাহ'লে আমি করতাম··· এখন। জানি না কী করতাম আমি।'

'কিন্তু দয়া ক'রে একটু বুঝিয়ে বলো··· '

'মানে ব্যাপারটা হ'লো এই, আমার বিয়ের আগে আমি একটা বোকামি করেছিলাম, এই গ্রামেরই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ ছিলো আমার। মানে বনে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম আমি, কিংবা মাঠে।'

'দেখতে সুন্দর ছিলো?' কাকার প্রশ্নে ইউজিনের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'লো, কিন্তু বাইরের কোনো সাহায্যের তার এতই দরকার ছিলো যে সে শোনে নি এমন ভাব ক'রে ব'লে চললো, 'ভেবেছিলাম ব্যাপারটা নেহাত তুচ্ছ; সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলবো এবং সত্যিই বিয়ের পর সব সম্পর্কই ত্যাগ করেছিলাম, প্রায় এক বছর ওকে দেখি নি; ভাবিও নি ওর কথা।' নিজের অবস্থার বর্ণনা ইউজিনের কানে অদ্ভুত শোনালো। 'তারপর হঠাৎ কেন জানিনে—সত্যিই মাঝে-মাঝে আমার যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস হয়—আমি ওকে দেখলাম আর একটা পোকা এসে

বাসা বাঁধলো আমার বুকে, আমাকে সে কুরে-কুরে খায়। নিজেকে অভিশাপ দিই আমি, আমার অন্যায়টা যে কত সাংঘাতিক তা আমি ভালো করেই বুঝতে পারি, মানে যে অন্যায় কাজটা আমি যে-কোনো মুহূর্তে ক'রে ফেলতে পারি তার কথা বলছি—কিন্তু তবু আমি নিজেকে ফেরাতে পারি না, আর সে অন্যায়টা যদি এখনো না-ক'রে থাকি·তাহ'লে সেটা শুধু ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করছেন ব'লে। গতকাল লিজা যখন আমাকে ডেকে পাঠালো তখন আমি ওকে দেখতে যাচ্ছিলাম।'

'কি, ওই বৃষ্টিতে?'

'হ্যাঁ, আমি ম'রে যাচ্ছি; কাকা, তাই সবকথা তোমাকে খুলে বললাম, তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিজের জমিদারিতে ব'সে এরকম একটা ব্যাপার অত্যন্ত খারাপ। পাঁচকান হবেই। লিজা অসুস্থ; ওর কানে যাতে এ-সব না ওঠে সেটা দেখা খুবই দরকার। কিন্তু তোমার নিজের জমিদারিতে এ-সব করছো কেন?' এবারও ইউজিন কাকার কথা না-শোনার ভাণ ক'রে আসল কথায় চ'লে এলো।

'হ্যাঁ, আমার নিজের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার কাছে এই প্রার্থনা। আজ দৈব আমাকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু কাল, কি এর পরের বার কেউ আমাকে বাধা দেবে না। আর সে এখন সব জেনেছে। আমাকে একা ছেড়ে দিও না।'

'বেশ, ঠিক আছে,' কাকা বললেন—'কিন্তু তুমি কি সত্যিই এমন গভীরভাবে প্রেমে পড়েছো?'

'না, তা একেবারেই নয়। তা নয়। এক অজানা শক্তি আমার উপর ভর করে; আমাকে আচ্ছন্ন করে। তখন আমি কী করি নিজেই জানিনে। হয়তো আমি জোর পাবো…তখন…'

'ঐ তো আমি ঠিক তাই বলছিলাম,' কাকা বললেন। 'চলো আমরা চ'লে যাই।'

'হ্যাঁ, তাই চলো। কিন্তু তার আগে তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে, আমার সঙ্গে কথা বলবে।'

কাকার কাছে সব কথা ব'লে, এবং তার চাইতেও বেশি সেই বৃষ্টির দিনের ঘটনার লজ্জা এবং বিবেকদংশন ইউজিনকে একটু শান্ত ক'রে রাখলো। স্থির হ'লো তারা এক সপ্তাহের মধ্যে ইয়াল্টায় রওনা হবে। এই সপ্তাহে ইউজিন শহরে গেলো, আসন্ন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহের জন্য; বাড়িতে এবং আপিশে জমিদারির ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দিলো; স্ত্রীর সঙ্গে সানন্দ এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহার করলো। নৈতিকভাবে যেন জেগে উঠতে লাগলো সে।

সেই বর্ষার দিনের পর স্টেপানিভাকে আর একবারও না-দেখে সে সস্ত্রীক ক্রিমিয়ায় রওনা হ'য়ে গেলো। চমৎকার দুটি মাস কাটালো সেখানে। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা তার মনে ছাপ ফেললো, অতীতটা যেন মুছে গেলো তার স্মৃতি থেকে। ক্রিমিয়ায় অনেক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ভাব হ'লো নতুন ক'রে, অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ক্রিমিয়ায় দিনগুলি যেন ছুটির বার্তা নিয়ে এলো ইউজিনের জীবনে, অনেক শেখালো তাকে, অনেক উপকার হ'লো। সেখানকার অভিজাত বংশীয় এক প্রাক্তন সেনাপতির সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'লো। বুদ্ধিমান এবং উদারপন্থী এই ব্যক্তিটি ইউজিনকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখে অনেক শিক্ষা দিলেন এবং নিজের দলভুক্ত ক'রে নিলেন। অগস্টের শেষের দিকে লিজার একটি সুস্থ সবল ফুটফুটে মেয়ে জন্মালো। আশাতীতভাবে সহজ হ'লো তার প্রসব।

সেপ্টেম্বরে ফিরে এলো তারা; বাচ্চা এবং ধাত্রীকে নিয়ে তারা এখন চারজন, লিজার পক্ষে বাচ্চাকে বুকের দুধ দেওয়া সম্ভব হয় নি। ইউজিন তার প্রাক্তন ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুখী এবং নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এলো সে। স্ত্রীর প্রসবের সময়ে সব স্বামীর মতো তাকেও যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিলো তারপর লিজাকে সে যেন আরো বেশি ভালোবাসলো। বাচ্চাকে যখন কোলে নিতো তখন এক মজার, এক নতুন সুখের, আবার সেই-সঙ্গে কেমন যেন অস্বস্তিকর অনুভূতি হ'তো তার। ডুমোচিনের (সেই প্রাক্তন সেনাপতি) সঙ্গে পরিচয়ের ফলে জমিদারির কাজ ছাড়া তার অন্য একটা ঝোঁক হয়েছে, সেটা হ'লো জেমস্টোভো; কিছুটা স্বার্থের খাতিরে —অর্থাৎ উন্নতির আশায়, আর কিছুটা কর্তব্যবোধে। অক্টোবরে এক বিশেষ

বিধান সভায় সে নির্বাচিত হবে কথা হয়েছে। জমিদারিতে ফেরার পর একবার শহর আর একবার ডুমোচিনের কাছে ছোটাছুটি করতে হ'তো তাকে।

তার সেই প্রাক্তন প্রলোভন আর যন্ত্রণার কথা সে এমনকি ভাবতেও ভুলে গেছে, কষ্ট ক'রে মনে করতে হয়। এখন মনে হয় একটা পাগলামি তখন তাকে পেয়ে বসেছিলো। নিজেকে সে এতটাই মুক্ত মনে করে যে তার কর্মচারিটির সঙ্গে প্রথম নিভৃত অবকাশেই খোঁজ খবর নিতে তার ভয় করলো না। আগে এ-বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে ব'লে জিগেস করতে লজ্জা করলো না তার।

'আর মিভর পেচনিকভ কি এখনো বাইরে নাকি?'

'হ্যাঁ, সে এখনো শহরে আছে।'

'আর ওর বৌ।'

'উঃ সে একটা অপদার্থ স্ত্রীলোক। এখন তো জেনোভির সঙ্গে খুব চালাচ্ছে। একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে বৌটা।'

'এইতো, কী চমৎকার নির্লিপ্ত আমি,' ইউজিন ভাবলো, 'কত বদলই না আমার হয়েছে!'

১৮

ইউজিনের সব ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। সম্পত্তি লাভ করেছে সে, কারখানাটা চমৎকার চলছে। বীট পালঙের চাষ খুব ভালো হয়েছে। অনেক বেশি আয় আশা করছে সে। তার স্ত্রী ভালোভাবে জন্ম দিয়েছে একটি সুস্থ সন্তানের; শাশুড়ি চ'লে গেছেন, এবং জেমস্টোভে সে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছে।

নির্বাচনের শেষে বাড়ি ফিরছিলো সে। অনেক অভিনন্দন পেয়েছে। অনেক ধন্যবাদ জানাতে হয়েছে, শ্যাম্পেন খেয়েছে প্রায় পাঁচ পাত্র। জীবন এখন সম্পূর্ণ নতুন সব পরিকল্পনা উপস্থিত করছে তার সামনে, বাড়ি ফেরার পথে সেই সব চিন্তা তার মাথায় ঘুরছিলো। প্রায় ভারতীয় গ্রীষ্ম তখন, চমৎকার পথ আর উত্তপ্ত সূর্য। বাড়ির কাছে পৌঁছে ইউজিন ভাবতে লাগলো এই নির্বাচনের ফলে জনসাধারণের কাছে সেই আসন পাবে যা তার চিরকালের

স্বপ্ন; মানে শুধুমাত্র কারখানায় চাকরি দিয়ে তাদের সাহায্য করা নয়, প্রত্যক্ষভাবে তাদের উপর নিজের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে সে। কল্পনা করলো আগামী তিন বছরের মধ্যে তার নিজের এবং অন্যান্য গ্রামের কৃষকেরা তার সম্বন্ধে কী বলবে। 'এই যেমন ওই লোকটি,' গ্রামের মধ্য দিয়ে গাড়িতে যেতে-যেতে তার চোখ পড়লো এক কৃষক ও একটি কৃষক রমণীর উপর; জলভরা বালতি হাতে তারা রাস্তা পার হচ্ছিলো। কৃষকটি হ'লো বুড়ো পেচনিকভ, আর সঙ্গিনীটি হচ্ছে স্টেপানিভা, ইউজিন তার দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলো এবং সুখের সঙ্গে অনুভব করলো যে সে একটুও বিচলিত বোধ করছে না। আগের মতোই সুন্দর আছে সে, কিন্তু সে কিছুই বোধ করলো না। বাড়ি চ'লে এলো।

'কী! অভিনন্দন জানাতে পারি তো?' কাকা বললেন।

'হ্যাঁ, আমি নির্বাচিত হয়েছি।'

'দারুণ! তাহ'লে ভোজ লাগিয়ে দেওয়া যাক।'

পরের দিন ইউজিন অনেককাল পরে ক্ষেতে গেলো। খামারের বাইরে একটা নতুন মাড়াই কল বসেছে। সেটা দেখতে-দেখতে ইউজিন কুলি-কামিনদের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে গেলো—চেষ্টা করলো তাদের লক্ষ না-করবার; কিন্তু শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার দু'বার স্টেপানিভার দুটি কালো চোখ আর লাল রুমাল তার চোখে প'ড়ে গেলো। স্টেপানিভা খড় ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। মুখ পাশে ফিরিয়ে দু'একবার সে তার দিকে তাকালো, বুঝতে পারলো কিছু একটা ঘটেছে তার ভিতরে, কিন্তু সেটা যে কী তার ব্যাখ্যা সে জানে না। জানলো পরের দিন; যখন আবার সেই মাড়াইঘরে গিয়ে একেবারে অকারণে সে দুই ঘণ্টা কাটালো, সেই পরিচিত, সুন্দর তরুণ দেহটিকে সে সারাক্ষণ চোখ দিয়ে আদর করলো। জানলো তার সর্বনাশ হয়েছে; আর তার উপায় নেই। আবার সেই যন্ত্রণা। আবার সেই লজ্জা আর ভয়, এবং নিজেকে রক্ষা করার তার কোনো উপায় নেই।

সে যা ভেবেছিলো তাই হ'লো। পরের দিন সন্ধ্যায় নিজেকে ইউজিন আবিষ্কার করলো স্টেপানিভার বাড়ির পিছনের উঠোনে, খড়ের ছাউনির তলায়; যেখানে হেমন্তকালে তারা একবার মিলিত হয়েছিলো। যেন পায়চারি করছে এমন ভাব দেখিয়ে সে সেখানে দাঁড়িয়ে প'ড়ে সিগারেট ধরালো। এক প্রতিবেশিনী দেখতে পেলো তাকে এবং ফিরে যাওয়ার পথে তার কানে

এলো—'যা, তোর জন্ত অপেক্ষা করছে—দিব্যি গেলে বলছি ঐ তো ওখানে দাঁড়িয়ে। যা, হাবা কোথাকার!' সে দেখলো একটি স্ত্রীলোক—স্টেপানিভা—খড়ের ছাউনির দিকে ছুটে গেলো; কিন্তু একটি কৃষকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো ব'লে তার পক্ষে আর সেখানে যাওয়া সম্ভব হলো না। বাড়ি ফিরে এলো।

১৯

বসবার ঘরে ঢুকে সব জিনিশই অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক বোধ হ'লো তার। সকালে সে ঘুম থেকে উঠেছিলো উদ্যম নিয়ে, স্থির করেছিলো ও-সব কথা দূরে ঠেলে রাখবে, ভুলে যাবে, ও-কথা ভাবতে দেবে না নিজেকে। কিন্তু নিজের অগোচরে সে যেন কখন কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেললো, শুধু তাই নয় চেষ্টা করলো কাজ এড়িয়ে যাবার। আগে যা তাকে সুখ দিতো, তার কাছে যা মূল্যবান বোধ হ'তো সব তুচ্ছ মনে হ'লো এখন। অনেক ভাবে সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো কাজকর্ম থেকে। সে ভাবলো, চিন্তা করার জন্য, ভবিষ্যৎ ভাবার জন্য তার অবকাশ দরকার। নিজেকে সব কিছু থেকে গুটিয়ে এনে সে একা রইলো। কিন্তু একা হবার সঙ্গে-সঙ্গে বাগানে আর বনে ঘুরতে শুরু করলো সে। সমস্ত জায়গা তার স্মৃতিতে মুদ্রিত হ'য়ে আছে, তাকে যেন আঁকড়ে ধরলো তার স্মৃতিরা। সে উপলব্ধি করলো যে সে বাগানে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের কাছেই ভাণ করছে কোনো কিছু ভাববার, কিন্তু আসলে সে কোনো কিছুই ভাবছে না; সুস্থ মস্তিষ্কে অবুঝের মতো তাকে আশা করছে। আশা করছে কোনো দৈবশক্তির বশে সে জানতে পারবে যে ইউজিন তাকে চায়, এবং এক্ষুনি চ'লে আসবে এখানে, অথবা এমন কোথাও যাবে যেখানে কেউ তাদের দেখতে পাবে না অথবা সে আসবে রাত্রে, যে-রাতে চাঁদ উঠবে না আকাশে, কেউ কিছু দেখতে পাবে না—এমনকি সেও না—সেইরাত্রে সে আসবে, আর ইউজিন স্পর্শ করবে তার শরীর···। 'এই তো, এই বাসনা বুকে নিয়ে তার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভাবছিলাম,' সে ভাবলো, 'হ্যাঁ? আর এই কি নিছক স্বাস্থ্যের খাতিরে একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করা?' 'না তা নয়। ওকে ও-ভাবে দেখা যাবে না ব'লেই মনে হচ্ছে। ভেবেছিলাম আমি ওকে গ্রহণ করেছি, এখন দেখছি ওই গ্রহণ করেছে আমাকে, এবং এখন আর ছাড়ছে না। কেন, আমি না ভেবেছিলাম

আমি মুক্ত? না আমি মুক্ত নই, বিয়ে করার সময় নিজের চোখে আমি নিজে ধুলো দিয়েছি।' সব বাজে—জোচ্চুরি। যেদিন ওকে প্রথম ছুঁয়েছিলাম সেদিন-ই এক নতুন অনুভূতি জন্ম নিয়েছিলো আমার মধ্যে, সেটা আসলে স্বামীর অনুভূতি। হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই ঘর বাঁধা উচিত ছিলো আমার।
দুটোর মধ্যে একটা জীবন আমাকে বেছে নিতে হবে; যে-জীবন আমি লিজার সঙ্গে শুরু করেছিলাম, কাজ, জমিদারির ব্যবস্থাপনা, সন্তান আর জনসাধারণের শ্রদ্ধা। যদি সেই জীবনই আমার হয় তাহ'লে স্টেপানিভার এখানে থাকা অসম্ভব। আগে আমি যা ভেবেছিলাম তাই করতে হবে: ওকে পাঠিয়ে দিতে হবে; কিংবা মেরে ফেলবো ওকে—ওর অস্তিত্বও যেন না থাকে। এবং অন্য জীবন হ'লো আমি ওকে নিয়ে যাবো ওর স্বামীর কাছ থেকে, টাকা দিয়ে লোকটার মুখ বন্ধ করবো, লজ্জা আর অপমান তুচ্ছ ক'রে ওর সঙ্গে বাস করবো। কিন্তু তাহ'লে লিজা আর মিমির (তার মেয়ে) অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। না, তা নয়, বাচ্চাটার জন্য কিছু এসে যায় না, লিজা থাকবে না সেটাই দরকার—লিজা চ'লে যাবে, লিজা জানবে, আমাকে অভিসম্পাত দেবে এবং চ'লে যাবে। সে জানবে যে এক কৃষক রমণীর জন্য ওকে আমি পরিত্যাগ করেছি; জানবে আমি ঠগ, আমি লম্পট! না, সেটা বড়ো ভয়ানক! সেটা অসম্ভব। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে অসুখ ক'রে ম'রে গেলো লিজা। ম'রে গেলো—তাহ'লে তো দারুণ হয়।
'দারুণ হয়!' লম্পট! না, কেউ যদি মরবার হয় তো সে স্টেপানিভা, ও মরলে কী ভালোই না হয়।
হ্যাঁ, এইভাবেই লোকে তাদের স্ত্রী অথবা প্রেমিকাকে হত্যা করে কিংবা বিষ খাওয়ায়। রিভলভার নাও, গিয়ে ওকে ডাকো এবং আলিঙ্গন করার বদলে ওর বুকে গুলি ছুঁড়ে চুকিয়ে দাও ব্যাপারটা।
'সত্যি ও হ'লো—শয়তান, আসল শয়তান! আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও আমাকে যাদু করেছে।
'হত্যা, হ্যাঁ, মাত্র দুই উপায় আছে, হয় আমার স্ত্রীকে নয় তাকে হত্যা করা। এ-ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে কী হবে? আমি বারবার লিজাকে বোঝাবো যে আমি এ-সব চাইনে; ওকে আমি ত্যাগ করবো, কিন্তু সে শুধু মুখেই, সন্ধে হ'লেই আমি চ'লে যাবো ওর বাড়ির পিছনের উঠোনে। ও

জানতে পেরে বেরিয়ে আসবে। আর লোকে যদি জানতে পারে, যদি লিজাকে বলে, কিংবা আমি নিজেই যদি বলি—কারণ মিথ্যে আমি বলতে পারবো না। আমি তাহ'লে সইতে পারবো না সেই জীবন! পারবো না! লোকে জানবে। সবাই জানবে—পারাশা জানবে; কামার জানবে। সে-ভাবে বাঁচা কি সম্ভব?

'অসম্ভব! মাত্র দুটো উপায় আছে লিজাকে অথবা ওকে মেরে ফেলা। হ্যাঁ, নয়তো ··আত্মহত্যা করা,' খুব আস্তে কথাটা বললো সে; আর হঠাৎ তার চামড়ার উপর দিয়ে শিহরণের একটা ঢেউ ব'য়ে গেলো। 'হ্যাঁ, আত্মহত্যা, তাহ'লে আর ওদের মারতে চাইবো না।' ভয় করলো তার, কারণ, অনুভব করলো এছাড়া আর কোনো পথ নেই। রিভলভার তার আছে। 'আত্মহত্যা করবো। একথা যে আমি কখনো ভাবি নি কী অদ্ভুত ব্যাপার হবে সেটা···'

সে তার পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে কাবার্ড খুললো রিভলবার বের করার জন্য, কিন্তু তার আগেই তার স্ত্রী ঘরে ঢুকলো।

রিভলভারের উপর ইউজিন একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলো।

'আবার সেই!' স্বামীর দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'লে উঠলো সে।

'কী সেই?'

'তোমার মুখের সেই ভয়ংকর চেহারা—আমাকে যার অর্থ তুমি কিছুতেই বুঝিয়ে বলবে না। জেনিয়া, সোনা আমার, বলো, বলো আমাকে। আমি তো দেখছি তুমি কষ্ট পাচ্ছো। যাই হোক, যাই হোক আমাকে বলো, তোমার যন্ত্রণার চাইতে আমার কাছে সব ভালো। আমি কি জানি না যে খারাপ কিছুই হয় নি?'

'তুমি জানো অথচ··'

'বলো, বলো, বলো। আমি তোমাকে ছাড়বো না।'

ইউজিন ম্লান হাসলো। বলবো?—না সে অসম্ভব। আর বলবার তো কিছু নেই।

হয়তো সে বলতো লিজাকে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ধাত্রীটি ঘরে ঢুকলো সে হাঁটতে যাবে কিনা জিগেস করতে। লিজা বাচ্চাকে সাজাতে চ'লে গেলো।

'তাহ'লে আমাকে বলবে তো? আমি এক্ষুনি আসছি।'

'হ্যাঁ, হয়তো…'

স্বামীর সেই করুণ, ম্লান হাসি সে সারা জীবনে ভুলতে পারে নি। লিজা বেরিয়ে গেলো।

চোরের মতো সন্তর্পণে অতি দ্রুত সে রিভলবারটা বের করলো, টেনে নিলো খাপ থেকে। গুলি ভরা আছে, হ্যাঁ, কিন্তু অনেকদিন আগে ভরা হয়েছিলো আর একটা কার্তুজ নেই?

'তাহ'লে? কী রকম হবে ব্যাপারটা?' কপালে নলটা ধ'রে সে একটু ইতস্তত করলো। কিন্তু তক্ষুনি মনে 'পড়লো স্টেপানিভা—মনে পড়লো তাকে না-দেখার শপথ; তার যন্ত্রণা, তার লোভ, পতন আর যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি— শিউরে উঠলো সে। 'না, এই ভালো।' সে ট্রিগার টিপলো ··

লিজা ঘরে এলো, বারান্দাটা তখন সে সবে পার হয়েছিলো—ইউজিন উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে মেঝেতে। কালো উষ্ণ রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরুচ্ছে তার ক্ষত থেকে, এখনো সামান্য নড়ছে তার শবদেহ।

তদন্ত হ'লো। আত্মহত্যার কারণ কেউই বলতে পারলো না। দুই মাস আগে ইউজিন যে স্বীকারোক্তি করেছিলো তার সঙ্গে যে এর কোনো যোগ থাকতে পারে একথা কাকা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

ভারভারা আলেক্সিভনা সকলকে এই ব'লে নিশ্চিন্ত করতে থাকলেন যে এই কাণ্ড যে হবে তা তিনি অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছিলেন। ইউজিনের প্রতিবাদ করার ধরন দেখেই তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন। লিজা কি মারি পাভলোভনা কেউই বুঝতে পারলেন না কেন এ-কাণ্ড ঘটলো, কিন্তু তবু ডাক্তারের কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলেন না, অর্থাৎ বিশ্বাস করতে পারলেন না যে ইউজিন মানসিকভাবে দুর্বল ছিলো—বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলো তার। এটা তাঁরা কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না; কারণ তাঁরা জানতেন তাঁদের পরিচিত একশো লোকের চাইতে ইউজিন সুস্থচিত্ত ছিলো।

এবং সত্যিই, ইউজিন ইরটেনেভের মস্তিষ্ক যদি বিকৃত হয় তাহ'লে এ-রকম ক্ষেত্রে সকলেই তাই, সবচাইতে বিকৃত মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই তারা যারা নিজের মধ্যে যা লক্ষ করে না, সেই পাগলামির লক্ষণ আবিষ্কার করে অন্যের মধ্যে।

অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত



নেকড়েনি

জ্যোভান্নি ভেরগা

সে ছিলো লম্বা, রোগা ; শক্ত, উদ্ধত তুই বুক ছিলো তার— কিন্তু তবু তার বয়স গেছে ; ফ্যাকাশে তার রঙ, যেন সর্বদাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, আর সেই বিবর্ণ মুখে বিশাল বিশাল চোখ, টকটকে লাল ঠোঁট যেন গিলে খেতে আসে।

গ্রামে সকলে তাকে ডাকে নেকড়েনি ব'লে, কারণ কখনো কিছু তার যথেষ্ট হ'তো না—কিছুই না। বন্য কুকুরির মতো নিঃসঙ্গ, ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো সন্দেহজনক ভঙ্গিতে সে যখন চ'লে যেতো তখন মেয়েরা ক্রুশ চিহ্ন আঁকতো ; তার টকটকে লাল ঠোঁট দিয়ে সে যেন মুহূর্তমধ্যে তাদের স্বামী-পুত্রের রক্ত শুষে নিতো, তার শয়তান-সুলভ চোখের পলকপাতে তাদের যেন সাপটে টেনে নিতো তার জামার তলায়, সন্ত আগ্রিপিনার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও বোধহয় পুরুষেরা সেই আকর্ষণ এড়াতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে, সে কখনো গির্জেয় যেতো না ; ইস্টারের সময় না, বড়োদিনের সময় না, যেতো না সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে অথবা স্বীকারোক্তি করতে। তার জন্য যীশুমাতা সন্ত মেরির প্রকৃত ভৃত্য ফাদার আঞ্জিওলিনো তাঁর আত্মা খুইয়েছেন।

লক্ষ্মী মেয়ে, বেচারি মারিচ্চিয়া, নেকড়েনির মেয়ে ব'লে গোপনে কাঁদতো; গ্রামের অন্য সব মেয়ের মতো তারও ছিলো এক আলমারি ভালো-ভালো জামাকাপড়, আর জমিজমা, কিন্তু মাদি-নেকড়ের মেয়ে ব'লে কেউ তাকে বিয়ে করবে না।

একদিন নেকড়েনি প্রেমে পড়লো এমন একটি ছেলের যে সবেমাত্র ফিরেছে যুদ্ধ থেকে, নোটারির জমিতে সে তার সঙ্গে ঘাস কাটছিলো। প্রেম শব্দটার তীব্রতম অর্থে নেকড়েনি তাকে চাইলো, পোশাকের তলায় তার সর্ব দেহে প্রবাহিত হ'লো আগুনের স্রোত। ছেলেটির চোখে চোখ রেখে সে সমতল দেশের ভরা জ্যৈষ্ঠের তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করলো। ছেলেটি কিন্তু অবিচলিত-ভাবে ঘাস কেটে চলতো, ঝুঁকে থাকতো কাস্তের উপর।

'ব্যাপার কী, পিনা?' ছেলেটি হয়তো জিগেস করে।

সেই বিশাল ক্ষেতে, যেখানে ফড়িঙের ডানার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই, যেখানে প্রখর সূর্যালোক মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারে, সেখানে নেকড়েনি অক্লান্তভাবে, একবারের জন্যও সোজা হ'য়ে না-দাঁড়িয়ে, একবারও ঠোঁট ফাঁক না-ক'রে একের পর এক, স্তূপের পর স্তূপ ঘাসের বোঝা সংগ্রহ ক'রে চলতো, শুধুমাত্র নানির কাছে থাকবার জন্য; আর নানি ঘাস কাটতো আর ঘাস কাটতো, শুধু মাঝে-মাঝে জিগেস করতো:

'কী চাও তুমি, পিনা?'

একদিন সন্ধ্যায় মাদি-নেকড়ে তাকে বললো, সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত চাষিরা যখন মাড়াই ঘরের মেঝেতে ব'সে ঝিমোচ্ছে, বিপুল অন্ধকারে ডুবে যাওয়া গ্রামের পথে কুকুর ডাকছে, তখন সে বললো সে কী চায়।

'আর আমি চাই তোমার মেয়েকে—যে এখনো কুমারী।' হাসতে-হাসতে জবাব দিলো নানি।

নেকড়েনি দু'হাতে চুল ছিঁড়লো, কপাল চাপড়ালো, বেরিয়ে গেলো একটা কথাও না ব'লে। তারপর থেকে মাড়াই ঘরে আর দেখা গেলো না তাকে। কিন্তু নানির সঙ্গে তার আবার দেখা হ'লো অক্টোবর মাসে, যখন জলপাই-তেল তৈরির কাজ চলছে, কারণ নানি কাজ করছিলো তার বাড়ির কাছে, কারখানার কাজের শব্দে সে সারা রাত ঘুমোতে পারতো না।

'জলপাই-এর বস্তাটা নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।' মেয়েকে বললো সে।

নানি তখন কোদাল দিয়ে যাঁতা-কলের ভিতরে জলপাই ঠেলে দিতে-দিতে 'হুইই' জাতীয় একটা শব্দ ক'রে খচ্চরটাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছিলো যাতে সেটা একটুও না থামে।

'তুমি আমার মেয়ে মারিচ্চিয়াকে চাও?' পিনা তাকে জিগেস করলো।

'তোমার মেয়ে মারিচ্চিয়াকে তুমি কী-কী দানসামগ্রী দেবে?' নানি জবাব দিলো।

'ওর বাপের সবকিছুই ও পাবে, তাছাড়া আমার বাড়িটাও আমি ওকে দিয়ে দেবো; রান্নাঘরের এক কোনায় একটু জায়গা হ'লেই আমার চ'লে যাবে, একটা মাদুর বিছোনোর মতো জায়গা আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'তাই যদি হয় তাহ'লে বড়োদিনের সময় এ-বিষয়ে কথা বলা যাবে।'

নানির চেহারা তখন চিটচিটে আর নোংরা, সারা শরীরে তেল আর ভাপানো জলপাই-এর টুকরো ছিটোনো, কোনো মূল্যেই তখন মারিচ্চিয়া তাকে কামনা করতে পারছিলো না। কিন্তু তার মা তাকে চুলের মুঠি ধ'রে চুল্লির কাছে নিয়ে গেলো, দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়-বিড় ক'রে বললো:

'তাকে যদি না নিস তাহ'লে তোকে খুন ক'রে ফেলবো আমি!'

নেকড়েনি প্রায় অসুস্থ হ'য়ে পড়লো, সকলে বলতে লাগলো যে, শয়তান বুড়ো হ'লে সাধু হ'য়ে যায়। আর সে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায় না, দাঁড়িয়ে থাকে না দরজার সামনে তার সেই গুণ-করা চোখের দৃষ্টি মেলে। তার সেই দৃষ্টি সে নিবদ্ধ করতো তার জামাইএর উপর, আর নানি তখন হাসতো আর পবিত্র কুমারীর মূর্তি বার ক'রে ক্রুশ আঁকতো বুকের উপর। মারিচ্চিয়া ঘরে থাকতো, বাচ্চাদের দেখাশুনো করতো, আর তার মা পুরুষদের সঙ্গে ক্ষেতে যেতো, ঠিক পুরুষের মতোই গাছগাছড়া পরিষ্কার করতো, আগাছা কাটতো, জন্তুদের খাওয়াতো, আঙুল লতা ছাঁটতো—জানুআরির উত্তরপূর্ব এবং ভূমধ্য-সাগরীয় বাতাস অথবা অগস্ট মাসের মরুভূমি থেকে ব'য়ে আসা উত্তপ্ত বাতাস যখন বইতো, যখন খচ্চরদের মাথা পড়তো ঝুলে আর মরদেরা ঘুমোতো উত্তরের দেয়ালের দিকে মুখ রেখে, তখনো এর ব্যতিক্রম হ'তো না। 'যখন কোনো ভালো মেয়ে পথে বেরোয় না সেই মধ্যাহ্ন আর সন্ধ্যার প্রার্থনার মাঝের ভয়ানক সময়ে,' পিনা ছিলো একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে গ্রামের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতো, আগুন-গরম পাথুরে পথ ভেঙে, ধান কাটা জলন্ত মাঠের মধ্য দিয়ে—দম আটকানো গরমে লুপ্তপ্রায় মাঠ যা সুদূরে গিয়ে

মিশেছে ধোঁয়াটে এটনার সঙ্গে, যেখানে দিগন্তের উপর ভারি হ'য়ে ঝুলে আছে আকাশ—সেখানে ঘুরে বেড়াতো পিনা।

'ওঠ!' ধূলিধূসরিত ঝোপের ধারে গর্তের মধ্যে ঢুকে মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়ে থাকা নানিকে সে ডাকে। 'ওঠো! মদ এনেছি, গলাটা ভিজিয়ে নাও।'

নানি তার তন্দ্রালস ঘুমের ঘোর-মাখা চোখ মেলে দেখলো সে দাঁড়িয়ে আছে সামনে, ফ্যাকাশে, তার উদ্ধত বুক আর কয়লার মতো কালো চোখ নিয়ে—নানি হাতড়াতে হাতড়াতে দুই হাত বাড়িয়ে দিলো।

'না! এই মধ্যাহ্ন আর সন্ধ্যার প্রার্থনার মাঝের ভয়ানক সময়ে কোনো ভালো মেয়ে বাইরে বেরোয় না!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নানি, গর্তের শুকনো ঘাসের উপর ছুঁড়ে দিলো নিজের মাথা, তার নখ গভীর, গভীরভাবে ব'সে গেলো খুলির চামড়ায়। 'চ'লে যাও! চ'লে যাও! আর কখনো এসো না মাড়াই-ঘরে!' মাদি-নেকড়ে চ'লেই যাচ্ছিলো, তার অপরূপ চুলের বেণী ঠিক ক'রে বাঁধতে-বাঁধতে, নিজের সামনে দৃষ্টি স্থির রেখে সে চ'লে যাচ্ছিলো—কয়লার মতো কালো তার দুই চোখ।

কিন্তু মাড়াই ঘরে সে আবার এলো, তারপর আবার, আর নানিও আর নালিশ করতো না। বরং তার আসতে দেরি হ'লে, সেই মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার প্রার্থনার মাঝের ভয়ানক সময়ে, সে শুভ্র, জনহীন প্রান্তরের মাথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো, কপাল তার ভেসে যেতো ঘামে, আর সে দু'হাতে ছিঁড়তো নিজের মাথার চুল, বারবার বলতো :

'চ'লে যাও! চ'লে যাও! আর এসো না মাড়াইকলে!'

সারা দিনরাত কাঁদতো মারিচ্চিয়া, আর তার মা,—শুষ্ক, বিবর্ণ, মাঠ থেকে ঘরে ফিরলেই অশ্রু আর ঈর্ষায় জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে সেও নেকড়েনির মতোই তাকাতো মার দিকে।

'ইতর, ইতর মা!' সে বলতো, 'ইতর মা!'

'চুপ!'

'চোর! চোর!'

'চুপ!'

'পুলিশের কাছে যাবো আমি, যাবোই!'

'যা না!'

সত্যিই তাই, গেলো সে, কোলে বাচ্চা নিয়ে, কিছু ভয় না ক'রে, এক ফোঁটা

চোখের জল না ফেলে, উন্মাদিনীর মতো সে বেরিয়ে গেলো, কারণ যাকে জোর ক'রে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার সেই তেল চিটচিটে, নোংরা, সর্বাঙ্গে তেল আর ভাপানো জলপাই-এর টুকরো ছিটোনো স্বামীকে সে এখন বড়ো বেশি ভালোবেসেছে।

পুলিশ-সার্জেণ্ট নানিকে ডেকে পাঠালেন; কয়েদ, এমনকি ফাঁসির-ও ভয় দেখালেন তিনি। নানি কাঁদতে শুরু করলো, দু'হাতে ছিঁড়লো মাথার চুল, সে কোনো কথারই প্রতিবাদ জানালো না, নিজের কথা খুলে বলবার চেষ্টা করলো না।

'প্রলোভন!' সে বললে, 'নরকের প্রলোভন।'

সার্জেণ্টের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে প'ড়ে সে মিনতি জানালো তাকে কয়েদ করবার জন্য।

'ভগবানের দোহাই, সার্জেণ্ট, এই নরক থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো। আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে কয়েদ করো; আর কখনো যেন ওকে আমার দেখতে না-হয়, কখনো যেন না-হয়! কখনো না!'

'না!' অথচ নেকড়েনি জবাব দিলো সার্জেণ্টকে। 'না, আমি রান্নাঘরের এক কোনায় প'ড়ে আছি, আর আমার পুরো বাড়িটা আমি ওকে দান করেছি ওর বিয়ের পণ হিশেবে। এটা আমার বাড়ি। এ-বাড়ি আমি ছেড়ে যাবো না।'

এর কিছুদিন পরে নানি পেটে খচ্চরের লাথি খেয়ে প্রায় মৃতকল্প হ'য়ে পড়লো, কিন্তু পুরোহিত তাকে শেষ আশীর্বাদ দিতে যেতে রাজি হলেন না, যদি-না নেকড়েনি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যায়। চ'লে গেলো নেকড়েনি, আর তার জামাইও প্রস্তুত হ'লো সৎ খ্রীষ্টানের মতো পৃথিবী ছেড়ে যাবার জন্য। সে পুরোহিতের কাছে তার স্বীকারোক্তি জানালো, এবং এমন অনুশোচনার সঙ্গে শেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করলো যে সকল কৌতূহলী প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীরা তার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেললো। সেদিনই যদি সে মারা যেতো তাহ'লেই ভালো হ'তো তার পক্ষে, তাহ'লে সে সুস্থ হবার পর আর শয়তান ফিরে এসে তাকে আবার প্রলোভিত করতে পারতো না, আচ্ছন্ন করতে পারতো না দেহ এবং আত্মা।

'আমাকে ছেড়ে দাও!' নেকড়েনিকে সে বললো, 'ভগবানের দোহাই, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও! আমি মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছি!

বেচারি মারিচ্চিয়া মরিয়া হ'য়ে গেছে। সারা শহর সব কথা জেনে ফেলেছে! তুমি যদি না বোঝো যে আমাদের দুজনের পক্ষেই ভালো…… '

নিজের চোখ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করতো তার, যাতে নেকড়েনির চোখ আর তাকে না দেখতে হয়, কারণ যখনই সেই দুই চোখ তার চোখে স্থির হ'তো তখনই সারা দেহ এবং আত্মা শিথিল হ'য়ে আসতো তার। সেই মায়া থেকে কী ক'রে নিজেকে ছাড়াবে তা সে জানতো না। যে-সব আত্মার নরকপ্রাপ্তি হয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে সে অর্থ দান করতো, সাহায্য চাইতো পুরোহিত আর সার্জেন্টের কাছে। ইস্টারের সময় সে স্বীকারোক্তি করতে গেলো, এবং গির্জের নুড়ি বিছোনো রাস্তায় হাঁটু ঘ'ষে এগিয়ে সর্বসমক্ষে চার ফুটের বেশি পথ জিভ দিয়ে চাটার শাস্তি মাথা পেতে নিলো আর তারপর মাদি-নেকড়ে আবার এলো তাকে প্রলোভিত করতে :

'শোনো!' সে বলে নেকড়েনিকে। 'আর এসো না মাড়াই ঘরে : যদি আসো, ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো।'

'মারো আমাকে,' জবাব দেয় নেকড়েনি, 'আমি গ্রাহ্য করি না; তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।'

সবুজ যবক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে দেখে নানি আঙুলক্ষেতের লতা ছাঁটা বন্ধ ক'রে এল্‌ম্‌ গাছের ডাল থেকে একটা কুঠার টেনে নিলো। নেকড়েনি তাকে দেখলো, ফ্যাকাশে মুখ, বড়ো-বড়ো চোখে সে এগিয়ে আসছে, হাতের কুঠার রোদে ঝকঝক করছে; কিন্তু নেকড়েনি এক পাও গেলো না, চোখ নামালো না; বাঘিনী এগিয়ে আসতে থাকলো তার দিকে, লাল পপিফুলে হাত ঢাকা, কালো দুই চোখ যেন গ্রাস করবে নানিকে।

'আঃ! নরকে গতি হোক তোর আত্মার!' বললো নানি।

অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত





দর্পণ

লিও লা পে

পত্র ১

ভাই আনাই, তোমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে পত্র লিখি—আমি গরিব বেচারি অন্ধ; যে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়িয়ে-হাতড়িয়ে চ'লে, তাকে কিনা তুমি লিখতে বলছো। আমার অন্ধকারে লেখা বিষাদময় পত্র পেতে তোমার কি ভয় হবে না? অষ্টপ্রহর অন্ধের মনে যে-বিষণ্ণ চিন্তার উদয় হয়, সেই সব চিন্তা কি তোমার ভালো লাগবে?

ভাই আনাই, তুমি সুখী; তুমি দেখতে পাও। দেখতে পাওয়া! হ্যাঁ দেখতে পাওয়া—নীল আকাশ, সূর্য, আর সকল রকম রং দেখতে পাওয়া—সে কী আনন্দ! সত্যি, এক সময় আমি এই আনন্দ উপভোগ করেছিলাম; আমার যখন পুরো দশ বৎসরও হয় নি, তখন আমি অন্ধ হই। পনেরো বৎসর থেকে এখন আমার চারিধারে সব জিনিশই রাত্রির মতো কালো দেখছি। প্রকৃতির আশ্চর্য শোভা-সৌন্দর্য আমার মনে আনতে কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারিনে। আমি তার সমস্ত রং ভুলে গিয়েছি। আমি গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারি, হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার গঠনটা অনুমান করতে পারি; কিন্তু তার গর্বের

জিনিশ রঙটা—যার সঙ্গে প্রায়ই মেয়েদের রঙের তুলনা দেওয়া হয়—সেই রঙ আমি ভুলে গিয়েছি—কিংবা আমি তার বর্ণনা করতে পারিনে। কখনো-কখনো এই স্থূল-দেহ-আবরণের নিচে অদ্ভুত রকমের কিরণ আনাগোনা করে। ডাক্তাররা বলেন, এটা হচ্ছে রক্তের গতি; এর থেকে আরোগ্যলাভের একটা আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে। বৃথা আশা! যে-আলোকচ্ছটায় পৃথিবী ভূষিত, তা যখন আমি পনেরো বৎসর থেকে হারিয়েছি, সে আর কখনো পাওয়া যাবে না—যদি কখনো পাওয়া যায় সে স্বর্গে।

সেদিন আমার একটা অপূর্ব অনুভূতি হচ্ছিলো। আমার ঘরে হাতড়াতে-হাতড়াতে, আমার হাত পড়লো একটা জিনিশের উপর—ওঃ! তুমি কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না!—একটা দর্পণের উপর! আমি দর্পণটার সামনে বসলাম এবং একজন ভাবুকের মতো আমার চুলটা গুছিয়ে ঠিকঠাক করলাম। ওঃ! আমি যদি আপনাকে আপনি দেখতে পেতাম! আমি সুশ্রী ব'লে যদি মানতে পারতাম—আমার চামড়াটা যেমন নরম, তেমনি শাদা কিনা—দীর্ঘ-পক্ষ্মবিশিষ্ট আমার চোখদুটি সুন্দর কি না, যদি জানতে পারতাম, তাহ'লে কত খুশিই হতাম!—ইস্কুলে এরা প্রায়ই আমাকে বলতো, ছোটো মেয়েরা অনেক-ক্ষণ ধ'রে আয়নায় মুখ দেখলে সেই আয়নায় শয়তান আসে! আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি, শয়তান আমার আয়নায় এলে খুব নাকাল হ'তো—কেননা আমি তো তাকে দেখতে পেতাম না।

তোমার পত্রখানি এইমাত্র ওরা আমাকে পড়িয়ে শোনালে, তাতে তুমি জিজ্ঞাসা করেছো, একজন কুঠিওয়ালা দেউলে হওয়াতে আমার বাপ-মা সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এ-কথা সত্যি কি না। আমি তো এ-কথা কিছুই শুনি নি। না, তাঁরা ধনী লোক। সমস্ত বিলাসের জিনিশ তাঁরা আমাকে জুগিয়ে থাকেন। যেখানেই আমার হাত পড়ে, সেখানেই আমার হাত রেশম ও মখমল স্পর্শ করে, ফুল ও বহুমূল্য কাপড় স্পর্শ করে। আমাদের খাবার টেবিলে প্রচুর খাদ্য থাকে এবং প্রতিদিন আমার রসনার তৃপ্তির জন্য কত মুখরোচক জিনিশ আনা হয়। তাই বলছি, আনাই, আমার পরমাত্মীয়েরা বেশ লক্ষ্মীমন্ত।

আনাই, তোমার মাথায় আসবে না, আমি তোমাকে কী বলতে যাচ্ছি। ওঃ! তা শুনলে তুমি হেসে গড়িয়ে পড়বে। তুমি মনে করবে, আমার দৃষ্টির সঙ্গে আমার বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।—আমার এক প্রণয়ী জুটেছে।

হাঁ ভাই; আমি তো এক দৃষ্টিহীন অন্ধ বালিকা, আমার আবার একজন প্রণয়-প্রার্থী! আমাকে কত আদর-যত্ন করে, কত সাধ্য-সাধনা করে—কী অদ্ভুত! এর পর আর কী বক্তব্য আছে? প্রেম যে-রকম অন্ধ, এমন আর কেউ নয়! তাই বুঝি প্রেম আমাকে তার নিজের লোক ব'লে মনে করেছে।

সে-ভদ্রলোকটি কী ক'রে আমাদের মধ্যে এসে পড়লো, আমি জানিনে; এই পর্যন্ত আমি বলতে পারি, সেদিন সে-ভদ্রলোকটি আমাদের খাবারের টেবিলে আমার বাঁদিকে বসেছিলো—আর আমার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছিলো—আমার প্রতি খুব যত্ন দেখাচ্ছিলো। আমি বললাম,—'এই প্রথমবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে।'

তিনি উত্তর করলেন,—'সত্যি, কিন্তু আমি আপনার মা-বাপকে জানি।' আমি উত্তর করলাম,—'আমি আপনাকে স্বাগত অভিবাদন করি; কেননা, যিনি আমার পরম দেবতা, আমার সেই বাপ-মার প্রতি কীরূপ শ্রদ্ধা করতে হয়, তা আপনি জানেন।'

তিনি আস্তে-আস্তে বললেন,—'শুধু তাঁদের উপরেই যে আমার মমতা আছে, তা নয়।'

আমি না ভেবে-চিন্তে উত্তর করলাম,—'তবে আর কাকে আপনার ভালো লাগে?'

তিনি বললেন,—'তোমাকে।'

'আমাকে? তার মানে কী?'

'মানে—আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমাকে? আমাকে আপনি ভালোবাসেন?'

'সত্যিই ভালোবাসি—উন্মত্তভাবে ভালোবাসি।'

এই কথায় আমি লজ্জিত হ'য়ে পড়লেম, আমার ওড়নাটা কাঁধের উপর একটু টেনে দিলেম।

'কথাটা আপনি বড়ো হঠাৎ পেড়েছেন।'

'ওঃ! আমার দৃষ্টিতে, আমার ভাবভঙ্গিতে, আমার সমস্ত কাজে এ-কথা প্রকাশ পাবে।'

'তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে অন্ধ; কোনো অন্ধ রমণীকে পাবার জন্য কেউ কি কখনো সাধ্য-সাধনা করে?'

তিনি বেশ অকপটভাবে বললেন,—'আমি দৃষ্টির কোনো তোয়াক্কা রাখিনে। তুমি যদি আলো দেখতে না পাও, তাতে আমার কী এসে যায়? তোমার গঠনটি কি সুন্দর নয়? তোমার পা-দুখানি কি পরীর মতো ছোট্ট নয়? তোমার কেশগুচ্ছ কি দীর্ঘ ও রেশমি-কোমল নয়? তোমার গাত্র কি শ্বেত প্রস্তরের মতো নয়? তোমার মুখের রংটি কি দুধে আলতার মতো নয়? তোমার হাত কি পদ্মফুলের রঙের মতো নয়?'

তাঁর কথা থেমে গেলেও, সেই কথাগুলি আমার কর্ণে ঝংকৃত হ'তে লাগলো। আমার হ্যানো আছে, আমার ত্যানো আছে ব'লে আমার রূপের কতই বর্ণনা করলেন—তাঁর চোখে আমি সুন্দরী! অন্ধ বালিকার কাছে এরূপ প্রণয়ী শুধু প্রেমের একজন প্রার্থী মাত্র, কিন্তু আমার মতো অন্ধ বালিকার কাছে তিনি প্রণয়ীর চেয়েও বেশি, তিনি একটি দর্পণ। আমি আবার বললেম,—

'আপনি যে রকম বলছেন, আমি কি সত্যিই সেই রকম সুন্দরী? আচ্ছা, এখন আমাকে কি করতে বলেন?'

'আমার ইচ্ছা, তুমি আমার স্ত্রী হও।' এই কথায় আমি খুব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেম। আমি বললেম, ' সত্যিই কি আপনার এই ইচ্ছে? অন্ধের সঙ্গে চক্ষুষ্মানের—রাত্রির সঙ্গে দিনের বিবাহ? না! না! আমার মা-বাপ ধনী; আইবুড়ো হ'য়ে থাকতে আমার ভয় হয় না। আমি চিরজীবন আইবুড়োই থাকবো— '

তিনি আর-কোনো কথা না-ব'লেই চ'লে গেলেন। আমার কাছে সবই সমান। তবে এইটুকু তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, আমি সুন্দরী! কিন্তু কে জানে কেন, আমার দর্পণ মহাশয়ের উপর আমার একটু টান হয়েছে, বুঝতে পারছি।

ভাই আনাই, তোমায় একটা মস্ত খবর দেবার আছে। এই জীবনে কত কি দুঃখের ঘটনা অপ্রকাশিতভাবে এসে পড়ে। কী ঘটেছে, তোমাকে বলতে যাচ্ছি আর আমার অন্ধ চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

আমি যাকে আমার দর্পণ বলি, সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাক্যালাপ হবার কয়েকদিন পরে মা-র বাহুর উপর ভর দিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, এমন সময় হঠাৎ একজন তাঁকে চেঁচিয়ে ডাকলে। আমার মনে হ'লো, আমাদের দাসী আমার মাকে তাড়াতাড়ি খোঁজ করতে এসে ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম,—'ব্যাপারটা কী মা?'

'কিছুই না বাছা; বোধ হয়, কোনো লোক দেখা করতে এসেছে। আমাদের যে-রকম অবস্থা, তাতে আমাদের সামাজিক কর্তব্য কিছু-কিছু পালন না-করলে চলে না।'

মাকে চুম্বন ক'রে আমি বললেম, 'তাহ'লে মা, তোমাকে আর আটকে রাখবো না বৈঠকখানায় গিয়ে দর্শনপ্রার্থীদের অভ্যর্থনা করো গে। যাও!'

মা তাঁর তুষার শীতল ওষ্ঠাধর দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ করলেন। তারপর তিনি চ'লে গেলেন—কাঁকর-বিছানো রাস্তা দিয়ে তাঁর পদশব্দ শুনতে পেলেম—ক্রমে সেই পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেলো।

মা চ'লে যাবার পরেই আমি যেন দুইজন শ্রমজীবীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম; তারা একলা রয়েছে মনে ক'রে, মন খুলে গল্পগুজব করছিলো। ছাখো আনাই, যখন ভগবান এক ইন্দ্রিয় থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন,—মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার জন্য, আমাদের অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেন। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি, যারা দেখতে পায়, তাদের চেয়ে এই কারণে বেশি তীব্র হ'য়ে থাকে। যদিও তারা আস্তে কথা কচ্ছিলো, তবু তাদের একটি কথাও আমার কান এড়ায়নি। তারা এই কথা বলছিলো,—'আহা বেচারি! ওদের জন্য দুঃখ হয়! আবার ঘটকরা এসেছে।'

'—আর বালিকাটির মনে একটু সন্দেহও হয়নি। সে আন্দাজ করতেও পারেনি যে তার অন্ধতার সুবিধা পেয়ে ওরা তাকে সুখী করবার চেষ্টা করে।'

'বলো কী তুমি ?'

'না, এ-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সে কেবল আবলুশ কাঠ ও মখমলই হাত দিয়ে স্পর্শ করছে। তবে কি না, মখমলটা বিশ্রী হ'য়ে গেছে, আবলুশের চেক্‌নাইটাও নষ্ট হয়েছে। আহারের সময় খাবার টেবিলে ব'সে মুখরোচক নানা-রকম খাদ্য সামগ্রী সে উপভোগ করে; সে স্বপ্নেও ভাবে না, তার কাছ থেকে ঘরকন্নার দুঃখকষ্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর ওই খাবার টেবিলে ব'সেই ওর বাপ-মা'রা শুকনো রুটি ছাড়া আর-কিছুই খায় না।'

—ওঃ! আনাই, এই কথা শুনে আমার কী কষ্ট হ'লো, তা বুঝতেই পারছো। ওঁরা আমার সুখের জন্য কত লালায়িত। আমার এই অন্ধকারের মধ্যে ওঁরা আমাকে,—কেবল আমাকেই নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী দিয়ে সুখে রাখতে চান। ওঃ! কী আশ্চর্য সেবা-যত্ন! এই ঋণ শত বৎসরেও আমি পরিশোধ করতে পারবো না।

পত্র ৪

বাড়ির দুরবস্থার এই গুপ্ত কথাটা আমি যে আন্দাজে জেনেছি—তা আমি কারও কাছে প্রকাশ করি নি। দারিদ্র্যের কথাটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখবার সব চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়েছে—এ-কথাটা মা জানতে পারলে একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়বেন। আমায় সর্বদাই দেখাতে হবে, যেন আমাদের বাড়ির ভালো অবস্থার সম্বন্ধে আমার খুবই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার বাড়িকে রক্ষা করবো ব'লে আমি দৃঢ়সংকল্প হয়েছি।

আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর নাম এদ্‌মঁ। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভগবান যেন আমাকে মার্জনা করেন! রঙ্গিণীর মতো হাব-ভাব দেখিয়ে তাঁর মন ভোলাবার একটু চেষ্টা করতে লাগলেম।

আমি বললেম,—'আমার উপর এখনো কি আপনার সমান ভালোবাসা আছে?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কারণ, তোমার যে রূপ-লাবণ্য, সে একটা উচ্চধরনের রূপ-লাবণ্য—অতি নির্মল, বেশ লজ্জানম্র।'

'আর আমার দেহের গঠন?'

'দ্রাক্ষালতার মতো সুন্দর ও সুললিত।'

'আঃ—আর আমার ললাট ?'

'গজদন্তের মতো প্রশস্ত ও মসৃণ ও-ললাটের কাছে গজদন্তও হার মানে।'

'সত্যি ?' এই কথা ব'লে আমি হাসতে লাগলেম।

'এ-কথায় তোমার এত মজা লাগলো কেন ?'

'আমার মনে হ'লো, যেন তুমি আমার দর্পণ। তোমার কথার ভিতর দিয়ে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি।'

'প্রিয়তমে, তুমি চিরদিন এই রকমই আমাকে ভেবো।'

'তুমি রাজি আছো ? তাহ'লে—'

'আমি নির্ভুল দর্পণের মতো, তোমার রূপ, তোমার গুণ তোমার কাছে প্রতিফলিত করতে আমি রাজি আছি। তুমি আমার স্ত্রী হবে ব'লে সম্মতি দাও। আমার একটু সম্পত্তি আছে। তোমার কিছুরই অভাব হবে না। আর আমি প্রাণপণে তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করবো।'

এই সময় আমার বাপ-মার কথা মনে এলো। আমি ভাবলেম, এঁকে যদি আমি বিবাহ করি, তাহ'লে তাঁরা ঋণ-ভার হ'তে মুক্ত হ'তে পারবেন। আমি উত্তর করলেম,—'কিন্তু এই বিবাহে তোমার আত্ম-মর্যাদার হানি হবে। আমি তোমাকে পাবো না।'

তিনি বললেন,—'হায় হায়!—একটা কথা আমারও তোমাকে জানানো আবশ্যক।'

'কথাটা কী ? শুনি।'

'আমি প্রকৃতি-দেবীর একটি কুৎসিত সন্তান। আমার মুখেতেও কোনো সৌন্দর্য নেই—আমার চলনভঙ্গিতেও কোনো গাম্ভীর্য নেই। আমার চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য হচ্ছে—দারুণ বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্নে আমার মুখ আচ্ছন্ন। অতএব, আমি যে একজন অন্ধ বালিকাকে বিবাহ করছি—তাতে আমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এতে আমার নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না।'

আমি তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলেম। 'আমি জানিনে, নিজের উপর তুমি কতটা কঠোর হচ্ছো, কিন্তু আর যাই হোক, আমার বিশ্বাস, তুমি খুব খাঁটি লোক। আমি যেমনটি আছি তুমি তবে আমাকে ঠিক সেই-ভাবে গ্রহণ কোরো। তোমার চিন্তা হ'তে কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। আমার এই আঁধার-মরুভূমিতে তোমার প্রেমই আমার হরিৎ কুঞ্জ হবে।'

আমি ঠিক কাজ করছি, কি ভুল করছি, আমি জানিনে। কিন্তু এটা জানি, আমার বাপ-মাকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি। হয়তো, হাতড়াতে-হাতড়াতে আমি ঠিক রাস্তাটা ধরতে পেরেছি।

পত্র ৫

তোমার এবারকার পত্রে তুমি প্রিয়সখির মতো আমার প্রতি কত স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেছো—আমাকে প্রশংসা করেছো—আমাকে অভিনন্দন করেছো, এই সবেতেই পত্রখানি ভরা।

হ্যাঁ ভাই, দুই মাস হ'লো, আমি বিবাহ করেছি। নারীদের মধ্যে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। আমার কিছুই আকাঙ্ক্ষা করবার নেই। আমার স্বামীর আমি হৃদয়-পুত্তলী, আর আমার বাপ-মায়ের আমি আদরের বস্তু। তাঁরা আমাকে ত্যাগ করেন নি।

আমার অন্ধতার জন্য আর আমি দুঃখিত নই। এদ্‌মঁর দৃষ্টি আমাদের উভয়ের উপরেই আছে।

যে-দিন আমাদের বিবাহ হয়, আমার দর্পণ আমার জাঁকালো 'কনে-সাজ'-এর কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমার অবগুণ্ঠনটি অতি সুন্দর হয়েছিলো—আর আমার লেবু-ফুলের মালাগাছিতে আমাকে খুব মানিয়েছিলো। কোনো আসল দর্পণ এর চেয়ে আর বেশি কী করতে পারতো?

সন্ধ্যার সময় আমরা দু'জনে বাগানে বেড়াই। সেখানকার ফুলের গন্ধে, পাখির গানে, ফলের আস্বাদে ও কোমল স্পর্শে আমি মুগ্ধ। কখনো-কখনো আমরা থিয়েটারে যাই, এবং সেখানেও, আমার অন্ধ-চোখ যা দেখতে পায় না, ওঁর বর্ণনার গুণে আমি সে-সমস্ত মানস-পটে দেখতে পাই। উনি বলেন, উনি দেখতে কুৎসিত, তাতে আমার কি এসে যায়? কোনটা সুন্দর, কোনটা কুৎসিত, আমি তো এখন বুঝতে পারিনে, আমি শুধু বুঝতে পারি স্নেহ-মমতা—ভালোবাসা।

ভাই আনাই, আজ তবে এইখানেই বিদায় হই—আমার সুখে তুমি সুখী হও।

পত্র ৬

ভাই আনাই, আমি মা হয়েছি। একটি ছোট্ট মেয়ের মা। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাইনে। সবাই বলে, এমন মিষ্টি দেখতে হয়েছে যে চোখ ফেরানো যায় না। তারা বলে, ও আমার জীবন্ত ক্ষুদে-নমুনা, কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারিনে। ওঃ! মায়ের ভালোবাসা কী বলবতী! আমি যে নীল আকাশ দেখতে পাইনে, আমার স্বামীর মুখশ্রী, আমার বাপ-মায়ের মুখশ্রী দেখতে পাইনে—সমস্তই তো আমি অম্লানবদনে সহ্য ক'রে এসেছি—কখনো আক্ষেপ প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি যে আমার বাছাটিকে দেখতে পাবো না—এ আমার পক্ষে অসহ্য। ওঃ! আমার চোখের কালো পর্দাটা যদি এক মিনিটের জন্য, শুধু এক সেকেণ্ডের জন্যও খ'সে পড়ে, যদি বিদ্যুতের মতোও তার মুখ একবার আমি দেখতে পাই, তাহ'লে আমি কত সুখী হই!—জীবনের অবশিষ্ট দিনের জন্য আমি তাহ'লে গর্ব অনুভব করতে পারি।

এবার এদ্‌মঁ আমার দর্পণ হ'তে পারবেন না। তিনি যতই বলুন না কেন, আমার বাছাটির চুল বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া, চোখ দুটি বেশ জ্বলজ্বলে, তার হাসিটি বড়ো মিষ্টি—তাতে আমার কী হবে?

যখন বাছাটি আমার দিকে হাত বাড়ায়, তখন তো আমি তাকে দেখতে পাইনে?

পত্র ৭

আমার স্বামী-দেবতা, জানো, তিনি কী করেছেন? গত বৎসর আমার জন্য যে কত কী করেছেন, তা আমি জানতেও পারি নি। তিনি আমার চোখ ভালো করতে চান—আর তার ডাক্তার তিনি নিজেই। তাঁর ডাক্তারি কাজটা ভালো লাগে না, তবু শুধু আমার জন্যই ডাক্তারের ব্যবসাটা শিখেছেন। কাল আমাকে তিনি সব খুলে বললেন,—'প্রাণেশ্বরি! জানো, আমি কী আশা করছি?'

'এ কী সম্ভব?'

'হাঁ, গাত্রচর্ম সুন্দর করবার জন্য যে ঔষধের জল তোমার ব্যবহারের জন্য

দিয়েছিলেম, সে-একটা অছিলে মাত্র—আসলে, এটা হচ্ছে আর-একটা গুরুতর ব্যাপারের পূর্বায়োজন।'

'সে ব্যাপারটা কী?'

'সেটা হচ্ছে চোখের ছানি সারানো।'

'তোমার হাত কি কাঁপবে না?'

'না। যখন আমার হৃদয় ঠিক আছে, তখন আমার হাতও ঠিক থাকবে।'

আমি তাঁকে চুম্বন ক'রে বললেম,—'তুমি মানুষ নও, তুমি দয়াময় দেবতা।'

তিনি বললেন,—'আঃ! আর-একবার আমাকে চুম্বন করো, প্রিয়তমে! আমাকে এই ক্ষণিকের বিভ্রম উপভোগ করতে দাও।'

'এ-কথার অর্থ কী এদ্মঁ?'

'অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদে শীঘ্রই তোমার চোখ ভালো হবে।'

'তারপরে—?'

'তারপর, আমি যেমনটি, ঠিক আমাকে সেইরকম দেখতে পাবে—বেঁটে, নগণ্য ও কুৎসিত।'

এই কথাগুলিতে আমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন একটা আলোর ছটা বের হ'লো, আমার কল্পনা মশালের মতো জ্বল্‌তে লাগলো। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললেম,—'এদ্মঁ, প্রিয়তম, আমার প্রেমের উপর যদি তোমার বিশ্বাস না-থাকে, যদি তুমি মনে করো, তোমাকে যে-রকমই দেখতে হোক না কেন, আমি তোমার স্বেচ্ছা-দাসী নই, তাহ'লে আমার অন্ধকারের মধ্যে, আমার চিররাত্রির মধ্যেই আমাকে রেখে দাও।' তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, কেবল আমার হাতটা একটু টিপে ধরলেন।

আমার মা বলেছিলেন, ছানি-কাটার কাজটা এক মাসের মধ্যে আরম্ভ হ'তে পারে।

আমার স্বামীর যে-বর্ণনা শুনেছিলাম, সে-সব কথা আমার আবার মনে পড়লো। মা বলেছিলেন, তাঁর মুখে বসন্তের দাগ আছে; বাবা বলেছিলেন, তাঁর চুল খুব পাতলা। আমাদের ঝি বলেছিলো, তিনি বুড়ো।

মুখে বসন্তের দাগ হওয়া, সে যে একটা দুর্ঘটনার কথা। লাভাটয়ের মতে টাক থাকা তো একটা বুদ্ধির লক্ষণ। তবে বুড়ো হওয়া একটা দুঃখের বিষয় বটে। তারপর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়—তাহ'লে আমার ভালোবাসার দিন সংক্ষেপ হবে।

ভাই আনাই, পরী-কেতাবের গল্পটি তোমার মনে আছে? আমার সেই গল্পের 'সুন্দরী ও পশু'র অবস্থা হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে কোনো জাদুমন্ত্রের দ্বারা রূপান্তর হবারও উপায় নেই। আপাতত, ভাই আনাই, আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোরো। কে জানে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে হয়তো আমি একদিন তোমার চিঠিগুলি পড়তে পাবো।

শেষ পত্র

দ্যাখো ভাই আনাই, আমার চিঠির গোড়ার দিকটা না-দেখে শেষ দিকটা দেখো না। যেমন-যেমন পরে-পরে হয়েছে, সেই স্বাভাবিক ক্রম-অনুসারে তুমি আমার দুঃখের, আমার ঘটনা বিপর্যয়ের, আমার আনন্দের ভাগ লও।

দু'হপ্তা হ'লো, আমার ছানি কাটা হ'য়ে গেছে। আমি দু'বার খুব চীৎকার ক'রে উঠেছিলুম। তারপর আমার মনে হ'লো, যেন আমি দিন, আলো, রঙ, সূর্য—সব দেখতে পাচ্ছি। তখনই আবার একটা পটি আমার চোখের উপর বসিয়ে দেওয়া হ'লো। আমি সেরে উঠলেম! কেবল একটু সহ্য ক'রে থাকা, আর একটু সাহসের দরকার।

এদ্‌মঁ আমার জীবনকে আবার মধুময় ক'রে তুলেছেন।

কিন্তু একটা কথা কবুল করবো কি? আমি একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলেম। আমি আমার ডাক্তারের কথার অবাধ্য হয়েছিলেম। তিনি তা জানতে পারবেন না। তাছাড়া আমার এই গোঁয়ার্তুমি থেকে এখন আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। চুমো খাবার জন্য খুকিকে ঝি আমার কাছে এনেছিলো। খুকি ঝির কোলে ছিলো।

পুঁটুমণি খুব নরম গলায় বললে,—'মা'; তখন আমি আর থাকতে পারলেম না, পটিটা ছিঁড়ে ফেললেম। আর ব'লে উঠলেম; 'আমার পুঁটুমণি! আহা, কী সুন্দর! এই যে আমার পুঁটুকে দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি।'

ঝি আবার আমার পটিটা চোখে বেঁধে দিলে। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমি এখন আর একলা নই। পুঁটুর মুখখানি মনে পড়তে লাগলো, আর সব যেন আলো হ'য়ে উঠলো।

কাল মা আমাকে কাপড় পরিয়ে দিতে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে আমার সাজ-সজ্জা চলছিলো। আমি একখানা রেশমি কাপড় পরেছিলেম, একটি

চিকনের কাজ-করা 'কলার' পরেছিলেম, আর হাল-ফ্যাশনের ধরনে চুল বেঁধেছিলেম। আমার সমস্ত সাজগোজ যখন শেষ হ'লো, তখন মা আমাকে বললেন,—'পটিটা খুলে নে।'

আমি বাঁধাটা খুলে ফেললেম। যদিও সেই সময় ঘরের ভিতর একটু গোধূলি আলো আসছিলো, তবু আমার মনে হ'লো, এমন সুন্দর আর-কিছুই দেখিনি। আমার মাকে, আমার বাবাকে, আমার পুঁটুকে বুকে চেপে ধরলেম।

বাবা বললেন,—'নিজেকে ছাড়া তুই আর সকলকে দেখতে পেয়েছিস।'

আমি ব'লে উঠলেম,—'আর আমার স্বামী? কোথায় আমার স্বামী?'

আমার মা বললেন, 'তিনি লুকিয়ে আছেন।'

তখন আমার মনে পড়লো, তাঁর কুৎসিত চেহারার কথা, তাঁর পরিচ্ছদের কথা, তাঁর টাকের কথা, তাঁর বসন্তের দাগে ভরা মুখের কথা।

আমি বললেম, 'বেচারি এদ্মঁ, তিনি আসুন না আমার কাছে, আমার চোখে তিনি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর।'

মা উত্তর করলেন,—'তোর স্বামীর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, তুই ততক্ষণ তোর নিজের মুখখানি আয়নায় একবার ভাখ—তোর নিজের মুখ দেখে নিজেই মুগ্ধ হবি, এমন সুন্দর।'

আমার মায়ের কথা শুনে আয়নার কাছে গেলেম, আমার নিজের একটু গর্ব ছিলো, একটু কৌতূহল ছিলো। যদি আমি সত্যিই কুৎসিত হই?—যদি আমার কুৎসিত চেহারার কথা সবাই আমার কাছে ভাঁড়িয়ে থাকে?—তাই আমি আয়নার কাছে গেলেম ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেম। কেমন ছিপছিপে গড়ন, কেমন গোলাপের মতো রঙ, কেমন জলজ্বলে চোখ; সত্যিই আমি রূপসী। কিন্তু বেশ আরামে আমার চেহারাটা দেখতে পারছিলেম, আয়নাটা ক্রমাগত কাঁপছিলো, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বটা যেন আনন্দে নৃত্য করছিলো।

আমি আয়নার পিছন দিয়ে তাকিয়ে দেখলেম আয়নাটা কেন কাঁপছে।

একটি যুবা-পুরুষ বেরিয়ে এলো, বেশ লম্বা-চওড়া শরীর, বড়ো-বড়ো কালো চোখ, একটা Legion of Honour-এর কৃত্রিম গোলাপ বুকে গোঁজা। এক-জন অপরিচিত লোকের কাছে রয়েছি ব'লে আমি লজ্জায় ম'রে গেলেম। ঐ যুবকের দিকে ভ্রূক্ষেপ না-ক'রেই আমার মা বললেন—'ছাখ দিকি, তুই কেমন সুন্দর—ঠিক যেন একটি শাদা গোলাপ।'

আমি ব'লে উঠলেম,—'মা!'

'গ্যাখ-দিকি এই শাদা হাত দু'খানি,'—এই কথা ব'লে তিনি আমার হাতের আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত উঠিয়ে দিলেন।

আমি বললেম,—'কিন্তু মা, একজন অপরিচিত লোকের সামনে তুমি কী বলছো ?'

'অপরিচিত লোক ?—এ যে একটা দর্পণ।'

'আমি আয়নার কথা বলছিনে, আয়নার পিছনে যে-যুবা পুরুষটি ছিলো, আমি তার কথা বলছি।'

বাবা বললেন, 'আরে বোকা! তোর আর অত লজ্জা করতে হবে না। ও যে তোর স্বামী!' আমি ব'লে উঠলেম, 'এদ্‌মঁ!'—এই কথা ব'লেই তাঁকে চুম্বন করবার জন্য এগিয়ে গেলেম।

তার পর আবার কিছু পেলেম। আহা, উনি কী সুন্দর! আমি কী সুখী! যখন অন্ধ ছিলেম, তখন বিশ্বাস ক'রেই ভালোবেসে ছিলেম। এখন নূতন প্রেমে আমার হৃদয় উথলে উঠছে—ওঁর মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার অন্ধতার জন্য, আমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে উনি সকলকে বলতে হুকুম দিয়েছিলেন যে, উনি নিজে দেখতে কুৎসিত।

এদ্‌মঁ আমার পায়ের নিচে নতজানু হ'য়ে বসলেন। মা চোখের জল মুছতে-মুছতে, আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার স্বামী আমাকে বললেন, 'তুমি কী সুন্দর!'

আমি চোখ নিচু ক'রে উত্তর করলেম,—'ওটা তোমার ভদ্রতার কথা।'

'না, কেবল আমিই যখন তোমার একমাত্র দর্পণ ছিলেম, আমি তো ওই কথাই তোমাকে বরাবর ব'লে এসেছি। এখন গ্যাখো! আমার এই যে সহযোগী সকর্মী—মুখ দেখবার আয়না, এরও এই একই মত—এও বলছে, আমি যা বলেছি, তাই ঠিক।'

অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমি কি পাগল?

গী দ্য মোপাসাঁ

আমি কি অপ্রকৃতিস্থ না ঈর্ষাপরায়ণ? আমি জানি না আমি কী, কিন্তু অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। এটা সত্য যে মস্ত একটা অপরাধ ক'রে ফেলেছি, কিন্তু তার জন্য দায়ী আমার বিকৃত ঈর্ষা নয়, আমার বিশ্বাসঘাতক ভালোবাসা। এবং যে-যন্ত্রণা আমি ভোগ করছিলাম তাতে অপরাধপ্রবণ না হ'য়েও একজন মানুষ একটা সাংঘাতিক অপরাধ ক'রে ফেলতে পারে।

মেয়েটির ভালোবাসায় আমি উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলাম—তবু তা কি সত্যি? সত্যি কি তাকে আমি ভালোবেসেছিলাম? না। না। সে আমার শরীর আত্মা অধিকার ক'রে ছিলো, আমি তার খেলার পুতুল ছিলাম; সে তার হাসি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, তার সুষমিত শরীরের সৌন্দর্য দিয়ে অধীন ক'রে রেখেছিলো আমাকে। তার দেহের এইসব বৃত্তিগুলোই আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু তাকে আমি অবজ্ঞা করতাম, ঘৃণা করতাম। আমি সর্বদাই ঘৃণা করতাম তাকে কেননা আমার মনে হ'তো সে এমন অপবিত্র আর অবিশ্বাসী যে তার মধ্যে কোনো আত্মা নেই। কিংবা সে তার চেয়েও নিকৃষ্ট, যেন একটা কোমল মাংসের স্তূপ মাত্র, যার ভিতরে কেবল কতগুলো কুৎসা ছাড়া আর কিছু নেই।

মিলনের প্রথম কয়েকমাস আশ্চর্য মধুরতায় কেটেছিলো। তিনটে বিভিন্ন রং ছিলো তার চোখের। না, আমি পাগল নই, সত্যিই বলছি। দুপুরে ধূসর, রাত্রিতে ছায়াচ্ছন্ন সবুজ, সূর্যোদয়ের সময় নীল। ভালোবাসার মুহূর্তে তার দৃষ্টি নীল থাকতো, আর চোখের তারা দু'টো বিস্ফারিত হ'য়ে নরম দেখাতো। ঠোঁট দুটি কাঁপতো এবং প্রায়ই তার লাল টুকটুকে জিভের ডগাটি এমনভাবে বেরিয়ে আসতো যে মনে হ'তো একটা সাপ যেন ছোবল দিতে উদ্যত হয়েছে। যখন সে তার ভারি চোখের পাতা তুলতো, আমি তার সেই আবেগময় দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কাঁপতাম, শুধুমাত্র তাকে ভোগ করবার অদম্য বাসনার জন্যই নয়, সেই পশুটাকে হত্যা করতে ইচ্ছে করতো আমার।

যখন সে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াতো, তার পায়ের প্রত্যেকটি শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতো আমার হৃদয়ে। আর যখন সে তার শাদা লিনেন আর লেসের পোশাকের স্তূপ থেকে তার কলঙ্কিত অথচ দীপ্ত অনাবৃত দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসতো একটা অদ্ভুত দুর্বলতা অনুভব করতাম আমি, আমি গ'লে যেতাম, আমার বুকটা ভারি হ'য়ে উঠতো, আমার মনে হ'তো মূর্ছিত হ'য়ে পড়বো, আমি এমন কাপুরুষ ছিলাম।

রোজ সকালে যখন সে জেগে উঠতো, তার প্রথম দৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে-করতে আমার হৃদয় রাগে, ঘৃণায়, অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ হ'য়ে যেতো, আমি ভাবতাম এই পশুরই এমন দাস হ'য়ে আছি আমি! কিন্তু যেই সে তার স্বচ্ছ নীল চোখের মদির অলস দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করতো, যেন জ্ব'লে উঠতাম, এক অনির্বাণ কামনার আগুনে জ্ব'লে উঠতাম আমি।

সেদিন যখন সে চোখ খুললো আমি তার চোখ নিষ্প্রভ দেখলাম, তার শূন্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রেমে ক্লান্ত হয়েছে সে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম, অনুভব করলাম সব শেষ হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ঘণ্টা মিনিট আমার কাছে এ-কথাই প্রমাণ করতে লাগলো যে আমি ঠিকই বুঝেছি। যখন আমি তাকে আলিঙ্গন ক'রে আদর করতে চাইলাম, সে শিহরিত হ'য়ে আমার কাছ থেকে স'রে গেলো।

'আমাকে একা থাকতে দাও,' ব'লে উঠলো সে, 'বিশ্রী লাগছে তোমাকে।' তারপরেই আমি সন্দিগ্ধ হলাম, বিকৃত ঈর্ষায় কাতর হলাম, কিন্তু আমি

অপ্রকৃতিস্থ নই, না, কক্ষনো না! আমি তাকে ধূর্তের মতো লক্ষ করতে লাগলাম। সে যে আমাকে ঠকাচ্ছে শুধু তাই নয়, তার নিস্তাপ ব্যবহারে আমি বুঝতে পারলাম শিগ্‌গিরই আমার জায়গায় আর কেউ অধিকারী হবে।

মাঝে-মাঝে সে এ-ও বলতো :

'পুরুষগুলো ভারি বিরক্তিকর।' হায়, সে যে কত সত্য ছিলো! তখন থেকেই আমি তার ঔদাসীন্যে, তার চিন্তায় ঈর্ষাকাতর হ'য়ে উঠলাম, আমি জানতাম তার সবই কলুষিত এবং যখন সে ঘুম থেকে উঠে কখনো-কখনো সেই মদির দৃষ্টিতে তাকাতো, রাগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসতো এবং তার গলা টিপে ধ'রে তাকে দিয়ে তার লজ্জাকর রহস্যের কাহিনী বলিয়ে নেবার এক অদম্য স্পৃহা হ'তো।

আমি পাগল? না।

একদিন রাত্রে তাকে ভীষণ সুখী মনে হ'লো। আমি অনুভব করলাম, বস্তুত আমি বুঝতেই পারলাম কোনো নতুন কামনার বশবর্তী হয়েছে সে। ঠিক পুরোনো দিনের মতো তার চোখ জ্বলছিলো, জ্বরের রোগীর মতো দেখাচ্ছিলো, এবং তার সমস্ত সত্তা যেন ভালোবাসার জোয়ারে ভাসছিলো। আমি তাকে খুব কাছে থেকে লক্ষ করছিলাম, অথচ ভাণ করলাম যেন কিছুই বুঝি নি। কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না। আমি এক সপ্তাহ দেরি করলাম, একমাস দেরি করলাম, প্রায় একটা বছর কেটে গেলো। সেই সময়ে সুখে যেন জ্বলজ্বল করছিলো সে, মনে হচ্ছিলো কে তাকে আদরে-আদরে ভ'রে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত অনুমান করতে পারলাম। না, আমি পাগল নই। আমি বলছি আমি পাগল নই। আমি কেমন ক'রে এই অবিশ্বাস্য বীভৎস ঘটনা বর্ণনা করবো? আমি কেমন ক'রে আমার কথা বোঝাবো? কিন্তু এই আমার অনুমান।

একদিন রাত্রে সে অনেক দূর পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে বেড়িয়ে এলো এবং আমার মুখোমুখি চেয়ারে ব'সে যেন ক্লান্তিতে ডুবে গেলো। তার গাল দু'টো অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছিলো, তার চোখে—যে চোখ আমি খুব ভালো ক'রে চিনি—ঠিক সেইরকম দৃষ্টি ছিলো, আমি ভুল করি নি। সেই রকম দৃষ্টি শুধু ভালোবাসার সময়েই ফুটে উঠতো তার চোখে। কিন্তু কাকে?

কী? আমার প্রায় মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার মতো হ'লো এবং আমি তার দৃষ্টি সহ্য করতে না-পেরে পিছন ফিরে জানলায় দাঁড়ালাম। একটা সহিস ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যাচ্ছিলো, সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেলো তাকিয়ে রইলো, তারপরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি সারারাত ভাবলাম আর ভাবলাম। আমার মন এক অদ্ভুত রহস্যের গভীরে-গভীরে পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াতে লাগলো। কামুক স্ত্রীলোকের এই অদ্ভুত বিকৃতির কে তল পায়?

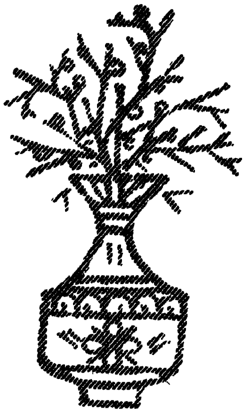
রোজ সকালে সে পাহাড়ে উপত্যকায় পাগলের মতো ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়াতো, এবং রোজই ক্লান্তিতে নিঃশেষ হ'য়ে ফিরে আসতো। অবশেষে আমি বুঝলুম। এই ঘোড়াই আমার ঈর্ষার পাত্র, এই বাতাস যা তাকে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াবার সময় আদর বুলোয়, এই ঝরাপাতা, এই শিশির-বিন্দু, এই জিন যা তাকে বহন ক'রে, সব, সব আমার ঈর্ষার বস্তু। আমি প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প হলাম। অত্যন্ত মনোযোগী হ'য়ে উঠলাম। যখনি সে বাড়ি ফিরতো আমি তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করতাম, এবং সেই ঘোড়াটা হিংস্রবেগে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতো। সে তাকে গলা চাপড়ে আদর করতো, তার ভেজা-ভেজা নাকে চুমু খেতো, এমনকি চুমু খেয়ে মুখটা পর্যন্ত মুছতো না। আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

একদিন সকালবেলা, ভোর হবার আগেই উঠে পড়লাম, এবং বনের যে-পথে বেড়াতে সে ভালোবাসতো, সেখানে গেলাম। একটা দড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম আমি, এবং বুকের তলায় পিস্তলটাও লুকিয়ে নিয়েছিলাম, যেন একটা ডুয়েল লড়তে যাচ্ছি। দু'দিকের দু'টো গাছে রাস্তার এপারে-ওপারে দড়িটাকে বেঁধে রাখলাম এবং নিজে ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। একটু পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, তারপরেই ঘোড়ায় চ'ড়ে তাকে দুরন্তবেগে ছুটে আসতে দেখলাম। রক্তিম গাল, শূন্য দৃষ্টি। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন এ-জগতে নেই। জন্তুটা দড়িটার কাছে এসেই ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেলো। পিঠ থেকে প'ড়ে যাবার আগেই আমি তাকে ধ'রে ফেললাম এবং দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। তারপরেই ঘোড়াটার কাছে গিয়ে কানের কাছে পিস্তল তুলে গুলি করলাম, যেন একটা মানুষ।

তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে অসহ্য জোরে দু'বার আঘাত করলো আমার মুখে, আমি প'ড়ে গেলাম, প'ড়ে যেতেই আবার যেই সে বেগে আমার কাছে এগিয়ে এলো আমি গুলি করলাম তাকে।

এখন আপনারাই বলুন, আমি কি পাগল ?

অনুবাদ : প্রতিভা বসু





উত্তর মেলে না

মামিল সিবিরিয়াক

বাঁ চোখের পাতায় নিপুণভাবে কাজল লাগাতে-লাগাতে মেয়েটি জিগেস করে, 'তাহ'লে তুমি বলছো আমাদের আপেলের একটা বাগানও থাকবে?'

হাত চলছে সমানে। এবার সে মুখে রং মাখে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছেলেটি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ। আপেল গাছে কুঁড়ি ধরলে কী সুন্দর যে দেখায়!'

'নিচে দিয়ে গেছে ভল্‌গা?'

'এই পাহাড়ের ঢাল, আর তার ঠিক ওপরেই আমার জমি। বারান্দায় দাঁড়ালে চমৎকার দৃশ্য। বসন্তকালে থৈ-থৈ করে ভল্‌গার কূলছাপানো জল।'

'সত্যি, কী সুন্দর! পাহাড়ের ঢাল। কূলছাপানো ভল্‌গা। আর তোমার ঐ আপেলের কুঁড়ি। সবই সুন্দর। কিন্তু কি জানো, আর একটা জিনিশ যদি থাকতো—'

রং-মাখা-মুখ ছেলেটির দিকে ফিরিয়ে মেয়েটি মৃদু হাসে। আশ্চর্য মুখ মেয়েটির। আর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি চুম্বকের মতো একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। চোখ দুটো কী সুন্দর—যেন ভোরের শুকতারা। গোলাপের

সম্ভ্রমপূর্ণ চালচলন দেখে মারিয়া তাকে সাজঘরে আসতে দিয়েছিলো। কিন্তু আজ ছেলেটা তাকে এমন অবাক ক'রে দিল যে তার প্রস্তাবটা হেসে ওড়াতে গিয়ে মারিয়া কিছুতেই আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারছিল না।

'আমি কিন্তু প্রাণ থেকেই কথাগুলো বলেছি'— রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে-বলতে ছেলেটির গলা শুকিয়ে গেলো।

'হয়েছে, হয়েছে, আর ঠাট্টা করতে হবে না। এখুনি আমার শমন আসবে। বলো, আজ কোন গানটা গাইলে তুমি খুশি হও।'

'যা তোমার ইচ্ছে।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা, কোন গান তোমার সব চেয়ে পছন্দ আমি জানি।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো মারিয়া। কিন্তু ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠলে। স্টেজ ম্যানেজারের ডাক। তড়াক ক'রে উঠে প'ড়ে সিল্কের স্কার্টটা সাপের গায়ের শুকনো খোলসের মতো খসর-খসর করতে-করতে মারিয়া ঘর ছেড়ে চলে গেলো। যেতে-যেতে নোংরা সরু দালানের আবছা অন্ধকারে মুখ হাসি-হাসি ক'রে মারিয়া আপন মনে বলল: 'কী মজার মানুষ উঃ, একদম উজবুক—পাগল!'

সাজঘরের দরজাটা খোলাই র'য়ে গেলো। একটু বাদেই ভেসে এলো দর্শকদের হর্ষধ্বনি।

সমুদ্রের কলরোলের মতো ছেলেটি শুনতে পেলো জনসমুদ্রের কলরব। মারিয়া পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকে এমন গাঁক-গাঁক ক'রে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে যে শুনলে মনে হবে যেন একপাল রক্তলোলুপ ক্ষুধার্ত জানোয়ারের দিকে একতাল মাংস ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ যেতেই সব শান্ত। ছেলেটি শুনতে পেলো গান হচ্ছে—যে গানটা তার খুব প্রিয়। টান-টান হ'য়ে ব'সে ভাবে বিভোর হ'য়ে গানের প্রত্যেকটি কলি সে শুনতে লাগলো। মেয়েটি সত্যিই বিশেষ ক'রে তাকে শোনাবার জন্যেই যেন গাইছে। অন্যের জবানীতে নিবেদন করছে নিজের প্রেম।

শমে এসে সুর থেমে গেলো। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। সকলে হৈ-হৈ ক'রে উঠলো; শিল্পীর পুনরাবির্ভাবের দাবিতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে হাজার-হাজার কণ্ঠ ফেটে পড়ছে। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সাজঘরের ভেতর সবেগে পায়চারি করতে লাগলো। এই উন্মত্ত হুল্লোড়, ইতর মাইফেলের এই পুরো পরিবেশটাই তার কাছে অসহ্য ঠেকলো। যেন উচ্ছৃঙ্খলতার পচা ভ্যাপসানির মধ্যে টেনে-

টেনে তাকে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে। এই নোংরা পাঁক থেকে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ উঠে চারিদিক এমন বিষাক্ত ক'রে রেখেছে যে কাছে যেতে ভয় হয়—আর এই পাঁকের মধ্যে পবিত্র শ্বেতপদ্মের মতো ফুটে আছে মারিয়া। এখানে এত যে গ্লানি, মারিয়াকে তা স্পর্শও করতে পারে নি। খেলো তামাশার এই জায়গাতেই কিনা ফুটলো ছেলেটির প্রেমের প্রথম কদম ফুল!

দর্শকের দল মারিয়াকে ছাড়তে চাইছে না। বাধ্য হ'য়ে তাকে গানের পর গান গেয়ে যেতে হ'লো। 'গাইশা' পালা থেকে কিছু-কিছু, আর সেইসঙ্গে তখন হালে ওঠা যে গান বলতে লোকে পাগল সেই বেদে-বেদেনীর গানও তাকে গাইতে হ'লো।

মারিয়া যখন সাজঘরে ফিরে এলো তখন আর তার শরীর বইছে না। মুখচোখ লাল হ'য়ে উঠেছে। একমুঠো ভিজিটিং কার্ড সে প্রসাধনের টেবিলের ওপর টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ছেলেটির চোখের নীরব প্রশ্নের জবাবে সে ক্লান্তভাবে বললো:

'আর বলো কেন? রাত্তিরে হোটেলের নিরিবিলি ঘরে বাবুদের খাবার নেমন্তন্ন। আমার ভক্তবৃন্দ ধ'রেই নিয়েছে পেট যেন আমার সাতটা, যেন উট আমি। হেঁজি-পেঁজি লোক নন কেউ, সবাই এঁরা গণ্যমান্য, মাথায় পাকা চুল, ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে। বাইজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে এঁদের মাথা কাটা যায়; কিন্তু যেখানে কেউ তাঁদের দেখে ফেলবে না, তেমন জায়গায় ফুর্তি লুটতে পারলে এঁরা খুশিই হন।' ছেলেটির চোখে ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠতে দেখে মারিয়া তাড়াতাড়ি হেসে বললো 'ভয় নেই; তোমার মুখের গ্রাস কেউ থাবা দিয়ে নেবে না। আমি যা, আজ আমি তাই হ'তে চাই; এমন সুযোগ রোজ-রোজ আসে না। আজকের এই দুর্লভ সন্ধ্যায় একটিবার আমি যা আমি ঠিক তাই হ'তে চাই।'

এই ব'লে মারিয়া তার নিটোল শুভ্র বাহু দিয়ে ছেলেটির কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে তার চোখে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে তন্ন-তন্ন ক'রে কী যেন খুঁজতে লাগলো। আর ফিশ-ফিশ ক'রে বললো, 'সব সন্ধ্যাতেই তো আর আমি প্রেম নিবেদন শুনতে পাই না। হাতের সঙ্গে হৃদয় ক'জনই বা দিতে চায়?'

ছেলেটি চোখ নামিয়ে নিলো। মারিয়া বুঝতে পারলো কথাটা ওভাবে বলা তার উচিত হয় নি।

থিয়েটার শেষ হবার পর দু'জনে হাঁটতে-হাঁটতে প্রমোদোত্তানের একেবারে শেষ প্রান্তে চ'লে গেলো। ছোট্ট সরাইখানার পাথরের বাড়িটার নিরিবিলি খোপ-গুলো সেইদিকেই। ছেলেটির হাতে হাত জড়িয়ে মেয়েটি সারাক্ষণ চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিলো পাছে কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। ছেলেটি বুঝতে পারছিলো মারিয়া ভয় পাচ্ছে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে সকলের মুখের ভাব লক্ষ করছিলো। দু'জন অভিনেতা তাদের সামনে পড়লো। একজন বেশ গোলগাল লাল টকটকে মুখ; আরেকজনের রং সামান্ত ময়লা, কালো-কালো চোখ—দেখতে খুব ভালো। দু'জনের চোখে চোখে কথা হ'লো। মোটা লোকটা চাপা গলায় কী যেন বললো—বুঝতেই পারা গেলো কথাটা মারিয়াকে উপলক্ষ ক'রে। সুপুরুষ অভিনেতাটি আড় চোখে হেসে ঘাড় নাড়লো।

'অসভ্য কোথাকার!' ব'লে মারিয়া হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো।

নিরিবিলি কেবিন-ঘর বলতে যা বোঝায় তাই। শুঁড়িখানাও বলতে পারো—একপ্রস্থ নোংরা ভাঙাচোরা পাঁচমিশেলি আসবাব, ছোপ-ধরা ঝাপ্‌শা আয়না, ঝর্ঝরে তেলচিটে গাল্‌চে, এইসব আর কি! থিয়েটারের একজন কর্মচারি দরজার কাছে ছুটে এসে মারিয়ার হাতে আরও দুটো ভিজিটিং কার্ড চুপি-চুপি গুঁজে দেবার চেষ্টা করলো। মারিয়া রেগে-মেগে তাকে এক ঝট্‌কায় সরিয়ে দিলো।

'রক্ষে করো। বাবুদের গিয়ে বলো ম'রে গিয়েছি। মারিয়া ম'রে গেছে, বলো।'

দু'জনে ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো। মারিয়া ধপাস ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো।

গলার স্বর উঠছে না। অবসাদে ভেঙে প'ড়ে বললো, 'তুমি ধারণা করতে পারবে না আমি কী ক্লান্ত! হ্যাঁ। ভালো কথা—তোমার নামটা যেন কী? ভুলে গিয়েছি, কিছু মনে ক'রো না।'

'পাভেল কন্‌স্তান্তিনিচ রুঝিশ্চেভ।'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মাপ ক'রো ভাই, এমন ভোলা মন আমার। তার ওপর—।' মারিয়ার-মুখে এসে গিয়েছিলো—'আলাপী লোকের সংখ্যা

তো কম নয়, তার ওপর রোজই নতুন-নতুন লোকের আমদানী।' তাড়াতাড়ি মারিয়া নিজেকে সামলে নিলো।

মারিয়াকে কী খাওয়াবে ঠিক করতে না-পেরে ছেলেটি খাবারের মেহুটা খুলে বসলো।

'পাভেল কন্‌স্তান্তিনিচ, আজ রাত্তিরে আমি খুব শাদামাটা ধরনের খাবার খেতে চাই। আমার জন্যে বীটের স্যুপ এক প্লেট, সসেজ, আর ধরো, বাঁধাকপি কি মেটে সেদ্ধ—'

'আমি ভাবছিলাম গরম-গরম মাছের ফ্রাই আনতে বলবো।'

'না, না। ওসব খেয়ে-খেয়ে আমার জিভে চড়া প'ড়ে গেছে। আমি একটু শাদাসিধে ঝোলতরকারি খেতে চাই।'

'ওয়াইন্ আনতে বলি?'

'রামো চন্দ্র! ওসব একেবারেই নয়। তার চেয়ে এক বোতল শস্তা বীয়ার আনাও। মনে করা যাক, আমরা স্কুলকলেজের ছাত্র। আজ সেইভাবে খাওয়া-দাওয়া হোক। আমি গরম-গরম সসেজের অর্ডার দিচ্ছি—সসেজ হবে এমন যাকে ছুরি দিয়ে ওপরের ছালসুদ্ধ পাতলা-পাতলা চাকা-চাকা ক'রে কাটা যায়—আর সেইসঙ্গে গেরস্তঘরের এক টুকরো শস্তা চীজ্ ছুরি চালালেই ঝুর-ঝুর ক'রে ভেঙে পড়বে। দেখো, যা একখানা হবে!'

মারিয়ার ছেলেমানুষি দেখে পাভেল খুব একচোট হাসলো। ওয়েটার অর্ডার নিতে এসে ছেলেটির দিকে করুণার চোখে তাকালো—মারিয়া ইভানোভনার মন জয় করবে তুমি এই দিয়ে! যে এখানকার সেরা বাইজী, তার পাতে কিনা এক বোতল বীয়ার! ছোঃ!

পাভেলের দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে মারিয়া বারবারই বলতে লাগলো, 'আঃ, যা একখানা হবে!'

লেসের তৈরি ওপরের হাত-কাটা কোটটা খুলে ফেলে মারিয়া জানলার ধারে চলে গেলো। থিয়েটার-ভাঙা দর্শকের ভিড় ততক্ষণে সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে। জানলা দিয়ে তাদের কলরব দূরাগত হট্টগোলের মতো শোনাচ্ছিলো।

মারিয়া নিজের মনে বিড়-বিড় ক'রে বললো, 'এখানে না-এসে বাইরের কোনো ছোট্ট শস্তা রেস্তোরাঁয় গেলেই ভালো হ'তো। পোড়া মাখন, ভাজা পেঁয়াজ আর হেরিং মাছের ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস যেখানে ভারি হ'য়ে থাকে। তবে খুব

বড়ো হোটেল ছাড়া কোনো রেস্তোরাঁই বোধ হয় এত রাত অবধি খোলা থাকে না।'

খাওয়াটা খুব জমেছিলো। মারিয়ার অবশ্য রোজ রাত্তিরে এক ঢোঁক ভোদ্‌কা খাওয়া অভ্যেস। তাতে নাকি স্নায়ুগুলো টিট থাকে। ভোদ্‌কা না-খেয়েও মারিয়াকে আজ বেশ চাঙ্গা দেখাচ্ছিলো। তখনও চোখের কোলে একটু-আধটু রং লেগে থাকা ছাড়া আর তার কোনো খুঁত ছিলো না। মারিয়ার দিকে বিভোর হ'য়ে তাকিয়ে পাভেল একমনে মারিয়ার মেয়েলি বকর-বকর শুনছিলো।

মারিয়া বেশ কয়েকবার সলজ্জ হেসে ছেলেটিকে জিগেস করলো, 'শুনে নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছো ? আমি কিন্তু তোমাকে ষোলোআনা সব কিছু খুলে বলতে চাই। ভয় নেই, তোমাকে মহাভারত শুনতে হবে না। শুধু সেইটুকুই বলবো যা তোমার জেনে রাখা ভালো। আমি জন্মেছি, বড়ো হয়েছি এখান থেকে অনেক দূরে—দক্ষিণে। আমাদের বাড়ির অবস্থা ছিলো মোটামুটি রকমের - খারাপও নয়, ভালোও নয়। কোনো রকমে চলে যেতো আর কি। ক্লাস এইটে ওঠার আগে পর্যন্ত আমার দিনগুলো ছিল একঘেয়ে। জীবনে কোনো বৈচিত্র্যই ছিলো না। তখন আমার বয়স এই বছর চোদ্দ—কিন্তু বয়সের চেয়ে আমাকে ঢের বড়ো দেখাতো। খাটো বাদামী রঙের ইউনিফর্ম পরতাম ব'লে আমার সারা দেহে কেমন যেন একটা নেশা ছড়ানো থাকতো। আমার নিজের যে একটা বাজার দর আছে—হায় আমার কপাল, এটা আমি খুব কম বয়সেই টের পেয়েছিলাম। বড়ো হ'য়ে আমি যে জ্বালাযন্ত্রণা সয়েছি, তার মূলও ছিলো বোধহয় সেইখানে। তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা কী ক'রে জানবে কুমারীর দেহযষ্টিতে কীভাবে ঢলঢল যৌবন নিয়ে নারীত্বের রোমাঞ্চিত আবির্ভাব ঘটে! আহা ওখানে ব'সে আছো কী করতে, কন্‌স্তান্তিন পাভলোভিচ ?'

'আমার নাম পাভেল কন্‌স্তান্তিনিচ।'

'ঘাট হ'য়ে গেছে, মাপ করো। এসো, এখানে উঠে এসো—এই সোফায় আমার পাশে বসো, গেলাশে গেলাশ ছোঁয়াই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বেশ ছিলো দিনগুলো। এখনও আমি নিজের সেই ছোট্ট বয়সটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার গড়নটা ছিলো খুবই ভালো। ঘন ঝাঁকড়া চুলের লম্বা বেণী, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং ; চোখদুটো সুন্দর স্নিগ্ধ। অনেকদিন আগের কথা। তাই আজ আমি নিজের সম্বন্ধে এভাবে বলতে পারছি। সেই আমি

আর এই আমি—দুটোকে বেশ তফাত ক'রে আজ দেখতে পারি। যেতে-আসতে প্রায়ই যাদের রাস্তাঘাটে দেখি, যাদের রূপ দেখে মন ভ'রে ওঠে—ভাবটা অনেকটা এই, যেন তাদেরই কারো সম্পর্কে আমি বলছি। স'রে এসো, আমার কাছটাতে এসে বসো। উঁহু, আরও কাছে। বেশ লোক তো দেখছি হে তুমি। আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি উঠে তোমার কাছে বসছি। হয়েছে? বাবা বাবা!'

মারিয়ার কাঁধ ছেলেটির প্রায় কাঁধে এসে ঠেকেছে। মারিয়ার দেহের উষ্ণতা, তার পাউডারের গন্ধ ছেলেটি অনুভব করতে পারছে। যেন খানিকটা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে সে, যেন কুহেলিঢাকা তার চোখ। বিষাদ আর আনন্দ, একই সঙ্গে বিষাদ আর আনন্দ—মুখ ফুটে ছেলেটির ইচ্ছে করছিলো সে-কথা বলতে; এমন এক আশ্চর্য ভাষায় সে বলবে, যেন ছায়ার মতোই সে-কথা ধরা শক্ত হয়। এদিকে মারিয়া বিড়বিড় ক'রে ব'কেই চলেছে। মাঝে-মাঝে বীয়ারের গ্লাশে একটু-একটু চুমুক। চীজ্ ঝুর-ঝুর ক'রে ভেঙে তার কোলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

'মানুষের চোখের চাউনি তুমি কখনও খুঁটিয়ে দেখেছো, কন্স্ত্—থুড়ি, পাভেল কন্স্তান্তিনিচ? ছোটোদের—বিশেষ ক'রে, খুব বাচ্চাদের চোখের চাউনি যে কী সুন্দর! একটু বড়ো হ'তে না হ'তেই ছেলেরা সে-গুণ হারিয়ে ফেলে; কিন্তু মেয়েদের বজায় থাকে প্রায় বছর ষোলো বয়স পর্যন্ত। হ্যাঁ, আমি বলছি শুদ্ধভাবের কথা। চাউনি যখন পবিত্র থাকে, চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় —নিথর নিস্তরঙ্গ দীঘির জলে তাকিয়ে আছি; যেন শান্ত অপাপবিদ্ধ এক পরিপূর্ণ আত্মার চোখে চোখ রাখছি। এমনি ক'রে তো ক্লাস নাইনে উঠলাম, তারপর টেন্-এ। তখন ছোটো ফ্রকে আমার ভারি বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া আধবোঁজা চোখে তার মাথাটা সোফার গায়ে এলিয়ে দিলো। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মারিয়ার হাত আলতোভাবে চাপড়ে দিতে লাগলো। মারিয়া নিজের হাত টেনে যেমন সরিয়েও নিলো না তেমনি আবার চোখ খুলেও তাকালো না। মধুর তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে মারিয়া ইভানোভনা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে মানসনয়নে নিজের কিশোরী-মূর্তি দেখতে লাগলো।

যেন এখুনি ঘুম থেকে উঠেছে, এমনি গলায় মারিয়া ফিশফিশিয়ে বললো, 'দিনগুলো সত্যিই ভারি সুন্দর ছিল। পরে অবশ্য—'

ছেলেটি বাধা দিয়ে বললো, 'পরেকার কথাগুলো আমি জানি। মানে আঁচ করতে পারি।'

যে ছেলেটি এত ভদ্র, এত ভালো, এত নিষ্পাপ—তার জানা উচিত কী ধরনের একজন মেয়েমানুষকে সে তার পৈতৃক ভদ্রাসনে, তার সাধের আপেল-বাগানে নিয়ে গিয়ে ওঠাতে চাইছে। এই ভেবে, ছেলেটিকে সমস্ত কথা, তার জীবনের পুরো কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলে-খুলে বলবে ব'লে মারিয়া হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। শুনে-টুনে ছেলেটি নিশ্চয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যাবে। একেবারে ছোটোলোকের মতো বঞ্চনা করার চেয়ে সেও বরং ভালো। মারিয়ার সারা জীবন গেছে মিথ্যে ব'লে-ব'লে—এত মিথ্যে যে, মনের কথা কোনোদিনই সে মুখ ফুটে বলে নি। ছেলেটি প্রথম যেদিন মারিয়ার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলো, মারিয়া ভেবেছিলো তার মতো মেয়েমানুষদের গাঁথবার জন্যে অনেকে যেমন টোপ ফেলে এও বোধহয় তেমনি। মারিয়ার জীবনে এ-অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে। কিন্তু এইবার মারিয়া সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝতে পারলো ছেলেটি সত্যি সমস্ত অন্তর দিয়েই তাকে চাইছে—তার আশ্চর্য চাউনি দেখেই মারিয়া বুঝলো। আর ছেলেটিও যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়েই, তার শরীরের পবিত্র নিষ্কলুষ প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়েই মারিয়ার দিকে চেয়ে ছিলো।

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। কথার চেয়ে এই নীরবতাই তাদের কাছে ঢের বেশি বাঙ্ময় হ'য়ে উঠলো। মেয়েটির মনের ভাব বুঝতে পেরে মুখ খোলবার আগেই ছেলেটি তাকে চুপ করিয়ে দিলো।

থেমে-থেমে কথা হাতড়ে-হাতড়ে ছেলেটি বললো, 'আমি বিলক্ষণ জানি। আমি জানি তোমার আগের একটা জীবন আছে। ও-নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ও-সব আমি জানতে চাই না। মানুষের মনে এমন কতকগুলো ভাব আছে, যা সবকিছুকে আগুনের মতো পুড়িয়ে নিখাদ করে। আমি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে যাচ্ছি না। সমস্ত জেনে-শুনেই আমি আমার ইচ্ছের কথা তোমাকে বলেছি। আমার শুধু একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। দিব্যি করতে হবে—ভুলেও আর তোমার সেই অতীতের কথা কখনও তুলবে না। কেননা, তা নাহ'লে আমি দুঃখ পাবো; মন বেজায় খারাপ হ'য়ে যাবে—বিশেষ ক'রে তোমার কাছ থেকে শুনলে!'

মারিয়া কোনো কথা বলতে পারলো না, তার মাথার ভেতরটা যেন বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছে আর সে দেখতে পাচ্ছে বিচিত্র রঙের চরকিবাজি।

শক্ত ক'রে মুঠোর মধ্যে মারিয়ার হাত ধ'রে ছেলেটি বার-বার বলতে লাগলো, 'না, কক্ষনো বলবে না। মানুষের বিচার হয় অন্তঃকরণ দিয়ে—কে কী ভুল করেছে তা দিয়ে নয়।'

ছেলেটি মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে আরও অনেক কথা গড়-গড় ক'রে ব'লে গেলো। বলছিলো খুব আপনার জনের মতো হ'য়ে। ভাই যেন বোনকে বলছে। বাগানের দিক থেকে ভেসে-আসা হৈ-হল্লোড় শুনে মারিয়া ইভানোভনার মনে হচ্ছিলো যেন একপাল মদোমাতাল লোক তাকে ডাকাডাকি ক'রে ফিরছে; আর মারিয়া যেন দূরে, বহু দূরে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করতে চাইছে। যে-মারিয়াকে এই লোকগুলো জানে, যাকে তারা তাদের সম্পত্তি ব'লে মনে করে—সেই মারিয়ার জের আর সে টানতে চায় না। মারিয়ার মনের অবস্থা সেই রুগীর মতো, যে তার রোগের হাত এড়াবার ব্যর্থ আশায় অন্য কোথাও চ'লে যাবার স্বপ্ন দেখে।

গলায় বাৎসল্যের সুর এনে মারিয়া বললো, 'তুমি খাঁটি মানুষ, উঁচু মন তোমার। পৃথিবীতে সত্যিকার খাঁটি লোক খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের কথা। চেষ্টা ক'রে কেউ ভালো হ'তে পারে না। ওটা রক্তের মধ্যে থাকে। তোমার মা-বাবা নিশ্চয় খুব ভালো লোক।'

'হ্যাঁ, সত্যিই ভালো।'

অনেক রাত অবধি ব'সে-ব'সে দুজনে সুখদুঃখের গল্প করলো। ছোটো খাটো তুচ্ছ বিষয়গুলোও তাদের চোখে হঠাৎ খুব বড়ো হ'য়ে দেখা দিলো। বিদায় নেবার সময় মারিয়া ছেলেটিকে চুমো খেলো। এই তাদের পরস্পরকে প্রথম চুম্বন। মারিয়া তো অবাক। তার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেছে। এমন তো কখনও তার হয় না!

আকাশে চাঁদ-না থাকলেও শুক্লপক্ষের রাত্তির। যারা পরে এসেছে তাদের দু'চারজন তখনও বাগানে র'য়ে গিয়েছে। একটা কেবিন থেকে ভেসে আসছে মাতালদের ঝগড়া। একদল ঘর্মাক্ত ওয়েটার ট্রের ওপর ডাঁই-করা এঁটো থালা আর খালি বোতল নিয়ে পাশ দিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেলো। এখানকার বাতাসের মুখ দিয়েও যেন পানোন্মত্ততার গ্যাঁজলা উঠছে।

মারিয়া ইভানোভনাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে পাভেল গাড়িতে তুলে দিলো। মারিয়া একটু রহস্যের হাসি হেসে মিষ্টি ক'রে পাভেলকে বললো, 'একাই যাবো। বাড়ি পৌঁছে দেওয়া আমার ভালো লাগে না।'

৬

পরের রাত্তিরগুলোও চাঁদনী রাত নয়। তবু বেশ ফুটফুটে ছিল। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের যা ধরন।

মারিয়া ইভানোভনার মনটা বেজায় ভার হ'য়ে আছে। তার মনে হচ্ছে কেবলি কী যেন তাকে ঠেসে ধরছে। চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো, নিজের ওপর রাগ হ'লো।

'বোকা ধাড়ি কোথাকার, এদিকে যে মরবার বয়স হ'লো!'

আয়নার সামনে গিয়ে নিজের মুখ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে মারিয়া করুণভাবে হাসলো। এখন আর সে-চেকনাই নেই।

'বয়স গেছে, এখন একদম বুড়ি!'

যৌবন-পেরিয়ে-যাওয়া যে সব মেয়ে প্রাণপণে খুকি সাজবার চেষ্টা করে, এককালে মারিয়া তাদের নিয়ে কী হাসাহাসিই না করেছে। এবার এসেছে তার নিজের পালা। মহাকালের পাষাণ হৃদয়ে দয়ামায়া ব'লে কিছু নেই। নিজের মাথাটাকে দু'হাতের মধ্যে নিয়ে মারিয়া তার ভাগ্যকে দুষলো। তারপর আবার চোখের জল ফেলতে লাগলো। দিনে দশবার ক'রে সে নিজের মত বদলাচ্ছে। রুঝিশ্চেভকে কিছুতেই তার বিয়ে করা চলবে না। লোকে গায়ে থুথু দেবে। স্বামীর বয়স চব্বিশ আর স্ত্রীর বয়স কিনা সাঁইত্রিশ! তেরো বছরের তফাত। সোজা কথা। তার চেয়ে পাভেলকে বরং সে বরাবর ভালোবেসে যাবে, পাভেলের কাছে এ-দাবি থাকবে না যে বিনিময়ে মারিয়াকেও তাকে ভালোবাসতে হবে। পাভেলের ভালোবাসার আয়ু আর কতদিন—বড়োজোর এক বছর কি দু'বছর? দরকার ফুরিয়ে যাওয়া, ভালোবাসা হারানো, সে আর বেশি কী? কিন্তু লোকের চোখে উপহাসের পাত্র হওয়া—মারিয়ার সে কিছুতেই সহ্য হবে না। আরও একটা কথা! আচ্ছা, বুড়ো-বুড়ো লোক অল্পবয়সের মেয়েদের কি বিয়ে করে না? পরস্পরের শ্রদ্ধার ভিত্তিতে কারো-কারো বিয়ে হয়। কোনো-কোনো পুরুষমানুষ তো জীবনে একবারই প্রেমে পড়ে। তারা তাদের স্ত্রীদের মধ্যে নিজেদের অনেকখানি খুঁজে পায়। এও তো হ'তে পারে যে সুখশান্তির চূড়ায় উঠে মারিয়া হঠাৎ ম'রে গেলো! পাভেলও তো ম'রে যেতে পারে। তাছাড়া মারিয়া যদি কখনও দেখে পাভেলের মনোভাবের এতটুকু পরিবর্তন

হয়েছে, তক্ষুনি তার জীবন থেকে স'রে গিয়ে মারিয়া পাভেলকে মুক্তি দিতে পারবে।

সহকর্মীদের কাছে মারিয়ার এই হৃদয়দৌর্বল্য বেশিদিন চাপা থাকলো না। লোকে তাকে দেখে মুচকি-মুচকি হাসতো। ভাঁড়ের পার্ট করতো মোটকা বুতুসভ; সে তো সকলের সামনেই ছড়া কাটা শুরু ক'রে দিলো:

'দু-কুড়িকে দুখান ক'রে
পাতবে ঘরকন্না
বিশ ফ্রাঁ নগদ বিশ ফ্রাঁ ধারে
মারিয়া ইভানোভনা।'

মারিয়ার প্রাণের বন্ধুরা তার সম্পর্কে বাজারচলতি এইসব গালগল্প আর ঠাট্টা-ইয়ার্কি তার কানে ওঠাতে ছাড়তো না। শুনে-শুনে তার কান প'চে গিয়েছিলো। মারিয়া শুধু বলতো, 'বোঝে না ব'লেই ওদের এত গায়ের জ্বালা।'

কোরাসে সখীর দলে গান গাইতো সুন্দর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। নাম তার তানিয়া। আনকোরা নতুন ব'লে কুমারীসুলভ লজ্জাশরমের ভাব তখনও তার মধ্যে বজায় ছিলো। মারিয়ার কেমন যেন মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো মেয়েটার ওপর। প্রায়ই তাকে নিজের সাজঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারিয়া তার খোঁপায় গুঁজে দিতো একগোছা টাটকা ফুল, কখনও-কখনও মিষ্টিও খাওয়াতো।

মারিয়া ইভানোভনাকে তানিয়া মনে-মনে এমন একটা উঁচু আসনে বসিয়েছিলো, যেখানে সে কোনো দিনই চেষ্টা ক'রেও উঠতে পারবে না। স্টেজে যাবার সময়টাতে দালানে দাঁড়িয়ে মারিয়ার চাউনির প্রত্যেকটি ভঙ্গি সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করতো। তার এই নীরব অচঞ্চল নিষ্ঠা দেখে মারিয়ার ভারি মজা লাগতো। মিষ্টিমতো মেয়েটার জন্যে মারিয়ার মনে ছিলো একটা করুণার ভাব। উইংসের ধারে কিছুক্ষণ ধ'রে মারিয়ার নামে নানান খানা শোনবার পর তানিয়া দালানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। যখন দেখলো ধারে-কাছে কেউ নেই, তখন সে চুপচাপ সটান মারিয়ার সাজঘরের ভেতর ঢুকে গেলো।

মারিয়া ইভানোভনা জিগেস করলো, 'কী চাই রে তানিয়া?'

তানিয়া থতমত খেয়ে ভয়ে তো তো ক'রে বললো, 'না। ইয়ে, কিছু নয়। মানে, ওরা সব বলছে তুমি নাকি প্রেমে পড়েছো?'

'বোকা মেয়ে আর বলেছে কাকে। সবাই যা বলছে তুইও তাই বলবি?'

'আমি জানি যে মারিয়া ইভানোভনা! তুমি প্রেমে পড়েছো।'

'আর ধরো, যদি তা হয়ও, তাতেই বা কী?'

'আমি ভাবছিলাম তোমার কাছ থেকে জেনে নেবো প্রেমে পড়লে কী রকমটা হয়।'

মারিয়া ইভানোভনা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! তুমিও প্রেমে পড়েছো বোধহয়?'

'ঠিক জানি না। দু'জন লোক আমার পেছনে ফিঙে হ'য়ে লেগেছে। একজন হ'লো হেড বক্সকীপার আর আরেকজন হেয়ার-ড্রেসার।'

'কাকে তোর পছন্দ?'

'দু'জনকেই।'

'দূর, বোকা! দু'জনকেই যদি তোর পছন্দ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে দু'জনের একজনকেও তুই ভালোবাসিস না। ভালোবাসা যায় শুধু একজনকেই। এখনও তোর অনেক দেরি রে, তানিয়া। প্রেমে পড়লে আপনিই জানতে পারবি, কাউকে জিগেস করতে হবে না।'

মারিয়া ইভানোভনা সেই সরল মানুষটিকে বুকে টেনে নিয়ে চুমোয়-চুমোয় অস্থির ক'রে তুললো।

মারিয়া ইভানোভনার কাঁধে নিজের ছোটো মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ফিশ-ফিশ ক'রে তানিয়া বললো 'মারিয়া ইভানোভনা, সবাই তোমাকে ভালোবাসে; সবাই তোমার মন পেতে চায়। আমার কাছে স্বীকার না-করলেও তুমি তা ভালো ক'রেই জানো। এদিকে আমি কী করি! বক্সকীপার সেদিন মনের দুঃখে মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হ'য়ে গেলো; আর হেয়ার-ড্রেসার আলফ্রেদ তো নিজে-নিজে খুন হবে ব'লে শাসিয়েছে।'

রুঝিশ্চেভকে গল্পটা করবার সময় মারিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো। কিন্তু এর মধ্যে হাসবার কী আছে? রুঝিশ্চেভও বুঝে উঠতে পারলো না।

রোজই দু'জনের দেখা হ'তো। রুঝিশ্চেভ যেন কতকটা কর্তব্যের খাতিরেই সন্ধেটা বাগানে কাটাতে আসতো। দেখতে-দেখতে অভিনেতা, অভিনেত্রী, বক্সকীপার, ওয়েটার, মায় যেসব লোক থিয়েটারের পোকা—তারা সবাই তার মুখচেনা হ'য়ে গিয়েছিলো। দিন-দিন যত সে কাছ থেকে দেখছে, ততই এ-জায়গাটা তার বিষবৎ মনে হচ্ছে। চারদিকে এর কুৎসিত নোংরামি।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তার চক্ষুশূল হ'য়ে উঠলো। তার সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন সে দেখে—মাতাল দর্শকের মন পাবার জন্যে নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে নেচে কুঁদে তারা বেহায়াপনা করে।

মারিয়া ইভানোভনাও এর ঊর্ধ্বে নয়। কোমর দুলিয়ে আধো-আধো গলা ক'রে সেও যখন রসের গান গায়, তার সঙ্গে অন্যদের কোনো তফাত থাকে না। মারিয়ার রং-করা মুখ, ঝুটো হীরের গয়না পরা হাত আর গলা, নির্লজ্জ হাসি আর কোমর দুলিয়ে নাচ—রুঝিশ্চেভের অসহ্য ঠেকে। রাত্তিরে খেতে-খেতে মারিয়াকে সে রোজ একই কথা বলে :

'চলো মারিয়া, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই। এ বড়ো ভীষণ জায়গা। এখানকার এই ছাইয়ের স্টেজে তোমাকে দাঁতমুখ খিঁচোতে দেখে আমার কী খারাপ যে লাগে বলবার নয়। স্টেজে উঠলে তোমাকে আর চিনতে পারি না। তোমার মুখটা কী রকম অদ্ভুত হ'য়ে যায়। তোমার হাসি, তোমার চলাবলা, তোমার গলার স্বর—'

'নতুন-নতুন আসছো, তাই অমন মনে হচ্ছে। নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে আমাদের চলে না। বাজারের মেছুনি একটু চ'টে গেলেই কোমরে কাপড় বেঁধে সমানে খিস্তিখেউড় শুরু ক'রে দেয়। ওটা ওদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ব'লে কেউ গায়ে মাখে না। আমাদেরও হয়েছে তাই। সব ঘাঁটা পড়ে গেছে। আর এখুনি চলে যাওয়ার কথা বলছো? আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চুক্তি আছে যে। এখনই চলে যেতে চাইলে অনেক টাকা খেসারত দিতে হবে।'

'যা লাগে দেবো।'

'কিন্তু বদনাম? একবার চুক্তির খেলাপ করলে ভাবছো কোনো থিয়েটার আর আমাকে নেবে? শিল্পীর একমাত্র পুঁজি তার সুনাম। সুনাম ভাঙিয়েই আমরা খাই। আজ তুমি আমাকে ভালোবাসছো, আজ আমার কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু কাল কী হবে কে বলতে পারে?'

'আমার মাথা খাও মারিয়া তুমি অমন ক'রে বোলো না।'

রুঝিশ্চেভ অত্যন্ত বিনয়ী ব'লে নিজের সম্পর্কে কিংবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু বলতে তার বাধে। কিন্তু মারিয়া ইভানোভনা যে জগতের মানুষ সেই রঙ্গজগতে কারো কোনো খবর চাপা থাকে না। রুঝিশ্চেভ যে ভল্‌গার ধারের এক জমিদারের একমাত্র ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং কোনো এক

মন্ত্রিদপ্তরে অবৈতনিক উচ্চপদে আসীন—এ খবর মারিয়া লোকপরম্পরায় জেনেছে।

থিয়েটারমহলে ঘুরতো-ফিরতো সন্দেহজনক চরিত্রের একটি লোক। শিল্পীদের সঙ্গে ছিলো তার কাজ-কারবার। মাথায় খাড়া টুপি, চোখে সোনার চশমা: অনেকগুলো ভাষা জানতো সে। সেইসঙ্গে রাখতো দুনিয়ার লোকের হাঁড়ির খবর। হেন লোক নেই যাকে সে চিনতো না। তার কাজ ছিলো অভিনেতাদের বিশেষ ক'রে অভিনেত্রীদের থিয়েটারে চাকরি যোগাড় ক'রে দেওয়া। লোকটার নাম অস্ত্‌মুস। সবাই বলতো, অস্ত্‌মুস লোক মোটেই সুবিধের নয়—ও না-করে কী। অভিনেত্রীদের শাঁসালো খদ্দের পাক্‌ড়ে দেওয়া, কাগজে তাদের প্রশংসা ক'রে সমালোচনা বার করা, আবার দরকার হ'লে তাদের নামে কুৎসা রটিয়ে গালে চুনকালি দেওয়া—সবই সে করে। মারিয়ার সঙ্গে তার আলাপ অনেকদিনের, কখনও-সখনও তাকে কাজেও লাগিয়েছে। লোকটাকে দেখলে এখন মারিয়ার আতঙ্ক হয়। মারিয়ার উদ্দাম জীবনের অনেক খবরই তার নখদর্পণে। দু'একটা বেনামী চিঠি ছাড়লেই ব্যস্‌, একেবারে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়বে।

অস্ত্‌মুসও তা হাড়ে-হাড়ে বোঝে। তাই মারিয়াকে দেখলেই সে গায়ে-পড়া হ'য়ে ঢলানিপনা শুরু করে।

মারিয়ার পিত্তি জ্ব'লে যায়।

সেদিন দেখা হ'তে লোকটা চোখের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ভাব এনে ভাঁড়ামি শুরু ক'রে দিলো, 'এই যে, কী খবর? একেবারে হাবুডুবু, তাই না? আমি বলি, আর দেরি করা নয়—দুগ্‌গা ব'লে এইবার ঝুলে পড়ো। আমি তা ব'লে পেটপাতলা লোক নই। সব মাগীর সব কেচ্ছাই এ-শর্মার জানা আছে। কিন্তু সব চাপা থাকে। ওটা আমার রীতি। তোমাকে আর আমি কী বলবো! তুমি তো আমার সঙ্গে কাজ-কারবার করেছো—তুমি জানো, আমার হ'লো গিয়ে ভদ্রলোকের এক কথা। হ্যাঁ, ভালো কথা, মারিয়া ইভানোভনা। আমাকে যদি চটাতে না-চাও তো আমার সামান্য একটু উপকার করতে হবে। তানিয়া ব'লে মেয়েটাকে তো তুমি চেনো। ঐ যে, কোরাসের দলে সখী সাজে গো। ওকে আমার খুব মনে ধরেছে। কিন্তু মেয়েটি ভারি ঢ্যাঁটা। একটু চোখ মেরেছি কি অমনি মারতে ওঠে। যদি তোমার ঘরে একদিন ওর সঙ্গে আমার মোলাকাত করিয়ে দিতে পারো—অবশ্যই দেখাটা এমনভাবে হবে যেন

আমি হঠাৎ এসে পড়েছি। কী বলো? ও তো তোমার খুব ন্যাওটা। তুমি যা ধড়িবাজ মেয়ে, একটু চেষ্টা করলেই ওকে পটাতে পারবে।'

মারিয়া ইভানোভনা তো রেগে আগুন। তক্ষুনি লোকটাকে চুপ করিয়ে দিয়ে মুখ বিষ ক'রে বলল, 'দেখুন মশাই, ও-সব ব্যাপারে আমি নেই।'

'বটে, ও তোমার অন্ন মারবে ব'লে ভয় হচ্ছে বুঝি? ছি, ছি—আমার ধারণাই ছিলো না তোমার মন এমন ছোটো।'

এরপর এ-জায়গা থেকে যত শীঘ্র সম্ভব পালানো ছাড়া মারিয়ার আর গত্যন্তর রইলো না। পালানো—হ্যাঁ, সত্যিই পালানো। ছেড়ে চ'লে যাওয়া নয়—পালানো।

৪

মারিয়া যখন এসে বললো যে সে ঠিকই ক'রে ফেলেছে থিয়েটার ছেড়ে দেবে, রুঝিশ্চেভের আনন্দ ধরে না।

পাভেলের দিকে গদগদ হ'য়ে তাকিয়ে মারিয়া বললো, 'আজ আমার শেষ অভিনয়, আজই আমি শেষ গান গাইবো। কাল ম্যানেজারকে জানিয়ে দেবো। অবিশ্যি বিবেকে একটু বাধছে। একেবারে মরশুমের মুখ কিনা! আমার যে নামডাক আছে, লোকে যে আমাকে চায়। আমি চ'লে গেলে কোম্পানির ব্যবসা বড়ো রকমের একটা ঘা খেতে পারে।'

'ও নিয়ে ভেবো না। তুমি গেলে আর কাউকে ওরা ঠিক জুটিয়ে নেবে।'

'ওদিকে আবার খেসারতও দিতে হবে অনেকগুলো টাকা। ছ'হাজার রুব্‌লের মতো। আমার হাজার দুই আছে। অসময়ের কথা ভেবে জমিয়েছিলাম।'

'টাকার জন্যে ভেবো না।'

'শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ঘড়া-ঘড়া মোহর জমা দিয়ে তোমার ভাবী বিবিকে বাঁদীগিরি থেকে মুক্ত করতে চাইছো।'

'নয় তো কী! তাহ'লে, অদ্য তোমার শেষ রজনী তো?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আজ রাত্রে শেষবারের মতো আমরা বাগানের রেস্তোরাঁতে খাবো।'

আবেগের সঙ্গে দু'জন দু'জনকে বুকে টেনে নিলো। তারপর মারিয়া ব'সে গেলো মেক-আপ করতে। আর পাভেল চললো থিয়েটারের হলের দিকে—এই শেষ বারের মতো নিজের লজ্জাকে প্রত্যক্ষ করতে। নিকৃষ্ট নাচের জায়গা, চারদিকে যতসব বড়োলোকের এঁটুলি, জোচ্চোর, জালিয়াত আর কাজের ছুতোয় শহরে-আসা মাইফেলবাজ বুড়ো মোড়লমাতব্বর—পাভেলের চোখে সব পিণ্ডি পাকিয়ে গেলো; তাদের মুখগুলো পর্যন্ত যেন ঘেঁটে-ঘুঁটে একাকার। অণুবীক্ষণের কাঁচের নিচে এক ফোঁটা দূষিত রক্তের মতো সবকিছু একটা জায়গায় অর্থহীনভাবে জটলা ক'রে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। পাভেল ভাবলো, 'উঃ, এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে খোলা হাওয়ায়। যখন আমার মনের মানুষটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে যেতে পারবো আমার নিজের দেশে, ভল্‌গার পাড়ে—আমার কী আনন্দ!'

পাভেলের মনে হচ্ছিলো সময় বইছে না, নদীর মুখে যেন বাঁধ বেঁধে দিয়েছে কেউ। মারিয়া ইভানোভনার গান সকলের শেষে। সবাই পাগল যার জন্য, তার বিদায়ের লগ্ন আসন্ন এটা বুঝতে পেরেই বোধহয় দর্শকের দল বারবার সোরগোল ক'রে তাকে দেখতে চাইছিলো। আর তাই বারবার দেখে-দেখেও তাদের আশ মিটছিলো না।

আর পাভেল ততবারই আপন মনে বলছিলো, 'হয়েছে, ঢের হয়েছে। আর কেন? এবার ওকে তোমরা ছাড়ান দাও!'

মারিয়া ইভানোভনা বাগানের নিরিবিলি ঘরে শেষবারের মতো খেতে চেয়েছে। মারিয়ার এমন অদ্ভুত শখ দেখে পাভেল একটু অবাকই হয়েছিলো। পাভেলের মতে, এখন দরকার পেছনে না-তাকিয়ে সোজা সামনে ছুট দেওয়া। কিন্তু মেয়েদের মন বোঝা শিবেরও অসাধ্য। কে জানে হয়তো বা মারিয়া চেয়েছে তার অতীতকে শেষ বিদায় জানাতে, একটা পুরোনো কুঅভ্যাসকে শেষ দক্ষিণা দিতে!

পাভেল বাগানের সেই নিরিবিলি ঘরে ব'সে মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ঘরটা আজ আর তার কাছে অতটা নোংরা, অতটা দুর্বিষহ ব'লে বোধ হচ্ছিলো না।

মারিয়ার আসতে একটু দেরি হ'লো। চোখেমুখে তার টগবগ করছে আনন্দ। পাভেল জিগেস করলো, 'সব চুকিয়ে এসেছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হ'লো ?'

'হ'লো। অল্পক্ষণের জন্যে। আমার ইচ্ছের কথা জানালাম। থাক, ও-সব এখন।' ব'লে হাসতে-হাসতে খানছয়েক ভিজিটিং কার্ড টেবিলের ওপর ছুঁড়ে মারলো।

তারপর মুখটা বেজার ক'রে মারিয়া বললো, 'মফস্বলের এইসব বুড়োখোকাদের জ্বালায় মলাম। জোয়ান বয়সের ছোকরা হ'লেও বুঝতাম। তা নয়, সাত ছেলের বাপ। লোকে জানে, অমন স্বামী হয় না একেবারে ধোয়া তুলসী। পারিবারিক সুখের জলন্ত দৃষ্টান্ত। লোচ্চা লম্পট বলতে আসলে তো এরাই।'

মারিয়া এও বলতে পারতো যে, এইসব কার্ডের একটা অংশ এসেছে অস্তুমুসের কোটনামির কৃপায়। কিন্তু মারিয়া চেপে গেলো।

ছাত্রদের মতো ওরা আজও সেই আটপৌরে হাল্কা খানারই অর্ডার দিলো। খেয়েদেয়ে সোফার ওপর ব'সে পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে তাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিনটার কথা তারা মনে করবার চেষ্টা করলো। মারিয়া মুগ্ধনেত্রে চেয়ে-চেয়ে রুঝিশ্চেভকে দেখতে লাগলো।

মারিয়া বললো, 'গোটা ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘ'টে গেলো। ঠিক স্বপ্নের মতো। আচ্ছা, তোমার আমার প্রথম দেখা হ'লো কীভাবে ? আমার তো মনেই পড়ছে না।'

'আলাপ কীভাবে হ'য়েছিলো সেটা কিছু মনে রাখার মতো ব্যাপার নয়। প্রথম দেখা হয়েছিলো এই রকমেরই একটা কেবিনে। তোমার মনে নেই ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তোমার সঙ্গে দুজন বুড়োমতো লোক ছিলো। তাদের মধ্যে একজন কী রকম যেন খয়াখর্বুটে, দেখে যা হাসি পাচ্ছিলো কী বলবো। নাম বলেছিলো ডাক্তার কিন্দেরবালসাম। আর বলেছিলো তোমার সঙ্গে নাকি সেইদিন সন্ধ্যেতেই সদ্য আলাপ।'

'উঁহু, না মারিয়া। আসলে উনি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিলেন,'—ব'লে রুঝিশ্চেভ হাসতে লাগলো। তারপর বললো, 'তোমাকে বলছি, কাউকে যেন ব'লে দিও না—উনি আমার বাবা। বুঝলে মারিয়া, মানুষটা ভালো—খুব আমুদে। তবে মাঝে-মাঝে মদ খেয়ে একেবারে বেহেড হ'য়ে পড়েন।'

মারিয়া এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোফা থেকে লাফ দিয়ে নেমে

দাঁড়ালো। সারা শরীর তার কাঁপছে, মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। রুদ্ধকণ্ঠে মারিয়া ব'লে উঠলো :

'ও-লোকটা—ও-লোকটা তোমার—বাবা ?'

পাভেল উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধ'রে মারিয়াকে সোফায় বসাবার চেষ্টা করলো। বললো, 'হ্যাঁ, আমার বাবা। দোষ একটু-আধটু থাকলেও আমার বাবা লোক খারাপ নন।'

মারিয়া আবার খুব টেনে-টেনে নিজেকে শোনাবার মতো ক'রে বললো, 'বাবা।' 'বাবা!' ব'লে আবার পাভেলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে একটা চেয়ারের ওপর অসহায়ভাবে ধপাস ক'রে বসে পড়লো।

'কী হয়েছে, মারিয়া ? অমন অবুঝের মতো করছো কেন—।'

কোনো কথা না-ব'লে মারিয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'সে রইলো।

'ছি মারিয়া, ওঁর কথায় অত রাগ করে না। একটা সামান্য কথা নিয়ে—'

দু'হাতে মুখ গুঁজে মারিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

তারপর হাতের মধ্যে মুখ রেখেই পাভেলকে বোঝাবার চেষ্টা করলো : 'ও কিছু নয় ; অমন আমার হ'য়েই থাকে। মাথায় একটা অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। কিছু মনে কোরো না, এক্ষুনি আমাকে বাড়ি চ'লে যেতে হবে। কাল সন্ধেবেলা এখানেই থেকো, সব কিছু মীমাংসা হ'য়ে যাবে। ম্যানেজারের সঙ্গেও ইতিমধ্যে পাকা কথা ব'লে রাখবো। আজ চলি, কেমন ?'

'মারিয়া চলো, আমি তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি।'

মারিয়া সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'না, না, না। কোনো দরকার নেই। তানিয়াই আমাকে দিয়ে আসবে।'

পাভেল মারিয়াকে সাজঘর অবধি এগিয়ে দিয়ে এলো। তানিয়া বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হ'য়ে ব'সে ছিলো। এতটা রাস্তা গাড়িতে মারিয়ার সঙ্গে একা যেতে পারবে জেনে বাড়ি পৌছে দেবার প্রস্তাবে তানিয়া নেচে উঠলো। ওদের দুজনকে রুঝিশেভ গাড়িতে তুলে দিলো। গাড়ি ছেড়ে দেবার পরও অনেকক্ষণ সে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো। বিদায় নেবার সময় মারিয়া ইভানোভনা তার মুখের দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিলো, আবেগের সঙ্গে তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলো। পাভেল এসবের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলো না।

পাভেলকে পেছনে ফেলে গাড়ি একটু এগিয়ে যেতেই মারিয়া কান্নায় ভেঙে

পড়লো। রাস্তার দু'ধারে গিজগিজ করছে লোক; কিন্তু মারিয়ার সে-সব খেয়াল নেই।

তানিয়া ঘাবড়ে গিয়ে তার আরাধনার দেবীকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগলো, 'কী হয়েছে তোমার, মারিয়া ইভানোভনা? আমাকে বলো।'

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তানিয়ার দিকে তাকিয়ে, গালের ওপর থেকে অশ্রুধারা মুছতে মুছতে মারিয়া ধরা গলায় বললো, 'মারিয়া ইভানোভনা ব'লে কেউ নেই আর। সে মরেছে রে, মরেছে। হা ভগবান, পাপের শাস্তি বুঝি এমনি ক'রেই দিতে হয়।'

'বুঝলে মারিয়া ইভানোভনা। পুরুষ জাতটাই ঐ-রকম, কিছুতেই ওদের বিশ্বাস করা চলে না।'

'না রে তানিয়া, তুই যা ভাবছিস তা নয়। পাভেলের খুব উঁচু মন, মানুষটাও খুব খাঁটি। আজ রাত্তিরে তুই আমার কাছে একটু থাক না রে। আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। আমার কী হয়েছে তোকে আমি বলতে পার:বো না।'

প্রমোদোদ্যান থেকে মারিয়া ইভানোভনার বাড়ি খুব বেশি দূর নয়। কয়েকটা মোড় মাত্র পেরোতে হয়। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই মারিয়া অগ্রপশ্চাৎ সমস্ত ভেবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলো। গাড়িতে যেতে-যেতে তার মাথার ভাবনাগুলো যেন তাড়া খেয়ে ফিরছিলো। 'বাবা' এই শব্দটা তার মগজটাকে হাতুড়ি পেটা করছিলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে যেন বাবামশাইটিকে মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলো। শির-শির ক'রে উঠলো মারিয়ার সমস্ত শরীর। লোকটাকে জুটিয়ে এনেছিলো অস্তমুস; বাগানের কেবিনে তার সঙ্গে আলাপ হবার পর মারিয়ার বাড়িতে সে ফুল, মিষ্টি, দামি দামি গয়নাগাঁটি নিয়ে কতবার যে এসেছে তার ঠিক নেই। এই বয়সেও লোকটার রীতিমতো মজবুত শরীর; মফস্বলে থাকে বটে, তবে বুড়োর প্রাণে শখ ষোলোআনা আছে। ডাক্তার কিন্দেরবালসাম মারিয়ার ঘরে রাত কাটিয়ে চ'লে যাবার পর প্রত্যেক বারই টেবিলের ওপর পাউডারের কৌটার তলায় একশো রুব্‌লের একটা ক'রে নোট পাওয়া যেতো। আগুনেপোড়া গনগনে লোহার মতো এইসব স্মৃতি মারিয়ার বুকের ভেতরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগলো। ডাক্তার কিন্দেরবালসামের গলার স্বর এখনও তার কানে লেগে আছে: আজকালকার ছেলেছোকরারা কোনো কর্মের নয়। এখনও ওদের কোমরে ঘুন্‌সী বাঁধার

ঘোড়াটি এবার তার মাথা ঝাঁকালো, একটু নাচলো, তারপর সেইরকমই হেলেদুলে পিছু হটলো; আরোহী আবার তার টুপি খুললো এবং তার অত্যদ্ভুত ঘোড়াটির মুখ ঘুরিয়ে অদৃশ্য হ'লো গির্জার পেছনে।

'জাহান্নমে যাক'—অফিসাররা তাদের আস্তানায় ফিরতে-ফিরতে এই সমবেত কটূক্তিতে গরম হ'য়ে উঠলো। 'এখনো আমরা প্রায় চোখের পাতাই খুলে রাখতে পারছি না। আর ঠিক এই সময় কে এক ফন রাবেক তাঁর চা নিয়ে হাজির হলেন। এই চা-পান যে কী ব্যাপার তা আমাদের হাড়ে-হাড়ে জানা আছে!'

ছ'টা উপদলের অফিসারদের প্রত্যেকেই তখন বিগত এক নিমন্ত্রণের জলজ্যান্ত স্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত। বাহিনী-পরিচালনার সাম্প্রতিক কৌশল প্রয়োগে যখন তারা নিযুক্ত, এর মধ্যে একদিন কাউণ্ট উপাধিধারী স্থানীয় একজন গ্রামীণ ভদ্রলোক, যিনি নিজেও একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, তাঁদের এবং সেই সঙ্গে কশাক সঙ্গীদের চা-পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এবং এই সহৃদয়, অতিথিপরায়ণ কাউণ্ট তাদের অভিভূত করেছিলেন অতি মনোযোগের দ্বারা, আকণ্ঠ ভোজন করিয়েছিলেন, তাদের গলায় অনর্গল ভদ্‌কা ঢেলেছিলেন এবং পরিশেষে তাদের রাত্রিবাস করিয়ে ছেড়েছিলেন। অবশ্য এই সব ব্যাপার-গুলো তারা বেশ উপভোগই করেছিলো কিন্তু মুশকিলটা হ'লো কি, এই বৃদ্ধ সৈনিকের আদর-আপ্যায়নের ঘটা তাঁর অতিথিদের পক্ষে একটু অতিরিক্তই হ'য়ে গিয়েছিলো। তাঁর বিগতকালের লোমহর্ষক সব অভিযান কাহিনীর অবিশ্রান্ত বর্ণনায় তিনি সারারাত ধ'রে তাঁর শ্রোতাদের আনন্দদান করেছিলেন, প্রায় টেনে-হিঁচড়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি তাদের বহুমূল্য সব চিত্রশিল্প, প্রাচীন খোদাই কাজ এবং দুষ্প্রাপ্য অস্ত্রশস্ত্র দর্শন করিয়েছিলেন; গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বহস্তে লেখা চিঠিগুলো তাদের প'ড়ে শোনাতেও তিনি ছাড়েন নি। অবসন্ন অফিসাররা ক্লান্তিতে নির্জীব হ'য়ে সে-সব শুনেছে, মুখব্যাদান করেছে, শয্যার কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছে এবং সন্তর্পণে ঘনঘন হাই তুলেছে আস্তিনের আড়ালে। শেষ পর্যন্ত তাদের আমন্ত্রণকর্তার হাত থেকে যখন তারা মুক্তি পেলো তখন আর শুতে যাবার সময় নেই।

এই ফন রাবেকও যদি সেইরকম আরেকজন বৃদ্ধ কাউণ্ট হ'য়ে থাকেন? কিছুই অসম্ভব না, অনায়াসেই হ'তে পারেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেহেতু অফিসাররা মুখহাত ধুয়ে

জামাকাপড় প'রে ফন রাবেকের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হ'লো। গির্জার মধ্যে থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে তারা জেনে নিয়েছিলো যে পাহাড়টা থেকে নেমে তাদের নদীর মুখ পর্যন্ত যেতে হবে, তারপর নদীর পাড় ধ'রে হাঁটলেই জেনারেলের বাগানে পৌঁছোনো যাবে। সেখান থেকে সোজাসুজি একটা রাস্তা তাঁর বাড়ি অবধি চ'লে গেছে। কিংবা তারা যদি যায়, পাহাড়টা ধ'রে উপর দিকেও যেতে পারে; তাহলে মিয়েস্‌টেশকি থেকে আধ মাইল মতো গেলেই তারা জেনারেলের খামারবাড়িতে পৌঁছোতে পারবে। এই রাস্তাটা ধ'রেই তারা রওনা হ'লো।

'কিন্তু এই ফন রাবেকটি কে বলো তো?' একজন প্রশ্ন করে। "প্লেভনায় এন্‌ অশ্বারোহী বাহিনীর যিনি অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই নাকি?'

'আরে না, তাঁর নাম তো ফন রাবেক নয়, শুধু রাবে—ফন্‌টন্‌ কিছু ছিলো না।'

'আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু চমৎকার।'

প্রথম যে খামারবাড়িটার সামনে তারা পৌঁছোলো সেখান থেকে দুটো রাস্তা দু'দিকে চ'লে গেছে। একটা রাস্তা সোজা গিয়ে আধেক অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, আর অন্যটা গেছে ডানদিকে ঘুরে জেনারেলের বাড়ি পর্যন্ত। বাড়িটার কাছাকাছি এসে অফিসাররা তাঁদের গলার আওয়াজ একটু নিচু করলো। তাদের ডাইনে বাঁয়ে সারি-সারি লাল ইটের ছাদওলা খামারবাড়ি, প্রাদেশিক মফস্বল শহরের সব বাড়ির মতোই বিষণ্ন এবং ভারি তাদের চেহারা। সামনেই ফন রাবেকের বাড়ির আলোকোজ্জ্বল জানলাগুলো দেখা যাচ্ছিলো।

'ভদ্রমহোদয়গণ, একটা শুভ সম্ভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের শিকারি কুকুরটিকে দেখুন, কিসের যেন গন্ধ পেয়ে আগে-আগে চলেছে। সুতরাং সামনেই শিকার!'

যার সম্পর্কে এই কটাক্ষপাত করা হ'লো, তিনি হলেন লেফটেন্যান্ট লোবিটকো। তাঁর বয়স পঁচিশ হ'লেও মুখমণ্ডলে রোমের চিহ্নমাত্র নেই। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে তাঁর একটা বিশেষ খ্যাতি ছিলো যে, ধারে-কাছে কোনো মহিলার উপস্থিতি সে নাকি তার সহজাত বোধশক্তি দিয়ে অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারে।

সঙ্গীর মন্তব্য শুনে সে ঘাড় ফিরিয়ে ব'লে উঠলো, 'ঠিক তাই। নারীসমাগম হয়েছে ওখানে। সেইরকমই বোধ হচ্ছে আমার।'

হলঘরের দরজাটার সামনেই সুপুরুষ এক ভদ্রলোক। বছর ষাটেক বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাঁর চেহারা রীতিমতো শক্তসমর্থ, শাদাসিধে ঘরোয়া পোশাকে তিনি অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। ইনিই ফন রাবেক। তাঁদের করমর্দন করতে-করতে তিনি নিবেদন করলেন যে, যদিও তাঁদের সাক্ষাৎলাভ ক'রে তিনি পরম আনন্দিত, কিন্তু তাঁদের রাত্রিবাস করার জন্যে অনুরোধ করতে পারছেন না ব'লে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর এই অক্ষমতার কারণ—ইতিমধ্যেই তাঁর দুই বোন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা, তাঁর এক ভাই এবং বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন; ফলে, সত্যি বলতে কি, আপাতত তাঁর একটিও বাড়তি ঘর নেই। যদিও তাঁর করমর্দনে, ক্ষমাপ্রার্থনায় এবং স্মিতহাস্যে কোনো ত্রুটি ছিলো না, তা সত্ত্বেও এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে, গত বছরের সেই কাউণ্ট তাদের দেখে যতটা উল্লসিত হয়েছিলেন, ইনি তার অর্ধেকও হন নি, এবং আসলে ভদ্রতার খাতিরেই তিনি তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নরম কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে অফিসাররা তাদের আমন্ত্রণকর্তার কথাবার্তা শুনে এ-কথাটি পুরোপুরিই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলো, এটা উপলব্ধি করতেও তাদের দেরি হয় নি যে, আসলে এ বাড়িতে তারা প্রায় অনধিকার প্রবেশ করেছে; শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসের একটা আবহাওয়াই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে তারা। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো ব্যক্তি যখন তার দুই বোন, তাদের সন্তানাদি, তার ভাই ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্র হ'য়ে নিঃসন্দেহে কোনো পারিবারিক উৎসব-উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, তখন তার পক্ষে উনিশজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অফিসারের আবির্ভাবে আক্রান্ত হ'য়ে কি কিছুমাত্র আনন্দ অনুভব করা সম্ভব?—তারা মনে-মনে নিজেদেরই এই প্রশ্ন করলো।

অনেকটা প্রাক্তন সম্রাজ্ঞী ইউজেনির মতো দেখতে, দীর্ঘকায়া, সুগঠনা একজন বয়স্কা মহিলা, যাঁর মুখটা একটু লম্বাটে ধরনের আর ভুরুগুলো কুচকুচে কালো, বসার ঘরের দরজার সামনে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত মৃদু হাসি দিয়ে আপ্যায়িত ক'রে তিনিও তাদের জানালেন যে, অফিসারদের সঙ্গলাভ ক'রে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত, এবং এটা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয় যে তিনি তাঁদের রাত্রিবাস করার জন্য অনুরোধ করতে পারছেন না। কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সে মুহূর্তেই তাঁর মুখ থেকে সেই ভদ্র, সম্ভ্রান্ত হাসির ছাপ মিলিয়ে গেলো; স্পষ্টতই বোঝা

গেলো যে, অফিসারদের সঙ্গে এই ধরনের সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনে বহুবারই ঘটেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্পর্কে তাঁর কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই ; সেই সঙ্গে এটাও খুব স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র সুশিক্ষা আর সামাজিক পদমর্যাদাই তাঁকে তাদের আমন্ত্রণ জানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

খাওয়ার ঘরটা বেশ বড়ো, সেখানে একটি বড়োসড়ো টেবিলের চারদিকে জনদশেক পুরুষ ও মহিলা চা খাচ্ছিলেন। তাঁদের পিছনে সিগারেটের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন হ'য়ে বেশ কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়েছিলো এবং এদের মধ্যে লাল জুলপিওলা অতি ক্ষীণদেহ একটি যুবক উচ্চস্বরে একটু আধো-আধো উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলছিলো। একটা খোলা দরজা দিয়ে উজ্জ্বল আলোকিত, নীল দেয়াল-কাগজে মোড়া একটা ঘরের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছিলো।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা অনেকে এখানে আছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা ক'রে পরিচয় করিয়ে দেওয়া রীতিমতো শক্ত ব্যাপার, সুতরাং দয়া ক'রে আদব-কায়দা বাদ দিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয় ক'রে নিন।' জেনারেলের চেষ্টাকৃত স্ফূর্তিব্যঞ্জক গলার উচ্চস্বর শোনা গেলো।

আগন্তুকরা সকলেই অত্যন্ত আড়ষ্ট বোধ করছিলো ; তাদের মধ্যে কেউ অতি গম্ভীর, এমনকি প্রায়-কঠোর মুখ ক'রে, আর কেউ কাষ্ঠহাসি হাসতে-হাসতে অভিবাদন জানিয়ে টেবিলের চারপাশে আসন গ্রহণ করলো। বেঁটে, সুগোল-স্কন্ধ, চশমাপরা যে অফিসারটির জুলপি দেখলে একটি বিশেষ জাতের বেড়ালের কথা মনে পড়ে, সেই স্টাফ ক্যাপ্টেন রিয়াবোভিচই এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আড়ষ্ট বোধ করছিলো। তার সহকর্মী অন্যান্য অফিসাররা যখন গম্ভীর মুখ ক'রে অথবা কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে তুলে বসেছিলো তখন তার মুখ, তার জুলপি আর চশমার মধ্যে দিয়ে যেন এই স্বীকারোক্তি ফুটে বেরোচ্ছিলো, 'সমস্ত বাহিনীর মধ্যে আমি হচ্ছি সবচেয়ে ভীরু, নম্র এবং সাধারণ।' টেবিলে এসে বসার পর বেশ কিছুক্ষণ সে এমনকি ভালো ক'রে কোনো কিছুর দিকে তার চোখ ফেলতে পারছিলো না। বিভিন্ন মুখ, পোশাক, পুরু কাচের কন্যাকের বোতল, ফেনিয়ে-ওঠা পানপাত্র, কারুকার্যকরা কার্নিশ—সব কিছু মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে এমন এক দুর্বলতায় তাঁকে অভিভূত করেছিলো যে, রীতিমতো ভীত বোধ করছিলো সে, কোথাও মুখ লুকোতে পারলে যেন সে বাঁচে। অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের মতো সে যেন সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিলো,

কিন্তু কোনো কিছুই আলাদা ক'রে চিনতে পারছিলো না। সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞানীরা যাকে আত্মিক অন্ধত্ব বলেন, সে তখন পুরোপুরি তার দ্বারা আক্রান্ত।

কিন্তু ক্রমশ তার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে রিয়াবোভিচ স্পষ্ট ক'রে সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলো। একজন মুখচোরা অসামাজিক লোকের পক্ষে যা খুব স্বাভাবিক—প্রথমত তার নবপরিচিত বন্ধুদের দুর্দান্ত সপ্রতিভতাই অবাক হ'য়ে লক্ষ করলো সে। ফন রাবেক, তাঁর স্ত্রী, দু'জন প্রৌঢ়া মহিলা, হাল্কা বেগুনি রংয়ের পোশাক-পরা একটি মেয়ে এবং সেই লাল জুলপিওলা যুবকটি, যাকে ফন রাবেকের ছেলে ব'লেই মনে হয়—এঁরা সকলেই এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে অফিসারদের মধ্যে বসেছিলেন যেন আগে থেকেই মহড়া দেওয়া ছিলো তাঁদের, এবং মুহূর্তের মধ্যে এমন সব গরম-গরম তর্কে নিমগ্ন হ'য়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা যে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁদের অতিথিরাও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলো। গোলন্দাজ সৈন্যদের অবস্থা যে আসলে অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অনেক ভালো, বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটি চূড়ান্তভাবে তা প্রমাণিত করলো; ফন রাবেক ও প্রৌঢ়া মহিলা-বৃন্দ সুদৃঢ়ভাবে ঠিক এর উল্টো মতটাই জ্ঞাপন করলেন। কথোপকথন ক্রমশই অসংলগ্ন হ'য়ে উঠতে লাগলো। রিয়াবোভিচ বেগুনি পোশাক পরা মেয়েটির কথা শুনছিলো, মেয়েটি যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে রীতিমতো দুর্দান্ত তর্ক জুড়ে দিয়েছিলো, বোঝাই যায় আসলে সে-সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, কোনো ঔৎসুক্যও তার নেই। তার মুখে যে কপট হাসির রেখা মাঝে-মাঝে ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিলো, রিয়াবোভিচ তাও লক্ষ করছিলো।

ফন রাবেক পরিবার অত্যাশ্চর্য কৌশলে তাঁদের অতিথিদের প্রায় প্রলুব্ধ ক'রে তর্কে টেনে আনছিলেন। এবং তারপর তারা নিজেরা তাদের প্রত্যেকের গেলাশ আর মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখতে মনোযোগ দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকে ঠিকমতো চা পাচ্ছেন তো ? মিষ্টি কম হয় নি ? ইনি বিস্কুট খাচ্ছেন না কেন ? উনি কন্যাক পছন্দ করেন ? এই সব দেখেশুনে রিয়াবোভিচ ক্রমশ এই কপট পরিবারটির শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগলো।

চা-পানের পর অতিথিরা বসার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলো। লোবিটকোর সহজাত বোধশক্তি তাকে ঠকায় নি। সমস্ত ঘরটা ভ'রে অল্পবয়স্ক মহিলা আর তরুণীদের সমাবেশ; এবং এক মিনিটের মধ্যে সেই শিকারি কুকুর নামধারী

লেফটেন্যাণ্টটিকে একটি অতি অল্পবয়সী, কালো পোশাক-পরা, সুকেশী মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। এমনভাবে ঝুঁকে সে দাঁড়িয়েছিলো যেন অদৃশ্য কোনো তরোয়ালের উপর ভর দিয়ে আছে। মাঝে-মাঝেই প্রণয়কুশল ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিলো সে। নিঃসন্দেহে সে খুবই নীরস অর্থহীন কথাবার্তা বলছিলো। কেননা সুশ্রী মেয়েটি প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে তার বিগলিত মুখের দিকে তাকালো, তারপর নিতান্ত নির্লিপ্ত স্বরে ব'লে উঠলো, 'তাই নাকি!' আর সম্ভবত এই নির্লিপ্ত 'তাই নাকি' শুনে অবিলম্বে সেই শিকারি কুকুরটি হৃদয়ঙ্গম করলো যে, ঘ্রাণ অনুসরণে ভুল হয়েছে তার।

বাজনা শুরু হ'লো। ওয়াল্‌ট্‌স্ এর বিষণ্ন সুরের স্পন্দন জানলা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো; একই ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মতো সকলের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে গেলো যে, এটা মে মাসের রাত, জানলার বাইরে এখন ভরা বসন্তকাল; কচি পপ্‌লার-পাতা, গোলাপ আর লাইলাকের সৌরভে বাতাস মদির হ'য়ে আছে, ওয়াল্‌ট্‌স্-এর এই মূর্ছনা আর বসন্তের দাক্ষিণ্যও সম্পূর্ণ অকপট। ওয়াল্‌ট্‌স্ এবং কন্যাকের মিশ্রিত মদিরায় রিয়াবোভিচ কীরকম যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলো। স্মিত মুখে সে জানলার বাইরে তাকালো, তারপর আবার ভেতরে তাকিয়ে মহিলাদের চলাফেরা লক্ষ করতে লাগলো; মনে হ'লো: গোলাপ, পপ্‌লার আর লাইলাকের গন্ধ যেন বাইরের বাগান থেকে নয়, মেয়েদের মুখ আর পোশাক থেকেই নিঃসৃত হ'চ্ছে।

নাচ আরম্ভ হ'লো। ফন রাবেকের পুত্র একটি অতি ক্ষীণকায় মেয়ের সঙ্গে নাচতে-নাচতে সমস্ত ঘরটা দু'বার প্রদক্ষিণ ক'রে এলো; এবং লোবিটকো সেই মসৃণ কাঠে-মোড়া মেঝের উপর পা রেখে প্রায় পিছলে বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটির কাছে চ'লে এসে তার সঙ্গে নাচবার সুযোগ ক'রে নিলো কিন্তু রিয়াবোভিচ ফুলের ঝাড়ের সাজানো দরজাটার কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সেদিকে শুধু তাকিয়ে রইলো। সর্বসমক্ষে ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়ের কোমর ধ'রে যাঁরা আকর্ষণ করতে পারে, সেই দুঃসাহসী ব্যক্তিদের কার্যকলাপে বিস্মিত বিহ্বল হ'য়ে রিয়াবোভিচ নিজেকেও ঐ-অবস্থায় কল্পনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। একটা সময় ছিলো যখন সে তার সঙ্গীদের রীতিমতো ঈর্ষা করতো। তাদের সাহস এবং বেপরোয়া ভাব দেখে ঈর্ষান্বিত হ'তো, যন্ত্রণাদায়ক আত্মবিশ্লেষণে ক্ষতবিক্ষত হ'তো, এবং পরিশেষে গভীর বেদনার সঙ্গে এই সত্যিটা উপলব্ধি করতো যে, সে ভীরু, সুগোলস্কন্ধ এবং

সাধারণ, তাছাড়া, তার জুলপি একটি বিশেষ জাতীয় মার্জার সদৃশ আর কোমরটা অতিরিক্ত লম্বা। কিন্তু কালক্রমে সে নিজের এই অকিঞ্চিৎকরতাকে মেনে নিয়েছিলো এবং আজকের এই নৃত্যরত ও উচ্চকথক ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে সে ঈর্ষা নয়, শুধু এক বিষণ্ণ ভাবাবেগ অনুভব করছিলো।

যে-নাচে একসঙ্গে চারটে জুটির বেশি নাচে না, সেই নাচের প্রথম পালা আরম্ভ হওয়ার পর ফন রাবেকের পুত্র দু'টি অফিসারের কাছে গিয়ে তাদের বিলিয়ার্ড খেলতে আমন্ত্রণ জানালো; অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রিয়াবোভিচের মনে হ'লো যে, এই সর্বজনীন সক্রিয়তায় তারও অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং সে তাদের অনুসরণ করলো। খাবার ঘর পার হ'য়ে, একটা সরু মসৃণ করিডর ধ'রে তারা একটা ঘরে ঢুকলো, যেখানে জনতিনেক পদাতিক সৈন্য ঝিমোতে-ঝিমোতে হঠাৎ তাদের দেখে চম্‌কে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো; তারপর যেন বাড়িটার প্রায় সমস্ত ঘরগুলোই একে-একে অতিক্রম ক'রে অবশেষে তারা একটা ছোট্ট বিলিয়ার্ড ঘরে হাজির হ'লো।

ফন রাবেক আর সেই অফিসার দু'জন খেলতে আরম্ভ করলো। রিয়াবোভিচ, যে তাস ছাড়া অন্য আর-সব খেলা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে উদাসীন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। খেলোয়াড়রা ততক্ষণে কোটের বোতাম খুলে যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে তাদের দণ্ডগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেছে, এদিক-ওদিক বিচরণ করতে-করতে হাস্যপরিহাস করছিলো তারা, এবং মাঝে-মাঝেই খেলার রীতি-সংক্রান্ত দুর্বোধ্য সব বাক্য উচ্চারণ করছিলো। রিয়াবোভিচকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলো তারা, শুধু যখন ঘুরতে-ফিরতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগছিলো কিংবা তাঁদের লাঠি রিয়াবোভিচের শরীর স্পর্শ করছিলো, তখন তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে 'মাপ করবেন' এই সংক্ষেপোক্তি করছিলো তারা। স্বভাবতই খেলা শেষ হওয়ার অনেক আগেই রিয়াবোভিচ অত্যন্ত ক্লান্ত, নিরুৎসুক বোধ করতে লাগলো; সে এখানে নিতান্তই অনাবশ্যক এ-কথাটা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি ক'রে সে বসার ঘরে ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

এই ফিরে আসবার সময়েই সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটায় হঠাৎ জড়িয়ে পড়লো সে। কিছুদূর যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারলো যে, তার পথ ভুল হয়েছে। তিনজন পদাতিক সৈন্য যে-ঘরটায় ব'সে ঝিমোচ্ছিলো সেই ঘরটা স্পষ্ট মনে ছিলো তার, আর প্রায় পাঁচ-ছটা একেবারে খালি ঘর পার হবার

পর সে নিজের ভুল বুঝতে পারলো। যে-পথ দিয়ে এসেছিলো, সেই পথ ধ'রে সে ফিরে চললো; বাঁ দিকে ঘুরতেই একটা প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে এসে পড়লো, যে-ঘরটায় এর আগে কখনোই সে ঢোকেনি। একটু ইতস্তত করার পর সামনে প্রথম যে-দরজাটা তার চোখে পড়লো, সাহস ক'রে সেটা খুলে ফেললো সে; সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাকে গ্রাস করলো। সামনের দিকের দরজাটার ছোটো ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলো উঁকি দিচ্ছিলো; দূর থেকে মাজুরকা নাচের বিষণ্ণ চাপা স্বরমূর্ছনা ভেসে আসছিলো। বসার ঘরের মতো এ-ঘরটার জানলাগুলো খোলা ছিলো, পপ্‌লার, লাইলাক আর গোলাপের গন্ধে ভরা ছিলো ঘরের বাতাস।

দ্বিধাবিমূঢ় অবস্থায় রিয়াবোভিচ দাঁড়িয়ে পড়লো। মুহূর্তের জন্যে সব নিস্তব্ধ। তারপরেই চকিত পদধ্বনি শোনা গেলো। তারপর কোনোরকম পূর্বাভাস না-দিয়েই, পোশাকের খস্‌খস্‌ আওয়াজ, একটি মেয়ের রুদ্ধশ্বাস ফিশ্‌ফিশে কণ্ঠস্বর, 'এতক্ষণে!' আর তারপর কোমল, সুরভিত, নিঃসন্দেহে মেয়েলি দুটি বাহু তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো, তার গালের উপর আরেকটি গালের উষ্ণ স্পর্শ পেলো, এরপরেই সশব্দ একটি চুম্বন তাকে অভিষিক্ত করলো। কিন্তু নৈঃশব্দ্যের মধ্যে এই চুম্বনের সামান্যতম কোনো প্রতিধ্বনি হবার আগেই সেই অপরিচিতার তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেলো আর রিয়াবোভিচের মনে হ'লো যেন প্রবল এক বিতৃষ্ণায় মুহূর্তের মধ্যেই সে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। রিয়াবোভিচ নিজেও প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো; দরজার ফাঁক দিয়ে আসা আলোকরেখা লক্ষ ক'রে সোজাসুজি ছুটলো সে।

বসার ঘরে ঢোকবার পর সে তার হৃৎস্পন্দনের তীব্রতা অনুভব করলো; এত স্পষ্টভাবে তার হাত কাঁপছিলো তখন যে, সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত পেছনে লুকোলো। প্রথমত যে-আবেগ তাকে অভিভূত করেছিলো তা হ'লো লজ্জা, যেন এই ঘরের প্রতিটি লোক ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে, একটু আগেই কেউ তাকে আলিঙ্গন করেছিলো, তাকে চুম্বন করেছিলো। জড়োসড়ো হ'য়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ব'সে সে ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু গৃহকর্ত্রী এবং অতিথিরা সকলেই এমন শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসেছিলো অথবা কথাবার্তা বলছিলো যে, তার সাহস ফিরে এলো। ক্রমশ অনাস্বাদিতপূর্ব এক ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে সে আত্মমগ্ন হ'য়ে গেলো। যা ঘটেছে তার উদাহরণ বিরল। তার ঘাড়, যেখানে সে অল্পক্ষণ

আগেই সেই কোমল, সুরভিত দুটি বাহুর আলিঙ্গনস্পর্শ পেয়েছিলো, এখনো যেন তৈলসিক্ত। তার বাঁ দিকের গোঁফের কাছেই, যেখানে সেই চুম্বন গ্রহণ করেছিলো সে, অত্যন্ত মৃদুভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো, পেপারমিন্টের ফোঁটা ফেললে যেমন হয়, ঠিক সেইরকম ঠাণ্ডা সুখকর অনুভূতিজনিত যেন সেই কম্পন। আর তার আপাদমস্তকের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যেন সম্পূর্ণ নতুন সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুরণিত হচ্ছিলো, ক্রমশ এই অনুভূতিগুলো আরো বাড়তে শুরু করলো, ছড়িয়ে পড়লো। তার মনে হ'লো যেন এক প্রবল উন্মাদনায় এক্ষুনি সে নেচে উঠবে, মুখর হ'য়ে উঠবে, ছুটে বাগানে বেরিয়ে গিয়ে ফেটে পড়বে উদ্দাম, অসংযত হাসিতে। তার গোল কাঁধ, তার বৈশিষ্ট্যহীনতা আর বেড়ালের মতো জুলপির কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেলো সে, ভুলে গেলো হঠাৎ কানে-আসা এক ভদ্রমহিলার মুখের সেই মন্তব্য—তার নাকি নিতান্তই 'অনির্দিষ্ট গড়ন'। শ্রীমতী ফন রাবেক যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে, এমন উদার এবং সদয় এক হাসিতে সমস্ত মুখ ভরিয়ে সে তাঁকে আপ্যায়িত করলো যে, তিনি কাছে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

চশমাটাকে সোজা করতে-করতে সে ব'লে উঠলো, 'আপনার বাড়িটি চমৎকার।' শ্রীমতী ফন রাবেক প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে জানালেন যে, এখনো তাঁর বাবাই আসলে এ-বাড়ির মালিক; তারপর, রিয়াবোভিচের বাবা-মা বেঁচে আছেন কিনা, কতদিন ধ'রে সে সেনাবাহিনীতে আছে, সে এত রোগা কেন ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন করলেন তিনি। প্রশ্নগুলির জবাব শোনার পরই তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। কিন্তু এই বাক্যালাপ শেষ হ'য়ে যাওয়ার পরও তার সারা মুখ এক পরম সদাশয় হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে রইলো। ব'সে-ব'সে সে ভাবতে লাগলো, কী চমৎকার সব লোকের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হ'লো আজ।

রাত্রের খাওয়া খেতে ব'সে রিয়াবোভিচের সামনে যা পরিবেশন করা হ'লো যান্ত্রিকভাবে তা-ই সে পান করলো আর খেয়ে নিলো। কোনো কথাই কানে ঢুকলো না, তার সেই রহস্যময় আর রোমাঞ্চকর অভিযানের মর্মোদ্ধার করার জন্যে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলো। কী ব্যাখ্যা হ'তে পারে এর? এটা খুবই স্পষ্ট যে সমবেত মেয়েদের মধ্যে কোনো একজনের অন্ধকার ঘরে কারুর সঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিলো, বেশ কিছুক্ষণ ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর সন্ত্রস্ত উত্তেজনায় সে রিয়াবোভিচকে তার নায়ক ব'লে ভুল

করেছিলো। ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কেননা ঐ অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকেই রিয়াবোভিচ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, যেন সে-ও কারুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। এই পর্যন্ত রহস্যটির একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

'কিন্তু এদের মধ্যে কোনজন?' সমবেত মহিলাদের মুখের উপর দিয়ে তার সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে থাকে। তার বয়স নিশ্চয়ই কম। কেননা বয়স্ক মহিলারা কখনোই এই ধরনের প্রেমাভিসারে লিপ্ত হয় না। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই পরিচারিকাদের মধ্যে কেউ নয়—তার পোশাকের জমকালো খস্‌খস্‌ আওয়াজ, সেই ঘ্রাণ, সেই কণ্ঠস্বর তার নির্ভুল প্রমাণ।

বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটির দিকে তাকালো সে, আর মেয়েটিকে তার বেশ ভালোই লাগলো; তার কাঁধ ও বাহুদুটি অত্যন্ত সুন্দর, মুখখানি বেশ চালাক চতুর আর ভারি চমৎকার তার কণ্ঠস্বর। রিয়াবোভিচ সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানালো এ-ই যেন সে হয়। কিন্তু এমন এক কপট হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে হঠাৎ তার লম্বা নাক কুঁচকালো যে তৎক্ষণাৎ তাকে অনেক বয়স্ক ব'লে মনে হ'লো। সুতরাং রিয়াবোভিচ চোখ ফেরালো কালো পোশাক-পরা স্বর্ণকেশীর দিকে। এই সোনালি চুল রুক্ষ মেয়েটির বয়স আরো কম, আরো অনেক সরল আর আন্তরিকও মনে হ'লো তাকে। ভারি সুন্দর থোকা-থোকা কোঁকড়ানো চুল তার। পানপাত্র হাতে নিয়ে অনির্বচনীয় এক লাবণ্যময় ভঙ্গিতে সে তাতে চুমুক দিচ্ছিলো। রিয়াবোভিচের আশা হ'লো এ-ই বোধ হয় সে—কিন্তু একটু পরেই লক্ষ করলো যে, নিতান্তই শাদামাটা তার মুখ; অতঃপর তার প্রতিবেশীর দিকে রিয়াবোভিচ তার চোখ সরিয়ে নিলো।

'এই ধাঁধার সমাধান করা একেবারেই দুঃসাধ্য।' মনে-মনে ভাবতে লাগলো সে, 'যদি বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটির কাঁধ ও বাহু, সোনালি চুলওলা মেয়েটির কোঁকড়ানো চুল আর লোবিটকোর বাঁদিকে উপবিষ্ট মেয়েটির চোখদুটি নেওয়া যায়, তাহ'লে—'

এই সমস্ত সৌন্দর্যগুলোকে একত্র ক'রে সে একটি কল্পচিত্র রচনা করলো, আর তারপর যে-মেয়েটি তাকে চুম্বন করেছিলো তার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। কিন্তু কোথাও সে মেয়ের দেখা পাওয়া যাবে না।

আহারাদি শেষ হ'লো, অতিথিরা ভোজনতৃপ্ত এবং কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাদের আমন্ত্রণকর্তৃবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। আমন্ত্রণকর্তা

এবং কর্ত্রী তাদের রাত্রিবাস করতে অনুরোধ জানাতে না-পারার জন্যে আবার মার্জনাভিক্ষা করলেন।

জেনারেল বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি. সত্যিই অত্যন্ত খুশি হয়েছি।' আর এবার তাঁর এই উক্তি রীতিমতো আন্তরিক ব'লেই মনে হ'লো; বলাই বাহুল্য যে, অবাঞ্ছিতাদের স্বাগত জানানোর চেয়ে বিদায়ী অতিথিদের তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক বেশি সহৃদয় হওয়াই স্বাভাবিক। 'সত্যি, ভীষণ খুশি হয়েছি আমি। আশা করি, ফেরবার পথে দয়া ক'রে আর একবার আপনারা আমার বাড়িতে পদার্পণ করবেন। কোনোরকম কেতাদুরস্ত ভদ্রতার দরকার নেই। কোনদিক দিয়ে ফিরবেন আপনারা? পাহাড়টা চড়াই হ'য়ে? না, তার চেয়ে বরং পাহাড়টা ধ'রে নিচে নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে যান। ওটাই সংক্ষিপ্ত পথ।'

অফিসার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করলো। বাড়ির ভেতরকার চোখ-ধাঁধানো আলো আর হৈচৈ-এর পর বাগানটাকে কেমন অন্ধকার, নিঃসাড় বলে মনে হচ্ছিলো। ছোট গেটে পৌঁছোনো পর্যন্ত সবাই চুপ ক'রে রইলো। বেশ ফুর্তির মেজাজে ছিলো তারা সবাই; কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত এবং পরিতৃপ্ত। অন্ধকার নিস্পন্দ রাত্রি তাদের মনে আনমনা সব ভাবনার উদ্রেক করছিলো। রিয়াবোভিচের মতো তাদের সকলের মাথার মধ্যেই সম্ভবত একই প্রশ্ন দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছিলো। এমন দিন কি সত্যই আসবে কখনো, যখন ফন রাবেকের মতো আমারও এই রকম বিরাট একটি বাড়ি থাকবে। থাকবে ঠিক এই রকম একটি পরিবার, একটি বাগান; আর থাকবে অন্যদের প্রতি মহানুভব হওয়ার, এমনকি যদি তা কপটও হয়, এই রকম সুযোগ, তাদের পরিতৃপ্ত, নেশাগ্রস্ত এবং সন্তুষ্ট করতে পারার এই আত্মতৃপ্তি?

কিন্তু বাগানটা ছাড়িয়ে এসেই এক সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো তারা, আর অকারণ হাসিতে ফেটে পড়লো। যে-রাস্তাটা ধ'রে তারা যাচ্ছিলো সেটা সোজাসুজি নদী পর্যন্ত গিয়ে তারপর তার ধার ঘেঁষে চ'লে গেছে; ঝোপঝাড় খানাখন্দ আর মাথার উপর ঝুলে-থাকা উইলো গাছের চার পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গেছে পথটা। পথটা ভালো ক'রে দেখা যাচ্ছিলো না, নদীর অপর পাড়টা অন্ধকারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে। তবু নদীর কালো জলে মাঝে-মাঝে তারার আলো ঝিকমিক্ ক'রে উঠে আভাস দিচ্ছিলো নদীর প্রবহমানতার। ওদিক থেকে একটি নিদ্রাতুর কাদাখোঁচা পাখির দীর্ঘনিশ্বাস

শোনা গেলো, আর তাদের ঠিক পাশেই একটি ঝোপের মধ্যে থেকে একটি নাইটিঙ্গেল আগন্তুকদের ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলো। অফিসাররা সবাই একসঙ্গে জড়ো হ'য়ে ঝোপটাকে নাড়া দিলো কিন্তু নাইটিঙ্গেলটি গান গেয়েই চললো।

'আরে, পাখিটার কীরকম আস্পর্ধা দেখেছো!' সপ্রশংসভাবে তারা বলাবলি করতে লাগলো। 'গ্রাহ্যই করলো না কাউকে! পাকা শয়তান একেবারে।'

তাদের পথ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিলো; এখান থেকে রাস্তাটা ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে, তারপর মিশেছে গির্জার ঘেরা জমির অদূরে এক পথের সঙ্গে। এতখানি উৎরাইয়ের পর এখানে পৌঁছে পরিশ্রান্ত অফিসাররা ঘাসের উপর ব'সে ধূমপান করতে লাগলো। নদীর ওপারে একটা নিস্তেজ লাল আলো দেখা যাচ্ছিলো, আলোচনার অন্য কোনো বিষয় না-থাকায়, এই আলোটা কিসের—কোনো উৎসব উপলক্ষে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড, জানলার আলো, নাকি অন্য কিছু—এই সমস্যা নিয়ে তারা তর্ক করতে শুরু করলো। রিয়াবোভিচও সেই আলোটার দিকে তাকালো, আর মনে হ'লো যেন মৃদু হেসে সেটা চোখ টিপলো তাকে, যেন সেই চুম্বনের কথাটা তার জানা।

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি পোশাক ছাড়লো সে, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়লো। সে ছাড়া আরো দু'জন থাকতো সেই ঘরে—লোবিটকো এবং লেফটেন্যাণ্ট সেরজলিয়াকভ ব'লে চুপচাপ শান্ত প্রকৃতির ছোটখাটো এক ভদ্রলোক, অত্যন্ত মার্জিতস্বভাব ব'লে সুনাম ছিলো তার। 'ইয়োরোপের ভগ্নদূত' ব'লে একটা বই সদাসর্বদা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতো সে এবং সর্বক্ষণই সেটা পড়তো। লোবিটকোও পোশাক ছাড়লো, তারপর ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত অধীর পদচারণা শুরু ক'রে দিলো। শেষপর্যন্ত চাকরকে ডেকে বীয়ার আনতে পাঠালো। সেরজলিয়াকভ শুয়ে পড়লো, মোমবাতিটিকে বালিশের ওপর সিধেভাবে দাঁড় করালো। তারপর তার মাথাটা ঢাকা পড়লো 'ইয়োরোপের ভগ্নদূত'-এর আড়ালে।

ঘরটার ঝুলকালো ছাদের দিকে তাকিয়ে রিয়োবোভিচ ভাবলো 'এখন সে কোথায়! তার ঘাড়টা এখনো যেন তৈলসিক্ত, আর মুখের কাছে ছোট্ট একটা জায়গায় এখনো যেন পেপারমিণ্টের ঠাণ্ডা স্পর্শানুভূতির কম্পন। সেই বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটির কাঁধ আর বাহু কালো পোশাক-পরা মেয়েটির কোঁকড়ানো চুল আর সরল দুটি চোখ, কটিদেশ বিচিত্র পোশাক, আর ব্রুচ্

—তার মাথার মধ্যে একের পর এক এই সব ছবি ঝিলিক দিয়ে উঠছিলো। কিন্তু যদিও সে এই ক্ষণস্থায়ী ছবিগুলো স্থিরভাবে সাজাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলো, তারা যেন ক্রমশ আবছা হ'য়ে দপ্‌দপ্‌ ক'রে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছিলো। আর ক্রমশ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে যখন তারা একেবারে মিলিয়ে গেলো, সেই বিরাট কালো পর্দায় চোখ বন্ধ করলে সব মানুষের চোখের সামনেই যা ঝুলে থাকে, তখন যেন ত্রস্ত পায়ের আওয়াজ কানে এলো তার, তারপরেই পেটিকোটের খস্‌খস্‌ আওয়াজ আর একটি চুম্বনের শব্দ। তীব্র, অকারণ এক আনন্দ তাকে অভিভূত করলো। কিন্তু আনন্দের এই আস্বাদনে মগ্ন হবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোবিটকোর ভৃত্য এসে জানালো যে, বীয়ার এখন পাওয়া যাবে না। লেফটেন্যাণ্ট আবার ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অধীর পায়চারি শুরু করলো।

'লোকটা একটা বুদ্ধু,' প্রথমে রিয়াবোভিচ এবং পরে সেরজলিয়াকভের সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলো লোবিটকো। 'একেবারে নিতান্ত হাঁদা আর গবেট ছাড়া এমন কেউ নেই যে বীয়ার যোগাড় করতে পারে না! ব্যাটা বদমাইশ।'

'ইয়োরোপের ভগ্নদূত' থেকে চোখ না-সরিয়েই সেরজলিয়াকভ জানালো, 'এখানে যে বীয়ার পাওয়া যায় না এ-কথা সবাই জানে।'

'তুমি বিশ্বাস করো এই কথা!' লোবিটকো চেঁচিয়ে ওঠে, 'হে ঈশ্বর,—আরে চাঁদে পাঠিয়ে দাও না আমাকে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি বীয়ার আর মেয়ে-মানুষ দুই-ই আমি যোগাড় করতে না পারি তো কী বলেছি। আমি নিজে যোগাড় করবো। না পারলে শালা ব'লো আমাকে।'

ধীরে-ধীরে পোশাক প'রে সে নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরায়, তারপর বেরিয়ে যায়।

'রাবেক, গ্রাবেক, লাবেক,' হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করতে থাকে সে, 'ধুত্তেরি, একা যাওয়া চলবে না, গোল্লায় গেছি আমি। ও রিয়াবোভিচ, একটু হেঁটে আসি চলো, কী বলো?'

কোনো জবাব না পেয়ে সে ফিরে এলো, ধীরে-ধীরে পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়লো। সেরজলিয়াকভ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে 'ইয়োরোপের ভগ্নদূত' নামিয়ে রেখে আলো নিভিয়ে দিলো। অন্ধকারের মধ্যে জোরে-জোরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বিড়বিড় করলো লোবিটকো, 'তাহ'লে?'

রিয়াবোভিচ বিছানায় চাদরটা তার চিবুক পর্যন্ত টেনে আনলো। কুঁকড়ে গুটিয়ে নিলো সে নিজেকে, আর তারপর আবছা অসংলগ্ন ছবিগুলোকে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবির কাঠামোয় সুসংবদ্ধ করার জন্যে প্রবল কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করতে লাগলো। কিন্তু সে-ছবি কিছুতেই ধরা দিলো না তার চোখে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো; ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে যে-বোধ তাকে আচ্ছন্ন করেছিলো তা হ'লো, কেউ যেন আশ্লেষে আবদ্ধ ক'রে আদরে অভিভূত ক'রে দিচ্ছে তাকে, যেন তার জীবনে অজানা একটা কিছু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, এমন একটা কিছু আসলে যা হয়তো নিতান্ত হাস্যকর কিন্তু যার মতো ভালো আর কিছুই হ'তে পারে না, অসামান্য যেন তার দ্যুতি। এমনকি, স্বপ্নের মধ্যেও তার এই ভাবনা তাকে পরিত্যাগ করেনি।

যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন সেই তৈলসিক্ত ভাব আর পেপারমিণ্টের ঠাণ্ডা অনুভূতি একটুও ছিলো না। কিন্তু গতরাত্রের মতো আজও এক সুখের অনুভূতি তার প্রতিটি শিরায় ছড়িয়ে ছিলো। ভোরের সূর্য জানলার কাচগুলোয় সোনা ঝরাচ্ছিলো, যেন প্রবল এক আনন্দে অভিভূত হ'য়ে সে সেদিকে তাকিয়ে রইলো, আর বাইরের আওয়াজ শুনতে লাগলো। জানলার ঠিক নিচেই খুব উঁচু গলায় একজন কথা বলছিলো। লোকটি লেবেদেৎস্কি, এই বাহিনীর অধিনায়ক—খুব সম্প্রতি সে এই কার্যভার হাতে নিয়েছে। সার্জেণ্ট-মেজরের সঙ্গে কথা বলছিলো সে; গলার স্বর খুব উঁচু পর্দায় কেননা নিচু গলায় কথা বলতে সে বিশেষ অভ্যস্ত নয়।

তারপরই লোকটি গর্জন ক'রে উঠলো।

'গতকাল হুজুর, নাল পরানোর সময় গোলুবচিককে বেঁধানো হয়েছে। ডাক্তার সাহেব মাটি এবং ভিনিগার চেয়ে পাঠিয়েছেন। আর গতকাল রাত্রে, হুজুর, আর্টেমিয়েফ ব'লে একজন মিস্ত্রি একদম মাতাল হ'য়ে পড়েছিলো— লেফটেন্যাণ্ট তাকে কামানবাহী গাড়ির যে অংশটা আলাদা করা যায়, সেখানে বন্ধ ক'রে রাখবার আদেশ দিয়েছেন।'

সার্জেণ্ট-মেজর আরো জানালো যে, কাপড় ও তাঁবুর পেরেক, নতুন দড়িদড়া ইত্যাদি আনতে ভুলে গেছে এবং অফিসাররা সকলে সেদিন সন্ধেটা ফন রাবেকের বাড়ি কাটিয়েছে। একটু পরেই জানলা দিয়ে লেবেদেৎস্কির লাল দাড়িওলা মুখটা দেখা গেলো। চোখে ভালো দেখতে না-পারার দরুন চোখ পিট্‌-পিট্‌ করতে-করতে সে শয্যাশায়ী আধ-ঘুমন্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানালো।

'সব ঠিক আছে তো?'

'গাড়িতে যোতবার সময় নতুন জোয়ালের ঘষা লেগে জিন্-দেওয়া ঘোড়াটার কাঁধের কাছটা ছ'ড়ে গেছে।' লোবিটকো উত্তর দিলো।

অধিনায়ক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবলেন, তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি ভাবছি আলেকজান্দ্রা ইয়েগোরোভনার কাছে একবার যাবো। ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। আচ্ছা, চললাম। রাত্রের আগেই তোমাদের আমি ধ'রে ফেলব।'

মিনিট পনেরো পরে সৈন্যবাহিনী আবার তাদের যাত্রা শুরু করলো। ফন রাবেকের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রিয়াবোভিচ ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো। শার্শিগুলো সব বন্ধ, বোঝাই যাচ্ছে যে, সবাই এখনো ঘুমন্ত। আর তাদের সকলের মধ্যে সে-ও ঘুমোচ্ছে—সে, যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই তাকে চুম্বন করেছিলো। সে তার নিদ্রিত অবস্থার ছবিটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলো। মনে-মনে সেই শোবার ঘরের যে-ছবিটা সে ফুটিয়ে তুললো, তার জানলাগুলো সম্পূর্ণ খোলা, সবুজ গাছের ডাল সেই জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে; ভোরের হাওয়ার নিষ্কলুষতা, পপ্লার, লাইলাক আর গোলাপের গন্ধ, বিছানাটা, একটা চেয়ার, গতকাল রাত্রে যার খস্খস্ আওয়াজ শুনেছিলো সেই পোশাকটা, একজোড়া ছোট্ট চটি, টেবিলের উপর একটা ঘড়ির টিক্‌টিক—এই সমস্তই খুঁটিনাটিসহ সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হ'লো তার সামনে। কিন্তু সেই মুখের গঠন, সেই কোমল, নিদ্রাতুর স্মিত হাসি—তার কল্পনাকে কেবলই ফাঁকি দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো, ঠিক যেমন রুপোর চাকতিগুলো তার হাত থেকে উড়ে যায়। প্রায় আধ-মাইল খানেক গিয়ে সে আবার ঘাড় ফেরালো। সবুজ গির্জা, সেই বাড়ি, চারপাশের বাগান, নদী—সব যেন আলোয় স্নান করছে। সবুজ পাড়ে-ঘেরা নদীর জলে প্রতিফলিত হচ্ছে হাল্কা নীল রঙের আকাশ। রুপোলি রোদের চুমকি-ছড়ানো নদীটা যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো বলা যায় না; আর, শেষবারের মতো, মিয়েস্‌টেশ্‌কির দিকে তাকিয়ে রিয়াবোভিচের মন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো, যেন চিরকালের মতো সে তার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, প্রিয় কোনো কিছুকে ছেড়ে যাচ্ছে।

তার সামনে যে-রাস্তা প'ড়ে আছে, তার চারদিকে ছড়ানো অতিপরিচিত দৃশ্যগুলোর দিকে সে তার নিরুৎসুক দৃষ্টি মেলে ধরলো; ডাইনে-বাঁয়ে কচি রাই

আর গমের ক্ষেতে কাক ইত্যাদি পাখি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ; সামনে ধুলো আর তার সঙ্গীদের ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ ; পেছনে সেই ধুলো আর অগুনতি মুখ। মিছিলের একেবারে সামনে চারজন তরোয়ালধারী সৈনিক কুচকাওয়াজ ক'রে যাচ্ছিলো—তারাই হ'লো অগ্রগামী প্রহরীদল। তারপরেই ব্যাণ্ডবাদকেরা। অগ্রগামী প্রহরী এবং ব্যাণ্ডবাদকেরা, ঠিক শবযাত্রায় শবানুগমনকারীদের মতোই, নিয়মমাফিক ব্যবধান না-মেনে বেশি আগে-আগে কুচকাওয়াজ করছিলো। রিয়াবোভিচ ছিলো পাঁচ নম্বর ব্যাটারির প্রথম কামানটার সঙ্গে, তার সামনে আরো চারটে ব্যাটারিকে দেখতে পাচ্ছিলো সে।

একজন সাধারণ অজ্ঞ লোকের কাছে গোলন্দাজবাহিনীর এই সুদীর্ঘ ঠাশাঠাশি-করা পদযাত্রা বেশ অভিনব, কৌতূহলোদ্দীপক আর অবোধ্য ব'লে মনে হবে। কেন একটি কামানের জন্যে এতগুলো লোকের প্রয়োজন হচ্ছে, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। আর তাছাড়া কেনই বা তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এইরকম অদ্ভুত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত, এতগুলো ঘোড়ার দরকার। কিন্তু রিয়াবোভিচ নিজে এ-সব ব্যাপারে পুরোপুরিই ওয়াকিবহাল, এই সমস্ত কিছুই তার অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিলো। বহু বছর আগেই তার শেখা হ'য়ে গেছে, কেন একজন জাঁদরেল সার্জেণ্ট মেজর সর্বদাই প্রত্যেক ব্যাটারির সম্মুখবর্তী অফিসারের ঠিক পাশে অশ্বারোহী অবস্থায় বিরাজ করে, কেন সার্জেণ্ট-মেজরকে unosin বলা হয়, কেনই বা গাড়ির চালকেরা তাদের পেছনে-পেছনে যায় ; রিয়াবোভিচ এটাও জানে যে, কেন নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী ঘোড়াগুলোকে আলাদা নামে ডাকা হয়—এবং একসময়ে এই সমস্তই রীতিমতো চিত্তাকর্ষক বলে ম'নে হ'তো তার। একটা চাকাগাড়ির উপর একজন সৈন্য চ'ড়ে যাচ্ছিলো, যার সর্বাঙ্গ এখনো গতকালের ধুলোয় আচ্ছাদিত, তার ডান পায়ের কাছেই একটা কিম্ভূত মজার চেহারার ঢালের মতো কী দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু রিয়াবোভিচ যেহেতু পা আড়াল করার জন্যে এই ঢালটার কী প্রয়োজন তা জানে, সেহেতু এর মধ্যে সে অদ্ভুত কিছুই দেখতে পেলো না। চালকেরা যান্ত্রিকভাবে এবং কখনো-কখনো চীৎকার ক'রে উঠে তাদের চাবুক আস্ফালন করছিলো। কামানগুলো অবশ্য মনে বেশ দাগ কাটে। কামান-বাহী গাড়ির সামনের অংশে ত্রিপল ঢাকা-দেওয়া একগাদা জইয়ের বস্তা গাদা-গাদি ক'রে রাখা ছিলো ; সর্বাঙ্গে ঝোলানো চায়ের পট আর ঝোলাঝুলিতে ভরতি কামানগুলোকে দেখে মনে হয় যেন আসলে সেগুলো নিরীহ কোনো

জন্তু, কী এক দুর্বোধ্য কারণে অনেক ঘোড়া এবং লোকজন যাদের ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। কামানের আচ্ছাদিত অংশের দিকে দু'জন গোলন্দাজ হাত দোলাতে-দোলাতে এগোচ্ছিলো, আর প্রত্যেক কামানের পেছনে-পেছনে আসছিলো আরো নানারকম গাড়ি আর লোকজন; আর তারপরে আরো কামান, প্রত্যেকটাই তার সামনের কামানটার মতোই কুশ্রী আর নিরুৎসাহ-জনক। এবং যেহেতু বাহিনীর ছটা ব্যাটারির প্রত্যেকটার সঙ্গেই চারটে ক'রে কামান, সেহেতু প্রায় আধ মাইল রাস্তা জুড়ে মিছিলটা চলেছিলো। একদম শেষে ছিলো একটা মালবোঝাই গাড়ি, সেটার সঙ্গে মাথা নিচু ক'রে চলেছিলো মাগার নামে একটা গাধা, টার্কি থেকে ব্যাটারি কম্যাণ্ডার যাকে নিয়ে এসেছিলো।

সমস্ত পারিপার্শ্বিক রিয়াবোভিচকে যেন একটুও স্পর্শ করছিলো না; সামনের দিকে অথবা পেছনের মুখগুলোর দিকে নিরুৎসুক দৃষ্টি ফেলে সে এগিয়ে চললো। গতরাত্রের সেই ঘটনাটা না-ঘটলে, ইতিমধ্যে সে অর্ধ-নিদ্রিত হ'য়ে পড়তো। কিন্তু এখন সে অভিনব এক ভাবনার মোহাবেশে মগ্ন হ'য়েছিলো। সকালবেলা যখন বাহিনীটা যাত্রা শুরু করলো, তখন সে নিজেকে এই ব'লে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলো যে, অত্যন্ত তুচ্ছ, যদিও বেশ রহস্যময়, একটা রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা ছাড়া ঐ-চুম্বনের কিছুমাত্র গুরুত্ব নেই; কোনো বাস্তব ফলাফল নেই এর; এবং এটা নিয়ে এত গুরুতরভাবে চিন্তা করা তার পক্ষে রীতিমতো হাস্যকর আচরণ হচ্ছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত যুক্তিগুলো উধাও হ'য়ে গেলো, আর যাওয়ার আগে তার সুস্পষ্ট কল্পনার হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে গেলো। কখনো সে নিজেকে দেখতে পেলো ফন রাবেকের খাবার ঘরে, যেন ছোট্ট নিবিড় একটা সমাবেশে ব'সে সে গল্পগুজব করছে, বেগুনি পোশাক-পরা মেয়েটি আর কালো পোশাক-পরা সেই স্বর্ণকেশী ছাড়া সে-আড্ডায় আর কেউ নেই; কখনো বা সে চোখ বুজে নিজেকে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে কল্পনা করলো। সে মেয়েটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তার মুখাবয়ব নিতান্তই আবছা তার কাছে; সে যেন সেই মেয়েটির সঙ্গে কথা বললো, তাকে আলিঙ্গন করলো, ঝুঁকে পড়লো তার কাঁধের উপর; সে যুদ্ধের কল্পনা করলো, এবং বিদায়ের …আর, তারপর, পুনর্মিলন, একসঙ্গে তাদের দুজনের প্রথম রাত্রির খাওয়া, তাদের সন্তান……

'ব্রেক লাগাও,' অধিনায়কের উঁচু গলা শোনা গেলো, তারা তখন পাহাড়-গুলোর ঠিক চূড়োয় পৌঁছেছে।

রিয়াবোভিচও চেঁচালো 'ব্রেক লাগাও,' প্রত্যেকবার চেঁচাবার সময়েই তার মনে হচ্ছিলো যেন যে সম্মোহনে সে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, এই চীৎকার তাকে টুক্‌রো ক'রে দেবে, বাস্তবে ফিরিয়ে আনবে তাকে।

একটা বড়ো খামারবাড়ির পাশ দিয়ে তারা এগিয়ে চললো। রিয়াবোভিচ ওপাশে বাগানটার মধ্যে তাকালো, দেখলো যে, একটা লম্বা, সোজা পথ, একটা লাইন-টানার রুল-কাঠির মতোই সোজা, সামনে চ'লে গেছে, হলুদ বালির গালিচা-বিছানো পথটা ছোটো-ছোটো বার্চ গাছের ছায়ায় ঢাকা। তীব্র একটা আনন্দে অভিভূত হ'য়ে হঠাৎ সে যেন দেখতে পেলো ছোট্ট দু'টি মেয়েলি পা সেই বালির উপর দিয়ে হাঁটছে; যেন বিদ্যুৎচমকের মতো তার কল্পনা ফিরিয়ে নিয়ে এলো সেই মেয়েটিকে যে তাকে চুম্বন করেছিলো, গতরাত্রে খাওয়ার পর সে তার মানসচক্ষে যার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলো। ছবিটা তার মস্তিষ্কের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে গেলো, আর তারপর থেকে কখনোই সে আর তাকে ছেড়ে গেলো না।

এই মোহাবেশ দুপুর পর্যন্ত তাকে আচ্ছন্ন করেছিলো, হঠাৎ মিছিলের শেষ প্রান্ত থেকে একটা জোর গলার আদেশ শোনা গেলো।

'মনোযোগ দিন! ডানদিকে চোখ ফেরান! অফিসারগণ!'

দু'টি শাদা ঘোড়ায়-টানা একটি গাড়িতে চ'ড়ে বাহিনীর জেনারেল আবির্ভূত হলেন। দ্বিতীয় ব্যাটারির সামনে তিনি থামলেন এবং একটা কিছু বললেন যা কেউই বুঝতে পারলো না। দুল্‌কি চালে কয়েকজন অফিসার এগিয়ে গেলো, রিয়াবোভিচও ছিলো তাদের মধ্যে।

'তারপর, কী রকম চলছে সব?' লাল চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে-করতে জেনারেল প্রশ্ন করলেন, তারপর যোগ করলেন, 'কেউ অসুস্থ-টসুস্থ হয়েছে নাকি?'

উত্তরটা শুনে সেই ছোট্টখাট্ট শীর্ণ জেনারেল কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর একজন অফিসারের দিকে ফিরে ব'লে উঠলেন, 'তোমার তৃতীয় কামান গাড়ির চালক তার পায়ের কাছ থেকে ঢালটাকে সরিয়ে গাড়ির সামনের অংশে টাঙিয়ে রেখেছে। ব্যাটা বদমাইশ! ওকে সাজা দাও!'

তারপর চোখ তুলে তিনি রিয়াবোভিচের দিকে তাকালেন, বললেন 'আর তোমার ব্যাটারিতে মনে হচ্ছে বর্শাচ্ছাদনটা আলগা হ'য়ে গেছে।'

এইরকম আরো গোটাকতক ক্লান্তিকর মন্তব্য ক'রে তিনি লোবিটকোর দিকে ফিরলেন, তারপর সহাস্যমুখে জিগেস করলেন, 'তোমাকে এরকম বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন হে লেফটেন্যান্ট লোবিটকো? মাদাম লোপুকভের জন্যে হা-হুতাশ করছো নাকি, অ্যাঁ? ম্যাডাম লোপুকভের জন্যে বেচারা একেবারে আকুল হ'য়ে উঠেছে।'

মাদাম লোপুকভ হলেন বিরাট লম্বা-চওড়া চল্লিশোত্তীর্ণা এক ভদ্রমহিলা। দশাসই চেহারার মহিলাদের সম্পর্কে, তাদের বয়স যা-ই হোক না কেন, তাঁর নিজের একটু পক্ষপাত থাকাতে তিনি তাঁর অধস্তনদের প্রতিও সেই পছন্দ আরোপ ক'রে থাকেন। অফিসাররা সসম্ভ্রমে একটু স্মিত হাস্য করলেন; আর জেনারেল এই ভেবে বেশ পরিতৃপ্ত বোধ করলেন যে বেশ একটা রসালো খোঁচা দেওয়া গেছে; এরপর তিনি কোচোয়ানের পিঠে ঠেলা দিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানালেন, গাড়িটা ঘুরে দূরে চলে গেলো।

'যদিও এই সমস্তটাই আমার কাছে এখন নিতান্ত অবাস্তব, অপার্থিব ব'লে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আসলে সবই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার,' জেনারেলের গাড়ির চাকায় উৎক্ষিপ্ত ধুলোর মেঘের দিকে তাকিয়ে রিয়াবোভিচ মনে মনে ভাবলো। 'এটা একেবারেই দৈনন্দিন ঘটনা, আর প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এই জেনারেলের কথাই ধরা যাক, নিশ্চয়ই তিনিও তাঁর বয়সকালে একসময় ভালোবেসেছিলেন, এখন তিনি বিবাহিত এবং সন্তানের জনক; ক্যাপটেন ওয়াচারও বিবাহিত। আর তাঁর কুৎসিত লাল ঘাড় এবং স্ফীত উদর সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভালোইবাসেন·· সালমানফের প্রকৃতি তো নিতান্তই রুক্ষ, যাকে বলে পুরোদস্তুর একটা গুণ্ডা। কিন্তু সে-ও প্রেম ক'রেই বিয়ে করেছে ·· এদের সকলের মতো আমাকেও নিশ্চয়ই আজ হোক কাল হোক, একদিন এই সব কিছুর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।'

আর এবার, সে যে একজন সাধারণ লোক, সাধারণ তার জীবন—তার এই ভাবনা তাকে উৎফুল্ল করলো, সান্ত্বনা দিলো। দ্বিধাহীনভাবে সে এখন 'তার' এবং তার নিজের মিলিত সুখের কল্পনা করতে পারলো; আর নিজের এই উন্মত্ত কল্পনাকে সে আর বাধা দিলো না।

সন্ধের দিকে শেষ হ'লো বাহিনীর পদযাত্রা। যখন অন্যান্য অফিসাররা তাদের তাঁবুতে হাত-পা টান করছিলো, তখন রিয়াবোভিচ, সেরজলিয়াকভ আর লোবিটকো একটা কাঠের মোড়ক-বাক্সের ধারে রাত্রের খাওয়া খেতে

বসেছিলো। সেরজলিয়াকভ খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিলো, আর হাঁটুর উপর 'ইয়োরোপের ভগ্নদূত' বইটা রেখে একমনে সেটা পড়ছিলো। লোবিটকো অবিশ্রান্ত বক্‌বক্‌ করতে-করতে নিজের গেলাশে বীয়ার ঢেলে নিচ্ছিলো। কিন্তু সেই ক্লান্তিহীন দিবাস্বপ্ন রিয়াবোভিচের মস্তিষ্ককে তখনো মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো, সে নিঃশব্দে খাচ্ছিলো। তিন গেলাশ পান করার পর সে কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত আর দুর্বল বোধ করতে লাগলো, একটা অদম্য ঝোঁক তাকে তার অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটা তার বন্ধুদের কাছে বিবৃত করতে প্রায় বাধ্য করলো।

'ফন রাবেকের বাড়িতে একটা অস্বাভাবিক ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার,' যথাসম্ভব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে, প্রায় ব্যঙ্গের স্বরে সে বলতে শুরু করলো। 'হ'লো কি, বিলিয়ার্ড ঘর থেকে আমি ফিরছিলাম…'

এইভাবে সে সেই চুম্বনের একটা বিস্তৃত বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হ'লো, কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ কাহিনীটা তার বলা হ'য়ে গেলো। এই এক মিনিটের মধ্যে সে প্রতিটি খুঁটিনাটির বিবরণ দিয়েছিলো; আর, গল্পটা এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হ'য়ে যাওয়াটা তার ভয়ানক খারাপ লাগলো; তার মনে হ'লো, গল্পটা বলতে তার পুরো রাতটাই লাগা উচিত ছিলো। যখন সে শেষ করলো, তখন লোবিটকো, যে নিজে মিথ্যেবাদী ব'লেই অন্য কাউকেও বিশ্বাস করে না, অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগলো। সেরজলিয়াকভ ভ্রূকুটি করলো আর 'ইয়োরোপের ভগ্নদূত'-এ যথারীতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললো, 'ঈশ্বর জানেন মেয়েটি কে! তুমি বলছো সে একেবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরলো, চেঁচিয়ে পর্যন্ত উঠলো না! নিশ্চয়ই কোনো পাগল, আমার তো তাই মনে হচ্ছে!'

'তাই হবে, পাগলই হবে নিশ্চয়ই,' রিয়াবোভিচ সায় দিলো।

'আমারও এই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে,' ভয়ংকর একটা মুখ ক'রে লোবিটকো শুরু করলো, 'আমি কোভনোয় যাচ্ছিলাম। চড়েছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। গাড়িটা একেবারে ভরতি ছিলো। একটুও ঘুমোতে পারছিলাম না, গার্ডকে একটা রুব্‌ল বকশিশ দিতে সে আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমাকে একটা কুপেতে চড়িয়ে দিলো। শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। বুঝতেই পারছো, কামরাটা একদম অন্ধকার; হঠাৎ মনে হ'লো কে যেন আমার কাঁধে টোকা দিচ্ছে, আর মুখের উপর নিশ্বাস ফেলছে। হাত বাড়িয়ে দিতেই একটা কনুই আমার হাতে ঠেকলো। তারপর আমি চোখ খুললাম। কী

দেখলাম, জানো! একটা মেয়ে! কয়লার মতো কালো চোখ, দামি প্রবালের মতো লাল ঠোঁট, নাসারন্ধ্রে তীব্র আবেগের উত্তেজিত নিশ্বাস, আর তার স্তন—আহা, যেন দুটো নরম গদি।'

'বাড়াবাড়ি ক'রো না!' সেরজলিয়াকভ শান্ত গলায় তার বাক্যস্রোতে বাধা দিলো, 'স্তনের কথা না-হয় বিশ্বাস করা গেলো, কিন্তু সেই ঘন অন্ধকারে তুমি তার ঠোঁট দেখলে কী ক'রে?'

সেরজলিয়াকভের বোধশক্তির অভাব নিয়ে একটু বিদ্রূপ ক'রে লোবিটকো তার গল্পের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলো। গল্পটা রিয়াবোভিচের বিরক্তি উৎপাদন করছিলো। সে বাক্স থেকে উঠে দাঁড়ালো, বিছানায় গিয়ে শুলো, আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে, আর কখনো কাউকে বিশ্বাস ক'রে সে নিজের কথা বলবে না।

শিবিরে তাদের জীবন ঘটনাবিহীনভাবে ব'য়ে চললো। দিনের পর দিন চ'লে যায়, প্রত্যেকটা দিন আগের দিনটারই মতো। কিন্তু ঐ-কদিন রোজই রিয়াবোভিচের ভাবনা, অনুভূতি আর আচরণ ঠিক যেন প্রেমিকসুলভ হ'য়ে উঠেছিলো। সন্ধ্যেবেলা যখন তার ভৃত্য তার জন্যে ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসতো এবং তার মাথা ধুইয়ে দিতো, তখন তার অর্ধজাগ্রত মস্তিষ্কে বিদ্যুৎচমকের মতো এই ভাবনাটা সঞ্চারিত হ'তো যে, অত্যন্ত মধুর আর উষ্ণ এমন কিছুর আবির্ভাব হয়েছে তার জীবনে যা তাকে ঘিরে, জড়িয়ে ধরছে সারাক্ষণ।

রাত্রিবেলা যখন তার বন্ধুরা প্রেম এবং নারী নিয়ে প্রবল আলোচনায় মগ্ন, সে তখন চেয়ারের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ব'সে থাকতো, একজন বৃদ্ধ সৈনিক যখন সে যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে সেইসব যুদ্ধের গল্প করে, তখন তার মুখের যে-রকম অবস্থা হয়, রিয়াবোভিচের মুখের চেহারা তখন ঠিক সেইরকম হ'য়ে উঠতো।

আর শিকারি কুকুর লোবিটকোর নেতৃত্বে যখন উচ্ছৃঙ্খল অফিসাররা প্রতিবেশী 'উপকণ্ঠবর্তী' অঞ্চলগুলোতে ডন জুয়ানি অভিযান চালাতো, তখন রিয়াবোভিচ তাঁদের সঙ্গে থাকলেও সর্বদাই বিষণ্ণ এবং বিবেকপীড়িত বোধ করতো মনে-মনে। ক্ষমা প্রার্থনা করতো 'তাঁর' কাছে। অবসর সময়ে অথবা নির্ঘুম রাত্রিতে যখন তার শৈশব, তার মা-বাবা, যা কিছু তার একান্ত আপন আর প্রিয় সেই সবকিছুর স্মৃতির আবেশে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতো সে, তখন অনিবার্যভাবে মিয়েসটেশকির কথাও তার মনে পড়তো; মনে পড়তো সেই নৃত্যপরায়ণ

ঘোড়াটার কথা, মনে পড়তো ফন রাবেককে আর, যাকে একেবারে সম্রাজ্ঞী ইউজেনির মতো দেখতে, সেই ফন রাবেকের স্ত্রীকে, মনে পড়তো সেই ঘরটা, দরজাটার সেই ফাটল···

অগস্ট মাসের একত্রিশ তারিখে সে শিবির ছাড়লো ; এবারে সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে নয়, মাত্র দুটি ব্যাটারি সঙ্গে নিয়ে। গৃহপ্রত্যাবর্তনকারী একজন নির্বাসিতের মতোই দিবাস্বপ্ন তাকে উত্তেজিত, মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো।

তীব্র আকাঙ্ক্ষার আবেগে সেই অদ্ভুতদর্শন বাড়িটা, সেই গির্জাটা, কপট ফন রাবেক পরিবার আর সেই অন্ধকার ঘরটার সম্মুখীন হ'তে চাইছিলো সে। আর বুকের ভেতর থেকে যে-স্বর প্রায়শই উদভ্রান্ত প্রেমিককে প্রবঞ্চনা ক'রে থাকে, সেই স্বর যেন চুপি-চুপি তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলো, 'তার' সঙ্গে আবার দেখা হবে তার। কিন্তু সংশয়ের যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করছিলো। কী ক'রে যে তার দেখা পাবে? কী-ই বা বলবে সে তাকে? যদি সে সেই চুম্বনের কথা ভুলে গিয়ে থাকে? সে নিজেকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলো যে, তার প্রত্যাশা যদি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, যদি কখনোই সে আর তাকে দেখতে না-ও পায় তাহ'লেও সে আরেকবার সেই অন্ধকার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবে, আর মনে করবে···

সন্ধ্যার দিকে শাদা খামারবাড়ি আর অতি-পরিচিত গির্জাটা দিগ্বলয়ে দেখা দিলো। রিয়াবোভিচের হৃৎস্পন্দন প্রবল হ'য়ে উঠলো। পাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাওয়ার সময় একজন অফিসার কী মন্তব্য করলো তাতে সে কানই দিলো না, সমস্ত পৃথিবী ভুলে গেলো সে। ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অদূরবর্তী নদীটার চকচকে জল, বাড়িগুলোর সবুজ ছাদ আর, যার উপর পাখিরা ছুটোপাটি করছে, সূর্যের সোনালি আলোয়-ধোওয়া সেই ঘুঘুর বাসাটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঘোড়া নিয়ে গির্জার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে সে আবার তাদের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কর্কশ গলা শুনতে পেলো। প্রতি মুহূর্তেই সে আশা করছিলো যে বেড়ার ওপাশ থেকে একজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব হবে এবং সে অফিসারদের চায়ের আমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু ঐ অফিসারটি তার বাগাড়ম্বরে ক্ষান্ত দিলো, অন্যান্য অফিসাররাও গ্রামে পৌঁছোনোর জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, এবং কোনো অশ্বারোহীরই আবির্ভাব হ'লো না।

'যখন ফন রাবেক তাঁর কৃষকদের কাছ থেকে শুনবেন যে, আমরা ফিরে এসেছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদের ডেকে পাঠাবেন।' রিয়াবোভিচ ভাবলো। এই বিষয়ে এতই নিশ্চিত সে যে ভেবে পেলো না কেন তার বন্ধুরা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে, আর কেনই বা ভৃত্যরা চায়ের জল গরম করার জন্যে উনোন জ্বালাতে ব্যস্ত।

একটা বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করছিলো। সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এক মুহূর্ত পরেই উঠে ব'সে কোনো অশ্বারোহী আসছে কিনা দেখতে লাগলো। কিন্তু কোনো অশ্বারোহীর দেখা নেই। আবার সে শুয়ে পড়লো, আবার উঠে বসলো। আর এবার নিজের প্রবল অস্থিরতার তাড়নায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারপর হাঁটতে শুরু করলো গির্জার দিকে। আঙিনাটা অন্ধকার, নির্জন। পাহাড়ের উপরে তিনজন সৈন্য নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। রিয়াবোভিচকে দেখে চমকে উঠে তারা অভিবাদন জানালো, সে প্রত্যুত্তরে তাদের অভিবাদন জানিয়ে তার অতি-পরিচিত রাস্তাটা ধ'রে নিচে নামতে আরম্ভ করলো।

নদীর ওপারে হাল্কা বেগুনি রঙের ছোপানো আকাশে আস্তে-আস্তে চাঁদ উঠলো। দু'জন কৃষক রমণী বকবক করতে-করতে রান্নাঘর-সংলগ্ন বাগানে ঢুকে বাঁধাকপির পাতা ছিঁড়তে লাগলো। তাদের ঠিক পেছনে তাদের কাঠ-গুদামটা আকাশের পটভূমিতে কালো দেখাচ্ছিলো। নদীর পাড়টা মে মাসে যেমন ছিলো ঠিক তেমনি আছে, ঝোপঝাড়গুলোও সব একই রকম; একমাত্র তফাত হ'লো, সেই নাইটিঙ্গেলটা আর গান গাইছে না। পপ্‌লার আর কচি ঘাসের গন্ধও আর পাওয়া যাচ্ছে না এখন।

ফন রাবেকের বাগানে পৌঁছে রিয়াবোভিচ বেড়ার গেটের মধ্যে দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। নিস্তব্ধতা আর অন্ধকার। শুধুমাত্র বার্চ গাছের শাদা ডাল-গুলো আর পথটার কিছু-কিছু অংশ ছাড়া বাগানটার সবকিছুই যেন এক কালো, অভেদ্য অন্ধকারে মিশে গিয়েছিলো। রিয়াবোভিচ ব্যগ্রভাবে কান পাতলো, তীক্ষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকালো। প্রায় মিনিট পনেরো সে এইভাবে ঘুরে বেড়ালো; তারপর, সামান্যতম কোনো শব্দও শুনতে না-পেয়ে, একটুও আলো দেখতে না-পেয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

নদীর ধার পর্যন্ত নেমে গেল সে। সামনেই জেনারেলের স্নানের ঘাট;

ব্রিজের রেলিঙে শাদা তোয়ালে টাঙানো রয়েছে। সে ব্রিজের উপর উঠলো, তারপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো; তারপর সম্পূর্ণ অকারণেই একটা তোয়ালে হাত দিয়ে ছুঁলো। আঠা-আঠা, ঠাণ্ডা তার স্পর্শ। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো নদীর স্রোত কী দ্রুত ব'য়ে চলেছে, স্নানের জন্যে ঘেরা জায়গাটার খুঁটিগুলোতে স্রোতের ধাক্কা লেগে প্রায় শোনা যায় না এতই অস্ফুট এক গুঞ্জনধ্বনি উঠছিলো। বাঁ-পাড়ের কাছে জ্বলজ্বল করছিলো চাঁদের রক্তিম প্রতিবিম্ব, নদীর ঢেউ তাকে প্রসারিত করছিলো, দ্বিখণ্ডিত করছিলো, আর মনে হচ্ছিলো আগাছা আর কাঠকুটোকে যেমন তারা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমন ক'রে এক্ষুনি তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

'মূঢ়! কী অর্থহীন!' সেই দ্রুতধাবমান ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রিয়াবোভিচ ভাবলো। 'এই সমস্ত কিছুই কী অর্থহীন বোকামিতে ভরা!'

এখন, যখন আশা ম'রে গেছে, সেই চুম্বনের বৃত্তান্ত, তার নিজের অধীরতা আর আকুলতা, তার অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা আর মোহমুক্তি সবকিছুই সে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পারলো। জেনারেলের অশ্বারোহী যে তার কাছে আসে নি— এটা আর তার কাছে একটুও আশ্চর্যজনক মনে হ'লো না। এই কথাটা মনে ক'রেও সে আর অবাক হ'লো না যে, সে আর কখনো তাকে দেখবে না, যে নিতান্তই দৈবক্রমে অন্য একজনের বদলে তাকে চুম্বন করেছিলো। বরং তার দেখা পাওয়াটাই একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে তার মনে হ'লো

জলস্রোত ব'য়ে যেতে লাগলো তার সামনে দিয়ে, কোথায়, কেনই বা— কেউ তা জানে না। মে মাসে বয়েছে এই স্রোত; একটা ছোট্ট জলধারাকে এই স্রোতবেগ ক্রমশ বিশাল এক নদীতে পরিণত করেছে, আর সমুদ্রে এই নদীর পরিণতি; অনেক উঁচুতে একসময় কুয়াশা হ'য়ে ভাসছিলো এই জলকণা, আবার বৃষ্টি হ'য়ে ঝ'রে পড়েছে। কে জানে, হয়তো মে মাসের সেই জলই আবার রিয়াবোভিচের চোখের সামনে দিয়ে এখন ব'য়ে চলেছে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? কেন?

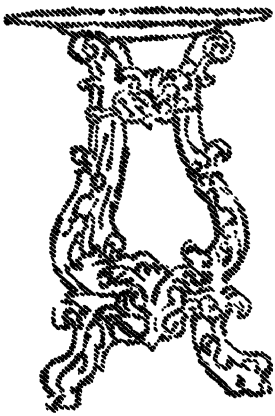
রিয়াবোভিচের মনে হ'লো যেন সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত জীবনটাই একটা দুর্জ্ঞেয়, উদ্দেশ্যহীন কুয়াশাজাল স্রোতের দিক থেকে চোখ তুলে সে আকাশের দিকে তাকালো, মনে পড়লো যে, তার ভাগ্য সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নারী হ'য়ে একবার তাকে আলিঙ্গন করেছিলো, সেই গ্রীষ্মে তার কল্পনা আর স্বপ্নের

কথাও মনে পড়লো তার, আর তার সমস্ত জীবন অস্বাভাবিক তুচ্ছ বিবর্ণ আর ভাগ্যহীন ব'লে বোধ হ'লো তার।

যখন সে তার ঘরে পৌঁছোলো, তখন তার বন্ধুরা সবাই উধাও। তার ভৃত্য তাকে জানালো যে, জেনারেল ফন রাবকিন তাঁর অশ্বারোহী পাঠিয়ে তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তারা সবাই সেখানে গেছে।

মুহূর্তের মধ্যে রিয়াবোভিচের হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সেই আনন্দের অনুভূতিকে সে মুছে ফেললো। তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো, সঙ্গে-সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতি তীব্র আক্রোশ আর বিদ্বেষ নিয়ে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো সে।

অনুবাদ : সত্রাজিৎ দত্ত





সেই ঘর

ও হেনরি

শহরের দক্ষিণপ্রান্তবর্তী লাল-ইট মজুর-পাড়ায় যাদের বসতি, তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ প্রায় সর্বদাই ভ্রাম্যমান; সময়ের মতোই জঙ্গম, অস্থির আর পরিবর্তনশীল তাদের জীবন। ঘরছাড়া, তাই একশো জায়গায় তারা ঘর বাঁধে। সাজানো এক ঘর থেকে অন্য এক ঘরে ভেসে বেড়ায়। সর্বদা সবক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী তারা—ক্ষণস্থায়ী তাদের আবাস, প্রবহমান তাদের হৃদয় আর মন। উন্মত্ত নাচের আসরে তারা ঘরে ফেরার গান গায়; তাদের গৃহদেবতাকে তারা তোরঙ্গের মধ্যে ব'য়ে বেড়ায়; তাৎক্ষণিক সব উপকরণে তারা স্থায়ী অভিজ্ঞতার স্বাদ খোঁজে।

সুতরাং সহস্র লোকের ক্ষণকালীন বাসস্থান এ-অঞ্চলের বাড়িগুলোর সঙ্গে যে অসংখ্য কাহিনী—যার অধিকাংশই হয়তো নিতান্ত নীরস—জড়িয়ে থাকবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আর এই ভবঘুরে লোকগুলো চ'লে যাবার সময় যে ক্ষীণ দাগ তাদের পেছনে ফেলে যায়, সেই চিহ্ন ধ'রে অন্তত দু'একটি প্রেতাত্মার সন্ধান এখানে না পাওয়া গেলে সেটা খুবই অস্বাভাবিক হ'তো। একদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে একটি যুবক এই জরাজীর্ণ লাল বাড়িগুলোর প্রতি

দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। দ্বাদশতম দরজায় দাঁড়িয়ে সে তার হাতে ঝোলানো সরু ব্যাগটা সিঁড়ির ধাপে রাখলো, তারপর কপালের আর টুপির ওপর থেকে ধুলো মুছে নিলো। ঘণ্টার ধ্বনি খুব অস্পষ্ট শোনালো, মনে হ'লো কোনো অতল গহ্বরের সুদূর শূন্যতা থেকে যেন সেই ধ্বনি ভেসে আসছে।

দ্বাদশতম এই বাড়িটির ঘণ্টা বাজবার পর দরজায় যাঁর আবির্ভাব ঘটলো, সেই গৃহকর্ত্রীটিকে দেখে যুবকটির মনে হ'লো তিনি যেন অতিভোজনের ফলে অসুস্থ স্থূলকায় একটি কীট, যে তার বাদামের অন্তঃসারটুকু নিঃশেষ ক'রে অতঃপর শূন্যগর্ভ শক্ত খোলাটির মধ্যে আহার্য হিসেবে কিছু বাসিন্দাকে ভরতি করতে উৎসুক।

যুবকটি জানালো যে সে একটি ঘর ভাড়া নিতে চায়।

গৃহকর্ত্রী বললেন, 'ভেতরে আসুন।' ঠিক গলদেশ থেকে তাঁর ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো, মনে হ'লো যেন তার গলনালীর ভেতরে একটি পশমের আস্তরণ আছে। 'চারতলার পেছনদিকে একটা ঘর গত এক সপ্তাহ ধ'রে খালি আছে। যদি দেখতে চান দেখাতে পারি।'

যুবকটি তাঁকে অনুসরণ ক'রে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। অনির্দিষ্ট কোনো উৎস থেকে ক্ষীণ আলো এসে প'ড়ে ঘরগুলোর চারদিকে ছায়ার ঘনত্ব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিলো। তারা নিঃশব্দ পায়ে কার্পেটে-ঢাকা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলো। কার্পেটটার চেহারা দেখে মনে হয় যে, যে-তাঁতে কার্পেটটা বোনা হয়েছিলো, সেই তাঁতটিও তার বর্তমান অবস্থা দেখে তাকে সৃষ্টি করার দায়িত্ব অস্বীকার করতো। মনে হয় যেন সেটা একটা উদ্ভিদের আস্তরণ, যেন আর্দ্র, রোদহীন আবহাওয়ায় নষ্ট হতে-হতে শেষ পর্যন্ত সেটা স্যাঁৎস্যাঁতে আগাছা অথবা বেড়ে-ওঠা শ্যাওলার মতো মাঝে-মাঝে সিঁড়ির ধাপে গজিয়ে উঠেছে; পায়ের তলায় তাদের ছোঁয়া যেন কোনো জৈব পদার্থের স্পর্শের মতো মনে হয়। সিঁড়ির প্রত্যেকটা বাঁকেই দেয়ালের মধ্যে সব খালি খোপ রয়েছে দেখা গেলো। হয়তো একসময় সেখানে ফুলগাছের টব রাখা ছিলো, আর তাহ'লে এই নোংরা স্যাঁৎস্যাঁতে আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে নিশ্চয়ই তাদের খুব দেরি হয়নি। এমনও হ'তে পারে যে, একসময় সেখানে সাধুসন্তদের মূর্তি দাঁড় করানো ছিলো, কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও এটা ধ'রে নেওয়া খুব শক্ত নয় যে, যত রাজ্যের প্রেত আর শয়তানের দল তাঁদের অন্ধকারের মধ্যে

দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিচের তলার সব সুসজ্জিত গহ্বরের অপবিত্রতায় নামিয়ে নিয়ে গেছে।

গৃহকর্ত্রী তাঁর ঘড়ঘড়ে গলায় কথা শুরু করলেন, 'এই ঘরটার কথা বলছিলাম, ভারি চমৎকার ঘর, কখনোই প্রায় খালি প'ড়ে থাকে না। গত বছর গরমের সময় কয়েকজন অত্যন্ত সজ্জন ভাড়াটে পেয়েছিলাম, কোনো ঝামেলা ছিলো না, তার ওপর আবার আগাম ভাড়া চুকিয়ে দিতো। জলের ব্যবস্থা হলটার একদম শেষদিকে পাবেন। স্পাউল্‌স্‌ আর মুনি এখানে মাস তিনেকের জন্যে থেকে গেছে ;—জমাটি গানে ভরতি কী যে চমৎকার একটা নক্‌শা করেছিলো ওরা। মিস্‌ ব্রেটা স্পাউল্‌স্‌—আপনি তার নাম শুনেছেন হয়তো—ঐ-নামটা অবশ্য ওর স্টেজের নাম, ওখানে ঠিক ঐ-টেবিলটার ওপরের দেয়ালে ওদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা টাঙানো ছিলো। গ্যাসের ব্যবস্থা এদিকে পাবেন—আর দেখুন, কাপড় জামা ছাড়ার ঘরটাও বেশ বড়সড়ই। এটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, ঘরটা সকলেরই খুব পছন্দ হয়, কখনোই এটা খালি প'ড়ে থাকে না।'

'আপনার এখানে বুঝি নাটকের লোকেদের খুব আনাগোনা ?' যুবকটি প্রশ্ন করে।

'সর্বদাই আসছে যাচ্ছে। আমার ভাড়াটেদের অধিকাংশই থিয়েটারের লোক,—আসলে এটা থিয়েটারের পাড়া ; আর জানেনই তো, অভিনেতারা কখনোই বেশিদিন এক জায়গায় থাকে না। আমার পাওনাটা আমি পাই, এই আর কি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা সর্বদাই আসছে যাচ্ছে।'

এক সপ্তাহের ভাড়া আগাম দিয়ে সে ঘরটি ভাড়া নিলো। সে জানালো যে, সে অত্যন্ত ক্লান্ত তাই এই মুহূর্তেই ঘরটি তার চাই ; তারপর টাকাটা গুনে দিয়ে দিলো। মহিলাটি বললেন যে, ঘরটির সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করা আছে। জল তোয়ালে কোনো কিছুরই অভাব নেই। এরপর তিনি ঘর থেকে বেরোবার আগেই সে সহস্রতমবার সেই প্রশ্নটি তাঁকে করলো যে-প্রশ্নটি সে সর্বদা তার জিভের আগায় ব'য়ে বেড়াচ্ছে।

'আচ্ছা, একটি মেয়ে—মিস্‌ ভ্যাশনার, মিস্‌ এলোয়া ভ্যাশনার—আপনার কি মনে পড়ে এই নামের একটি মেয়ে কখনো আপনার কোনো ঘরে ছিলো কিনা ? খুবসম্ভব সে আসরে গান করতো। মাঝারি লম্বা, একহারা গড়নের, সুশ্রী একটি মেয়ে,—লালচে সোনালি চুল, আর বাঁ ভুরুর কাছে একটা কালো জড়ুল।'

'না, নামটা তো আমার মোটেই চেনা মনে হচ্ছে না। আর এই সব পেশার লোকেরা তাদের নামও বড়ো ঘন-ঘন বদলায়। ঠিক তাদের ঘরের মতোই ;

সর্বদাই তো তারা আসছে যাচ্ছে কিনা। মোটকথা, ঐরকম কোনো নাম আমার একটুও মনে পড়ছে না।'

'না,' সর্বদাই শুধু 'না'। পাঁচমাস ধ'রে অবিশ্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের অনিবার্য উত্তর এই 'না'। কী অজস্র সময় কেটেছে সারাদিন ধ'রে যত থিয়েটারের ম্যানেজার আর এজেন্টের কাছে নাটকের ইস্কুল আর নাচ-গানের দলে তাকে খুঁজে বেড়িয়ে, সারারাত ধ'রে সব প্রথমশ্রেণীর থিয়েটার থেকে হীনতম রঙ্গালয়ে পর্যন্ত শ্রোতা হ'য়ে ব'সে থেকে, তার আর ইয়ত্তা নেই। এমন নিচু শ্রেণীর রঙ্গালয়েও সে গেছে, যেখানে তার দেখা পাওয়ার কথা ভাবতেও ভয়ে শিউরে উঠেছে সে। সে তাকে সবার থেকে, সবকিছুর থেকে বেশি ভালোবেসেছিলো। তাই আজ তাকে খুঁজে বের করার প্রাণপণ প্রয়াস না-ক'রে তার উপায় নেই। তার গৃহত্যাগের পরমুহূর্ত থেকেই সে নিশ্চিতভাবে জানতো যে, বিশাল এক দ্বীপের মতো এই শহর কোথাও না কোথাও তাকে লুকিয়ে রেখেছে; কিন্তু শহরটা যেন আসলে এক হিংস্র খল চোরাবালি, তার কণাগুলো যেন সর্বদাই অস্থির আর বিচরণশীল—কোনো ভিত কোনো অবলম্বন নেই তাদের। আজকে যে কণাগুলো ওপরে ভেসে আছে, কালই নরম থকথকে কাদার ভেতরে তারা তলিয়ে যায়।

ঘরটা তার নবাগত অতিথিকে কপট আতিথেয়তার প্রাথমিক উষ্ণতা দ্বারা অভ্যর্থনা জানালো; মন্দ চরিত্র কোনো রমণীর বানিয়ে-তোলা মৃদু হাসির মতোই শীর্ণ, বিবর্ণ আর নিরুৎসুক সেই অভ্যর্থনা।

ঘরটার মধ্যে ছড়ানো কয়েকটি জরাজীর্ণ আসবাবপত্রে, একটা সোফা ও দুটো চেয়ারের ছেঁড়া ব্রোকেডের গদিতে, দুটো জানলার মাঝখানে একফুট চওড়া একটা শস্তা কাচের টুকরোয়, দেয়ালে-ঝোলানো দু' একটা ছবির সোনালি ফ্রেমে আর কোনায় দাঁড় করানো একটা পেতলের দণ্ডে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে একটা কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া তৈরি করেছিলো।

একটি চেয়ারে তার নিস্পন্দ শরীরটা এলিয়ে দিয়ে সে ব'সে রইলো, আর ঘরটাও যেন ক্রমশ এক বিমূঢ় কোলাহলে মুখর হ'য়ে উঠলো, অস্পষ্ট অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সে যেন তার বিচিত্র সব বাসিন্দাদের সম্পর্কে তার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলো।

সমুদ্রের মতো ঢেউ-তোলা একটি ধূলিধূসর মাদুরের মাঝখানে একটি বহুবর্ণ কম্বল বিছানো ছিলো, ঠিক যেন গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত ফুলে-ঝলমল কোনো

আয়তাকার দ্বীপ। ধূসর কাগজে-মোড়া দেয়ালে সেই বহু পরিচিত ছবিগুলো টাঙানো—সেই হ্যুগেনট প্রেমিক, প্রথম কলহ, বিবাহকালীন প্রাতরাশ আর ঝর্নার ধারে সাইকি-র ছবি; যেন এই ভবঘুরে লোকগুলোর অবিশ্রান্ত বাসা বদল সত্ত্বেও এরা কখনোই তাদের ছাড়বে না। অগ্নিকুণ্ডের ওপরের তাকটির সরল কঠিন রেখাগুলোকে আড়াল ক'রে একটা রুচিহীন প্রগল্ভ ঝালর অগোছালো ক'রে টাঙানো, ঠিক যেন কোনো লাস্যময়ী নর্তকীর বিস্রস্ত কটিবন্ধ। মজ্জমান জাহাজে আটকে-পড়া লোকেরা যখন সৌভাগ্যবশত হঠাৎ এসে পড়া কোনো জাহাজে চ'ড়ে নিরাপদ বন্দরের উদ্দেশে রওনা হয়, তখন জলে ভেসে যাওয়া তাদের পরিত্যক্ত কিছু-কিছু মালপত্রের মতোই ঐ-তাকটার ওপরে দু'একটা শস্তা ফুলদানি, অভিনেত্রীদের কয়েকটা ছবি, একটা ওষুধের শিশি আর কয়েকটা বিক্ষিপ্ত তাস এলোমেলোভাবে রাখা ছিলো। গুপ্তলিপির অক্ষরগুলো যেমন একটা-একটা ক'রে ক্রমশ সুপরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, তেমনি এই আসবাব সমেত ঘরটির বহুবিচিত্র বাসিন্দাদের ফেলে-যাওয়া চিহ্নগুলো ক্রমশ অর্থময় হ'য়ে উঠতে লাগলো। ড্রেসিং টেবিলের ঠিক সামনেই কার্পেটটার জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে বুঝতে দেরি হয় না যে, বহু সুন্দরী মহিলার সমাবেশ হয়েছে এ-ঘরে। দেয়ালের ওপর ছোটো-ছোটো আঙুলের ছাপগুলো ব'লে দেয় এ-ঘরের সব ক্ষুদে বন্দীদের কথা, যারা বাইরের রৌদ্র-বাতাস মাখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতো। দেয়ালের ওপর এক জায়গায় বোমা-বিস্ফোরণের উৎক্ষিপ্ত রশ্মির স্থির ছায়াচিত্রের মতোই ছিটকে-ওঠা কোনো জলীয় পদার্থের দাগটি সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, কোনো এক সময়ে একটি গ্লাশ বা বোতল তার মধ্যেকার পানীয়সহ ঐ-জায়গায় নিক্ষিপ্ত হ'য়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিলো। খিলানের কাচটাকে জুড়ে দ্বিধাগ্রস্ত আঁচড়ে 'মারি'—এই নামটি লেখা আছে। এই সব দেখে মনে হয় যেন এই ঘরে শীতলতার যে সমারোহ, তা এর স্বল্পস্থায়ী বাসিন্দাদের অধৈর্যকে স্বভাবতই উদ্দীপ্ত করেছিলো এবং তাদের উন্মত্ত ভাবাবেগের বাঁধ খুলে দিয়ে তারা তার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো। আসবাবপত্রগুলোর অনেক জায়গায় কুচি উঠে গেছে, বিবর্ণ, ক্ষতবিক্ষত তাদের চেহারা; ফাটা, স্প্রিং-বেরিয়ে পড়া সোফাগুলোর বিকৃত অবস্থা দেখে মনে হয় যেন একটি বীভৎস জন্তু কিম্ভূত কোনো স্নায়বিক আক্ষেপে আক্রান্ত হ'য়ে নিহত হয়েছে। সম্ভবত এর চেয়েও প্রবল কোনো আলোড়ন অগ্নিকুণ্ডের ওপরে মার্বেল-তাকটির বেশ বড়ো একটি খণ্ডকে অপসারিত

করেছে। মেঝের পাটাতনের প্রত্যেকটি তক্তার ক্লিষ্ট আর্তনাদ যেন আলাদা-আলাদা এক-একটি যন্ত্রণাবোধ থেকে উৎসারিত। এ-কথা ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে যে, অন্তত কিছু সময়ের জন্যেও যারা এ-ঘরকে তাদের বাসা ব'লে মনে করেছিলো, তারাই হিংস্র বিদ্বেষের আঘাতে-আঘাতে একে ক্ষতবিক্ষত করেছে; কিংবা, হয়তো, ঘর বাঁধবার যে-সহজাত প্রবৃত্তি তাদের শুধু প্রবঞ্চনায় ভ'রে উঠেছে, এর মধ্যে সেই গ্লানিরই স্বাক্ষর; যে-মিথ্যে গৃহদেবতারা তাদের রোষকে উদ্দীপ্ত করেছেন, তাঁদের প্রতি তিক্ত ক্ষোভ আর ক্রোধই এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। তা না হ'লে, যে-কুটির আমাদের একান্ত নিজস্ব, তাকেও তো আমরা ঝেড়ে মুছে সযত্নে সাজিয়ে রাখতেই চাই।

ঘরটির যুবক বাসিন্দা যখন চেয়ারে ব'সে ব'সে এই ভাবনার সারিকে তার মনের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হ'তে দিচ্ছিলো, তখন ঘরের ভেতরটা বাতাস-বাহিত শব্দ আর গন্ধের বিচিত্র সম্ভারে ভ'রে উঠছিলো। কোনো একটা ঘর থেকে খিলখিল্ ক'রে চটুল প্রগল্‌ভ একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেলো; অন্যান্য ঘর থেকেও একক গলার ভর্ৎসনোক্তি। ছক্কা-ঘুঁটির আওয়াজ, ঘুম-পাড়ানি গান, একঘেয়ে কান্না ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। তার ঠিক ওপরের ঘরটা থেকে শোনা যাচ্ছিলো ব্যাঞ্জোর সজীব টুং-টাং ধ্বনি। কোথাও প্রচণ্ড শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ হ'লো; মাঝে-মাঝে উঁচু লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে-চলা ট্রেনের গর্জন; বাড়ির পেছনে বেড়ার ওপর একটি বেড়ালের আর্ত কোঁকানির আওয়াজ। তার নিশ্বাসে যেন বাড়িটার বাতাসের ঘ্রাণ নিশ্বসিত—ঠিক ঘ্রাণ নয়, যেন আর্দ্র স্যাঁৎস্যাঁতে আস্বাদন। যেন মাটির তলার ঘর থেকে ঠাণ্ডা, থ্যাত্‌লানো আঙুরের গেঁজিয়ে-ওঠা বাষ্পের সঙ্গে তৈলাক্ত কাপড়ে-ঢাকা মেঝে আর শ্যাওলা-পড়া পচা কাঠের ভ্যাপ্‌সানো গন্ধ মিশে গেছে।

এই ভাবেই ব'সে ছিলো সে, যখন হঠাৎ, মিনোনেট ফুলের তীব্র মিষ্টি গন্ধে ঘরটার বাতাস আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো, যেন আকস্মিক একটা দম্‌কা হাওয়ার ঝাপট্ তা'কে ব'য়ে নিয়ে এলো; কোনো সপ্রাণ আগন্তুকের মতোই নিশ্চিত, প্রবল আর সৌরভমদির তার আবির্ভাব। আর-সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, 'বলো, মণি?' যেন সে স্পষ্ট কারুর ডাক শুনতে পেয়েছে, তাই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে তাকে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। সেই সমৃদ্ধ সৌরভ যেন চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে, পেঁচিয়ে, জড়িয়ে ধরলো; সে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে চাইলো; সময়ের সমস্ত বোধ তার মিলে

মিশে একাকার হ'য়ে গেলো। কিন্তু গন্ধ কি কখনোই এই রকম নিশ্চিতভাবে ডাক দিতে পারে? সে নিশ্চয়ই কোনো শব্দ শুনেছিলো। কিন্তু তাহ'লেও, সেই শব্দই কি তাকে স্পর্শ করে নি? আশ্লিষ্ট করেনি তাকে?

'এই ঘরেই ছিলো সে,' কান্নার মতো শোনালো তার চীৎকার। একটা কোনো চিহ্ন, কোনো সূত্র খুঁজে বের করার উন্মত্ত আগ্রহে সে ছিটকে উঠে দাঁড়ালো; সে জানতো যে, যা একদিন তার ছিলো, যা একদিন তার স্পর্শ পেয়েছে—এমন প্রত্যেকটি জিনিশ সে ঠিক চিনে নিতে পারবে। মিনোনেটের যে-ঘ্রাণ তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে এ তো তারই প্রিয় ঘ্রাণ। তারই সত্তার সৌরভ—কোথা থেকে ভেসে এলো এই সৌরভ? কী ক'রে এলো?

অত্যন্ত অগোছালো ক'রে কোনোরকমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে এই ঘরটিকে। পাতলা টেবিল-ঢাকার ওপরে প্রায় আধ ডজন চুলের কাঁটা ছড়ানো; স্থান-কাল-অবস্থার কোনোরকম সূত্রহীন নারীজাতির এই অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের আলাদা ক'রে চেনার কোনো উপায় নেই। তাদের এই নিশ্ছিদ্র পরিচয়হীনতা তাকে বাধ্য করলো তাদের উপেক্ষা করতে। টেবিলের দেরাজগুলো তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলো সে, আর অবশেষে ছোট্ট, পরিত্যক্ত, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো একটি রুমাল সে খুঁজে পেলো। সে সেটা তার মুখের ওপর চেপে ধরলো; তীব্র ঝাঁঝালো, রোদে-পোড়া তার গন্ধ। মেঝের ওপর সেটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে। অন্য আরেকটা দেরাজে সে পেলো আল্‌গা কয়েকটি বোতাম, একটি নাটকের অনুষ্ঠানলিপি, একজন বন্ধকি-কারবারীর নাম-লেখা একটি কার্ড আর স্বপ্নের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-সংবলিত একটি বই। শেষ দেরাজটা খুলে মেয়েদের চুলে লাগাবার একটি কালো মখমলের ফুল তার হাতে এলো। কিছুক্ষণের জন্যে স্থাণু হ'য়ে গেলো সে, যেন আগুন আর বরফের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। কিন্তু এই কালো মখমলের ফুলও আসলে একান্তভাবে মেয়েলি, মেয়েদের সেই নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ ভূষণ যা কখনোই কোনো বিশেষ কাহিনী বর্ণনা করতে পারে না।

শিকারি কুকুরের মতো ঘ্রাণ অনুসরণ ক'রে-ক'রে সে এবার পাগলের মতো ঘরটার ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘরের দেয়াল হাতড়িয়ে, মেঝের ওপর ফেঁপে-ফুলে-ওঠা কার্পেটের কোনাগুলো তার হাত আর হাঁটু দিয়ে অনুভব ক'রে-ক'রে টেবিল আর তাক, পর্দা আর দেয়ালে ঝোলানো সব কিছুকে উলটে-পালটে এমনকি ঘরের কোনায় মদ রাখবার তাকটাকে পর্যন্ত

তোলপাড় ক'রে সে একটা কোনো চিহ্ন খুঁজে বের করতে চাইলো যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায়। সে যে তার পাশে তার সামনে-পেছনে ভেতরে বাইরে তাকে ঘিরে-জড়িয়ে, সোহাগে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে, এটা অনুভব করেও কিছুতেই যেন সে তাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছে না। তার সূক্ষ্ম বোধ-শক্তিতে তীব্র, তীক্ষ্ণভাবে সেই অন্তরঙ্গ আহ্বান এসে আঘাত করছিলো যে, তার প্রত্যেকটি সচেতন ইন্দ্রিয় পর্যন্ত যেন তাতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠছিলো। তাই আরো একবার সে সজোরে সাড়া না-দিয়ে পারলো না, 'এই যে, সোনা।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যেন শূন্যতার দিকে সে তার উন্মত্ত দৃষ্টি তুলে ধরলো। কেননা মিনোনেটের এই সৌরভে আচ্ছন্ন সে আর এখন আকার আর বর্ণ, ভালোবাসা আর বাড়িয়ে-দেওয়া দুই বাহুর মধ্যে কোনো তফাত করতে পারছে না। হে ঈশ্বর কোথা থেকে এলো এই সৌরভ, কবে, কী ক'রে গন্ধও ধ্বনি হ'য়ে উঠলো, এ রকম ক'রে ডাক দিতে শিখলো, ব'লে দাও আমাকে!—অসহায়ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে ফিরতে লাগলো সে।

ঘরের প্রত্যেকটি কোনাখামচি সে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে কয়েকটা ছিপি আর সিগারেটের টুকরো ছাড়া আর কিছু পেলো না। বিতৃষ্ণায় মন ভ'রে গেলো তার, উদ্যমহীনভাবে সেগুলোকে সে সরিয়ে রাখলো। একবার কার্পেটের ভাঁজে সে একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেলো, আর হিংস্র তীব্র কটূক্তি ক'রে তার পায়ের তলায় সে সেটাকে পিষে ফেললো। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পদচারণা ক'রে বেড়ালো সে। এ-ঘরের ভ্রাম্যমান বাসিন্দাদের দীনতা ও হীনতার অনেক খুঁটিনাটি তথ্য তার কাছে উদ্ঘাটিত হ'লো, কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এক সময়ে যে হয়তো এই ঘরেই ছিলো, আর এখনো যার সত্তার সৌরভে স্পন্দমান এ-ঘরের বাতাস—তার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই সে খুঁজে পেলো না।

শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর কথা মনে পড়লো তার।

এই প্রেতপুরী থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলো সে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটি ভেজানো দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিলো। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তার উত্তেজনা যথাসম্ভব দমন ক'রে সে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, আমি আসার আগে এ-ঘরটিতে কে ছিলো বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, সে-কথা তো আমি বলেছি আপনাকে, আর একবার বলতেও আপত্তি

নেই। প্রাউল্‌স্ আর মুনি ছিলো ও-ঘরে। যদিও ওর থিয়েটারের নাম ছিলো মিস্ ব্রেটা প্রাউল্‌স, কিন্তু আসলে ও-ই মিসেস মুনি। তা আমার বাড়িতে যে কোনো নোংরামি চলে না, তা সকলেই জানে। ওদের বিয়ের বাঁধানো সার্টিফিকেটটা তো ওখানেই ঝোলানো ছিলো। একটা পেরেকের ওপরে ঐ—'

'আচ্ছা, এই মিস্ প্রাউল্‌স্ কীরকম ছিলেন বলুন তো—মানে, ঠিক কেমন দেখতে ছিলেন তিনি?'

'কেমন আর, এই ধরুন, চুলটা কালো, বেঁটে শক্তপোক্ত, আর মুখটা দেখলে কীরকম যেন হাসি পেতো। প্রায় হপ্তাখানেক আগে গত মঙ্গলবার ওরা চ'লে গেছে।'

'তার আগে কে ছিলেন?'

'তার আগে ছিলো এক ভদ্রলোক, মালপত্র ব'য়ে-টয়ে নিয়ে যাওয়ার কী যেন ব্যবসা করতো সে। এক সপ্তাহের ভাড়া না-দিয়েই সে চ'লে গিয়েছিলো। তার আগে ছিলো মিসেস্ ক্রওডার আর তার দুই বাচ্চা—ওরা মাসচারেক ছিলো। তারও আগে ছিলো মিস্টার ডথেল ব'লে এক বুড়ো, তার ছেলেরা তার ঘরের ভাড়া দিতো। সেও প্রায় মাস ছয়েক ছিলো। এই নিয়েই তো এক বছরের ওপর হ'য়ে গেলো—তার আগেকার কথা, দেখুন, আমার কিছু মনে নেই।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে আবার শিথিল পায়ে তার ঘরে ফিরে এলো। ঘরটা আবার যেন নির্জীব নিঃঝুম হ'য়ে পড়েছে। যে-সত্তার সার তাকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলো, তা আবার মিলিয়ে গেছে। মিনোনেটের সেই সৌরভ এখন লুপ্ত, তার জায়গায় ধূলিমলিন আসবাবপত্রের আর বদ্ধ আবহাওয়ার পুরোনো, বাসি, ভ্যাপ্‌সানো গন্ধ আবার ফিরে এসেছে।

অপসৃত আশা তার বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। কম্প্র, হলুদ গ্যাসের আলোর দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে দিয়ে সে বসে রইলো। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বিছানার কাছে গেলো, তারপর বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো অনেকগুলো ফালি তৈরি করলো। তার ছুরির ফলা দিয়ে সেগুলোকে চেপে ঢুকিয়ে জানলা এবং দরজার প্রত্যেকটি ফাঁক আর ফাটল সে বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর সেই নিশ্ছিদ্র বদ্ধ ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে গ্যাসের মুখ আবার সম্পূর্ণ ক'রে খুলে দিলো সে। আর অবশেষে বিছানায় শুয়ে কী এক অসীম কৃতজ্ঞতায় তার মন ভ'রে গেলো।

আজ রাতে মিসেস ম্যাক্‌কুলের বীয়ার নিয়ে আসার পালা ছিলো। সুতরাং

সেটা নিয়ে এসে তিনি যথারীতি মিসেস পার্ডির সঙ্গে মাটির তলায় ঘরটায় আড্ডা দিতে বসলেন। মজলিসি মেজাজের প্রকৃষ্ট স্থান এই ঘরগুলোতেই সাধারণত গৃহকর্ত্রীদের জমজমাট আসর বসে।

মদের ফেনার একটি বৃত্তাকার নিটোল বুদ্‌বুদের মধ্যে দিয়ে মিসেস্ পার্ডি কথা বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা আমার দোতলার পেছন দিকটা ভাড়া দিলাম, লোকটার বয়স অল্প—এই তো, ঘণ্টাখানেক আগে সে শুতে গেলো।'

মিসেস ম্যাকৃকুল গভীর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে উঠলেন, 'তাই নাকি, আপনি সত্যি বলছেন মিসেস পার্ডি! কী ক'রে যে ঐ-রকম ঘরের ভাড়াটে যোগাড় করেন আপনি, ভাবতেই আমার অবাক লাগে। আপনি নিশ্চয়ই তাকে সব ব'লে ক'য়ে ভাড়া দেন নি, তাই না?' শেষ কথাটা রহস্যপূর্ণ খস্‌খসে গলায় ফিশফিশ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

মিসেস পার্ডির স্বভাবসিদ্ধ ঘড়ঘড়ে গলা আরো ঘড়ঘড়ে শোনায়, 'ঘরগুলো ভাড়া দেবার জন্যেই সাজানো থাকে। খামকা আমি বলতে যাবো কেন, মিসেস্ ম্যাকৃকুল।'

'ঠিক বলেছেন আপনি! আরে, এই ঘরভাড়া দিয়েই তো আমাদের খেতে হয়। সত্যিই আপনার খুব ব্যবসা-বুদ্ধি আছে। ও-ঘরের বিছানায় শুয়ে একজন আত্মহত্যা করেছে এ-কথা জানতে পারলে কি আর কেউ ও ঘর ভাড়া নিতে চাইবে।'

মিসেস পার্ডি বললেন, 'আর আপনি যা বললেন—আমাদের তো খেয়েপরে থাকতে হবে!'

'ঠিক বলেছেন, একেবারে খাঁটি কথা। মাত্র হপ্তাখানেক আগেই তো ঘরটা ঠিকঠাক ক'রে গুছিয়ে দিলাম আমরা, তাই না? তা যাই বলুন, মেয়েটা কিন্তু নেহাত বাচ্চা, ও-ভাবে গ্যাস খুলে দিয়ে নিজেকে শেষ ক'রে দিলো—আহা, কী সুন্দর ছোট্ট মিষ্টি দেখতে ছিলো মেয়েটা, সত্যি!'

মিসেস পার্ডি তাঁর সঙ্গে একমত হ'য়েও একটু সমালোচনা না-ক'রে পারেন না, 'তা যা বলেছেন, মেয়েটা এমনিতে দেখতে সুন্দরীই ছিলো—অবশ্য বাঁ-ভুরুর ওপরের ঐ কালো জড়ুলটা বাদ দিলে। সে যাকগে, আপনার গেলাশ যে এদিকে খালি হ'য়ে গেলো, মিসেস্ ম্যাকৃকুল। আবার ভ'রে নেবেন না?'

অনুবাদ : সত্রাজিৎ দত্ত



কোনো মানুষের চেয়ে কম নয়

মিগুয়েল দ্য য়ুনামুনো

ঐতিহাসিক রেনাদা শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে জুলিয়ার[১] রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। জুলিয়া, বলা যেতে পারে, সেখানকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপসী, রাজধানীর প্রাচীন ভাস্কর্যের সম্পদের মতোই আরেকটি শোভা—অবশ্য জীবন্ত ও সতেজ। ঘনায়মান দুর্যোগের দুর্লক্ষণ এই সুন্দরীর চোখে বাসা বেঁধেছিলো। যারা তাকে চেনে কিংবা যারা তাকে দেখেছে তারা সকলেই তার মুখের ভাবে অস্বস্তি বোধ করে। সে পাশ দিয়ে চ'লে গেলে বৃদ্ধেরা বিমর্ষ হ'য়ে পড়তেন, সমস্ত পথচারীর দৃষ্টি তার পশ্চাদ্বর্তী হ'তো, আর সেইসব রাত্রে যুবকদের চোখে ঘুম আসতো দেরি ক'রে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলো ব'লে রিষ্ট ভবিষ্যতের ভার বোধ করতো সে। তার চেতনার গভীর

১ এই ছোটো উপন্যাসটির কুশীলবের নামে মূল এস্পানী উচ্চারণ অনুসৃত হ'লেও শুধুমাত্র নায়িকার বেলায় ইংরেজি রীতি অনুযায়ী 'জুলিয়া' ব্যবহার করা হয়েছে; কেননা এস্পানীতে এই 'জুলিয়া' শোনাবে 'হুলিয়া' ও 'খুলিয়া'র মাঝামাঝি একটি শব্দ—বাঙালির জিহ্বা ও বাংলা বর্ণমালা যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আর নায়িকার নাম 'হুলিয়া' কিংবা 'খুলিয়া' হ'লে কি পাঠক-পাঠিকা খুব উৎসাহ বোধ করতেন?

থেকে এক গোপন স্বর তাকে যেন বলতো : 'তোমার রূপই তোমার কাল হবে।' আর সে তা না-শোনার চেষ্টা করতো।

এই আঞ্চলিক রূপসীর পিতা ডন ভিক্তোরিনো ইয়ানেথ, যাঁর অতীত জীবন মোটেই সন্দেহমুক্ত নয়, তাঁর আর্থিক দায়মুক্তির শেষ আশা এই কন্যার উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন। বর্তমানে তিনি লিপ্ত ছিলেন ব্যবসায়, কিন্তু অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছিলো। তাঁর হাতের শেষ টেক্কা, তাঁর তুরুপের তাস, অর্থাগমের শেষ এবং পরম আশা তাঁর মেয়ে। এক ছেলেও ছিলো তাঁর, কিন্তু আস্ত একটি অপদার্থ সে, এবং বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দেশ।

'জুলিয়াই এখন আমাদের যথাসর্বস্ব,' স্ত্রীকে বলতেন তিনি। 'ও কী-রকম বিয়ে করে বা আমরা কী-রকম বিয়ে দিই, তার উপরই সব নির্ভর করছে। আর ও যদি বোকার মতো কোনো ভুল ক'রে বসে—আমার ঘোরতর ভয় হয় ও হয়তো তা-ই করবে—তাহ'লেই তো আমরা গেছি।'

'বোকার মতো ভুল মানে?'

'তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? সত্যি, আনাক্লাতা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই।'

'কী করবো, বলো ভিক্তোরিনো। তুমি ছাড়া আর-কারুর তো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই—তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

'আরে, তোমাকে তো একশোবার বলেছি যে জুলিয়ার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। অল্পবয়সী মেয়েগুলো যে-রকম বোকার মতো ভালোবাসায় প'ড়ে সময়, সুযোগ, এমনকি স্বাস্থ্যও নষ্ট করে, জুলিয়া যাতে কিছুতেই তা না করে সেদিকে লক্ষ রেখো। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রেমিকমিথুনের কাকলি বা কোনো রকম ন্যাকামি আমি বরদাস্ত করবো না : কোনো ছোকরাকে যেন প্রেমিক ব'লে না-জোটায়।'

'কিন্তু আমি ওকে নিয়ে কী করতে পারি?'

'তাই নাকি? ওকে তুমি বোঝাবে যে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের উভয়ের মঙ্গল, এমনকি হয়তো সম্মানও···বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম।'

'না, তুমি বোঝোনি। আমাদের সম্মান—কানে যাচ্ছে কথাটা?—আমাদের পারিবারিক সম্মান নির্ভর করছে ওর বিয়ের উপর। নিজেকে ওর কাম্য রাখতেই হবে।'

'আহা, বেচারি!'

'আহা বেচারি মানে? বোকা-বোকা কতগুলো প্রেমিকের আলিঙ্গনে ও যেন নিজেকে ছেড়ে না দেয়: আর ওইসব আজগুবি উপন্যাস পড়াটাও বন্ধ করতে হবে—ওতে ওর মাথা ঘুরে গিয়ে ধোঁয়াটে হ'য়ে যাবে।'

'কিন্তু ও কী করবে বলো?'

'ভালো ক'রে ভেবো ছাখো; ওর এত রূপ নিয়ে ও কী করতে পারে সেটা উপলব্ধি ক'রে ওকে তার সদ্ব্যবহার করতেই হবে।'

'তা, আমার যখন ওর বয়স ছিলো…'

'আঃ, আনাক্লাতা, ঢের বোকামো হয়েছে। তুমি মুখ খুললে বাজে কথা ছাড়া আর-কিছু বেরোয় না। ওর বয়সে তুমি…ওর বয়সে তুমি তাই নাকি! ভুলে যেয়ো না তখনো আমি তোমাকে চিনতাম…'

'হ্যাঁ দুর্ভাগ্যবশত…'

তারপর এই রূপসীর পিতামাতা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতেন পরের দিন ঠিক এই এক কথোপকথন শুরু করবার জন্য।

বেচারি জুলিয়া, তার বাবার হিশেবনিকেশের কুৎসিত উদ্দেশ্য খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারতো সে, ফলে দুঃখ পেতো। 'দেউলে ব্যবসা বাঁচাবার জন্য আমাকে বেচতে চান বাবা,' নিজের মনে সে বলতো, 'বোধ হয় কয়েদখানার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।' এবং আসল ব্যাপারটা সত্যিই তাই।

স্বভাব-বিদ্রোহী জুলিয়া তাই তার সর্বপ্রথম ভক্তের নিবেদনই গ্রহণ ক'রে ফেললো।

'ভগবানের দোহাই, বাছা, সাবধান হও,' মা বললেন। 'যা সব হচ্ছে সবই বুঝতে পারছি। বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি ছেলেটাকে, তোমাকে কী সব ইঙ্গিতও করছিলো। এও জানি যে ও তোমাকে একটা চিঠি লিখেছে আর তুমিও তার জবাব দিয়েছো…'

'তাতে কী হয়েছে, মা? আমাকে কি ক্রীতদাসীর মতো থাকতে হবে নাকি, যতদিন না কোনো-এক সুলতান এসে আমার বাবার হাত থেকে আমাকে কিনে নিয়ে যান?'

'ও-রকম কথা বলিস না, সোনা…'

'আর পাঁচটা মেয়ের মতো আমার কি একজন প্রেমিক থাকতে পারে না?'

'নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু তার তো সত্যি-সত্যি ভালোবাসতে পারা চাই তোকে·· ···'

'সত্যি-সত্যি ভালোবাসবে কি বাসবে না তা আগে জানবো কী ক'রে? কোথাও না কোথাও তো শুরু করতেই হবে। একজনকে ভালোবাসার আগে তাকে চেনা চাই তো।'

'ভালোবাসা···ভালোবাসা ··'

'ও না, আমাকে তো অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে আমার খদ্দেরের জন্য।'

'তোর বাপের মতোই তোর সঙ্গেও পেরে ওঠা যায় না। ইয়ানেথ পরিবারটার ধারাই এই। উঃ! সেই দিনের মুখে ছাই যেদিন আমার বিয়ে হয়েছিলো ··'

'ঠিক ওই কথাটাই আমি কোনোদিন বলতে চাই না।'

এই কথার পর তার মা তাকে ছেড়ে চ'লে যেতেন।

মরিয়া হ'য়ে জুলিয়া একদিন একতলায় নেমে গেলো, ছোটো একটা গুদোম-মতো ঘরের জানলা থেকে কথা বললো প্রেমিকের সঙ্গে। 'আমার বাবার চোখে যদি পড়ে যাই,' সে ভাবলে, 'তাহ'লে আমার কপালে ভয়ংকর কিছু একটা ঝুলছে। কিন্তু তাই ভালো: লোকেরা জানবে যে বাবা আমার রূপকে নিলেমে চড়াতে চায়।' জানলায় নেমে এলো সে, এবং এই প্রথম আলাপেই, স্থানীয় উঠতি ডন হুয়ান এনরিকের কাছে তার পারিবারিক জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা আর মন-খারাপ-করা খুঁটিনাটি ব্যক্ত ক'রে ফেললো। সে যে এসেছে তাকে রক্ষা করতে, তাকে ত্রাণ করতে।

কিন্তু এই সুন্দরী মেয়েটির প্রতি তার মোহ সত্ত্বেও এনরিকে অনুভব করলে যে তার উৎসাহ ম'রে আসছে। সে ভাবলে, 'খুব একটা ব্যথাতুরা ভাব দেখাচ্ছে ছুকরি, ন্যাকা-ন্যাকা উপন্যাস গেলার ফল।' আর এই বিখ্যাত সুন্দরী তাকে কেমন ভাবে তার জানলার ধারে এগিয়ে আসতে দিয়েছে এ-কথা সারা রেনাদা শহরে জানিয়ে দেয়ার পর থেকে সে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে স'রে পড়ার সুযোগ খুঁজছিলো। সুযোগ পেতে দেরি হ'লো না। এক সকালে অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে নেমে এলো জুলিয়া, কেঁদে-কেঁদে তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি লাল হ'য়ে গেছে, বললে, 'এনরিকে, আর সইতে পারছি না। এটা না-ঘর, না-সংসার: এটা নরক। আমার বাবা সব জানতে পেরেছেন। আমি নিজেকে সমর্থনের চেষ্টা করছিলাম ব'লে গতরাত্রে উনি আমাকে মেরেছেন।'

'জানোয়ার!'

'বাবা যে কেমন মানুষ তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আবার বললেন তোমাকে দেখে নেবেন।'

'দেখাই যাক—আসুন না কেন! তাহ'লে তো চুকেই গেলো!' কিন্তু সেইসঙ্গে মনে-মনে সে বলছিলো: 'এবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেই হবে; হাতছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে দেখলে রাক্ষসটা এমন-কোনো সাংঘাতিক কাজ নেই যা করতে পারে না, আর আমি যখন ওর দেনা শুধতে পারবো না…'

'বলো, এনরিকে, তুমি আমাকে ভালোবাসো?'

'এই কি ওই প্রশ্ন করার সময়?'

'জবাব দাও; আমাকে ভালোবাসো তুমি?'

'আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আত্মা দিয়ে ভালোবাসি, সোনা।'

'কিন্তু সত্যি ভালোবাসো?'

'সত্যি, যথার্থ।'

'আমার জন্য যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত আছো?'

'হ্যাঁ, যে-কোনো।'

'বেশ, তাহ'লে এসো, আমাকে নিয়ে যাও। আমাদের চ'লে যেতে হবেই, কিন্তু দূরে, অনেক দূরে, যেখানে কিছুতেই বাবা আমাদের নাগাল পাবেন না।'

'শান্ত হও, লক্ষ্মীটি।'

'না, না, আমাকে নিয়ে যাও; যদি আমাকে ভালোবাসো, তাহ'লে আমাকে নিয়ে যাও। আমার বাবার এই সম্পত্তি নিয়ে যাও যাতে আমাকে তিনি বেচতে না পারেন। আমি ক্রীত হ'তে চাই না—আমি চাই আমাকে কেউ নিয়ে যাক।'

অতএব তারা পালাবার ব্যবস্থা করলে।

কিন্তু তার পরদিন—তাদের পালাবার জন্য যে দিনটা ঠিক করা হয়েছিলো—জুলিয়া তার ছোটো কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে গোপনে-ভাড়া করা গাড়ির জন্য অস্থির হ'য়ে অপেক্ষা করলো, কিন্তু এনরিকে উপস্থিত হ'লো না। 'কাপুরুষ! কাপুরুষেরও অধম! ঘৃণ্য! ঘৃণ্যেরও অধম!' বেচারি জুলিয়া বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে রাগে বালিশ কামড়াতে-কামড়াতে কাঁদলো। 'আর ও বলতো যে ও আমাকে ভালোবাসে! না, না, ও আমাকে ভালোবাসে নি, ভালোবেসেছে আমার রূপকে। না, তাও না। ও যা চেয়েছিলো তা হচ্ছে সারা রেনাদার কাছে গর্ব ক'রে বলতে যে আমি, জুলিয়া ইয়ানেথ—স্বয়ং

আমি—ওকে প্রেমিক ব'লে গ্রহণ করেছি। আর এখন ও সবাইকে ব'লে বেড়াবে আমি কেমন ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। উঃ! ঘৃণ্য, ঘৃণ্য, ঘৃণ্য! ও আমার বাবার মতো নীচ; সব পুরুষের মতোই ও ঘৃণ্য।' সান্ত্বনাহীন হতাশায় সে ডুবে গেলো।

'বাছা,' তার মা বললেন, 'দেখছি ব্যাপারটা চুকে গেছে; ভগবানকে সেজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ছাখ, তোর বাবাই ঠিক; এভাবে চললে নিজের নামই খারাপ করবি।'

'কী ভাবে চললে?'

'এই ভাবে—যে আসবে তাকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলা। ছেনাল ব'লে জানবে তোকে সবাই আর ··'

'তাও অনেক ভালো, মা, তাও অনেক ভালো। তাতে ক'রে আরো বেশি পুরুষ আসবে। বিশেষ ক'রে যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন তা না হারাই।'

'হায়রে হায়! তুই সত্যিই তোর বাপের মেয়ে রে।'

প্রকৃতপক্ষে, এর কিছুদিন পরেই, জুলিয়া আরেকটি প্রেমিক গ্রহণ করলে। তার কাছেও ঠিক এক কথাই জানালো সে, এবং এনরিকের মতো তাকেও ভয় পাইয়ে দিলো। কিন্তু পেদ্রোর কলজের জোর আর-একটু বেশি ছিলো।

এবং ঠিক সেই একই প্রাথমিক ধাপে অগ্রসর হ'য়ে, জুলিয়া শেষ পর্যন্ত তার কাছে পালিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে।

'ছাখো জুলিয়া,' পেদ্রো জবাব দিলে, 'আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় আমার আপত্তি নেই। কেননা তুমি তো জানোই আমি তাতে সুখী হবো। কিন্তু পালিয়ে আমরা যাবো কোথায়, আর করবোই বা কী?'

'সেটা পরে ভাবা যাবে।'

'না, তা এড়িয়ে গেলে চলবে না। এক্ষুনি স্থির করতে হবে। আমার কথা যদি ধরো, তাহ'লে বলি এই মুহূর্তে—এবং পরেও—বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে ভরণপোষণ করতে পারবো না। আমি জানি আমার বাড়ির কেউ আমাদের ঢুকতে দেবে না, আর তোমার বাবা ’

'কী! নিশ্চয়ই এখনি স'রে পড়তে চাচ্ছো না তুমি?'

'কিন্তু আমরা কী করবো বলো?'

'তুমি নিশ্চয়ই কাপুরুষের মতো ব্যবহার করবে না। না কি করবে?'

'কিন্তু কী করতে পারি আমরা, বলো।'

'বেশ আত্মহত্যা করবো।'

'তুমি খেপেছো নাকি জুলিয়া?'

'হ্যাঁ, আমি খেপেছি; হতাশায় খেপেছি, বিতৃষ্ণায় খেপেছি, আমাকে যে বেচে দিতে চায় সেই পিতৃদেবের ভয়ে আমি পাগল হ'য়ে গেছি···আর যদি তুমিও খেপে গিয়ে থাকো, যদি আমার প্রেমে পাগল হ'য়ে থাকো, তাহ'লে তুমিও আমার সঙ্গে আত্মহত্যা করবে।'

'কিন্তু জুলিয়া, মনে রেখো, তুমি চাও তোমার প্রেমে আমি এমন পাগল হই যে একসঙ্গে আত্মহত্যা করতে পারি; কিন্তু তুমি নিজে বলছো যে আমার প্রেমে পাগল ব'লে নয়, তোমার বাবা এবং বাড়ির প্রতি বিতৃষ্ণায় তুমি খেপে গেছো ব'লে তুমি আমার সঙ্গে নিজেকে হত্যা করবে। দু'টো তো আর এক নয়।'

'আ। খুব ভালো যুক্তি। কিন্তু প্রেম তো যুক্তি জানে না।'

তাদের সম্পর্কও ছিন্ন হ'লো। জুলিয়া নিজের মনে বলে: 'ও অন্য-কারুর চাইতে কিছু বেশি ভালোবাসেনি আমাকে। ওরা সবাই আমার নয়, আমার রূপের প্রেমে পড়ে। আমি ওদের কাউকে মানি না।' তারপর সে ভয়ংকর ভাবে কাঁদতে থাকে।

'দেখলি তো, বাছা,' তার মা বললেন, 'বলি নি আমি তোকে? আরেকজন গেলো!'

'এ-রকম একশোজন যাবে মা, একশোজন, যতদিন না আমি আমার সেই আপনার জনকে খুঁজে পাই, যে আমাকে তোমাদের দু'জনের হাত থেকে বাঁচাবে। উঃ, আমাকে কিনা চায় বিক্রি করতে!'

'তোর বাবাকে গিয়ে এই কথা বল।'

তারপর ডোনা আনাক্লাতা নিজের ঘরে গিয়ে একা ব'সে কাঁদেন।

অবশেষে জুলিয়ার বাবা তাকে বললেন: 'ছাখো, দু'-দু'বার তোমার প্রেম-কলাপ আমি দেখেও দেখি নি; আমার যা করা উচিত ছিলো, তার কিছুই করি নি। কিন্তু এবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আর কোনোরকম বোকামি আমি সইবো'না। জানলে তো আমার মত।'

'আরো আছে।' তিক্ত বিদ্রূপের স্বরে জুলিয়া চেঁচিয়ে উঠলো, প্রতিযোগীর দৃষ্টিতে তাকালো বাবার চোখের দিকে।

'কী বলছো ?' কুৎসিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন তার বাবা।

'বলছি আমার আরো-একজন প্রেমিক আছে।'

'আরেকজন! কে ?'

'কে ? বাজি রেখে বলতে পারি তুমি আন্দাজ করতে পারবে না।'

'নাও, নাও, রসিকতা করতে হবে না, জবাব দাও, আমার ধৈর্য হারিয়ে দিচ্ছো তুমি।'

'স্বয়ং জন আলবার্তো মেলেনদেথ দ্য কাবিউবনিসা।'

'কী সাংঘাতিক!' ব'লে উঠলেন মা।

একটি শব্দ উচ্চারণ না ক'রে ডন ভিক্তোরিনো ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন। ডন আলবার্তো হলেন একজন অতিরিক্ত ধনী জমিদার, লম্পট, মেয়েদের সম্পর্কে অত্যন্ত খেয়ালি, তাঁর সম্পর্কে বলা হ'তো যে তাদের জয় করার জন্য কোনো কর্মেই তিনি পেছপা হতেন না। বিবাহিত, কিন্তু স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন। ইতিমধ্যে তাঁর রক্ষিতাদের মধ্যে দু'জনকে তিনি চমৎকার যৌতুক সহকারে বিয়ে দিয়েছেন।

'কী বলো, বাবা ? চুপ ক'রে আছো ?'

'বলছি তুই উন্মাদ।'

'আমি পাগলও নই, কল্পনাপ্রবণও নই। উনি সমানে আমাদের রাস্তা দিয়ে পায়চারি করেন, আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখেন। ওঁকে কি বলবো তোমার সঙ্গে কথা বলতে ?'

'আমি চললাম। তা না-হ'লে ফলটা ভালো হবে না।'

উঠে প'ড়ে বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেলেন তার বাবা।

'কিন্তু সোনা আমার! সোনা আমার।' মা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

'মা, নিশ্চিন্ত থাকো, এই প্রস্তাবটা ওঁর কাছে তেমন একটা খারাপ ব'লে বোধ হচ্ছে না; আমি তোমাকে বলছি আমাকে উনি আলবার্তোর কাছেও বেচে দিতে পারেন।'

বেচারির শক্তি ক'য়ে আসছিলো। তার মনে হচ্ছিলো এমনি এক্ষুনি বিক্রি হ'য়ে গেলেও সে ত্রাণ পায়। সবচাইতে প্রয়োজনীয় হ'লো বাড়ি ছেড়ে যেতে পারা—যে কোনো উপায়ে পালানো তার বাবার হাত থেকে।

এই সময়ে এক 'ভারতীয়' (এক এস্পানী, যে আমেরিকায় গিয়ে ধনী হয়েছে) আলেয়াক্সো গোমেথ[1] য়েনাদার উপান্তে সব চাইতে ঐশ্বর্যশালী এবং বৃহত্তম জমিদারিটা কিনলো। তার বংশপরিচয় অথবা জীবন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না, কারণ তাকে কখনো তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, দেশ অথবা শৈশব সম্বন্ধে তাকে কিছু বলতে শোনা যায় নি। তার বিষয়ে কেবলমাত্র এইটুকু জানা ছিলো যে যখন সে খুব ছোটো তখন তার মা-বাবা তাকে কিউবা নিয়ে যান, সেখান থেকে মেক্সিকো, সেখানে (ঠিক কী ক'রে তা কেউ জানে না) সে এক বিপুল অবিশ্বাস্য সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে বলা হ'তো প্রায় কয়েক কোটি ডলার—বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছেয় স্পেনে ফিরে এসেছেন—বয়স এখনো চৌত্রিশ পেরোয় নি। লোকেরা বলতো নিঃসন্তান বিপত্নীক সে, অদ্ভুত সব গল্প বলতো তার সম্বন্ধে। তার সঙ্গে যাদের কারবার ছিলো তারা তাকে জানতো উচ্চাভিলাষী, বৃহৎ সব পরিকল্পনায় মগ্ন, দৃঢ়চিত্ত, জেদি এবং আত্মকেন্দ্রিক ব'লে। সে যে নিম্নজাত, এই কথা জাহির ক'রে সে গর্ব করতো।

'টাকা থাকলে সব করা যায়,' এই হ'লো তার মত।

'সব সময় নয়, এবং সকলের ক্ষেত্রে নয়,' লোকেরা জবাব দেয়।

'সকলে নয়, না; কিন্তু কী ক'রে টাকা করতে হয় যারা জেনেছে তারা পারে। অবশ্য সেইসব হবু-বাবুরা যাঁরা তাঁদের টাকা পান উত্তরাধিকার সূত্রে —ননীর পুতুল কাউণ্ট বা ডিউকেরা—কোটিপতি হ'লেও কিছু করতে পারে না। কিন্তু আমি! আ মি! যে জেনেছে শুধুমাত্র দুই হাতের শক্তিতে কী ক'রে টাকা করতে হয়, সেই আমি পারি। আমি!'

আর সেই 'আমি' শব্দের উচ্চারণটা শ্রবণযোগ্য। তার এই ব্যক্তিগত আত্ম-নির্ঘোষের মধ্যে যেন তার সমস্ত সত্তা দানা বেঁধেছে।

'এমন কিছুই নেই যা আমি সত্যি-সত্যি চেয়েছি অথচ পাই নি। ইচ্ছে করলে আমি প্রধান মন্ত্রীও হ'তে পারতাম। কিন্তু কথাটা হচ্ছে আমি সেটা চাইনে।'

[1] এস্পানীতে 'গোমেথ' কথাটি কামার বোঝায়; আর আলেয়াক্সো যে ঐতিহাসিক বীরপুরুষ আলেকজাণ্ডার-এর এস্পানী অপভ্রংশ, তা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

রেনাদার বিখ্যাত সুন্দরী জুলিয়ার কথা আলেয়াল্রোর কাছে বলতো লোকেরা। 'তাকে আমাদের দেখতে হবে,' ভাবতো আলেয়াল্রো। আর তাকে দেখবামাত্র বললে, 'ওকে আমাদের চাই।'

একদিন জুলিয়া বললে তার বাবাকে, 'ঐ গল্পকথার আলেয়াল্রো—জানো তো তাকে; বহুদিন হ'লো লোকেরা এখন অন্য কোনো কথা বলছে না– সেই যে লোকটি কারবাজেদোর জমিদারি কিনেছে?…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি কে। তা তার হয়েছে কী?'

'জানো তো, আমার দিকে তারও নজর গেছে!'

'জুলিয়া, তুই কি আমাকে নিয়ে মজা করার চেষ্টা করছিস?'

'ঠাট্টা করছি না আমি—সত্যি বলছি। সে আমাকে ভালোবাসা জানাচ্ছে।'

'বলছি তামাশা রাখ'

'বেশ, এই নাও তার চিঠি।'

বুকের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের ক'রে সে তার বাবার মুখের উপর ছুঁড়ে দিলে।

'কী করবে ভাবছো।' বাবা জিগেস করলেন।

'হুঁ? আমি আবার কী করবো! আমি ওকে ব'লে দেবো তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তুমি দর ঠিক ক'রে দেবে।'

তীব্রদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন ডন ভিক্তোরিনো, তারপর একটাও কথা না-ব'লে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন। এর পরবর্তী কয়েকদিন বাড়িতে রাজত্ব করলো এক অশুভ নিস্তব্ধতা আর মূক আক্রোশের আবহাওয়া। জুলিয়া তার এই অধুনাতম প্রেমিককে বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞাভরে চিঠি লিখেছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বড়ো, স্পষ্ট, কোনাচে হস্তাক্ষরে—তলায় ভারি লাইনে দাগটানা—এই ক'টি কথা লেখা জবাব পেলো জুলিয়া; 'তুমি অবশ্যই আমার হবে। আলেয়াল্রো গোমেথ জানে সে যা চায় তা কী ক'রে পেতে হয়।' প'ড়ে জুলিয়া ভাবলো, 'এই তো পুরুষের মতো পুরুষ। এ কি রক্ষা করবে আমাকে? আমি কি রক্ষা করবো ওকে?' দ্বিতীয় চিঠি আসার কয়েকদিন পরে ডন ভিক্তোরিনো ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চোখে জল নিয়ে প্রায় নতজানু হ'য়ে মেয়েকে বললেন:

'শোন্, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, তোর সিদ্ধান্তের উপরই এখন সব নির্ভর করছে: আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আমার সম্মান। আলেয়াল্রোকে যদি প্রত্যাখ্যান

করিস তাহ'লে আর বেশিদিন আমি লুকিয়ে রাখতে পারবো না আমার সর্বনাশ, আমার জালিয়াতি, আর এমনকি আমার · '

'আমাকে বোলো না।'

'না, কিছুই আর আমি লুকোতে পারবো না। আমার মেয়াদ শেষ হ'য়ে আসছে। আমাকে ওরা হাজতে পুরবে। এতদিন পর্যন্ত ঠেলে রাখতে পেরেছিলাম শুধু তোর জন্য, তোর নাম ব'লে। তোর রূপই আমাকে রক্ষা করেছে। "আহা বেচারি মেয়েটা," সবাই বলে।'

'আর আমি যদি তাকে গ্রহণ করি?'

'বেশ, তাহ'লে সব কথাই তোকে খুলে বলি। ও আমার অবস্থা জানতে পেরেছে, ওকে খবর দেওয়া হয়েছে। আর এখন, আমি যে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছি, তার জন্য ওকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। আমার সব অপরিশোধ্য দেনা ও শোধ করেছে, ও টাকা দিয়েছে আমার·· '

'হ্যাঁ জানি, আর বলতে হবে না। কিন্তু এখন তাহ'লে কী?'

'সর্বতোভাবে ওর উপর নির্ভর করছি আমি—আমরা সবাই। আমি ওর দয়াতেই বেঁচে আছি, আর তুই, তুই নিজেও ওর উপর নির্ভর···'

'মানে, এক কথায়, তুমি ইতিমধ্যেই আমাকে তার কাছে বেচে দিয়েছো।'

'না, সে আমাদের সবাইকেই কিনে নিয়েছে।'

'অতএব, আমি চাই বা না-চাই ইতিমধ্যেই আমি তার সম্পত্তি হ'য়ে গেছি।'

'সে তো তেমন দাবি করছে না। সে কিছুই চায় না, কোনো দাবিই করে না।'

'আহা, কী দয়ালু!'

'জু লি য়া!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। তাকে বোলো সে যখন ইচ্ছে আসতে পারে, অন্তত আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই।'

কথাটা ব'লেই সে কেঁপে উঠলো। কে বললে এই কথাটা? সে কি সে নিজে? না কি অন্য-কেউ, যে তার মধ্যে লুকিয়ে থেকে তার উপর অত্যাচার করে।

'ধন্যবাদ, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, ধন্যবাদ!'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন মেয়েকে আলিঙ্গন করার জন্য; কিন্তু সে তাঁকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো.

'না, আমাকে অপবিত্র কোরো না।'

'কিন্তু মা··· '

'যাও, তোমার বন্ধক-দেয়া জিনিশপত্রকে গিয়ে চুম্বন করো। কিংবা চুম্বন করো তাদের ভস্মস্তূপে, যারা তোমাকে হাজতে পাঠাতো।'

* * *

'জুলিয়া, আমি বলিনি তোমাকে যে আলেয়ান্দ্রো গোমেথ জানে সে যা চায় তা কী ক'রে পেতে হয়? এমন কথা আমাকে বলা! আ মা কে!'

এই হ'লো ভিক্তোরিনো কন্যার প্রতি তরুণ 'ভারতীয়'টির প্রথম সম্ভাষণ। এই কথা শুনে অল্পবয়সী মেয়েটি কেঁপে উঠলো; জীবনে এই প্রথমবার সে অনুভব করছে যে সে একজন সত্যিকার পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মনে হ'লো যে সে যতটা ভেবেছিলো লোকটি তার চাইতে বেশি অনুগত, এবং তার চাইতে কম কুদর্শন।

তৃতীয় বার যখন সে এলো তখন মা-বাবা তাদের একা রেখে চ'লে গেলেন। কাঁপতে থাকলো জুলিয়া। আলেয়ান্দ্রো চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ ধ'রে এই কম্পন ও নিস্তব্ধতা ছাড়া আর-কিছু নেই।

'জুলিয়া, মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ,' সে বললে।

'না, না, আমি ভালোই আছি।'

'তাহ'লে অত কাঁপছো কেন?'

'ঠাণ্ডার জন্য বোধহয়।'

'না, তুমি ভয় পেয়েছো ব'লে।'

'ভয়? কিসের ভয়?'

'আমার ভয়।'

'আপনাকে ভয় পাবো কেন?'

'হ্যাঁ, আমাকে তুমি ভয় পাচ্ছো।'

আর জুলিয়া চোখের জলে ভেসে গিয়ে তার ভয় প্রকাশ ক'রে দিলে। জুলিয়ার কান্না উত্থিত হ'লো তার অন্তঃস্তল থেকে—সে কাঁদলো তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। কান্নায় তার দম আটকে এলো, সে নিশ্বাস নিতে পারলে না।

'আমি কি রাক্ষস নাকি?' ফিশফিশ করলো আলেয়ান্দ্রো।

'ওরা আমাকে বেচে দিলে। ওরা আমাকে বেচে দিলে! ওরা অর্থের বদলে আমার রূপ বিকোলো। ওরা আমাকে বেচে দিলে।'

'কে বলে এমন কথা ?'

'আমি, আমি বলি। কিন্তু না—কোনোদিন আমি আপনার হবো না, মৃত্যুর আগে নয়।'

'তুমি আমারই হবে, জুলিয়া ; তুমি আমার কাছে আত্মদান করবে, তুমি আমাকে ভালোবাসবে…তুমি কি বলতে চাও তুমি আমাকে ভালোবাসবে না ? আ মা কে ? কিন্তু সেটাই যে শেষ উপায় !'

'আমাকে' শব্দটার স্বরে এমন একটা কিছু ছিলো যাতে জুলিয়ার অশ্রুর উৎস সহসা স্তব্ধ হ'য়ে গেলো. মনে হ'লো তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হ'য়ে যাবে। তারপর—এই লোকটার দিকে যখন সে তাকালো তখন—মনে হ'লো একটা স্বর যেন বলছে : 'এই একজন পুরুষ !'

'আপনি আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।' সে বললে।

'কী বলতে চাও তুমি ?' আলেয়ান্দ্রো 'তুমি'র অন্তরঙ্গতা পরিত্যাগ করলো না।

'আমি জানি না…জানি না আমি কী বলতে চাই…'

'তুমি বললে কেন যে তোমাকে নিয়ে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি ?'

'পারেন ব'লে বললাম ..'

'আমি চাই,' তার 'আমি'টা স্পষ্ট এবং বিজয়ী শোনালো, 'তোমাকে আমার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে।'

জুলিয়া এক আর্তস্বর চেপে রাখতে পারলো না ; তার বিশাল, সুন্দর দুই চোখ বিস্ময়ে জ্ব'লে উঠলো যে-লোকটির দিকে তাকিয়ে, সে তখন মৃদু হেসে ভাবছে : 'সারা স্পেনের সেরা সুন্দরী আমার স্ত্রী হবে।'

'কিন্তু আমি কী চাই ব'লে তোমার মনে হয়েছিলো ?' সে প্রশ্ন করলে।

'আমি ভেবেছিলাম…আমি ভেবেছিলাম…'

আবার চাপা কান্নায় ওঠানামা করলো তার বুক। তারপর সে অনুভব করলে তার ঠোঁটের উপর অন্য দুটি ঠোঁটের চাপ, শুনলো একটি স্বর তাকে বলছে :

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী, আমার…আমার নিজের অবশ্য আমার বিবাহিত পত্নী। আইন আমার ইচ্ছার সমর্থক হবে। কিংবা আমার ইচ্ছাই আইন !'

'হ্যাঁ, তোমার।'

জুলিয়া বিজিত হ'লো। ঠিক হ'লো বিয়ের দিন।

এই স্থূল ও গোপনতা-প্রিয় মানুষটির মধ্যে এমন কী ছিলো যাতে সে ভয় পেয়েছিলো, অথচ সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা না-ক'রে পারেনি? আর সবচাইতে ভয়ংকর হ'লো এই যে সে জুলিয়ার মধ্যে জাগিয়ে তুললো এক অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা। কারণ এই দুঃসাহসী অভিযানকারী যে শুধুমাত্র তার বিপুল অর্থ জাহির করবার জন্য পৃথিবীর সুন্দরীতমাদের মধ্যে একজনকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তাকে জুলিয়া ভালোবাসতে চায় নি। কিন্তু তাকে ভালোবাসতে না-চেয়েও, জুলিয়া অনুভব করতো এমন এক আনুগত্য যার সঙ্গে আবেগের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তার সঙ্গে যেন মিল আছে সেই ভালোবাসার, ক্রীতদাসীর হৃদয়ে যা বাসা বাঁধে উদ্ধত বিজয়ী বীরের জন্য। সে তাকে কেনে নি, না! কিন্তু সে তাকে জয় ক'রে নিয়েছে।

'কিন্তু,' জুলিয়া ভাবতো, 'সে কি সত্যি ভালোবাসে আমাকে; সে কি আমাকে ভালোবাসে, সত্যি ভালোবাসে আমাকে, যেমন ও বলে – আর কী ভাবে বলে! ও কি আমাকে ভালোবাসে, নাকি ও শুধু চায় লোককে আমার রূপ দেখাতে? দুর্লভ এবং মহার্ঘ কোনো আশবাবের চাইতে বেশি মূল্য কি আমার নেই ওর কাছে? ও কি সত্যিই আমার প্রেমে পড়েছে? আমার আকর্ষণ কি দু'দিনেই ওর কাছে ফুরিয়ে যাবে না? যাই হোক, সে হবে আমার স্বামী, আর এই অভিশপ্ত বাড়ি থেকে, আমার বাবার হাত থেকে আমি মুক্তি পাবো। কারণ আমার বাবা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকতে আসবেন না! ওঁকে আমরা একটা নির্দিষ্ট হাত-খরচ দেবো, এবং উনি বেচারি মাকে একইভাবে অপমান ক'রে যেতে থাকবেন, চালিয়ে যাবেন চাকরানিদের সঙ্গে রঙ্গরস। আবার যাতে ব্যবসা-সংক্রান্ত অসুবিধের মধ্যে না-পড়েন সেদিকে দৃষ্টি রাখবো আমরা। আর আমি ধনী হবো, বিশাল ধনী।'

কিন্তু এতে সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। সে জানতো শহরের লোকেরা তাকে ঈর্ষা করছে; সে জানতো তার আশ্চর্য সৌভাগ্যই এখন সবচাইতে প্রিয় আলোচ্য বিষয়, জানতো সবাই বলে যে তার রূপ তাকে যা দিলো তার বেশি আর কিছু সম্ভব নয়। কিন্তু লোকটি কি ভালোবাসে তাকে? সে কি সত্যি সত্যি ভালোবাসে তাকে?

'ওর প্রেম জয় ক'রে নিতে হবে আমাকে,' সে ভাবলে। 'ওকে দিয়ে সত্যি-সত্যি ভালোবাসিয়ে ছাড়বো আমাকে—তা নাহ'লে স্ত্রী হবো কী ক'রে, সেটা সবচাইতে বিশ্রী ধরনের হাতবদল। কিন্তু, আমি কি সত্যি-সত্যি ওকে

ভালোবাসি?' তার সামনে ভয়ে গুটিয়ে যেতো জুলিয়া, তার গভীর থেকে উঠে এসে এক রহস্যময় স্বর তাকে বলতো: 'এই একজন সত্যিকার পুরুষ।' সে কেঁপে উঠতো যতবার আলেয়াণ্ড্রো উচ্চারণ করতো 'আমি' শব্দটা। তার সেই কম্পন ভালোবাসার, যদিও সে ভাবতো কারণটা ভিন্ন, কিন্তু হয়তো সে এই কারণ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলো।

* * *

তাদের বিয়ে হ'লো, রাজধানীতে বাস করতে গেলো তারা। আলেয়াণ্ড্রোর বিপুল বিষয়সম্পত্তির দৌলতে তার অসংখ্য পরিচিত এবং বন্ধু-বান্ধব ছিলো, কিন্তু তারা সকলেই কেমন যেন কৌতূহলী। জুলিয়ার মনে হ'তো যে তাদের বাড়িতে যারা আসে তাদের মধ্যে অধিকাংশই—অভিজাত মণ্ডলীরও অনেকে ছিলেন তাদের মধ্যে – তার স্বামীর খাতক, মূল্যবান জিনিশ বাঁধা রেখে তার স্বামী তাদের টাকা ধার দেয়। কিন্তু তার কর্ম বিষয়ে জুলিয়া কিছুই জানতো না, সেও কোনোদিন তাকে বলতো না। এমন কিছু নেই যা জুলিয়ার ছিলো না; তার তুচ্ছতম খেয়ালও সে চরিতার্থ করতে পারে, কিন্তু একটা জিনিশের অভাব সে বোধ করতো, এবং সত্যিই তার সেই কামনা স্বাভাবিক। যে তাকে জয় করেছে, এমনকি গুণ করেছে, জাদু করেছে, এখন আর শুধু তার প্রেম নয়, তার প্রেমের পরম নিশ্চয়তার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো। 'সে আমাকে ভালোবাসে, না কি বাসে না?' নিজেকে প্রশ্ন করে সে। 'আদরে যত্নে আমাকে সে ভ'রে রেখেছে, এর চাইতে সসম্মান ব্যবহার ভাবা যায় না, কিন্তু তবু তার কাছে আমি যেন এক খেয়ালি শিশুমাত্র; সে এমনকি আমার স্বভাব খারাপ ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু সত্যি কি সে ভালোবাসে আমাকে?' এই লোকটির কাছে প্রেম আর ভালোবাসার কথা বলা অর্থহীন।

'বোকারাই কেবল ওই নিয়ে কথা বলে,' সে বলবে। 'আমার মনোহারিণী ·· আমার রূপবতী প্রেমিকা আমার ··আমি? আমি এ-সব বিষয়ে কথা বলবো? ভাবাবেগ জিনিশটাই হ'লো উপন্যাসের সম্পত্তি। জানি তোমার উপন্যাস পড়তে ভালো লাগতো '

'এখনো লাগে।'

'তাহ'লে যত ইচ্ছে পড়ো। আরে তুমি যদি খুশি হও তাহ'লে পাশের জমিতে আমি একটা চত্বর ক'রে দেবো, সেটাকে তুমি তোমার গ্রন্থাগার

হিশেবে ব্যবহার কোরো, এবং আদমের সময় থেকে যত উপন্যাস লেখা হয়েছে সব আমি জমা করবো সেখানে।'

'কী কথা!'

যথাসম্ভব সাধারণ পোশাক পরতো আলেয়ান্দ্রো, যথাসম্ভব অযত্নে। এমন নয় যে লোকের দৃষ্টিগোচর না-হওয়ার জন্যই সে অমন সাজতো, চেহারায় নিম্ন-শ্রেণীর একধরনের অশালীনতা ফুটিয়ে রাখাই তার উদ্দেশ্য। পোশাক-পরিবর্তন তার পক্ষে শক্ত ছিলো, কারণ যে-পোশাকে সে অভ্যস্ত তার প্রতি তার একটা টান জ'ন্মে গেছে। লোকে বলতো, নতুন স্যুট পরলে সে নাকি সেটাকে অপরিচ্ছন্ন দেখাবার জন্য ইচ্ছে ক'রে দেয়ালে ঘ'ষে নিতো। অথচ এদিকে স্ত্রীর সাজটি হওয়া চাই চরম, এমনভাবে সে সাজবে যাতে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য সবচাইতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে। যে-কোনো হিশেবই চটপট মিটিয়ে দেয়া তার অভ্যেস, কিন্তু সবচাইতে খুশি হ'য়ে সে যে টাকা শোধ করতো, তা হ'লো তার জুলিয়ার দরজির হিশেব।

জুলিয়ার সঙ্গে বেরুতে ভালোবাসতো সে, ভালোবাসতো তার নিজের আর জুলিয়ার সাজপোশাক এবং ধরনধারণের তফাতটার উপর জোর দিতে। পুরুষেরা যখন তার স্ত্রীকে দেখবার জন্য থেমে পড়তো তখন বেশ মজা লাগতো তার; আর তার স্ত্রী যদি ছলনাময়ীর ভঙ্গিতে তাদের দৃষ্টি টেনে নিতো নিজের দিকে, তাহ'লে সে লক্ষ করতো না, অথবা লক্ষ না-করার ভাণ করতো। তার স্ত্রীর প্রতি যারা সকাম দৃষ্টিপাত করতো তাদের সে যেন বলতো: 'আপনার ভালো লাগছে ওকে? তা, খুবই খুশি হলাম, কিন্তু ও আমার, কেবল আ মা র, কাজেই আপনার ইচ্ছে কোনোদিনই পূর্ণ হবে না,' তার এই মনোভাব জুলিয়া বুঝতে পারতো আর ভাবতো: 'আমাকে ভালোবাসে, না বাসে না?' কারণ সর্বদাই জুলিয়া তার সম্পর্কে লোকটি ব'লে ভাবতো—তার নিজের লোক কিংবা সেই লোক সে যার রক্ষিতা হয়েছে। একটু-একটু ক'রে হারেমবাসিনী ক্রীতদাসীর আত্মা বেড়ে উঠছিলো তার মধ্যে, বিশিষ্ট ক্রীতদাসী, কিন্তু তবু ক্রীতদাসী-ই।

অন্তরঙ্গতা ছিলো না দু'জনের মধ্যে। স্বামীর যে কী ভালো লাগবে ভেবে পেতো না সে। একবার সে তার সংসার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো।

'আমার সংসার?' আলেয়ান্দ্রো বলেছিলো। 'তুমি ছাড়া আমার অন্য সংসার নেই। নিজেই আমি নিজের সংসার। আমি, আর তুমি—যে আমার।'

'কিন্তু তোমার মা-বাবা ?'

'জেনে রাখো আমার কোনো মা বাবা ছিলো না কোনোদিন। আমার পরিবার আমাতেই শুরু। আমি নিজেই নিজেকে তৈরি করেছি।'

'আমি আরেকটা কথা জিগেস করতে চাচ্ছিলাম আলেয়ান্দ্রো, কিন্তু সাহস হচ্ছে না।'

'এ কী কথা—সাহস হচ্ছে না? আমি কি খেয়ে ফেলবো তোমাকে? কোনোদিন তোমার কোনো কথায় কিছু মনে করেছি আমি ?'

'না, কোনোদিন না, আমার কোনো অভিযোগ নেই…'

'তাহ'লে তো চুকেই গেলো।'

'আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু…'

'ভালো, তাহ'লে প্রশ্নটা ক'রে ফেলে ঝামেলাটা চুকিয়ে দাও।'

'না, আমি তোমাকে জিগেস করবো না।'

'জিগেস করো।'

এবং সে এমন সুরে, এমন পরম অহংকারের সঙ্গে কথাটা বললে যে ভয় আর ভালোবাসায়—প্রিয় দাসীর অনুগত ভালোবাসা—কম্পিত কণ্ঠে জুলিয়া জবাব দিলে :

'তাহ'লে বলো আমাকে, তুমি কি বিপত্নীক ?'

'হ্যাঁ, আমি বিপত্নীক।'

'আর তোমার প্রথম স্ত্রী ?'

'লোকেরা তোমার কানে কোনো-একটা কথা তুলেছে নিশ্চয়ই।'

'কেন ··না, তো, কিন্তু ?'

'লোকেরা তোমার কাছে কোনো-একটা কথা তুলেছে; কী সেটা ?'

'মানে, হ্যাঁ, আমি একটা কথা শুনছিলাম ··।'

'আর তুমি কি তা বিশ্বাস করেছিলে ?'

'না, না, আমি বিশ্বাস করি নি।'

'অবশ্যই তুমি বিশ্বাস করতে পারো না; বিশ্বাস করা তোমার উচিত নয়।'

'আর আমি বিশ্বাসও করি নি।'

'সেটাই স্বাভাবিক! তোমার মতো, যে আমাকে ভালোবাসে—তোমার মতো, যে আমারই সম্পত্তি—সে কিছুতেই এ-সব আজগুবি মিথ্যে বিশ্বাস করতে পারে না।'

'তোমাকে যে আমি ভালোবাসি সেটা তো স্পষ্ট,' স্বামীর পক্ষ থেকেও এ-রকম একটা-কিছু স্বীকারোক্তি শোনার আশায় সে বললে কথাটা।

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি ন্যাকা উপন্যাসের পাতা থেকে তোলা কথাবার্তা আমার পছন্দ হয় না। অপরের প্রতি ভালোবাসার কথাটা যত কম স্বীকার করা যায়, ততই ভালো।'

একটু থেমে সে আবার ব'লে চললো :

'ওরা তোমাকে বলেছে যখন আমার বয়স খুব কম তখন মেক্সিকোতে আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এক বিশাল ধনী মহিলার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়—তিনি বৃদ্ধা এবং প্রভূত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী এবং আমি তাঁকে দিয়ে জোর ক'রে নিজেকে তাঁর সম্পত্তির অধিকারী করিয়ে নিয়েছি, এবং তারপর তাঁকে খুন করেছি। এই তো বলেছে ওরা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওরা তাই বলেছে।'

'আর তুমি বিশ্বাস করেছিলে?'

'না, আমি বিশ্বাস করি নি। তুমি তোমার স্ত্রীকে খুন করেছো, আমি তা বিশ্বাস করতে পারি নি।'

'দেখছি আমি যা ভাবতাম তার চাইতেও বেশি কাণ্ডজ্ঞান আছে তোমার। আমার নিজের স্ত্রীকে—এমন একটা জিনিশকে যা আমারই সম্পত্তি—তাকে আমি কী ক'রে খুন করতে পারি?'

এ-কথা শুনে জুলিয়া কেঁপে উঠলো কেন? নিজের কম্পনের কারণ সে নিজে বুঝতে পারে নি—কিন্তু কারণটা হ'লো প্রাক্তন স্ত্রীর উল্লেখকালে স্বামীর 'জিনিশ' শব্দটার ব্যবহার।

'চরম বোকামো হ'তো,' আলেয়ান্দ্রো ব'লে চললো: 'কেন? কেন খুন করবো তাকে? তার উত্তরাধিকারী হ'তে? কেন, আজকের মতো ঠিক একই ভাবে তখনো তার সম্পত্তি ভোগ করতাম আমি। নিজের স্ত্রীকে খুন করার কী কারণ থাকতে পারে পৃথিবীতে?'

'কিন্তু অনেক স্বামী তো খুন করেছে তাদের স্ত্রীকে,' সাহসে ভর ক'রে বললে জুলিয়া।

'কী কারণে?'

'ঈর্ষা অথবা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য…'

'বাজে কথা। কেবল বোকারাই ঈর্ষাতুর হয়। কেবল বোকারাই ঈর্ষাতুর

হয়, কারণ কেবল বোকারাই দেয় তাদের স্ত্রীকে ঠকাবার সুযোগ। কিন্তু আমি! আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আ মা কে ঠকাতে পারে না! আমার প্রথম স্ত্রী পারে নি, তুমিও পারবে না।'

'ও-রকম ভাবে কথা বোলো না! বিষয়টা বদলানো যাক!'

'কেন?'

'তোমাকে এ-সব কথা বলতে শুনলে আমার কষ্ট হয়। যেন তোমাকে ঠকাবার কথা আমার মাথায় ঢুকতে পারে, এমনকি স্বপ্নেও...'

'আমি জানি; এমনকি তোমার বলার আগেই জানি: আমি জানি তুমি কোনোদিন আমাকে ঠকাবে না। আমাকে ঠকাবে! আ মা র নিজের স্ত্রী? অসম্ভব! আর সে, অন্যজন, খুন করার দরকার হয় নি, সে নিজেই মারা গেছে।'

এটা সেই সব দিনের একদিন, যখন আলেয়ান্দ্রো স্ত্রীর সঙ্গে সব চাইতে বেশি সময় কথাবার্তা বলতো। বিষণ্ণ ও কম্পিত হ'য়ে থাকতো জুলিয়া। তাকে লোকটি ভালোবাসে, না বাসে না?

* * *

বেচারি জুলিয়া! ভয়ংকর তার এই নতুন বাড়ি; তার বাবার বাড়ির মতোই ভয়াবহ। স্বাধীন সে এখানে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে তার যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে, ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করতে পারে। ইচ্ছেমতো তার বান্ধবী-দের এমনকি পুরুষদেরও ডাকতে পারে বাড়িতে। কিন্তু তার প্রভু ও মালিক —তিনি কি ভালোবাসেন তাকে? তার ভালোবাসার এই অনিশ্চয়তা তাকে এই মুক্ত-অর্গল রাজকীয় কারাগারে বন্দিনী ক'রে রেখেছে।

জুলিয়া যখন বুঝতে পারলো তার স্বামী তাকে গর্ভবতী করেছেন তখন উত্তাল ঝড়ের ছায়া ভেদ ক'রে তার বন্দিনী আত্মায় সূর্যালোক প্রবেশ করলো। 'এখন,' বললে সে, 'এখন আমি জানতে পারবো সে আমাকে ভালোবাসে কিনা।'

স্বামীকে এই শুভবার্তা জানাতে সে বললে:

'এই আশাই করছিলাম। এবার আমার উত্তরাধিকারী পাবো এবং তাকে মানুষ ক'রে তুলবো আমি—আমার মতো মানুষ। আমি তার জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলাম।'

'সে যদি না-আসতো তাহ'লে কী হ'তো?' সে প্রশ্ন করে।

'অসম্ভব। তাকে আসতেই হ'তো। আমার সন্তান হ'তেই হবে—আ মা র।'
'অনেকেই তো বিয়ে করে, কিন্তু সন্তান হয় না।'
'অন্যদের না-হ'তে পারে। কিন্তু আমার নয়! আমার সন্তান হ'তেই হবে।'
'কেন?'
'কারণ গর্ভধারণ না ক'রে তোমার উপায় ছিলো না।'
সন্তান জন্ম নিলো, কিন্তু তার পিতা আগের মতো গুটিয়ে রইলো নিজের মধ্যে। কেবল স্ত্রীকে নিষেধ ক'রে দিলে তাকে বুকের দুধ দিতে।
'তুমি যে সুস্থ এবং শক্তিশালী তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু বুকের দুধ দিলে শক্তি নাশ হয়, এবং তোমার আমি তা হ'তে দিতে চাই না। আমি চাই যতদিন পর্যন্ত সম্ভব তুমি নিজেকে যুবতী রাখো।'
ডাক্তার যখন তাকে এই ব'লে নিশ্চিত করলেন যে বাচ্চাকে খাওয়ালে জুলিয়ার ক্ষতি হওয়ার চাইতে বরং লাভই হবে, এবং তাতে তার রূপ আরো উথলে পড়বে, তখনই কেবল আলেয়ান্দ্রো রাজি হ'লো।
সন্তানকে চুম্বন করতে সম্মত হয় না বাবা। 'এই ধরনের বোকা-আদরে ওদের শুধু বিরক্তই করা হয়।' সে কারণটা ব্যক্ত করে; মাঝে-মাঝে তাকে কোলে নিয়ে বহুক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে ছাখে।
'আমার পরিবারের বিষয় জানতে চেয়েছিলে না?' একদিন আলেয়ান্দ্রো বললে স্ত্রীকে। 'এই তো, এখন আমার একটা পরিবার হ'লো, এবং এমন একজন হ'লো যে হবে আমার উত্তরাধিকারী, যে চালিয়ে যাবে আমার কাজ।'
জুলিয়ার লোভ হ'লো স্বামীকে জিগেস করে তার কাজটা কী, কিন্তু সাহসে কুলোলো না। 'আমার কাজ!' সত্যি, কী কাজ হ'তে পারে লোকটার? আগেও তাকে এই একই কথা বলতে শুনেছে জুলিয়া।
তাদের বাড়িতে যারা বেশি আসতেন তাদের মধ্যে ছিলেন বোর্দাভিয়েলার কাউন্ট এবং কাউণ্টেস, বিশেষত কাউন্ট, আলেয়ান্দ্রোর সঙ্গে যাঁর কারবার ছিলো এবং যাঁকে আলেয়ান্দ্রো সুদ নিয়ে বেশ কিছু টাকা ধার দিয়েছিলো। প্রায়ই কাউন্ট জুলিয়ার সঙ্গে একহাত দাবা খেলতেন, জুলিয়ার ভালো লাগতো, আর কাউন্ট তাঁর বন্ধুর—তাঁর দেনাদারের—স্ত্রীর কাছে তাঁর পারিবারিক দুর্ভাগ্যের গল্প করতেন। কাউণ্টের সংসার ছিলো ছোটোখাটো নরকবিশেষ, যদিও খুব বেশি আগুন নেই তাতে। কাউন্ট আর কাউণ্টেসের বনিবনাও হয়

না, পরস্পরকে ভালোও বাসেন না তাঁরা। দু'জনেই যার-যার খেয়াল খুশিমতো চলেন, এবং তিনি, কাউন্টেস, ভয়ংকর সব কেচ্ছার খোরাক জোগান। লোকেরা তাঁর জন্য এই ছোট্ট ধাঁধাটা আবিষ্কার করেছে: 'বোর্দাভিয়েলার কাউন্টের সহকারী স্বামীটি কে?' অতএব কাউন্ট যেতেন সুন্দরী জুলিয়ার গৃহে, তার সঙ্গে দাবা খেলতেন, আর অপরের দুর্ভাগ্য নিজের ব'লে চালাতেন সান্ত্বনালাভের আশায়।

'কী? আজও ওই কাউন্টটা এসেছিলো?' আলেয়াান্দ্রো জানতে চাইলো স্ত্রীর কাছে।

'ওই কাউন্টটা · ওই কাউন্টটা কেন, কোন কাউন্টের কথা বলছো?'

'কোনটা? ঐ কাউন্ট! একজনই কাউন্ট আছে, একজন মারকুইস এবং একজন ডিউক···আমার কাছে ওরা সবাই সমান, সব যেন একটাই জিনিশ।'

'হ্যা; উনি এসেছিলেন।'

'তোমার যদি এতে ভালো লাগে তাহ'লে আমি খুশি। ওই একটা কাজই ওর দ্বারা হয় - বেচারি বোকা।'

'আমার ধারণা উনি বুদ্ধিমান, রুচিবান, ভব্য, এবং বেশ একটা আকর্ষণ আছে ওর।'

'হ্যা, উপন্যাসে যাদের কথা তুমি পড়ো, ও তাদেরই মতো একজন। কিন্তু তা যদি তোমার ভালো লাগে···'

'আর এত দুঃখী ভদ্রলোক।'

'বাঃ! তা তো ওর নিজের দোষ।'

'কেন?'

'কারণ ও একটা হাবা। ওর যা হয়েছে তা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। এই কাউন্টের মতো ক্যাবলাকার্তিককে যে তার স্ত্রী ঠকাবে তা তো খুবই স্বাভাবিক। আরে, ও কি একটা পুরুষ! ও-রকম একটা বস্তুকে লোকে যে কী ক'রে বিয়ে করে, আমি তো তাই ভাবতে পারি না। অবশ্য, মহিলা ওকে নয়, ওর উপাধিকে বিয়ে করেছিলেন! এই অসহ্য জানোয়ারটার সঙ্গে তার বউ যে-রকম ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে কোনো স্ত্রীলোক তা করুক দেখি!'

জুলিয়া তাকিয়ে রইলো তার স্বামীর দিকে, তারপর কী বলছে তা উপলব্ধি না-ক'রেই হঠাৎ ব'লে উঠলো:

'আর যদি কেউ করে? তোমার স্ত্রী-ই যদি এই স্ত্রীলোকটির মতো হয়?'
'বাজে!' আলেয়াদ্রো ফেটে পড়লো হাসিতে। 'বই থেকে তুলে আনা হুন দিয়ে জারিয়ে নিতে চাও আমাদের জীবন? কিন্তু ঈর্ষাতুর ক'রে যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও তাহ'লে ভুল করছো। আমি সে-রকম লোক নই। বোকাটাকে খেলিয়ে ফুর্তি ক'রে নাও।'
'এ কি সম্ভব যে এই লোকটির মধ্যে ঈর্ষার কণামাত্র নেই?' জুলিয়া নিজেকে প্রশ্ন করে। 'কাউণ্ট আমার বাড়িতে এসে ওভাবে আমার মনোরঞ্জন করছে দেখে কি ওর খারাপ লাগে না? এ কি আমার আনুগত্য আর প্রেমের প্রতি তার বিশ্বাস? না কি আমার উপর তার শক্তি ও অধিকারের প্রতি বিশ্বাস? এ কি নিছক নিস্পৃহতা? সে কি আমাকে ভালোবাসে? আমাকে সে কি ভালোবাসে না?' জুলিয়ার অসহ্য হ'য়ে উঠলো। তার প্রভু এবং মালিক ভেঙে ফেলছিলেন তার হৃদয়কে।
এই ভাগ্যহীনা রমণী এমন ভাবে স্বামীর ঈর্ষা জাগাবার চেষ্টা করতে থাকলো যেন সেটাই তার প্রেমের কষ্টিপাথর; কিন্তু সে সফল হ'লো না!
'কাউণ্টের বাড়ি যাবে আমার সঙ্গে?' সে হয়তো জিগেস করলে।
'কেন?'
'চা খেতে।'
'চা? আমার তো পেটের ব্যথা নেই। আমাদের কালে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে পেটব্যথা হ'লেই কেবল আমরা এই নোংরা জল খেতাম। তবে দেখো, তুমি যেন চা বরদাস্ত করতে পারো। এবং বেচারি কাউণ্টকে একটু সান্ত্বনাদান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো। কাউণ্টেস বোধহয় তাঁর অধুনাতম নাগরটিকে নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। চমৎকার সঙ্গ!'

* * * *

কাউণ্ট জুলিয়ার জন্য ওৎ পেতেই ছিলেন। বান্ধবীর সহানুভূতি জাগাবার জন্য তিনি ভাণ করতেন যে পারিবারিক দুর্ভাগ্যে কষ্ট পাচ্ছেন, এবং তার সহানুভূতির সূত্রে তাকে টেনে নেবার চেষ্টা করছিলেন প্রণয়ে, অবৈধ প্রণয়ে। আর সেই সঙ্গে জুলিয়াকে তিনি এটাও বুঝতে দিয়েছিলেন যে তার আপন সংসারের গোলমাল সম্পর্কেও তিনি অল্পবিস্তর অবহিত আছেন।
'হ্যাঁ, জুলিয়া, সত্যি; বাড়ি আমার নরক, পুরোপুরি নরক! তুমি আমাকে করুণা ক'রে ভুল করো নি। আঃ! যদি আরো আগে আমাদের দেখা

হ'তো! আমি আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে। আর তুমি তোমার...'

'আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আগে। তাই কি বলতে চান?'

'না. না, তা ঠিক বলতে চাই নি...'

'তাহ'লে কী বলতে চেয়েছিলেন, কাউণ্ট?'

'তুমি অন্য-একজনের কাছে, তোমার স্বামীর কাছে, আত্মদান করার আগে...'

'আপনি কি তাহ'লে এ বিষয়ে এতই নিশ্চিত যে আপনার কাছে আমি আত্মদান করতাম?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'

'সত্যি, আপনাদের পুরুষদের কী আস্পর্ধা।'

'আস্পর্ধা?'

'হ্যাঁ, আস্পর্ধা। আপনার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য—এই কি আপনার ধারণা?'

'আমার?'

'আর কে?'

'আমাকে একটা কথা বলার অনুমতি দেবেন, জুলিয়া?'

'যা ইচ্ছে বলুন।'

'আমি নয়, আমার প্রেম হ'তো অপ্রতিরোধ্য। হ্যাঁ, আমার প্রেম।'

'এটা কী পুরোদস্তুর প্রস্তাব, কাউণ্ট? ভুলে যাবেন না আমি বিবাহিত, সাধ্বী এবং স্বামীর প্রতি আসক্ত...'

'ওঃ! সে...'

'আপনার কি তাতে সন্দেহ আছে? হ্যাঁ, আমি আসক্ত, শুনে রাখুন—সত্যি, সত্যি আসক্ত আমার স্বামীর প্রতি...'

'কিন্তু সে তো...'

'কী বলতে চান? কে বলেছে আপনাকে যে উনি আমাকে ভালোবাসেন না?'

'আপনি নিজে।'

'আমি? কবে আমি বলেছি যে আলেয়াল্দ্রো আমাকে ভালোবাসেন না? কবে?'

'আপনি বলেছেন আপনার চোখ দিয়ে, আপনার ভঙ্গি দিয়ে, আপনার ভাবে।'

‘দেখছি আপনাকে আমিই উৎসাহ দিয়েছি আমার সঙ্গে প্রেম করতে। সাবধান কাউন্ট, এই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।’

‘ঈশ্বরের দোহাই, জুলিয়া।’

‘হ্যাঁ, এই আমার শেষ, একেবারে শেষ কথা।’

‘ঈশ্বরের দোহাই, জুলিয়া। নীরবে এসে দেখে যেতে দেবেন আপনাকে। আমাকে শুধু তাকিয়ে থাকতে দেবেন আপনার দিকে, আর আপনাকে দেখতে-দেখতে শুকিয়ে ফেলতে দেবেন আমার অন্তরের অশ্রুধারা…’

‘চমৎকার।’

‘আর আমি আপনাকে যা বললাম তাতে মনে হচ্ছে আপনি অসম্মানিত বোধ করলেন…’

‘মনে হচ্ছে? আমি সত্যিই অসম্মানিত বোধ করছি…’

‘আপনাকে কি আমি অসম্মান করতে পারি?’

‘কেন?’

‘আমার যে কথায় আপনি অসম্মানিত বোধ করেছেন তা শুধুমাত্র এই: যে শুধু যদি আমাদের দেখা হ’তো—আমি আমার স্ত্রী এবং আপনি আপনার স্বামীর হাতে নিজেকে সপর্পণ করার আগে—তাহ’লে এখনকার মতোই উন্মত্তভাবে আমি আপনাকে ভালোবাসতাম! আপনার কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলছি আমি। এখনকার মতোই উন্মত্তভাবে আমি আপনাকে ভালোবাসতাম! আমার প্রেম আপনার প্রেম জয় ক’রে নিতো। জুলিয়া, আমি সেই সব পুরুষদের একজন নই যারা নিজের ক্ষমতা দিয়ে মেয়েদের জয় ক’রে তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়—কারণ তারা কেমন লোক বলুন যারা প্রতিদানে ভালোবাসা না-দিয়ে প্রেমের দাবি করে! আমার মধ্যে সেই রকম কোনো অহংকার আপনি পাবেন না।’

ফোঁটায়-ফোঁটায় বিষ গ্রহণ করছিলো জুলিয়া!

‘এমন অনেক পুরুষ আছে,’ কাউন্ট ব’লে চললেন, ‘কাউকে ভালোবাসার ক্ষমতা যাদের নেই, কিন্তু যারা ভালোবাসা দাবি করে, আর তাদের ধারণা যে বেচারি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তার ভালোবাসা আর পরম সতীত্বের উপর তাদের ন্যায্য অধিকার আছে। যারা রূপের জন্য বিখ্যাত কোনো মহিলাকে বাছে শুধুমাত্র নিজেদের গৌরব বৃদ্ধির খাতিরে, পোষা সিংহীর মতো তাদের পাশে নিয়ে ঘোরবার জন্য। “আমার সিংহীকে ছাখো,” তারা বলে;

"দেখেছো কেমন বশ করেছি।" আর শুধু এই জন্যই তারা ভালোবাসে তাদের সিংহীকে।'

'কাউন্ট, কা উ ণ্ট! আপনি এমন একটা কথা বলতে যাচ্ছেন...'

কাউন্ট আরো কাছে এগিয়ে এলেন, প্রায় তার কানের পাশে। ঝকঝকে বাদামি চুলের থোকার মাঝখানে গোলাপি মাংস দিয়ে গড়া সেই অপরূপ ঝিনুকটিতে সে অনুভব করলো দমবন্ধকরা নিশ্বাসের কম্পন, যখন কাউন্ট ফিশফিশ ক'রে বললেন:

'জুলিয়া, আমি তোমার আত্মায় প্রবেশ করছি।'

তাঁর অন্তরঙ্গ 'তুমি' সম্বোধনে তার অপরাধী কান লাল হ'য়ে উঠলো।

আসন্ন ঝড়ের সূত্রপাতে সমুদ্রের মতো ওঠাপড়া করতে লাগলো জুলিয়ার বুক।

'হ্যাঁ, জুলিয়া, আমি তোমার আত্মায় প্রবেশ করছি।'

'চ'লে যান, ভগবানের দোহাই, আপনি চ'লে যান। উনি যদি এসে পড়েন তাহ'লে কী হবে?'

'উনি আসবেন না। তোমার কোনো কাজেই তাঁর কোনো উৎসাহ নেই। উনি এখানে আমাদের এ-রকম একা রেখে যান তার কারণ উনি ভালোবাসেন না তোমাকে · না, না, উনি ভালোবাসেন না তোমাকে, উনি তোমাকে ভালোবাসেন না জুলিয়া, উনি তোমাকে ভালোবাসেন না।'

'আমার প্রতি ওঁর অটুট বিশ্বাস ব'লেই...'

'তোমার প্রতি? না, নিজের প্রতি। চরম বিশ্বাস আছে ওঁর নিজের উপর, আছে অন্ধ আত্মবিশ্বাস! উনি মনে করেন যে উনি, কারণ উনি যা—আলেয়ান্দ্রো গোমেথ, যিনি নিজের ভাগ্য নিজে গড়েছেন—কোন উপায়ে তা আমি বলবো না—উনি মনে করেন যে একজন স্ত্রীলোক তাঁকে ঠকাতে পারে না। আমাকে উনি ঘৃণা করেন—তা আমি জানি।'

'হ্যাঁ, উনি আপনাকে ঘৃণা করেন '

'আমি জানতাম! কিন্তু আমারই মতো তোমাকেও ঘৃণা করেন।'

'ভগবানের দোহাই আপনি থামুন। আপনি মেরে ফেলেছেন আমাকে...'

'তোমাকে যে মারবে সে তোমার স্বামী! এবং তুমিই প্রথম নও।'

'ওটা মিথ্যা রটনা, কাউণ্ট, মিথ্যা! আমার স্বামী তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেন নি। চ'লে যান এখান থেকে; চ'লে যান, আর আসবেন না কোনোদিন।'

'যাচ্ছি, কিন্তু আমি আবার আসবো। তুমিই আমাকে ডেকে পাঠাবে।'
এই ব'লে তিনি বিদায় নিলেন, চরম আঘাত হেনে গেলেন তার হৃদয়ে।
'লোকটা কি সত্যি কথা ব'লে গেলো?' নিজের মনে ভাবলে জুলিয়া। 'তাই কি হ'তে পারে? আমি এমনকি নিজের কাছেও যা স্বীকার করতে চাই নি ও আমাকে তাই ব'লে গেলো। সে আমাকে ঘৃণা করে, একি সত্যি? একি সত্যি যে সে আমাকে ভালোবাসে না?'

কাউন্টের সঙ্গে জুলিয়ার সম্পর্ক নিয়ে শহরের নিন্দুকমহলে গুজব ছড়াতে শুরু করেছিলো। আলেয়াক্সো সে-সব কিছু শুনতো না অথবা না-শোনার ভাণ করতো। এক বন্ধু যখন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে কথা বলতে শুরু করেছিলো তখন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সে বলেছিলো: 'জানি, আপনি কী বলবেন। কিন্তু চুপ করুন; এ-সব গল্প বাজে কেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই না। ভাবপ্রবণ স্ত্রীলোকদের ইচ্ছেমতো চলতে দেয়াই উচিত।' এ কি হ'তে পারে, এ কি হ'তে পারে যে সে কাপুরুষ।

কিন্তু একদিন কাসিনোতে[১] তার সামনেই যখন একজন শিং[২] নিয়ে এক ইঙ্গিতপূর্ণ দ্ব্যর্থক মন্তব্য করতে সাহস করলো সে একটা বোতল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো তার মাথায়। ফল হ'লো ভয়ংকর এক কেলেংকারি!

'আমার কাছে—আমার কাছে আসে এ-সব রসিকতা করতে!' তার সবচাইতে সংযত কণ্ঠস্বরে সে বললে। 'আমি যেন ওর কথা বুঝি নি! ওই পরের চরকায় তেল দেয়া বাবুদের মধ্যে যে-সব বোকার মতো কথা ছড়াচ্ছে আমার স্ত্রী বেচারির কল্পনাপ্রবণতার খেয়াল নিয়ে তা যেন আমি আর জানিনে। ঐসব ভিত্তিহীন কেচ্ছার মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে আমি বদ্ধপরিকর…'

'কিন্তু ওভাবে চলে না, ডন আলেয়াক্সো,' কেউ হয়তো সাহস ক'রে বলে।
'কী ক'রে চলে তাহ'লে? কী ক'রে তা বলো?'
'এই সব কেচ্ছার কারণটা বরং দূর করুন।'
'ওঃ। তাই নাকি। কাউন্টের মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে?'
'তা-ই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

১ জুয়ার আড্ডা ও ক্লাবের সংমিশ্রণ। ভূমধ্যসাগরবর্তী দেশগুলির অনন্য "সাংস্কৃতিক" অবদান।
২ ইয়োরোপে প্রবাদ আছে স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী হ'লে স্বামীর মাথায় শিং বেরোয়।

'কিন্তু তাতে তো নিন্দুকদেরই সমর্থন করা হবে। তা ছাড়া আমি তো অত্যাচারী নই। আমার স্ত্রী বেচারি যদি এই সাজের পুতুল কাউণ্টটাকে নিয়ে একটু মজা পায় আমি কি তাকে তার অবসর বিনোদনের উপায় থেকে বঞ্চিত করবো—যে অবসর বিনোদনের উপায় বাৎলে দিচ্ছে ঐ মহামূর্খ কাউণ্ট যে কিনা—আমি শপথ ক'রে বলতে পারি—একেবারে গেঁয়ো ভূত একটা, যার অস্তিত্বের কোনো মূল্যই নেই, মান-অপমান কিছু করার যার কোনো ক্ষমতাই নেই, আর যে ডহুয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করছে—শুধুমাত্র অন্য-এক বোকার দল কী বলবে সে-কথা ভেবে? তাহ'লে তো সব চুকেই গেলো! ভাবো একবার, আমার স্ত্রী ঠকাচ্ছে আমাকে! আ মা কে! আমাকে তোমরা চেনো না!'

'কিন্তু ডন আলেয়ান্দ্রো, আপাতদৃষ্টিতে···'

'আমি সত্য জগতে বাস করি, সেখানে আপাতদৃষ্টির কোনো স্থান নেই।'

তার পরের দিন দু'জন ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক আলেয়ান্দ্রোর বাড়িতে এলেন অপমানিত লোকটার নাম ক'রে অপমানের শোধ তুলতে।

'তাকে বলবেন,' আলেয়ান্দ্রো বললে তাদের, 'তার ডাক্তারের হিশেবটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে; সেটা তো বটেই, তাছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি যদি হ'য়ে থাকে, তার জন্যও আমি টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।'

'কিন্তু ডন আলেয়ান্দ্রো···'

'আরে, আপনারা চান কী?'

'আমরা কিছুই বলছি না। তবে অপমানিত পক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন করছেন · অপমানের শোধ নিতে · একটা সসম্মান ব্যাখ্যা ··'

'বুঝতে পারলাম না·· কিংবা বুঝতে চাইও না।'

'আর তা না-হ'লে উনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ডাকবেন আপনাকে?'

'ভালো কথা! যখন তিনি ইচ্ছা করছেন তখন তাই হবে। কিন্তু আপনাদের তার ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের কোনো সহকারীর প্রয়োজন নেই। তবু ওঁকে ব'লে দেবেন মাথাটা একটু ভালো হ'লে—মানে বোতলের বাড়িটা সামলে উঠলে—আমাকে যেন জানান; ওঁর যেখানে খুশি সেখানেই আমরা যাবো, ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে খালি হাতেই মিটিয়ে ফেলবো ব্যাপারটা। অন্য-কোনো অস্ত্রে আমি রাজি হবো না। আলেয়ান্দ্রো গোমেথ যে কে, সেটা বুঝতে পারবেন।'

'কিন্তু ডন আলেয়াল্দ্রো, আপনি মজা করছেন আমাদের নিয়ে,' দ্বন্দ্বযুদ্ধের হবু সহকারীদের একজন বললেন।

'মোটেই না। আপনারা এক জগতের অধিবাসী, আমি আরেক জগতের। আপনারা সব নামজাদা বাপের ছেলে—অভিজাত পরিবারভুক্ত···আর আমি নিজেই আমার পরিবারের সৃষ্টিকর্তা। কোনো উচ্চবংশে আমার জন্ম নয়, ভব্যতা নামক মিথ্যা ভাণকে আমি মেনে নিতে রাজি নই। এই হ'লো আমার কথা!'

সহকারীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং একজন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে—এবং বেশ জোর দিয়ে, কিন্তু একেবারে অশ্রদ্ধাভরে নয় (কারণ শত হ'লেও এই লোকটি হ'লো একজন প্রভাবশালী কোটিপতি, এবং এর জন্ম রহস্যাবৃত)—বললেন:

'তাহ'লে, সিনিয়র আলেয়াল্দ্রো গোমেথ, আমাকে বলতে দিন যে···'

'যা-ইচ্ছে বলুন, কিন্তু কী বলছেন ভেবে বলবেন, কারণ আরেকটা বোতল আমার হাতের কাছেই আছে।'

'তাহ'লে সিনিয়র ডন আলেয়াল্দ্রো গোমেথ,' গলার স্বর চড়িয়ে ভদ্রলোক জানান: 'আপনি ভদ্রলোক নন।'

'অবশ্যই নই; অবশ্যই আমি ভদ্রলোক নই। আমি, ভ দ্র লো ক? কবে থেকে? কী ক'রে! এক গর্দভপালক আমাকে মানুষ করেছিলো, কোনো ভদ্রলোক নয়। যে-লোকটি নিজেকে আমার বাবা বলতো, তার দুপুরের খাবারটা আমি যখন নিয়ে যেতাম গাধার পিঠে পর্যন্ত চ'ড়ে যেতে পারতাম না, হেঁটে যেতে হ'তো। অবশ্যই আমি ভদ্রলোক নই। ভদ্রলোক আর আমি—উঃ কী আজগুবি!'

'আমরা চলি,' অন্য সাথীটি বললেন, 'আমাদের আর-কিছু করবার নেই এখন। সিনিয়র ডন আলেয়াল্দ্রো, আপনার এই দুর্বোধ্য ব্যবহারের ফল আপনি পাবেন।'

'নিশ্চয়ই, আমি প্রতীক্ষায় থাকবো। আর ইয়ে—ঐ মুখ-আলগা ভদ্রলোক, যাঁর মাথার খুলি আমি ভেঙে দিয়েছি—ওঁকে বলবেন, আমি আবার বলছি, ডাক্তারের হিশেবটা আমাকে পাঠিয়ে দিতে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ে কথা বলতে। আর আপনারা দু'জন, কত কীই তো ঘটতে পারে, যদি কোনোদিন এই বর্বর এবং দুর্বোধ্য স্বভাবের কোটিপতিকে দরকার হয়, এমন

এক বর্বর যে ভব্যতার ধার ধারে না, তাহ'লে আমার সাহায্য চাইতে পারেন, অন্য অনেক ভদ্রলোককে যেমন করেছি এবং করি, তেমনি আপনাদেরও আমি সাহায্য করবো।'

'অসহ্য! আর থাকা যায় না!'

এই ব'লে সহকারীদ্বয় বিদায় নিলেন।

* * *

সেই রাত্রে আলেয়ান্দ্রো—বোতলের ব্যাপারটা খুলে বলার পর—সহকারী দু'জনের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে তাও সবিস্তারে স্ত্রীর কাছে বিবৃত করলো। তার এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে বেশ আমোদ পাচ্ছিলো সে। সভয়ে তার বক্তব্য শুনলো জুলিয়া।

'আমায় বলে কিনা ভদ্রলোক! আমি ভদ্রলোক! আলেয়ান্দ্রো গোমেথ! ককখনো নয়! শুধু পুরুষ মানুষ, আমি সত্যিকার পুরুষ।'

আর আমি?' কিছু একটা বলবে ব'লেই সে বললে।

'তুমি? তুমি হ'লে সত্যিকার স্ত্রীলোক। এমন স্ত্রীলোক, যে উপন্যাস পড়ে।

'আর ওই নগণ্য কাউণ্টটি, যে তোমার সঙ্গে দাবা খেলে, সে কেউ-না, কেউ-নারও অধম। পোষা কুকুর নিয়ে তুমি যেমন খেলা করতে পারতে এর সঙ্গেও পারো সেই রকম—আমি বাধা দেবো কেন? তুমি যদি ঐ একটা লোমওলা কুকুর, কি আঙ্গোরা বেড়াল অথবা ছোট্ট একটা পোষা বাঁদর কিনতে, তাকে পুষতে এমনকি চুমুও খেতে, তাহ'লে কি আমি সেই কুকুর-বাচ্চাটাকে, অথবা বেড়াল কি পোষা বাঁদরটাকে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতাম? ভারি বুদ্ধির কাজ হবে সেটা, বিশেষত যখন কোনো এক পথচারীর মাথায় গিয়ে পড়তে পারে। কাউণ্টের বেলাতেও ঠিক তাই, ও হ'লো ঐ রকমই একটা ছোট্ট কুকুর-ছানা, বেড়ালবাচ্চা কিংবা কোনো মর্কট। তাকে নিয়ে যত ইচ্ছে মজা করতে পারো।'

'আলেয়ান্দ্রো, লোকে কিন্তু, ঠিকই বলছে; ওই লোকটিকে তোমার বাড়িতে না-আসতেই দেয়া উচিত…'

'কী বললে? লোকটি?'

'সে তুমি তাকে যা-ই মনে করো। কিন্তু বোর্দাভিয়েলার কাউণ্টকে এ-বাড়িতে আসতে তোমার বারণ করাই উচিত।'

'তুমি করো না কেন? তুমি যতদিন তা না-করছো ততদিন বুঝবো তোমার

হৃদয়ে তার কোনো আসন নেই। কারণ তোমার প্রতি ওর ঝোঁক থাকলে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই তুমি তাকে সরিয়ে দিতে।'

'আর যদি আমার ওঁর প্রতি ঝোঁক থাকে।'

'ভালোরে ভালো। আমাকে তুমি ঈর্ষাকাতর করতে চাও! আ মা কে! কবে তুমি এটা উপলব্ধি করবে যে আমি অন্যদের মতো নই?'

*　　　*　　　*

যত দিন যেতে লাগলো, তার স্বামী ততই জুলিয়ার কাছে ক্রমশ আরো দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠতে লাগলো; অথচ সে তাকে যতই কম ক'রে বোঝে ততই তার মুগ্ধতার পরিমাণ আরো বেড়ে যায়; আর আগের চেয়ে আরো-অনেক বেড়ে ওঠে তার উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল সত্যি কি সে তাকে ভালোবাসে, না বাসে না? ওদিকে আলেয়াল্দ্রো—স্ত্রীর বিশ্বস্ততায় সে যদিও পুনর্বার নিঃসংশয় হয়েছে, উপরন্তু তার, অর্থাৎ আলেয়াল্দ্রোর, স্ত্রী কেমন ক'রে তাকে—যে কিনা একজন সত্যি-মানুষ, আসল মানুষ!—প্রতারিত করতে পারে এটা যদিও তার কাছে অসম্ভবই ঠেকে—তবু নিজের কাছে বলতে শুরু করেছিলো 'ওই সব আজগুবি উপন্যাস আর রাজধানীর এই জীবনযাত্রাই বেচারির মাথা খাচ্ছে!' স্ত্রীকে তাই সে পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক করলে, এবং এই উদ্দেশ্যেই তারা একদিন তাদের জমিদারির উদ্দেশে মফস্বলের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লো।

'কয়েক দিন গ্রামদেশে কাটালে তোমার ভালো লাগবে,' স্ত্রীকে সে বললো। 'স্নায়ুর উত্তেজনা শান্ত হবে তাতে। তাছাড়া তোমার ওই মর্কটটি সঙ্গে না-থাকলে তোমার যদি একঘেয়ে ও বিরক্তিকর লাগার ভয় থাকে তো আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তাকে তুমি আমন্ত্রণ জানাতে পারো। আমি যে মোটেই ঈর্ষাতুর নই, তা তো তুমি ভালোই জানো। তোমাকে নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই: তুমি—আ মা র স্ত্রী—তোমার সম্বন্ধে আমি অতিশয় নিশ্চিত।'

মফস্বলে গিয়ে কিন্তু জুলিয়ার উৎকণ্ঠা বরং আরো বেড়ে গেলো। ভীষণ একঘেয়ে ঠেকলো দিনগুলি, ক্লান্তিকর ও দুর্বিষহ। তার স্বামী আবার তাকে কিছুতেই বই পড়তে দেবে না।

'ওই বইগুলির কাছ থেকে দূরে সরাবার জন্যই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম। কোনো আপদ হবার আগেই তোমার ওই স্নায়ুদৌর্বল্য সেরে যাক, এটাই আমি চাই।'

'স্নায়ুদৌর্বল্য ? আমার ?'

'কেন ? তোমারই তো ! ওটাই তো তোমার একমাত্র গণ্ডগোল। ওই আজগুবি বইগুলি থেকেই ও-সব আসে।'

'তবে আর ও-সব বই পড়বো না।'

'না, তেমন-কিছু করতে আমি বলি না…কোনো জোরজুলুম করতে চাই না আমি। কী ভেবেছো তুমি আমাকে ? উৎপীড়ক ? স্বেচ্ছাচারী ? পাষণ্ড ? জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে কোনোদিন কিছু আদায় করেছি আমি ?'

'না তা কেন। এমনকি আমি যে তোমাকে ভালোবাসি তাও তুমি কোনো-দিন দাবি করো নি।'

'খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ ক'রে এমন-কিছু দাবি করাই যখন অসম্ভব ও হাস্যকর। আর তাছাড়া এটা তো আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালো-বাসো, আর-কাউকে ভালোবাসাই তোমার পক্ষে অসম্ভব…বিশেষত তুমি যখন এতদিনে আমাকে জেনেছো, সে-প্রশ্নই তখন ওঠে না। একজন আস্ত মানুষ কেমন হয়, আমার দৌলতে এটা যখন তুমি জেনে নিয়েছো, তখন চেষ্টা করলেও আর-কাউকে তুমি ভালোবাসতে পারবে না, সে-ক্ষমতাই নেই তোমার। কিন্তু এ-কথা থাক, বইয়ের বুলি ঢের হয়েছে ! গল্প-উপন্যাস যে আমি মোটেই পছন্দ করি না, তা তোমাকে আগেই বলেছি। কোনো ছোট্ট কাউণ্টের সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসলে লোকে আর কী করে—তখন বাধ্য হ'য়ে নেহাতই কথা বলার খাতিরে ও-সব আজেবাজে বই নিয়ে আলোচনা করতে হয়।'

তার স্বামী যে একজন বোকা, আকাট ও মোটাশোটা দাসীর সঙ্গে—যে কিনা এমনকি দেখতেও মোটেই ভালো না—শস্তা ও বাজে একটি প্রণয়ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছে, এটা আবিষ্কার করার সঙ্গে-সঙ্গেই জুলিয়ার যন্ত্রণা আরো শতগুণ বেড়ে গেলো। রাতের বেলায় একদিন যখন খাবার পরে তারা দু'জনেই কেবল ব'সে আছে, তখন হঠাৎ কথাটা পাড়লো জুলিয়া :

'এটা কিন্তু তুমি ভুলেও ভেবো না, আলেয়ান্দ্রো, যে সিমোনার সঙ্গে তোমার কুকীর্তির কিছুই আমার চোখে পড়ে নি।'

'তা আমি কখনো লুকোতেও চাই নি। কিন্তু এটা তেমন-কিছু জরুরি ব্যাপার নয়। রোজই কি আর মুর্গির ঝোল…'

'তার মানে?'
'তুমি এত সুন্দর যে তোমাকে রোজ ব্যবহার করা যায় না।'
কেঁপে উঠলো তার স্ত্রী। এই প্রথম তার স্বামী তাকে খোলাখুলি সুন্দর বললো। এটা কি তবে সম্ভব যে ও তাকে ভালোবাসে?
'কিন্তু,' জুলিয়া বললো, 'শেষে কিনা ওই মাংসের ঢিবিটার সঙ্গে!'
'ঠিক ওই জন্যে। নোংরা ব'লেই তো এত মজা! এটা ভুলো না যে আমি বড়ো হয়েছিলাম শুয়োরছানাদের আস্তানায়; আমার এক বন্ধুর মতে সেই জন্যই নাকি আস্তাকুঁড়ের প্রতি আমার এক বিগলিত দাক্ষিণ্য আছে। ও তো হ'লো পাড়াগেঁয়ে চাটনির মতো, ক্ষুধা বাড়াবার হজমিগুলি: তাকে চেখে নেবার পরে তোমার রূপ, রুচি আর সূক্ষ্ম ও মার্জিত আভিজাত্যকে আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবো।'
'তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাচ্ছো, না এ তোমার চাটুকারিতা?'
'এই ছাখো! আবার তোমার স্নায়ুদৌর্বল্য শুরু হ'য়ে গেলো। অথচ আমি কিনা ভেবেছিলাম তোমার উন্নতি হচ্ছে।'
'এটা ঠিক যে তোমরা পুরুষেরা অনায়াসেই তোমাদের সব শখ মেটাতে পারো। আমাদের ঠকাতে তোমরা যে…'
'কে আবার তোমাকে ঠকালো?'
'তুমি!'
'একে তুমি ঠকানো বলো? বাঃ, চমৎকার! সব বইয়ের বুলি…পড়া পুঁথি! সিমোনার জন্য আমার এক কানাকড়িও…'
'নিশ্চয়ই না। ও তো তোমার কাছে নেহাতই একটি কুকুরছানা, তোমার পোষা মার্জারী কিংবা একটি মেয়ে-মর্কট।'
'ঠিক বলেছো, মেয়ে-মর্কট, ঠিক তাই! পোষা মর্কট ছাড়া আর-কিছু না। সত্যি, আস্ত একটি মেয়ে-মর্কট, পুরোপুরি তাই। খুব ভালো নাম দিয়েছো তুমি, সত্যি: পোষা মর্কট! কিন্তু তাতে কি এটা বোঝায় যে আমি আর এখন তোমার স্বামী নই?'
'তুমি বলতে চাচ্ছো যে এই ঘটনার পরেও আমি তোমার স্ত্রীই আছি আগের মতো—আমার স্ত্রীত্বের কোনোই হানি হয়নি তাতে…'
'বেশ চাতুরী শিখেছো তো তুমি, জুলিয়া…'
'ঠেকলে লোকে সবই শিখে নেয়।'

'শিখেছো তো আমার কাছ থেকে—তোমার ওই পোষা মর্কটটির কাছ থেকে নিশ্চয়ই নয়।'

'তোমার কাছ থেকেই তো শিখেছি—তা আর বলার কী আছে?'

'সাধু! কিন্তু এমন একটি গেঁয়ো কেচ্ছায় যে তোমার ঈর্ষা হবে, তা আমার বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছে না! তুমি, তুমি ঈর্ষাতুর হবে! তুমি, যে কিনা আ মা র স্ত্রী! শেষকালে কিনা এই মেয়ে-মর্কটটির জন্য ঈর্ষা! আর, তার কথা ভাবছো? তাকে কিছু যৌতুক দিয়ে দেবো, ব্যস, সব চুকে গেলো!'

'নিশ্চয়ই, বিশেষত কেউ যখন ধনী…'

'এবং এই যৌতুকের জন্যই চক্ষের নিমেষে তার শুভপরিণয় হ'য়ে যাবে—যৌতুক ছাড়া স্বামীকে আস্ত একটি ছেলেও উপহার দেবে সে। আর ছেলেটি যদি বাপের মতো হয়—বাপটি তো একজন আসল মানুষ—তাহ'লে তার প্রাণেশ্বরের তো ডবল লাভ!'

'চুপ করো! চুপ করো!' বেচারি জুলিয়া কান্নায় ভেঙে পড়লো।

'আমি কিনা ভেবেছিলাম,' আলেয়ান্দ্রো তার বক্তব্যের দাঁড়ি টানলো, 'এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে তোমার স্নায়ুর অসুখ সেরে গেছে! সাবধান, না-হ'লে কিন্তু ভীষণ হ'য়ে উঠবে শেষটায়!'

দু'-দিন পরে তারা তাদের শহরের বাড়িতে ফিরে এলো।

*　　*　　*

আবার শুরু হ'লো জুলিয়ার মনস্তাপ, এবং আবার বোর্দাভিয়েলার কাউন্টের দর্শন পাওয়া যেতে লাগলো নিয়মিত—অবশ্য এবার তাঁর প্রতিটি আগমনই অনেক বেশি সুচিন্তিত, বুদ্ধিমান ও কৌশলী হ'লো। শেষকালে জুলিয়া—সে তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত—হাল ছেড়ে দিলে; তাদের এই বন্ধুতা যাতে তার স্বামীর কাছে উগ্রভাবে প্রকাশ পায় এইজন্য সে তার বান্ধবের ওই বিষাক্ত বক্রোক্তিতে কর্ণপাত করতে আরম্ভ করলো; তার স্বামী অবশ্য বহু আগেই এ-বিষয়ে একবার শাসিয়ে রেখেছিলো. 'পাড়াগাঁয়ে ফিরে গিয়ে আবার তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি!'

একদিন, সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাবার পরে, বিধ্বস্ত জুলিয়া এই ব'লে তার স্বামীকে আক্রমণ ক'রে বসলো:

'তুমি কি মানুষ, না আর-কিছু? না, তুমি মানুষ নও, আলেয়ান্দ্রো!'

'এ আবার কী? আমি? মানুষ নই? কেন, শুনি!'

'না, মোটেই মানুষ নও তুমি, মানুষ নও!'

'কেন, তা বুঝিয়ে বলো।'

'এখন তো আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না। আমার কিছুতেই তোমার কোনো কৌতূহল নেই, এমনকি তোমার সন্তানের জননী পর্যন্ত নই আমি তোমার কাছে! জানি, কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে: কেবল জাঁক দেখাবার জন্য, আমাকে দেখিয়ে গর্ব পাবে ব'লে, আমার রূপ তোমার আহ্লাদকে…'

'ওঃ, এই কথা? এ তো পুরোপুরি সাহিত্য। কেন আমি মানুষ নই, সে-কথা বলো!'

'এখন তো আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না।'

'এই ভালোবাসা না-বাসার কথা, প্রেম হৃদয় আত্মা প্রভৃতি আজগুবি ও বাজে কথা শুধু যে কোনো কাউন্টের চায়ের টেবিলেই মানায়, তোমাকে তো এটা হাজারবার বলেছি।'

'তুমি যে আমাকে ভালোবাসো না, তা এখন আরো ভালো ক'রে বুঝলাম।'

'হুঁ, কিন্তু তাছাড়া আর কী?'

'যাকে তুমি মর্কট বলো, সেই কাউণ্ট যে যখন খুশি তখন এ-বাড়িতে ঢুকতে পায়, এ-বিষয়ে তোমার সম্মতিই তো…'

'সে তো তুমিই সম্মতি দিয়েছো ব'লে!'

'আমি কেন তাতে সম্মতি দেবো না—বিশেষ ক'রে সে যখন আমার প্রণয়ী। শুনলে তো এখন! আমার প্রণয়ী সে—আমার প্রেমিক।'

স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আলেয়ান্দ্রো, শান্ত ও উদাসীন। রোষে-ক্রোধে তার স্বামী এবার বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়বে ভেবে জুলিয়া আরো উত্তেজিত হ'য়ে উঠে চীৎকার ক'রে বললো:

'কী! কী করবে তুমি এবার? বধ করবে না আমাকে, যেমন তোমার আগের স্ত্রীকে করেছিলে?'

'আগের স্ত্রীকে আমি বধ করেছি এটা যেমন সত্যি নয়, তেমনি ওই মর্কটটা যে তোমার প্রেমিক তাও একটি ডাহা মিথ্যে কথা। আমাকে চেতাবার জন্য মিথ্যে কথা বলছো, তুমি রাগাতে চাচ্ছো আমাকে! একজন ওথেলো বানিয়ে দিতে চাও তুমি আমাকে—কিন্তু আমার বাড়ি কোনো নাট্যশালা নয়।

এভাবে যদি আর-কিছুদিন চলে তো শেষটায় তুমি নির্ঘাত পাগল হ'য়ে যাবে—তখন তোমাকে বন্ধ ক'রে রাখতে বাধ্য হবো আমরা!'

'পাগল? আমি? আ মি পা গ ল!'

'নিশ্চয়ই! আস্ত মাথা খারাপ! কোনখানে পৌঁচেছে এসে, একবার দ্যাখো—শেষে কিনা ভাবছে তার একজন প্রেমিক আছে। মতলব হচ্ছে আমাকে তা বিশ্বাস করাবে! যেন আমার স্ত্রী ফাঁকি দিতে পারবে আমাকে! আ মা কে! আলেয়ান্দ্রো গোমেথ কোনো মর্কটশাবক নয়! সে হ'লো সত্যি-মানুষ! তোমার ওই উচ্চাশা কিছুতেই কিন্তু সফল হবে না—ভেবেছো যে তোমার কানে শুড়শুড়ি দেবার জন্য গল্পের বইয়ের বুলি আর কাউন্টের চায়ের টেবিলের কথাবার্তা আমি ব্যবহার করবো, তাই না? কিন্তু এই উদ্দেশ্য মোটেই সার্থক হবে না! আমার বাড়ি কোনো নাট্যশালা নয়।'

'ভীতু! ভীতু তুমি, কাপুরুষ! আস্ত ভীতুর ডিম!' নিজেকে সামলাতে না-পেরে জুলিয়া চীৎকার ক'রে উঠলো।

'বুঝতে পারছি বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের,' কড়া ক'রে বললো তার স্বামী। এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

* * *

স্ত্রীকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছিলো আলেয়ান্দ্রো; এই দৃশ্যের দু'দিন পরে তাকে সে হঠাৎ একবার পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালে। আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিলো বেচারি জুলিয়া, ভীত আর বিপন্ন। গিয়ে দেখলো আপিশ-ঘরে ব'সে আছে তার স্বামী, তার জন্য অপেক্ষা করছে, সঙ্গে আছেন বোর্দাভিয়েলার কাউন্ট ও আরো দু'জন ভদ্রলোক।

'শোনো জুলিয়া,' ভীষণ শান্ত গলায় তার স্বামী বললে, 'এই ভদ্রলোক দু'জন মানসিক রোগের চিকিৎসা ক'রে থাকেন। আমার অনুরোধেই এঁরা তোমাকে দেখতে এসেছেন—যাতে তোমার জন্য আমরা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি। তোমার মানসিক অবস্থা যে তেমন ভালো নেই, উন্মাদনা কেটে গেলে তা নিশ্চয়ই তুমি টের পাও।'

'আর তুমি এখানে কী করছো, হুয়ান?' স্বামীর দিকে কোনো দৃকপাত না-ক'রেই কাউন্টকে জিগেস করলো জুলিয়া।

'দেখলেন তো?' ডাক্তারদের দিকে ফিরে আলেয়ান্দ্রো ব'লে উঠলো, 'এখনো

ওই মতিভ্রম উনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এখনো কিনা এই ভদ্রলোককে তাঁর প্রেমিক ব'লে কল্পনা করছেন!'

'হ্যা, উনি আমার প্রেমিক!' তাকে থামিয়ে দিলো জুলিয়া, 'আমার কথা সত্যি না-হ'লে উনিই সে-কথা অস্বীকার করবেন।'

স্থির চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন কাউন্ট।

'দেখলেন তো, কাউন্ট, কেমন জেদ ক'রে ইনি এই বাতুল কল্পনাটাকে আঁকড়ে ধ'রে আছেন।' বোর্দাভিয়েলাকে বললে আলেয়াস্ত্রো, 'সত্যি তো আর তাঁর সঙ্গে প্রেম করেন নি আপনি—আমার স্ত্রীর সঙ্গে এমন কোনো সম্পর্ক আপনার হ'তেই পারে না—'

'নিশ্চয়ই না,' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন কাউন্ট।

'তবেই দেখুন,' ডাক্তারদের দিকে ফিরলো আলেয়াস্ত্রো।

'কিন্তু হুয়ান, তুমি, তুমি প্রিয়তম, এ-কথা তুমি কোন সাহসে বলতে পারলে যে আমি তোমার নই,' জুলিয়া চেঁচিয়ে উঠলো।

আলেয়াস্ত্রোর স্থির হিমদৃষ্টির তলায় ব'সে-ব'সে কাঁপতে লাগলেন কাউন্ট. বললেন, 'সংযত হোন, সেনোরা। এটা তো আপনি ভালো ক'রেই জানেন সেনোরা, যে, আপনাদের বাড়িতে আমি যে মাঝে-মাঝে আসি তা কেবল আপনার ও আপনার স্বামীর বান্ধব হিশেবে। আর এও তো আপনি ভালোই জানেন এঁর মতো কোনো বন্ধুর সম্মানে আমি কিছুতেই আঘাত করতে পারি না… '

'বিশেষত সেই বন্ধু যখন আমি!' বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো আলেয়াস্ত্রো, 'আমি! আমি? আ লে য়া স্ত্রো গো মে থ! কোনো কাউন্ট আমাকে চটাবার স্পর্ধা রাখে না, আর আমার স্ত্রী তো কিছুতেই আমার বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারেন না। কাজেই মহোদয়গণ তো স্বচক্ষেই দেখলেন এই দুর্ভাগিনীর উন্মত্ততা কী বিষম আকার নিয়েছে!'

'আর তুমিও হুয়ান, তুমিও, তুমিও প্রিয়তম!' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো সে, 'ভীতু! ভীতু তুমি—কাপুরুষ! যেই আমার স্বামী একটু চোখ রাঙালেন অমনি ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছো একেবারে—কাপুরুষ কোথাকার! তাই আর সত্যি কথা বলার সাহস নেই তোমার! তাই আমাকে পাগল ব'লে প্রতিপন্ন করার এই কদাকার প্রহসনে কিনা তুমিও সাহায্য করছো! ভীতু! কাপুরুষ! পাপিষ্ঠ!—তুমি, হ্যাঁ, তুমিও, স্বামী আমার, তুমিও!'

যেন বিক্ষিপ্ত হ'য়ে স্নায়ুগুলি তাকে আক্রমণ করলে, মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলো সে তৎক্ষণাৎ।

'এই সুবিখ্যাত চিকিৎসক দু'জন যাতে আমার দুর্ভাগিনী স্ত্রীকে ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে পারেন,' কাউন্টকে আহ্বান করলো আলেয়াান্দ্রো, 'তার সুযোগ দেবার জন্য, চলুন, এ-ঘর ছেড়ে এবার আমরা চ'লে যাই।'

পায়ে-পায়ে তাকে অনুসরণ করলেন কাউন্ট। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আলেয়াান্দ্রো তাঁকে বললো, 'এটা নিশ্চয়ই আপনি ভালো ক'রেই উপলব্ধি করেছেন যে আমার স্ত্রীকে উন্মাদিনী ব'লে ঘোষণা না-করা হ'লে আপনার আর তাঁর মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেবো। এ-বিষয়ে মীমাংসা করার ভার কিন্তু আপনার হাতেই, কাউন্ট।'

'এখন আমার একমাত্র করণীয় হ'লো আপনার সব ঋণ পরিশোধ ক'রে দেয়া—যাতে আমাদের মধ্যে আর-কোনো সম্বন্ধ না থাকে।'

'না! আপনাকে ও-টাকা ধার দিয়েছি তো কেবল মুখবন্ধ ক'রে রাখার জন্য। বেশ, ব্যাপারটার তবে নিষ্পত্তি হ'য়ে গেলো—আমার স্ত্রী এখন বদ্ধ উন্মাদ, আর আপনি হ'লেন উজবুকদের সেরা। আর, এটার কথা মনে রাখবেন।' আলেয়াান্দ্রো তাঁকে একটা রিভলভার দেখালো।

কয়েক মিনিট পরে মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ যখন আলেয়াান্দ্রোর পড়ার ঘর থেকে বেরোলেন, তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন :

'কী ভীষণ দুঃখের ব্যাপার, আহা! এবার তবে আমরা কী করি?'

'মেয়েটিকে পাগল ব'লে ঘোষণা করা ছাড়া আর কীই-বা করতে পারি? না-হ'লে তো লোকটা তাকে আর এই কাউন্ট বেচারাকে বধ ক'রে বসবে!'

'কিন্তু জীবিকার প্রতি একটা কর্তব্যও তো আছে আমাদের। এই পেশারও একটা সম্মান আছে!'

'এ-ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হ'লো বৃহত্তর দুষ্ক্রিয়াটিকে নিবৃত্ত করা।'

'ডন আলেয়াান্দ্রোকেই উন্মাদ ব'লে ঘোষণা করলে এর চেয়ে শ্রেয়তর হ'তো নাকি?'

'না, উন্মাদ সে নয়; বরং অন্য-কিছু গণ্ডগোল আছে তার!'

'আহা বেচারি! তার কথা শুনলেও বিভীষিকা জাগে। আমার তো ভয় হয় বেচারি না শেষটায় সত্যিই পাগল হ'য়ে মরে!'

'কী জানি। তবে আপাতত তাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হ'লো তাকে উন্মাদ ব'লে ঘোষণা করা। তাহ'লে অন্তত এখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা যাবে।'

অতএব তাঁরা তাকে উন্মাদ ব'লেই ঘোষণা করলেন শেষটায়; এবং এই ঘোষণার জোরে তার স্বামী তাকে একটি বাতুলালয়ে বন্দী ক'রে রাখলো।

* * *

জুলিয়া যখন নিজেকে আরোগ্যনিকেতনে বন্দিনী দেখলে, তখন তার প্রাণের মধ্যে এমন এক ঠাণ্ডা, মেদুর ও নিশ্ছিদ্র রাত নেমে এলো, যার কোনো দিকে কোনো তারা জ্বলে না। ওরা যে মাঝে-মাঝে তার ছেলেকে দেখা করাতে নিয়ে আসে, এর মধ্যে শুধু এইটুকুই ছিলো তার সান্ত্বনা। হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে সে বুকে চেপে ধরে, তার ছোট্ট মুখখানি স্নান করিয়ে দেয় চোখের জলে। আর কান্নার কারণ যদিও কিছুই বোঝে না, তবু সেই একরত্তি দুর্ভাগা ছেলেটি মায়েরই সঙ্গে সমানভাবে চোখের জল ফ্যালে।

'আরে আমার সোনা! আমার সোনা!' তাকে সে বলে, 'তোর মধ্য থেকে যদি কোনোমতে তোর বাবার রক্ত বের ক'রে দিতে পারতুম! কারণ তোর বাবা হ'লো কিনা সে—আলেয়ান্দ্রো গোমেথ!'

একলা থাকলেই দুর্ভাগিনী ভাবে সে বুঝি এক্ষুনি পাগল হ'য়ে যাবে: 'এখানে থাকলে শেষটায় হয়তো সত্যিই পাগল হ'য়ে যাবো! তখন হয়তো নিজেই বিশ্বাস ক'রে বসবো যে ওই বদ কাউন্টটার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটাই বুঝি নেহাতই কোনো স্বপ্ন আর মতিভ্রম! আঃ, কী ভীরু লোকটা, কাপুরুষ! আমাকে কিনা এমন ভাবে পথে বসিয়ে দিলো শেষে! বন্দী ক'রে রাখতে দিলে আমাকে, কোনো প্রতিবাদও কিনা করলে না! উঃ! মর্কটশাবক—মর্কটশাবকই বটে! আমার স্বামীই সত্যি বলতো। কিন্তু আলেয়ান্দ্রো কেন বধ করলো না আমাদের? না, তা কেন করবে—এটা তো আরো ভীষণতর প্রতিশোধ! ওই ভীতু মর্কটটাকে কেন বধ করতে যাবে? না, না, তার চেয়ে ঢের ভালো তাকে অপমান ও অপদস্থ ক'রে মিথ্যে বলতে ও আমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা। স্বামীর সামনে তো ভয়েই কেঁপে উঠেছিলো সে, কেমন কাঁপছিলো তখন! আমার স্বামী তো পুরুষ কিনা, তাই। আর আমাকে কেন সে বধ করলো না! ওথেলো হ'লে তো তক্ষুনি আমাকে বধ ক'রে বসতো! কিন্তু আলেয়ান্দ্রো তো আর ওথেলো নয়—ওথেলোর মতো কোনো

জানোয়ার নয় সে। ওথেলো ছিলো প্রচণ্ড এক মুর—আবেগপ্রবণ, কিন্তু অতি হাবা! আলেয়ান্দ্রোর মনের জোর কিন্তু অসীম—ওই দিয়েই তো ওর ওই ইতর আর নারকী গর্বকে বজায় রেখে যাচ্ছে! না, আগের বউকে আর হত্যা করতে হয়নি তাকে—তাকে সে মরতে বাধ্য করেছিলো! ভয়ে, শুধুমাত্র ভয়েই সে ম'রে গিয়েছিলো তার সামনে! আর আমি··· ? ওকি সত্যি ভালোবাসে আমাকে!'

এখানে, এই পাগলাগারদে, পুনর্বার সে ছিঁড়তে লাগলো আপনাকে ; আবার এই ভীষণ দোটানায় হৃদয়কে নির্যাতিত করতে আরম্ভ করলো সে ; 'ও কি আমাকে ভালোবাসে—না বাসে না ?' তার পরেই নিজের কথা তাকে বলতে হয় : 'কিন্তু আমি—আমি যে এদিকে ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি!'

অবশেষে, বোর্দাভিয়েলার সঙ্গে তার প্রণয় যে শুধুমাত্র একটি মতিভ্রম এ-কথা নিশ্চিত করে বলতে শুরু করলো সে। এখানে বেশি দিন থাকলে সত্যি যদি কখনো পাগল হ'য়ে যায়, এই ভয়েই তার এই সুস্থতার ভাণ। তার স্বামীকে খবর দেয়া হ'লো।

একদিন ওরা বসার ঘরে ডেকে পাঠালে জুলিয়াকে : তার স্বামী তার জন্য অপেক্ষা করছিলো সেখানে। কাঁদতে-কাঁদতে সে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো।

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আলেয়ান্দ্রো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'জুলিয়া, ওঠো,' আলেয়ান্দ্রো তাকে উঠিয়ে দিলো।

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'তোমাকে ক্ষমা করবো ? তোমাকে আবার ক্ষমা করতে যাবো কেন ? ওরা তো বললো যে তুমি এখন সেরে উঠেছো, আর নাকি তোমার মতিভ্রম হয় না ·· ?'

স্বামীর চোখে অন্তর্ভেদী, তুহিন দৃষ্টি দেখে জুলিয়া আতঙ্কে ভ'রে গেলো। অন্ধ তার আতঙ্ক, তার ভালোবাসার মতোই অন্ধ ;—আর এই আতঙ্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত তার অন্ধ ও উন্মাদ প্রেম—যা তাকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে নিয়েছে।

'তুমি ঠিকই বলেছিলে, আলেয়ান্দ্রো, তুমি সত্যি ধরেছিলে। একেবারেই খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো আমার মাথা, পুরোপুরি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। তোমার ভিতর ঈর্ষার জ্বালা ধরাবার জন্য, শুধু তোমাকে একটু ঈর্ষাতুর করার জন্য, ওই কাহিনী উদ্ভাবন করেছিলাম আমি। কিন্তু আদ্যোপান্ত মিথ্যে

সব—তাহা মিছে কথা। আর, সত্যি তো, আমি কি তোমাকে ঠকাতে বা ফাঁকি দিতে পারি? আমি, তো মা কে? তুমি এখন বিশ্বাস করছো তো আমাকে!'

'জুলিয়া, একবার,' তুহিন স্বরে তার স্বামী বললে, 'আমাকে তুমি জিগেস করেছিলে এটা কি সত্যি যে আমি আমার প্রথম স্ত্রীকে হত্যা করেছি, আর তখন আমি তোমাকে ফিরে জিগেস করেছিলাম তোমার তা বিশ্বাস হয় কি না। উত্তরে তুমি কী বলেছিলে, মনে আছে?'

'বলেছিলাম যে আমি তা বিশ্বাস করি নি; যে, আমি তা বিশ্বাস করতে পারি নি।'

'ঠিক। তাহ'লে আমিও এখন বলি; ওই মর্কটশাবকটার কাছে তুমি আত্মদান করেছো, এ-কথা আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করি নি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি নি। এই কথাই কি যথেষ্ট নয়?'

কাঁপছিলো জুলিয়া, মনে হচ্ছিলো যেন কোনো উন্মত্ততার কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে সে—বিভীষিকা আর ভালোবাসায় মেশা এক ভীষণ উন্মত্ততা!

'তাহ'লে এবার,' তার স্বামীকে চুম্বন ক'রে কানে-কানে বললো দুর্ভাগিনী, 'তাহ'লে এবার আমাকে বলো, আলেয়ান্দ্রো, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

তার পরেই, এই প্রথম বার, আলেয়ান্দ্রোর ভিতর এই দুর্ভাগিনী এমন-কিছু দেখতে পেলো, যা এর আগে কখনোই তার চোখে পড়ে নি। নিজের চেষ্টায় বড়ো-হওয়া এই ধনী মানুষটি যা এতদিন অতিরিক্ত সাবধানীর মতো সন্দিগ্ধভাবে গোপন ক'রে রেখেছিলো সেই চাপা ও মৌন তুমুল ভীষণ আত্মার গভীর স্তরগুলি যেন উন্মোচিত হ'য়ে গেলো হঠাৎ—যেন কোনো ঝড়ের আলো চমকে গেলো কোনো কালো, অতল ও বহুস্তর হ্রদের বুকে, আর মুহূর্তে সব আলো ক'রে দিয়ে তার উপরিভাগকে এক দীপ্ত বিচ্ছুরণে ভ'রে দিলো। মানুষটির ঠাণ্ডা চোখে ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ দু-ফোঁটা চোখের জল যেন সে দেখতে পেলো। তার পরেই মানুষটির মধ্য থেকে ফেটে বেরিয়ে এলো:

'সোনা, তোমাকে ভালোবাসি কিনা জানতে চাচ্ছো, ভালোবাসি কিনা? প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আমি তোমাকে, আমার রক্ত দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তোমাকে আমি ভালোবাসি আমার নিজের চেয়েও অনেক বেশি। প্রথম যখন বিয়ে হয়েছিলো, বাসতুম না। কিন্তু এখন? জানো, এখন তোমাকে আমি অন্ধের মতো ভালোবাসি—পশুর মতো, বন্যের মতো

ভালোবাসি তোমাকে। আমার কাছে তুমি যতখানি, তার চেয়েও বহু, বহুগুণে আমি তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছি!'

রুষ্ট বর্বরের মতো তাকে সে চুম্বন করলো, জরাতুর সেই চুম্বন—বিকারের ঘোরে ভরা, উন্মত্তপ্রতিম; ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অস্ফুটে ব'লে উঠলো: 'জুলিয়া! জুলিয়া! দেবী আমার, আমার সর্বস্ব!'

তার স্বামীর এই অনাবৃত ভিতরটা দেখে তার মনে হ'লো সে বুঝি এক্ষুনি আবার পাগল হ'য়ে যাবে।

'এবার আমার মরতেও ভালো লাগবে, আলেয়ান্দ্রো,' তার কাঁধে মাথা রেখে চুপি-চুপি তার কানে-কানে বললো সে।

এ-কথা শুনেই মানুষটি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো, নিজেকে ঝেঁকে যেন স্বপ্নের ঘোর ঝেড়ে ফেললো সে; আর আবার যারা তুহিন ও অন্তর্ভেদী হ'য়ে উঠলো সেই চোখ দু'টি যেন চোখের জল গিলে ফেললো তৎক্ষণাৎ; সে বললো: 'এটা কিন্তু ঘটে নি, জুলিয়া! বুঝলে তুমি? বুঝতে পারলে? সব তুমি জেনে ফেলেছো এখন; কিন্তু এইমাত্র তোমাকে যা বললাম তা কিন্তু আমি বলি নি··· একে তুমি ভুলে যেয়ো!'

'ভুলে যাবো?'

'বেশ, তাহ'লে মনে ক'রে রেখো; কিন্তু মনে থাকে যেন কোনো দিনও যেন এ-কথা তুমি শোনো নি।'

'মৌন থাকবো আমি—'

'এমনকি কোনো দিন তোমার নিজের কাছেও তার পুনরাবৃত্তি কোরো না।'

'করবো না, কিন্তু···'

'তাহ'লেই হবে।'

'কিন্তু দোহাই তোমার, আলেয়ান্দ্রো, আরেকটা মুহূর্ত দাও আমাকে—শুধু আরেকটু বাঁচুক এই মুহূর্তটা আমি যে আমি, সেই জন্যেই কি তুমি আমাকে ভালোবাসো? আমি যা, কেবল তারই জন্য? যদি অন্য-কারো হতুম, তবু বাসতে? নাকি তুমি শুধু এই জন্যই আমাকে ভালোবাসো যে তোমার সম্পত্তির মতো আমিও তোমার···'

'বললামই তো যা তোমাকে বলেছি, সব তোমাকে ভুলে যেতে হবে। বেশি চাপ দিলে কিন্তু তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যাবো। এসেছিলাম তোমাকে নিয়ে যেতে, কিন্তু পুরো না-সারলে তুমি যেতে পাবে না।'

'আমি তো সেরেই গেছি!' তীব্রভাবে এই কথাটায় জোর দিলে তার স্ত্রী। আলেয়ান্দ্রো তার স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে এলো।

* * *

জুলিয়া আরোগ্যনিকেতন থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে বোর্দাভিয়েলার কাউন্ট আলেয়ান্দ্রোর কাছ থেকে তার বাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণ পেলেন একদিন; আমন্ত্রণ না-ব'লে তাকে অবশ্য আদেশ ব'লেও মনে করা যায়; চিঠিটা এই রকম :

> 'প্রিয় কাউন্ট, আমার স্ত্রী যে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েই আরোগ্যনিকেতন ত্যাগ করেছেন, এটা আপনার জানা উচিত। পশ্চাতে কোনো অসদভিপ্রায় না-থাকলেও বিকারের ঘোরে সেই দুঃখের দিনে দুর্ভাগিনী আপনার সম্মানে গভীর আঘাত হেনেছিলেন; আপনার বিরুদ্ধে তিনি এমন-এক দুর্নীতিপূর্ণ আচরণের অভিযোগ করেছিলেন, যা—বলাই বাহুল্য—আপনার তুল্য কোনো নির্মল ও নিষ্কলুষ পুরুষ তা কোনোদিনই করতে পারেন না। আপনার তুল্য সজ্জন ও ভদ্রব্যক্তি যাতে পরিপূর্ণভাবে পরিতোষ ও ক্ষতিপূরণ লাভ করেন, সেইজন্য আগামী বৃহস্পতিবারে, অর্থাৎ পরশুদিন, একটি প্রীতিভোজে যোগদান করার জন্য সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার স্ত্রীও আপনাকে আসবার জন্য অনুরোধ করছেন—এবং আমি আপনাকে আদেশ করছি। সেদিন এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির যথোচিত মার্জনা ও কৈফিয়ত গ্রহণ করতে না-এলে এর সমুচিত ফলাফল ভোগ করতে হবে আপনাকে। এবং এটা তো আপনি ভালো ক'রেই জানেন আমার কী করার সামর্থ্য আছে।
>
> আলেয়ান্দ্রো গোমেথ।'

নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলেন বোর্দাভিয়েলার কাউন্ট। পাণ্ডুর হ'য়ে গেছেন তিনি, কাঁপছেন, একেবারে বিপর্যস্ত। ভগ্নোদ্যম টুকরো-টুকরো কথা-বার্তা হ'লো ভোজের সময়; ভৃত্যদের সামনেই অত্যন্ত চটুল ও হাল্কা বিষয়ে কথা হ'লো, সঙ্গে থাকলো আলেয়ান্দ্রোর হিংস্র মন্তব্য ও ইঙ্গিতময় রসিকতা। জুলিয়াও তার স্বামীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে। ফলমূল ও মিষ্টি দেবার পর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে আলেয়ান্দ্রো বললে : 'চা নিয়ে এসো।'

'চা!' কাউণ্টের মুখ ফশকে বেরিয়ে এলো।

'বাঃ, নিশ্চয়ই!' গৃহস্বামী উত্তর দিলো : 'এটা ভাববেন না যে আমার পেট-ব্যথা করছে। তা মোটেই না, আসলে এ শুধু কেবল স্বাভাবিক ও উপযুক্ত ভঙ্গিটা বজায় রাখার জন্য। ভদ্রলোকেরা যখন পরস্পরের ভুলচুক নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তার সঙ্গে চা-ই তো সবচেয়ে ভালো মানায়…'

তারপর সে ভৃত্যটির দিকে ফিরে বললে, 'তোমরা যেতে পারো।'

এবার এ-ঘরে একা পড়লো তিনজনে। কাউণ্ট তখন কম্পমান; এমনকি চায়ের স্বাদ নেবার সাহসটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত।

'আমাকেই প্রথম দিয়ো, জুলিয়া।' তার স্বামী বললো। 'লোকে যে আমার বাড়িতে সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গেই চা-পান করতে পারেন, এটা আপনাকে দেখাবার জন্য আমি নিজেই প্রথম চুমুক দেবো।'

'কিন্তু আমি .... '

'না, কাউণ্ট। আমি ভদ্রলোক না-হ'তে পারি, এমনকি তার চেয়েও ছোটো হ'তে পারি, কিন্তু অতটা অধঃপতন আমার হয় নি। এবং এখন আমার স্ত্রী আপনাকে কিছু বলবেন—অল্প কয়েকটি কৈফিয়ত কেবল।'

জুলিয়ার দিকে তাকালো আলেয়ান্দ্রো; আর সে, আস্তে, মৃতবৎ গলায়, বলতে শুরু করলো। ঝলমল করছে সে, সুন্দর ও জ্যোতির্ময়। বিদ্যুতের শিখার মতো ঝকমক করছে তার চোখ। আস্তে তুহিন স্রোতের মতো ব'য়ে যাচ্ছে তার কথাগুলি, কিন্তু এটা বোঝা যায় যে এদের তলায় একটি সর্বগ্রাসী শিখা দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে।

'আমিই স্বামীকে ব'লে আপনাকে এখানে আমন্ত্রণ করেছি, কাউণ্ট,' জুলিয়া শুরু করলো, 'কেননা একবার আপনার সম্মানে আমি গভীর আঘাত করেছিলাম ব'লে ক্ষমা চেয়ে নেয়া দরকার।'

'আমার কাছে, জুলিয়া?'

'আমাকে "জুলিয়া" ব'লে সম্বোধন করবেন না।...হ্যাঁ, আপনার কাছে। তখন আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম; আমার স্বামীকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতুম ব'লে সর্বদা যখন এটা আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম যে তিনি আমাকে সত্যি ভালবাসেন কিনা, তখন আমি একবার আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি আমাকে ধর্ষণ করেছেন। নেহাতই ঈর্ষাপ্রসূত মত্ততার বশে এই ধর্ষণ করার অভিযোগ আমি তুলেছিলাম; একেবারেই মিথ্যে এই কথা, তখন যদি পাগল না-হতাম তাহ'লে এই অপযশ আমার পক্ষে ক্ষমারও অযোগ্য হ'তো। ঠিক বলি নি আমি, কাউণ্ট?'

'নিশ্চয়ই, ডোনা জুলিয়া, সম্পূর্ণ সত্য '

'সেনোরা দ্য গোমেথ,' তাঁর সম্বোধনটি আলেয়ান্দ্রো শুধরে দিলো।

'আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করার সময় আপনাকে মর্কটশাবক বলার জন্য আমাকে এবং আমার স্বামীকে ক্ষমা করতে হবে।'

'করা হ'লো।'

'কোনো ভদ্রলোকের অযোগ্য একটা নীচ, হীন ও দুর্বিনীত আচরণের অভিযোগ করেছিলুম,—অত্যন্ত অশোভন…'

'এটা খুবই ভালো বলা হয়েছে,' আলেয়ান্দ্রো যোগ করলে, 'কোনো ভদ্রলোকের অযোগ্য কোনো নীচ, হীন ও দুর্বিনীত আচরণ! বাঃ, চমৎকার।'

'তখন আমার যে-অবস্থা ছিলো তাতে অবশ্য কোনো দোষই আমার উপর বর্তায় না। তবু, আবারও, আমি আপনার কাছে মার্জনা চাচ্ছি। আপনি কি আমাদের ক্ষমা করেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্ষমা করেছি, দু'জনকেই ক্ষমা করেছি।' এক নিশ্বাসে ব'লে উঠলেন কাউন্ট; এখন তাঁকে বরং জীবিত না-দেখিয়ে মৃত ব্যক্তি ব'লে মনে হচ্ছে; যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এই বাড়ি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য একেবারে ছটফট করছেন।

'দু'জনকেই?' আলেয়ান্দ্রো বাধা দিলো, 'আমি এমন কী করেছি যার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন?'

'তা তো সত্যি খুবই সত্যি।'

'ঠাণ্ডা হোন, নিজেকে শান্ত করুন,' আলেয়ান্দ্রো বললো, 'আপনার স্নায়ুরা দেখছি বড্ড লাফাচ্ছে! আরেক পেয়ালা চা নিন বরং। জুলিয়া, কাউন্টকে চা দাও। একটু লেবুর রস দিয়ে দেবে? ভালো লাগবে তা?'

'না, না…'

'তা, আমার স্ত্রীর যা বক্তব্য ছিলো সবই তো বলা হ'য়ে গেছে। আর তাঁর এই পাগলামিকে আপনি যখন ক্ষমাই করেছেন, তখন মাঝে-মাঝে আবার দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন এখানে—শুধু এই দাক্ষিণ্যটুকুই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। কোনোদিন ও-রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিলো ব'লেই যদি সব সম্পর্ক আপনি ছিন্ন ক'রে বসেন, তাহ'লে তার পরিণাম কী-রকম খারাপ হবে, তা নিশ্চয়ই আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন। আমার স্ত্রী যখন এখন সম্পূর্ণই নিরাময় হয়েছেন—তাঁর সেবাযত্নের জন্য অবশ্য আমিই ধন্যবাদের যোগ্য—তখন এখানে আসতে আপনার আর-কোনো ভয় নেই। এবং আমার স্ত্রীর পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভের উপর আমার আস্থা কতদূর তার প্রমাণস্বরূপ এখন আমি আপনাদের এখানে একা রেখে যাচ্ছি। হয়তো আপনাকে তাঁর

আরো-কিছু বলার আছে, যা তিনি আমার সামনে সাহস ক'রে বলতে পারছেন না—কিংবা যা শুনতে হয়তো আমার স্পর্শবোধে বাধবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো আলেয়ান্দ্রো, এবং তার আচরণে তারা সম্পূর্ণ হতচকিত হ'য়ে মুখোমুখি ব'সে রইলো।

'কী একটা মানুষ!' ভাবলেন কাউণ্ট।

'মানুষ বটে, সত্যি!' বললে জুলিয়া নিজেকে।

গুরুভার একটি স্তব্ধতা নেমে এলো তার নিষ্ক্রান্তির পর। জুলিয়া আর কাউণ্টের পরস্পরের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছিলো না। যে-দরজা দিয়ে আলেয়ান্দ্রো বেরিয়ে গেলো, বোর্দাভিয়েলা শুধু সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন।

'ওভাবে তাকাবেন না দরজাটার দিকে,' জুলিয়া বললে, 'আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না। আড়ি-পাতার জন্য তিনি দরজার আড়ালে লুকিয়ে নেই।'

'নেই, তা জানবো কী ক'রে? হয়তো সাক্ষীশাবুদ সুদ্ধু হাজির হ'য়ে বসবেন।'

'ও-কথা বলছেন কেন?'

'আপনি কী ভাবেন যে যে-দিন দু'জন ডাক্তার নিয়ে এসে তিনি আমাকে যার-পর-নেই অপদস্থ করলেন এবং আপনাকে পাগল ব'লে ঘোষণা করার মতো অপরাধ ঘটালেন, সেই দিনটির কথা আমি ভুলে গেছি?'

'কিন্তু সে তো আর মিথ্যে কিছু না। আমি যদি তখন সত্যিই পাগল না-হতুম তাহ'লে কি তখন যে বলেছিলুম আপনি আমার প্রেমিক, এ-কথা আমি কোনোদিনও বলতে পারতুম? ককৃখনো না।'

'কিন্তু…'

'কিন্তু কী…কাউণ্ট!'

'আমাকেও কি পাগল ব'লে ঘোষণা করতে চাও তুমি? তুমি কি এটা অস্বীকার ক'রে বলতে চাও জুলিয়া…'

'ডোনা জুলিয়া কিংবা সেনোরা দ্য গোমেথ—আপনার যা অভিরুচি।'

'সেনোরা দ্য গোমেথ, আপনি কি বলতে চান যে কালক্রমে কোনো কারণে আমার প্ররোচনা… না, আমার প্রেমে আপনি আত্মসমর্পণ করেন নি!'

'কাউণ্ট!'

'আপনি কী বলতে চান যে আমার প্রেম গ্রহণ করাই কেবল নয়, শেষদিকে আপনি তাকে উৎসাহিত করেন নি, এবং—'

'আমি তো বলেছি, কাউণ্ট, যে, তখন আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম। এই কথাটা কি আমাকে বারে-বারে মনে করিয়ে দিতে হবে?'

'আমি যে তোমার প্রেমিক, তা কি অস্বীকার করতে পারো?'

'আবারও বলছি আপনাকে : আমি তখন পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম।'

'তাহ'লে আর এক মুহূর্তও আমি এ-বাড়িতে থাকতে পারি না! চললাম, বিদায়!'

সে হয়তো প্রত্যাখ্যান করতে পারে এই ভয় নিয়ে কাউণ্ট তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জুলিয়া তাঁর হাত ধ'রে বললে : 'আমার স্বামী কী বললেন, তা তো আপনি শুনেছেন। যখন খুশি এ-বাড়িতে আপনি আসতে পারেন—ভগবান আর আলেয়ান্দ্রোর কৃপায় আমি যখন এখন সেরে উঠেছি, আমার সব অসুখই যখন সেরে গেছে, তখন হঠাৎ আপনি আসা থামালে ব্যাপারটা বিশ্রী হ'য়ে বসতে পারে।'

'কিন্তু জুলিয়া!'

'কী! আপনি কি আবার শুরু করতে চান নাকি? বলি নি কি, তখন আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম!'

'আমাকেই তোমরা পাগল বানাতে চাচ্ছো—তুমি, আর তোমার স্বামী…'

'আপনাকে? আ প না কে পাগল বানাবো? ওটা তেমন সহজসাধ্য ব'লে তো মনে হচ্ছে না আমার…'

'তোমরা যে আমাকে মর্কটশাবক বলো, তা তো স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।'

হাসিতে ফেটে পড়লো জুলিয়া। অপমানে, রোষে, লজ্জায় আর কোনো দিন এই বাড়িতে পদার্পণ না-করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাউণ্ট বেরিয়ে গেলেন।

*　　　*　　　*

এই সব তীব্র ও অপার্থিব মানসিক যন্ত্রণায় বেচারি জুলিয়ার জীবন প্রায় জীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলো; এবার সে গুরুতর রোগে পড়লো; মনের ভারসাম্য থাকলো না। বুঝি সত্যিই এবার পাগল হ'য়ে যায়! মাঝে-মাঝে বিকারের ঘোরে উদ্দীপ্ত ও সংরক্ত স্বরে সে স্বামীকে ডেকে পাঠায়। আর এই মানুষটি তার পত্নীর এই বেদনাজনক আকস্মিক উচ্ছ্বাস ও প্রবল আবেগকে শান্ত করার জন্য নিজেকে যেন সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয়। 'আমি তো তোমার, তোমারই, সম্পূর্ণভাবে তোমার,' কানে-কানে বলে সে তাকে এই কথা, আর জুলিয়া এমনভাবে তার গলা জড়িয়ে ধরে যে আলিঙ্গনে যেন তার দম বন্ধ হ'য়ে বুক ফেটে যাবে।

আলেয়ান্দ্রো নিয়ে গেলো তাকে জমিদারিতে, পাড়াগাঁয়ে, যদি গ্রামের আবহাওয়া তাকে সারিয়ে দিতে পারে। কিন্তু রোগ তখন তাকে আস্তে-আস্তে জীর্ণ ক'রে আনছিলো—যেন তার অস্তিত্বের একেবারে অন্তস্তলে কোনো ভীষণ এসে প্রবেশ করেছে।

অবশেষে এই ধনী মানুষটি যখন উপলব্ধি করলে যে মৃত্যু তার স্ত্রীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ওৎ পেতে আছে, তখন সে একটা দুরন্ত, অনমনীয় ও তুহিন রোষে ভ'রে গেলো। ডেকে পাঠালো সেরা ডাক্তারদের। 'কোনো আশাই আর নেই,' তাঁরা জানালেন।

'দোহাই, ওকে বাঁচিয়ে দিন আমার জন্য', সে তাঁদের অনুনয় করলে।

'কিছুতেই তা সম্ভব নয়, ডন আলেয়ান্দ্রো, কিছুতেই সম্ভব নয়।'

'বাঁচিয়ে দিন ওকে, আমি বলছি! সব দিয়ে দেবো আপনাদের, টাকাকড়ি ধনরত্ন, সব! ওর প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমার যথাসর্বস্বও আমি বিলিয়ে দেবো।'

'এটা সাধ্যাতীত, ডন আলেয়ান্দ্রো।'

'তাহ'লে আমি আমার নিজের প্রাণ দিয়ে দেবো ওর জন্য। আমার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে গিয়ে ওকে দিতে পারেন না? সব রক্ত নিয়ে নিন আমার—নিয়ে, ওকে দিন! নিন আমার রক্ত, নিন।'

'এ হয় না, ডন আলেয়ান্দ্রো। এ একেবারেই অসম্ভব কথা।'

'কী বলছেন আপনারা—অসম্ভব! বলছি তো, আমার সব রক্ত দিয়ে দেবো ওর জন্য!'

'এখন কেবল ঈশ্বরই ওঁকে বাঁচাতে পারেন।'

'ঈশ্বর? কোথায় থাকেন তিনি? কোনখানে? আমি যে কোনোদিনই তাঁর কথা ভাবি নি!'

জুলিয়ার দিকে ফিরলো সে তখন: যদিও পাণ্ডুর, তবু আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে তার রূপ—যে-মৃত্যু তাকে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসছে সে-ই নিজের রূপ দিয়ে তাকে আরো রূপসী করেছে। জিগেস করলে:

'জুলিয়া, ঈশ্বর কোথায় থাকেন?' জুলিয়া তার শূন্য আয়ত চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে বললো:

'ওই যে ওখানে তিনি · '

স্ত্রীর বিছানার শিয়রের কাছে যে-ক্রুশ ঝোলে তার দিকে তাকালো আলেয়ান্দ্রো; তাকে নামিয়ে আনলো সে, তার মুঠোর মধ্যে তাকে পিষ্ট ক'রে তীব্র গলায় ব'লে

উঠলো : 'বাঁচাও ওকে—আমার জন্য ওকে বাঁচাও। তার বদলে তুমি যা চাও—যে-কোনো জিনিশ, আমার ঐশ্বর্য বিত্ত ধনরত্ন, আমার বুকের রক্ত, আমার অস্তিত্ব—সব, সব দিয়ে দেবো—শুধু ওকে বাঁচিয়ে দাও ··' তার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ক'রে একটু মৃদু হাসলো জুলিয়া। স্বামীর এই অন্ধ রোষ যেন তার আত্মাকে অতি মধুর এক দীপ্তিতে পূর্ণ ক'রে দিলো। অবশেষে সে সত্যি জানতে পেলো সুখ কাকে বলে! আর একদিন কিনা সে এমন সন্দেহও করেছিলো · এই মানুষটি তাকে ভালোবাসে কিনা!

বিন্দু-বিন্দু ক'রে ঝ'রে পড়ছিলো দুর্ভাগিনীর প্রাণ। মর্মর পাথরের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে শরীর। পাশে শুয়ে স্বামী তাকে তীব্র সংরাগে জড়িয়ে ধরলো যে-তাপ এই দেহটি থেকে ধীরে-ধীরে স'রে যাচ্ছে, সে যেন নিজের শরীর থেকে সেই তাপ তাকে দেবে! তার নিজের নিশ্বাস সে দিতে চাইলো তাকে। অর্ধোন্মাদ ও অর্ধচেতন! আর সব সময়, সব সময় জুলিয়া কেবল স্মিত হাসতে থাকলো।

'ম'রে যাচ্ছি আমি, আলেয়ান্দ্রো, ম'রে যাচ্ছি!'

'না, মরতে পারবে না তুমি—মরবে না,' ব'লে উঠলো সে, 'কিছুতেই তুমি মরতে পাবে না—কিছুতেই না!'

'তোমার স্ত্রীর মৃত্যু কিছুতেই হ'তে পারে না, তাই না?'

'না, কিছুতেই মরতে পারে না আমার স্ত্রী। বরং আমি নিজে মরবো। আসুক মৃত্যু, দেখবো আমরা সে কী করতে পারে। আসুক সে আমার কাছে। আমার কাছে মৃত্যুকে আসতে দাও একবার!'

'ওঃ, আলেয়ান্দ্রো! এত দিনে আমি জানতে পেলাম যে আমার সব যন্ত্রণা সার্থক। আর ভাবো—এই তোমার ভালোবাসায় কিনা একদিন আমি সন্দেহ করেছিলাম!'

'না, কখনো তোমাকে আমি ভালোবাসি নি, কোনো দিনও না। জুলিয়া, জুলিয়া, তোমাকে তো হাজারবার বলেছি যে ভালোবাসার এই সব ন্যাকা কথা কেবল সাহিত্যের কতগুলি বাজে কথার স্তূপ—পচা, আবর্জনা, জঞ্জাল! না, তোমাকে আমি ভালোবাসি নি! ভালোবাসা? প্রেম? শুধু একবার ভেবে ছাখো এই সব পাপী, কাপুরুষ, দুরাত্মারা – যারা ভালোবাসায় একেবারে গ'লে যায়—তারা কিনা তাদের স্ত্রীকে, ম'রে যেতে দেয়! না, তাকে ভালোবাসা বলে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি না জুলিয়া, ভালোবাসি না ··'

আবার জুলিয়ার আগের ভয় ফিরে এলো। 'বেশ, তাহ'লে কী?' ক্ষীণস্বরে সে জানতে চাইলো তীব্রভাবে।

'না, তোমাকে আমি ভালোবাসি না আমি, আমি, আমি…কোনো কথা নেই কোনোখানে!' আর তারপরেই এক দীর্ঘ শুষ্ক অশ্রুহীন কান্নায় সে ভেঙে পড়লো—নাভিশ্বাসের মতো এক কান্না, বন্য ও দুর্দম এক ভালোবাসা ও যন্ত্রণার কাতর গোঙানি!

'আলেয়াান্দ্রো!'

এই একটি ক্ষীণ চীৎকারের মধ্যেই থাকলো বিজয়ের সব ব্যথাতুর উল্লাস।

'মরতে পাবে না তুমি। মরবে না, ব'লে দিচ্ছি। আমি চাই না যে তুমি ম'রে যাও! আমাকে মেরে ফ্যালো তুমি জুলিয়া, কিন্তু তোমাকে বাঁচতেই হবে! এসো, মারো আমাকে, বধ করো!'

'আমি কিন্তু ম'রে যাচ্ছি…'

'আমিও তোমার সঙ্গে!…'

'তাহ'লে বাচ্চাটির কী হবে, আলেয়াান্দ্রো?'

'সেও মরুক আমাদের সঙ্গে। তোমাকে ছাড়া আমি কেন ওকে ভালোবাসতে যাবো!'

'ভগবানের দোহাই, আলেয়াান্দ্রো, তুমি পাগল…'

'ঠিক। পাগল যদি কেউ হয় তো সে শুধু আমি। পাগল আমি, উন্মাদ, চিরকাল পাগল হ'য়ে ছিলাম, তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য উন্মাদ হ'য়ে ছিলাম…আমি, উন্মাদ মেরে ফ্যালো আমাকে—জুলিয়া, তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাও তুমি!'

'ওঃ! যদি আমি…'

'না, না! মেরে ফ্যালো আমাকে, কিন্তু তোমাকে বাঁচতেই হবে। নিজের মতো ক'রে বাঁচো তুমি!'

'আর তুমি?'

'আমি? তুমি না-নিলে মৃত্যু আমাকে নেবে!'

আরো ঘনিষ্ঠ ক'রে তাকে সে জড়িয়ে ধরলো, যেন চিরকাল সে এইভাবে তাকে জড়িয়ে থাকবে।

'তুমি কে, তা কি আমাকে বলবে না, আলেয়াান্দ্রো?' জুলিয়া তার কানে-কানে বললো।

'আমি? আমি, নেহাতই একটি মানুষ—তুমি আমাকে যেমন বানিয়েছো।'
ফিশফিশ এই স্বর এলো যেন মৃত্যুর পরপার থেকে—যেন জীবনের তীর থেকে আসতে-আসতে সীমান্তরের কোনো ছায়ার জলে ভেসে গেলো ভেলাটা।

*　　　*　　　*

একটু পরেই আলেয়াান্দ্রো বুঝতে পারলে তার সবল বাহু দু'টি কেবল একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমাকেই আঁকড়ে ধ'রে আছে! সেই বিপুলমহান পরম রাত্রির মৃত্যুময় তুহিন চেপে বসলো যেন তার আত্মায়। উঠে পড়লো সে, তাকিয়ে দেখলো সেই কঠিন-হ'য়ে-যাওয়া প্রাণহীন রূপ। চরম রাত্রির পরে যে-চিরন্তন উষার আলো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে, সে যেন এখন সেই উজ্জ্বলের ভিতর অবগাহন করছে। এর মধ্যেই জ'মে-যাওয়া সেই মৃতদেহের সামনে আরো বিপুলভাবে তার স্মৃতি জেগে উঠলো, মনে হ'লো কোনো জমাট মেঘের মতো তার পুরো জীবনটাই যেন তার সামনে দিয়ে ভেসে চ'লে যাচ্ছে; এই জীবনকেই সে লুকিয়ে রেখেছিলো-সকলের কাছে, এমনকি নিজের কাছে পর্যন্ত গোপন রেখেছিলো এতদিন। ফিরে গেলো সে তার শৈশবের সেই ভীষণ দিনগুলিতে, যখন তার জনক ব'লে কথিত ব্যক্তিটির নির্দয় আঘাতের সামনে দাঁড়িয়ে সে আতঙ্কে কাঁপতো; ফিরে পেলো সে সেই দিনটি, যে-বার সে প্রথম অভিশাপ দিয়েছিলো তার বাবাকে; আর যখন একরাত্রে, সমস্ত সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাবার পরে, বিপর্যস্ত সে তার গ্রামের ছোট্ট গির্জেটিতে গিয়ে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে তার বজ্রমুষ্টি তুলেছিলো, তাও যেন ফিরে এলো।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সে অবশেষে; বন্ধ ক'রে দিলে পিছনের দরজা: খোঁজ করতে গেলো কোথায় তার ছেলে রয়েছে। ছোট্ট ছেলেটির বয়স তিন বছরের কিছু বেশি হবে। পিতা তাকে কোলে তুলে নিলো, ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। প্রচণ্ডভাবে চুম্বন করতে লাগলো তাকে, আর ছেলেটি —পিতার চুম্বন পাওয়া তার অভ্যেস নেই, এতদিন সে একবারও পিতার চুম্বন পায় নি—বোধহয় তার বুকের ভিতরকার ভালোবাসার বন্যাকে কিঞ্চিৎ আঁচ করতে পারলো, আর কান্না শুরু ক'রে দিলো।

'চুপ ক'রে থাকো, খোকা, চুপ ক'রে থাকো। এখন আমি যা করতে যাচ্ছি, তার জন্য তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে, সোনা? ক্ষমা করবে কি তুমি?'
আতঙ্কে ভ'রে গিয়ে শিশুটি চুপ ক'রে থাকলো; তার চোখে, তার মুখে, তার

চুলের কুঞ্চনে হারানো জুলিয়ার চোখ, মুখ, কেশদামকে সন্ধান করছে তার বাবা—সে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকলো হতবাক।

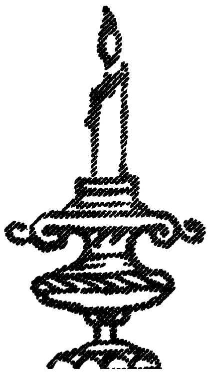
'ক্ষমা কোরো, সোনা, ক্ষমা কোরো।'

একটুক্ষণের জন্য সে গিয়ে তার খাশকামরায় বসলো শুধু তার শেষ ইচ্ছাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য; তারপর সে আবার ফিরে এলো তার স্ত্রীর কাছে—কিংবা ফিরে এলো তার কাছে, একদা যা তার স্ত্রী ছিলো।

'তোমার জন্য রক্ত দিলাম,' আলেয়াান্দ্রো তাকে বললো, যেন সে তা শুনতে পাবে। 'মৃত্যু তোমাকে ছিনিয়ে নিলো বটে, কিন্তু এখন আমি আসছি তোমাকে ফিরে পাবার জন্য!' মুহূর্তের জন্য তার মনে হ'লো সে যেন তার স্ত্রীকে ছোট্ট ক'রে হাসতে দেখলো, যেন নড়তে দেখলো তার চোখের তারা। জড়িয়ে ধরলো সে তাকে, বারে-বারে নাম ধ'রে ডাকলো, চুপি-চুপি তার কানে ঢেলে দিলো ভীষণ সব ভালোবাসার কথা। কিন্তু ঠাণ্ডা প'ড়ে থাকলো সে, নিঃসাড়।

মৃত্যু-কোঠার দরজা ভেঙে ফেলতে হয়েছিলো তাদের; ভিতরে ঢুকে তারা দেখলো দুইবাহু দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে আছে সে; পাণ্ডুর তার সর্বাঙ্গ, মৃত্যুময়, তুহিন; তারই দেহ শূন্য ক'রে ক্রমে-ক্রমে যে-রক্ত বেরিয়ে এসেছে তাতে স্নান ক'রে প'ড়ে আছে।

অনুবাদ: মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়





ঘটনাচক্র

সমারসেট মম

বারান্দায় ব'সে ডোরিস অপেক্ষা করছিলো স্বামীর জন্য—দুপুরে খেতে বাড়ি আসবে সে। রোদ একটু বাড়তেই মালয়ী ছেলেটি এসে ঘরের জানলা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু ডোরিস একটা খড়খড়ি তুলে দিয়েছে যাতে নদীটা একটু দেখা যায়। দ্বিপ্রহরের রুদ্ধশ্বাস সূর্যালোকের তলায় নদীটা মৃতের মতো শাদা রং দিয়ে প'ড়ে আছে। একটি স্থানীয় লোক ডোঙা বাইছে—ডোঙাটা এত ছোটো যে জলের উপরে তার আভাসটুকু শুধু পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে। ধূসর বিবর্ণ দিন। তাপমাত্রার ওঠা-পড়ার সঙ্গে দিনের রং বদলায়। (প্রাচ্য দেশীয় নিচু পর্দার স্বরের মতো যার দুর্বোধ একঘেয়েমি স্নায়ুর উপর মিথ্যে অত্যাচার ছাড়া আর-কিছু না; অস্থির হ'য়ে আমাদের শ্রবণশক্তি একটা-কিছু ঘটবে, এমন আশা করে। কিন্তু বৃথা।) ঝিঁঝি পোকারা যেন বিকারের ঘোরে গেয়ে চলেছে তাদের বিরক্তিকর গান—পাথরের উপর ঝর্নাধারার অবিরাম মর্মরধ্বনির মতোই ক্রমাগত আর একঘেয়ে তাদের এই সমবেত সংগীত। কিন্তু হঠাৎ অন্য-এক পাখির সুতীব্র মধুর এক স্বর ভেসে এলো এই গান ডুবিয়ে দিয়ে।

চকিতের জন্য তার ইংলণ্ডের—তার দেশের—শ্যামাপাখির কথা মনে প'ড়ে গেলো।

বাংলোর পিছনে নুড়ি-বিছোনো যে-পথটি বিচারালয় পর্যন্ত চ'লে গেছে সেখান থেকে তার স্বামীর পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো ; চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ডোরিস। উঁচুনিচু ভিত তাদের বাংলোর, সিঁড়িটা প্রায় টপকে চ'লে এলো তার স্বামী, দরজার কাছে অপেক্ষমান ছোকরা চাকরের হাতে তুলে দিলো মাথার টুপি। যে-ঘরটি একাধারে তাদের বসবার এবং খাবার ঘর, সে-ঘরে এসে স্ত্রীকে দেখে আনন্দে তার চোখ জ্ব'লে উঠলো।

'কী গো ডোরিস? খিদে আছে তো?'

'রাক্ষুসে ক্ষুধা অনুভব করছি।'

'এক মিনিট। স্নানটা সেরেই আসছি।'

'তাড়াতাড়ি কোরো,' ডোরিস মৃদু হাসলো।

কাপড় ছাড়ার ঘর থেকে তার ফুর্তিবাজ শিসের শব্দ শোনা গেলো, আর সেই সঙ্গে পরম অবহেলাভরে (যেটাতে তার স্ত্রী সর্বদাই আপত্তি জানায়) গা থেকে জামাকাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো মেঝের উপর। উনত্রিশ বছর বয়স হ'লে কী হবে, এখনো স্কুলের ছেলের মতো স্বভাব; কোনোদিন যেন ও বয়স্ক হবে না। বোধ হয় সেই জন্যই ডোরিস ওর প্রেমে পড়েছিলো; বোধ হয়, কারণ যতই ভালোবাসা থাক এ-কথা ডোরিস কিছুতেই বলতে পারবে না যে ও সুপুরুষ। ছোটোখাটো গোলগাল শরীর, পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরাট লালচে মুখ, আর নীল চোখ। মুখে ব্রণের দাগ। অনেক খুঁটিয়ে দেখেও ডোরিস স্বামীর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে তার মুখে এমন একটা জিনিশও নেই যেটার সে প্রশংসা করতে পারে। ডোরিস তো প্রায়ই বলে—'তুমি মোটেও আমার যোগ্য নও।' 'আমি সুন্দর, এমন কথা তো কখনো বলিনি,' ও হেসেছে। 'তোমার মধ্যে যে কী দেখেছিলাম ভেবেই পাইনে।'

আসলে কিন্তু সে খুব ভালো ক'রেই জানে কী দেখেছিলো। মানুষটা আমুদে, ফুর্তিবাজ, কিছুতেই মুখ গম্ভীর হয় না, নিজেও হাসে, ডোরিসকেও হাসায়। জীবনটা ওর কাছে মোটেও গুরুগম্ভীর একটা বিষয় নয়। জীবনটা আনন্দের।

মনোমোহন হাসিটি ঠোঁটে সর্বদাই লেগে আছে। ও কাছে থাকলে সুখী মনে

হয় নিজেকে ; মেজাজ ভালো থাকে। খুশিতে উজ্জ্বলতর দুই নীল চোখে গভীর প্রেমের স্বাক্ষর লক্ষ ক'রে ডোরিস অভিভূত না হ'য়ে পারে না। এভাবে কেউ ভালোবাসে ভাবতেও ভালো লাগে। একবার বিয়ের ঠিক পরে, স্বামীর কোলের উপর ব'সে তার মুখ দু'হাতের মধ্যে নিয়ে, সে বলেছিলো :

'কুচ্ছিৎ দেখতে, গাপ্তাগোপ্তা চেহারা হ'লে কী হবে, তোমার আকর্ষণ আছে, গাই। তোমাকে ভালো না-বেসে পারা যায় না।' আবেগে ডোরিসের চোখ জলে ভ'রে এসেছিলো, দেখেছিলো অনুভূতির তীব্রতায় তার স্বামীর মুখ কুঁচকে গিয়েছে, যদিও মুহূর্তের জন্য। আর কথা বলতে গিয়ে কেঁপে গেছে গাই-এর গলা : 'উঃ, বিকৃতমস্তিষ্ক বউ থাকা সত্যিই বড়ো সাংঘাতিক।' ডোরিস একটু হাসলো। ঠিক এই উত্তরই তার স্বামীর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়। অন্য কোনো উত্তর তাকে খুশি করতে পারতো না। প্রায় বিশ্বাসই হয় না যে মাত্র ন' মাস আগেও সে তার স্বামীর নাম পর্যন্ত শোনেনি। সমুদ্রতীরের এক ছোট্ট শহরে একবার সে তার ছুটি কাটাতে গিয়েছিলো, সেইখানেই দেখা। পার্লামেণ্টের কোনো-এক সদস্যের সেক্রেটারি ছিলো সে। গাই ছুটিতে দেশে গিয়েছিলো, একই হোটেলে উঠেছিলো তারা। আর দু'দিনেই গাই তার জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছিলো ডোরিসকে। তাঁর জন্ম সেমবুলুতে, সেখানে তার বাবা দ্বিতীয় সুলতানের অধীনে তিরিশ বছর চাকরি করেছেন ; ছাত্রজীবন শেষ ক'রে সে নিজেও ঐ একই চাকরি করছে। দেশটাকে সে ভালোবাসে। 'সত্যি বলতে, ইংলণ্ড আমার কাছে বিদেশ,' সে বলেছিলো, 'সেমবুলুই আমার দেশ।'

আর এখন তো ডোরিসেরও দেশ।

মাসের ছুটি শেষ হ'য়ে এলে পরে গাই ডোরিসের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলো। ডোরিস আগেই সন্দেহ করেছিলো এবং প্রত্যাখ্যান যে করবেই সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না তার। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান সে, মাকে ছেড়ে দূরে যাওয়া তার পক্ষে শক্ত। কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন সেই মুহূর্ত এলো, কী যে হ'লো তা সে নিজেই বুঝলো না। অভাবিত এক আবেগের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিলো। চার মাস হ'লো এখানে তারা সংসার পেতেছে। ডোরিস সুখী, সুখী।

একবার ডোরিস স্বামীকে বলেছিলো যে সে মনঃস্থির করেছিলো তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

'করো নি ব'লে দুঃখ হচ্ছে নাকি ?' ঝকঝকে নীলচোখের তারা নাচিয়ে গাই হেসেছিলো।

'সেটা চূড়ান্ত বোকামি হ'তো। ভাগ্যই বলো আর দৈবই বলো—ভাগ্যিশ ব্যাপারটা আর আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিলো না।'

গাই স্নানের ঘরে যাচ্ছে—ডোরিস সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার শব্দ পেলো। কী ভয়ংকর হট্টগোল করতে পারে, খালি পা হ'য়েও রেহাই নেই। কিন্তু উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলছে গাই ? স্থানীয় কথ্য ভাষায় দু-তিনটে কথা, ডোরিস তার মানে বুঝতে পারলে না। তারপর শুনলো কে যেন তার সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু জোরে নয়, খুব নিচু গলায় ফিশফিশ ক'রে। স্নান করতে যাচ্ছে মানুষটা—এ-সময় এ-রকমভাবে পথ আটকানো সত্যি বড়ো খারাপ। গাই আবার কী বললো, তার নিম্নস্বর সত্ত্বেও সে যে বিরক্ত হয়েছে সেটা বুঝতে ডোরিসের দেরি হ'লো না। অন্য গলাটিও একটু চড়েছে: মেয়ের গলা। ডোরিসের মনে হ'লো কেউ কোনো অভিযোগ করতে এসেছে, শুধু মালয়ী স্ত্রীলোকেরাই এইরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিশেষ সুবিধে কিছু হচ্ছে ব'লে মনে হয় না। কারণ ডোরিস শুনতে পেলো গাই বলছে 'বেরিয়ে যাও।' কথ্য ভাষায় হ'লেও এ-কথাটার মানে সে বুঝলো, তারপর আওয়াজ পেলো দরজা বন্ধ করার। গায়ে জল ঢালার শব্দ ভেসে এলো। (স্নানের ব্যবস্থা দেখে এখনো তার মজা লাগে; শোবার ঘরের তলায় স্নানের ঘর, একেবারে মাটির উপর। টব-ভর্তি জল আছে, একটা ছোটো টিনের পাত্রে জল নিয়ে গায়ে ঢালতে হয়।) আর তার একটু পরেই গাই খাবার-ঘরে এসে ঢুকলো। তখনো তার চুল শুকোয় নি। খেতে বসলো দু'জনে।

'তোমার ভাগ্য ভালো যে আমার ঈর্ষা বা সন্দেহবাতিক নেই;' সে হাসলো, 'স্নান করার সময় মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা ঠিক হচ্ছে কি ?' ঘরে ঢোকার সময় গাই-এর ফুর্তিবাজ মুখ একটু বিরক্ত দেখাচ্ছিলো, কিন্তু এখন আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

'মেয়েটিকে দেখে আমিও যে খুব খুশিই হয়েছিলাম এমন বলতে পারিনে।'

'তোমার গলার স্বরে তাই মনে হচ্ছিলো। সত্যি বলতে, আমার মনে হচ্ছিলো বেচারির সঙ্গে বেশ একটু তিরিক্ষি মেজাজেই কথা বলছিলে।'

'কী আস্পর্ধা! এভাবে আমার পথ আটকায়।'

'কী চাচ্ছিলো ?'

'কে জানে। ক্যামপঙ থেকে এসেছে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে হয়তো।'

'ও-ই বোধ হয় আজ সকালে ঘুরঘুর করছিলো।'

গাই ভুরু কুঁচকোলো।

'কেউ ঘুরঘুর করছিলো নাকি?'

'হ্যাঁ তোমার কাপড়ছাড়ার ঘরটা গুছোনো আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম; স্নানের সিঁড়ি থেকে মনে হ'লো কে যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে; তাকিয়ে দেখি একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে।'

'কথা বললে?'

'জিগেস করলাম কী চায়। কী যেন বললো, আমি বুঝতে পারলাম না ওর ভাষা।'

'এইসব আজেবাজে লোক যেন আর কখনো এ-রকম ফটফট ঢুকে না পড়ে।' গাই বললে, 'এখানে ওরা ঢোকে কোন অধিকারে?'

গাই হাসলো বটে, কিন্তু প্রেমিকার সহজাত অনুভূতি দিয়ে ডোরিস লক্ষ করলো, গাই-এর ঠোঁট হাসলো, চোখ হাসলো না: একটা উদ্বেগ আছে ওর। কী?

'কী করলে আজ সকালে?' জিগেস করলো গাই।

'বিশেষ কিছু নয়। একটু হাঁটতে গিয়েছিলাম।'

'ক্যামপঙের দিকে?'

'হুঁ! একটা দৃশ্য দেখে রীতিমতো রোমাঞ্চিত হলাম—একটা বানরের গলায় শেকল বেঁধে একটা লোক তাকে গাছে তুলে দিয়েছে ডাব পেড়ে আনার জন্য।'

'বেশ মজা লাগে দেখতে, না?'

'জানো, গাই, দুটো ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, অন্যদের চাইতে অনেক ফর্শা তাদের গায়ের রঙ। দো-আঁশলা ব'লে মনে হ'লো আমার। কথা বললাম, কিন্তু একটুও ইংরিজি জানে না।'

'ক্যামপঙে আছে এ-রকম দু-তিনটে দো-আঁশলা।'

'কার ছেলে ওরা?'

'ওদের মা এই গ্রামেরই মেয়ে।'

'আর বাবা?'

'এই ধরনের প্রশ্ন করা বোধ হয় একটু বিপজ্জনক।' গাই একটু হাসলো। 'অনেক লোকেরই এই দেশীয় স্ত্রী থাকে; তারপর যখন দেশে চ'লে যায় অথবা বিয়ে করে তখন কিছু টাকাকড়ি দিয়ে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়।'

ডোরিস চুপ ক'রে গেলো। স্বামীর নির্লিপ্ত ভঙ্গিটা যেন তার কাছে একটু অনুভূতিহীন ব'লে মনে হ'লো। উত্তর দিতে গিয়ে তার সহজ সরল সুশ্রী ইংরেজমুখে প্রায় বিরক্তির ছোঁয়া লাগলো।

'আর ছেলেপুলেরা?'

'ওদের ব্যবস্থা যে ভালোই হয় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার। সাধ্যমতো সকলেই চেষ্টা করে ওদের লেখাপড়ার জন্য টাকাকড়ি দিতে। সরকারি আপিশে কেরানির চাকরি পায়; ওরা ভালোই থাকে।'

ডোরিস ম্লান হাসলো। 'এটাকে খুব ভালো ব্যবস্থা ব'লে মনে করতে বলছো আমাকে?'

'বেশি কড়া হোয়ো না,' গাইও হাসলো।

'কড়া হচ্ছিনে, কিন্তু তোমার যে কোনো মালয়ী বউ ছিলো না সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাহলে বিশ্রী লাগতো আমার। ভেবে ত্যাখো, ঐ বাচ্চা দু'টো যদি তোমার হ'তো?'

ছোকরা চাকরটি এসে তাদের প্লেট বদলে দিয়ে গেলো। তাদের খাদ্যবস্তুর বৈচিত্র্য খুবই কম। একঘেয়ে বিস্বাদ নদীর মাছ দিয়ে শুরু হয়েছে তাদের মধ্যাহ্নভোজন, তার আনবার জন্য তাতে প্রচুর টম্যাটোর চাটনি মাখিয়ে নিতে হয়। তারপর এসেছে কী-একটা ঝোল। গাই তাতে বেশ খানিকটা চাটনি মিশিয়ে নিলে।

'বৃদ্ধ সুলতানের ধারণা ছিলো এ-দেশে কোনো শ্বেতাঙ্গিনী বাস করতে পারবে না,' একটু পরে গাই বললে, 'উনি বরং সকলকে উৎসাহই দিয়েছেন—মানে এ-দেশীয় মেয়েদের নিয়ে সংসার পাততে। দেশটা খুব শান্তিপূর্ণ তো; আর এখানকার আবহাওয়াও এখন আমাদের বেশ গা-সওয়া হ'য়ে এসেছে।'

'কিন্তু গাই, সব চাইতে বড়ো ছেলেটির বয়স সাত আটের বেশি নয়, তার পরের জনের পাঁচ হবে।'

'বড়ো নির্জন এ অঞ্চলটা। এমনও হয় প্রায় ছ'মাসের মধ্যে অন্য-কোনো শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয় না আমাদের। প্রায় ছেলেবেলা থেকেই এখানে আস্তানা গেড়েছি।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গাই তার মনোমোহন হাসি হাসলো,

যে-হাসি তার গোলগাল সাধারণ মুখে অন্য আলো জ্বেলে দেয়। 'সব কিছুরই ক্ষমা আছে, জানো তো ?'

এই হাসি ডোরিসকে সব ভুলিয়ে দেয়। এই হাসিই গাই-এর সব চাইতে ভালো যুক্তি। ডোরিসের চোখ আবার কোমল আর স্নিগ্ধ হ'য়ে এলো।

'সে তো বটেই,' টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্বামীর হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিলে সে।

'আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে তোমার বয়স অল্প থাকতে থাকতেই তোমাকে গ্রেপ্তার করেছি। সত্যি বলছি, যদি শুনতাম তুমিও ও ভাবে জীবন কাটিয়েছো তাহ'লে আমি সইতে পারতাম না।'

গাই তার হাতে মৃদু চাপ দিলে।

'তুমি সুখী, সোনা ?'

'সাংঘাতিক।'

আশ্চর্য ঠাণ্ডা আর সতেজ দেখাচ্ছে ডোরিসকে তার সাধারণ লিনেনের ফ্রকে। যৌবনের অনিবার্য সৌন্দর্য ছাড়া আর যে কিছু বিশেষত্ব ছিলো তার চেহারায়, তা নয়—অবশ্য তার বাদামি চোখ দুটি ভারি সুন্দর।—কিন্তু মুখের ভাবে একটা প্রীতিকর সারল্য আছে, আর আছে পরিচ্ছন্ন, চকচকে একমাথা চুল। তাকে দেখেই মনে হয় ভারি প্রাণবন্ত মেয়েটি, আর পার্লামেণ্টের যে-সদস্যের কাছে সে সেক্রেটারির কাজ করতো, তিনি যে তার কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তাতেও কোনো সন্দেহ থাকে না।

'প্রথম দেখাতেই তো আমি এ-দেশের প্রেমে প'ড়ে গেছি,' সে বললে, 'এত একা থাকি তবু কখনো নিঃসঙ্গ লাগে না।' অবশ্য মালয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে গল্প-উপন্যাস সে পড়েছে। তার কল্পনায় মালয় ছিলো গুরুগম্ভীর একটি দেশ, যেখানে বিশাল-বিশাল সব অলুক্ষুণে নদী আর স্তব্ধ, দুর্ভেদ্য অরণ্য। কিন্তু নদীর মুখে এসে যখন দেখলো বারো মাল্লার বিরাট নৌকা দাঁড়িয়ে তখন সেখানকার প্রাকৃতিক শোভায় তার দম বন্ধ হ'য়ে এসেছিলো। বিস্ময়ের উদ্রেক না-ক'রে এখানকার দৃশ্য বরং বন্ধুর মতো সহজে আপন ক'রে টেনে নেয়। এখানে প্রকৃতিতে গাছে-গাছে পাখির খুশিভরা গানের মতো আনন্দ ছড়িয়ে আছে—যা সে মোটেই আশা করে নি। নদীর দুই পাশে গাছের সারি; আর তার পিছনে ঘন সবুজ বনানী। দূরে, যতদূর চোখ যায়, নীল পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সারি। নিজেকে আর বন্দী মনে হয় নি ডোরিসের, বিচ্ছিন্ন

লাগে নি, বরং তার চেতনাকে নাড়া দিয়েছিলো এমন উন্মুক্ত এক বিস্তৃতির অনুভূতি যেখানে তার কল্পনা আপন খুশিতে ডানা মেলে উড়তে পারে। উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে ঝকঝকে সবুজ স্থলভাগ আর প্রশান্ত বন্ধুর মতো নির্মেঘ আকাশ নিয়ে এই দেশ তাকে যেন স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো।

নদীর তীর ঘেঁষে নৌকা বেয়ে তারা এগোচ্ছিলো, আর অনেক উঁচুতে তাদের মাথার উপর উড়ে চলেছিলো একজোড়া পায়রা। যেন কোনো অলংকার প্রাণ পেয়ে তাদের নৌকোর সামনে চকিতে ভেসে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিলো—মাছরাঙা! দু'টো বাঁদর ল্যাজ ঝুলিয়ে পাশাপাশি গাছের ডালে বসেছিলো। দূরের দিগন্তবিস্তৃত আবিল জলরাশির ওপারে জঙ্গল ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছিলো শাদা মেঘের টুকরো—আকাশে ঐ একমাত্র মেঘের দল যেন এক সারি শাদা পোশাক-পরা ব্যালেনাচের মেয়ে। সারা শরীরে ফুর্তি মেখে প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করছে পর্দা ওঠার জন্য। আনন্দে ভ'রে গিয়েছিলো তার মন; এবং এই মুহূর্তে সে-কথা মনে ক'রে কৃতজ্ঞ এবং সপ্রেম দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকালো।

ঘর সাজানো নিয়েই কি কম মজা হয়েছিলো নাকি? বিশাল ঘর, মস্ত। সে যখন প্রথম আসে তখন মেঝেতে পাতা ছিলো একটা ছেঁড়া, নোংরা মাদুর; রং-হীন কাঠের দেওয়ালে ঝুলছিলো (অনেক উঁচুতে) বাজে-বাজে ছবির ফোটোগ্রাফ, ডায়েক[১] ঢাল আর রাম-দা। টেবিল ঢাকা ছিলো গুরুগম্ভীর রঙের ডায়েক কাপড়ে, আর টেবিলের উপর ছিলো কয়েকটা অত্যন্ত মলিন পিতলের বাসন। খালি সিগারেটের টিন আর মালয়ী রুপোর দু-একটি টুকরো। একটা অমসৃণ কাঠের তাকে শস্তা সংস্করণের কিছু উপন্যাস আর ছেঁড়াখোড়া মলাটের কিছু ভ্রমণকাহিনী শোভা পাচ্ছিলো; আর-একটা তাক ভর্তি ছিলো ফাঁকা বোতলে। একেবারে আদর্শ অবিবাহিতের ঘর। অপরিচ্ছন্ন কিন্তু পুরুষালি; মজা লাগলো, করুণাও হ'লো। এমন শুষ্ক আরামবিহীন এক জীবন গাই এখানে কাটায়! সে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেয়েছিলো।

'আহা! বেচারি আমার।'

তার নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ঘরটা শিগগিরই বাসযোগ্য হ'য়ে উঠলো। এটা ঠিক করলো, ওটা ঠিক করলো, আর যেটা ঠিক করতে পারলে না সেটা বের

---

১ প্রাচ্যদেশীয়।

ক'রে দিলে। বিয়ের উপহারগুলো কাজে লাগলো তার। ঘরটা দেখলে এখন ভালো লাগে—যথেষ্ট আরামের ব্যবস্থা আছে। সুন্দর অর্কিড রাখা হয়েছে কাচের পাত্রে, আর বিরাট পাত্র ভ'রে আছে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুলে ভরা লতাপাতা। এ-ঘর নিয়ে অসম্ভব গর্ব তার, কারণ এটা তার বাড়ি, (খুপরি কামরার ফ্ল্যাটে ছাড়া অন্য-কোনো রকম বাড়িতে সে এর আগে থাকে নি) তার স্বামীর কাছেও বাড়িটা এখন মনোমুগ্ধকর ব'লে মনে হয়।

'আমাকে ভালো লাগছে তো ?' কাজ শেষ হ'লে সে জিগেস করেছিলো।

'ভালোই লাগছে।' গাই হেসেছিলো।

ইচ্ছে ক'রে এই কমিয়ে বলাটার অনেক মূল্য ডোরিসের কাছে। তারা পরস্পরকে যে এত ভালো ক'রে বোঝে তা কী আশ্চর্য রকমের ভালো কথা, ভাবো! তারা দু'জনেই মনের ভাব প্রকাশ করতে লজ্জা পায়—পরস্পরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ না ক'রে তারা কথা বলছে, এমন মুহূর্ত দুর্লভ।

দুপুরের খাওয়া শেষ হ'লো; গাই একটা লম্বা চেয়ারে এলিয়ে পড়লো ঘুমের জন্য। ডোরিস এগোলো নিজের ঘরের দিকে। গাই যখন হঠাৎ তাকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে ঠোঁটে চুমু খেলো, তখন একটু অবাক হ'লো সে। সাধারণত যখন-তখন প্রেমটেম করার অভ্যেস নেই তাদের।

'পেট ভ'রে খেয়ে মনটা খুব নরম হ'য়ে আছে বুঝি ?' সে ঠাট্টা করলো।

'বেরিয়ে যাও; অন্তত দু' ঘণ্টার মধ্যে যেন তোমার মুখ দেখতে না হয়।'

'নাক ডেকো না যেন।'

ডোরিস চ'লে গেলো। ভোর না হ'তে তারা ওঠে: পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো দু'জনেই।

স্নানের ঘরে স্বামীর জল ছিটোনোর শব্দে ডোরিসের ঘুম ভাঙলো। বাংলোটার দেওয়ালগুলো যেন শব্দগ্রহণকারী যন্ত্রবিশেষ, সামান্যতম শব্দটুকুও কানে এসে বাজে। নড়তেও আলস্য লাগছিলো তার, কিন্তু চায়ের বাসনের টুংটাং শব্দ কানে আসাতে বুঝতে পারলো ছোকরা চাকরটি চায়ের ব্যবস্থা শুরু ক'রে দিয়েছে, কাজেই লাফিয়ে উঠে নিজের স্নানের ঘরে চ'লে গেলো। স্নিগ্ধ হ'লো—খুব ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু শীতল জলের কেমন একরকম আরাম আছে। বসার ঘরে যখন এলো তখন গাই র‍্যাকেট বের করছে; সন্ধ্যার ক্ষণস্থায়ী ঠাণ্ডা বাতাসে তারা টেনিস খেলতো। বাংলো থেকে টেনিস-কোর্টটা দু'-তিনশো গজ দূরে, চা শেষ ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে তারা হেঁটে গেলো কোর্টের দিকে।

'এই, গ্যাখো,' ডোরিস বললো, 'ঐ যে সেই মেয়েটা—যাকে আজ সকালে দেখেছিলাম।'
দ্রুত মুখ ফেরালো গাই। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখ থেমে রইলো স্থানীয় স্ত্রীলোকটির উপর ; কিন্তু কিছু বললো না।
'কী সুন্দর পোশাক পরেছে,' ডোরিস বললে। 'এগুলো কোথায় পাওয়া যায় কে জানে।'
স্ত্রীলোকটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে এলো দু'জনে। রোগা, ছোটো একটি মেয়ে ; সেই বড়ো-বড়ো কালো ঝকঝকে দুই চোখ যা তাদের জাতের বৈশিষ্ট্য ; আর একরাশ কালো কুচকুচে চুল। তারা যখন পাশ দিয়ে গেলো তখন একটুও নড়লো না সে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলো। ডোরিস দেখলো সে যতটা ভেবেছিলো মেয়েটি তত অল্পবয়সী নয়। কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটিকে দেখে ডোরিস একটু হাসলো, কিন্তু উত্তরে মেয়েটির ঠোঁটে কোনো হাসির রেখা ফুটে উঠলো না।
'বাচ্চাটা কী মিষ্টি, না?'
'লক্ষ করি নি।'
স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরিস একটু হকচকিয়ে গেলো। মৃতের মতো শাদা তার মুখ, ব্রণগুলো টকটকে লাল দেখাচ্ছে—তাতেও কম উদ্বিগ্ন বোধ করলো না সে।
'ওর হাত পায়ের গড়ন দেখেছিলে? একেবারে রানীর মতো।'
'আদিবাসীদের সকলেরই হাত পায়ের গড়ন ভালো।' গাই জবাব দিলে, কিন্তু তার কথায় স্বাভাবিক ফুর্তির সুর বাজলো না। সে যেন জোর ক'রে কথা বলছে।
'মেয়েটি কে, জানো?'
'কামপঙেরই মেয়ে।'
ততক্ষণে তারা টেনিস কোর্টে পৌঁছে গেছে। জালটা শক্ত ক'রে বাঁধা আছে কিনা দেখতে গিয়ে গাই ফিরে তাকালো। মেয়েটি সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরের চোখে চোখ পড়লো তাদের।
'আমি বল দেবো?' জিগেস করলো ডোরিস।
'হ্যাঁ, বলগুলো তো সব তোমার দিকে।'
সেদিন গাই খুব খারাপ খেললো। সাধারণত স্ত্রীকে হারাবার আগে পনেরো

পর্যন্ত তুলে নিতে দেয় সে, কিন্তু আজ ডোরিস সহজেই জিতে গেলো। নিঃশব্দে খেলতে লাগলো গাই। এমনকি ভয়ানক গোলমাল করে সে খেলার সময়, চ্যাঁচায় সমস্তক্ষণ, ঠিকমতো মারতে না পারলে নিজেকে শাপশাপান্ত করে, আর স্ত্রীর নাগালের বাইরে বল দিতে পারলে তাকে খেপিয়ে অস্থির ক'রে তোলে।

'না বাপু, আজ তোমার খেলায় মন নেই।'

'মোটেও না।'

স্ত্রীকে হারাবার জন্য একটার-পর-একটা বলে বাড়ি মেরে চললো সে, কিন্তু সব গিয়ে ঠেকলো জালে। স্বামীর এ-রকম গম্ভীর মুখ ডোরিস কখনো ছাখে নি। ভালো খেলতে না-পারার জন্য মেজাজ খারাপ হ'লো নাকি? অন্ধকার নেমে এলো, খেলা বন্ধ করলো তারা। ফেরার পথেও দেখলো মেয়েটি ঠিক সেই একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলেশহীন মুখে সে তাদের চ'লে যেতে দেখলো।

বারান্দার জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে, টেবিলের ছু'পাশে ছু'খানা লম্বা চেয়ার পাতা, টেবিলের উপর মদ আর সোডার বোতল সাজানো। সারাদিন পরে এই সময়টাতে তারা প্রথম পান করে; গাই সোডার সঙ্গে জিন মিশিয়ে নিলে। তাদের সামনে বিস্তৃত নদী, তার ওপারে আসন্ন রাত্রির রহস্যে আবৃত বনানী। নিঃশব্দে একটি আদিবাসী ছু'বৈঠার একটা নৌকা বেয়ে চলেছে।

'বোকার মতো খেলেছি আজ,' স্তব্ধতা ভেঙে গাই ব'লে উঠলো। 'শরীরটায় আজ তেমন জুত নেই।'

'ছুঃখিত। জ্বরটর হবে না তো আবার?'

'আরে না। কালকেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

অন্ধকার ঘন হ'লো। ব্যাঙের সরব ডাকের সঙ্গে কোনো রাত-পাখির গানের সুর মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে। বারান্দার চারপাশে জোনাকি, আশ-পাশের গাছগুলি দেখে মনে হচ্ছে যেন ছোটো মোমের আলোয় সাজানো বড়োদিনের গাছ। জ্ব'লে দপদপ করছে জোনাকির নরম আলো। ডোরিসের কানে যেন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এলো। কেমন যেন অস্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করলো সে। গাই তো এমনিতে সদানন্দ।

'কী হয়েছে তোমার খোকামশাই?' নরম গলায় সে বললো। 'আমাকে বলো।'

'কিছু হয় নি। আরেক গেলাশ জিন নেবো।' অন্যমনস্ক জবাব গাই-এর।

পরদিন গাইকে আবার তার স্বাভাবিক প্রফুল্ল মেজাজে দেখা গেলো। সেদিন তাদের ডাক এসেছে। কয়লা-খনিতে যাতায়াতের পথে স্টিমার মাসে দু'বার নদীর মোহানায় আসে। যাবার পথে ডাক নিয়ে আসে, নৌকো পাঠিয়ে গাই ডাক আনবার ব্যবস্থা করে। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে এই ডাক উত্তেজনার ঢেউ তোলে। প্রথম দু'একদিন তো কেবল যা এসেছে তার উপর চোখ বোলাতেই কেটে যায়—চিঠি, ইংরেজি কাগজ, সিঙ্গাপুরের কাগজ, পত্রিকা আর বই—তারপর বাকি সপ্তাহগুলি ভ'রে এ-সবই ভালো ক'রে পড়ে তারা। পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে তারা সচিত্র পত্রিকাগুলির পাতা ওল্টাতে ব'সে গেলো। ডাক নিয়ে অতটা মগ্ন না হ'য়ে থাকলে ডোরিস লক্ষ করতো গাই-এর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। তার পক্ষে সেটা বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য হ'তো, ব্যাখ্যা করা তো আরো কঠিন। গাই এর চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি, মুখ দুশ্চিন্তায় আনত।

প্রায় এক সপ্তাহ পরের কথা। ভোরবেলা নিজের ঘরে ব'সে মালয়ী ভাষার ব্যাকরণ পড়ছিলো ডোরিস. (ভাষাটা কিছুদিন থেকে সে সযত্নে শিখছে) বাইরে গোলমালের শব্দে তার মনোযোগ ব্যাহত হ'লো। প্রথমে কানে এলো বালকভৃত্যটির গলা, খুব রেগেমেগে কথা বলছে। তারপর আরেকটি পুরুষকণ্ঠ—বোধ হয় ভারীর। এবং সবশেষে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ এক নারীকণ্ঠ। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে বোঝা গেলো। ডোরিস উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলো। দেখলো, তাদের ভারী একটি মেয়ের হাত ধ'রে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য টানছে। ভৃত্যটি মেয়েটিকে ঠেলছে পিছন থেকে। ডোরিস তক্ষুনি চিনলো একেই সে বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এই মেয়েটিই দাঁড়িয়ে ছিলো সেদিন টেনিস কোর্টের পাশে ; কোলে একটি বাচ্চা। তিন-জনেই ক্রুদ্ধ হ'য়ে চীৎকার করছে।

'এই চুপ, থামো। কী হচ্ছে তোমাদের এখানে,' ডোরিস চীৎকার ক'রে উঠলো। তার গলা শুনে ভারী তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিলো। কিন্তু ছোকরা চাকরটি পেছন থেকে তখনো ধাক্কা দিতে থাকায় মেয়েটি মাটিতে প'ড়ে গেলো। হঠাৎ সকলে চুপ, ভৃত্যটি অপ্রস্তুত হ'য়ে আকাশ-বাতাস দেখতে লাগলো। দু-এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে ভারী স'রে গেলো। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলে মেয়েটি। অপলক ভাষাহীন

দৃষ্টিতে সে ডোরিসের দিকে তাকিয়ে ছিলো। ভৃত্যটি মেয়েটিকে এবার এমন কিছু বললো যার অর্থ হয়তো ডোরিসের বোধগম্য হ'তো—কিন্তু সে-কথা শোনা বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু সে-কথায় মেয়েটির মুখের কোনো পরিবর্তন হ'লো না, অবশ্য ধীরে-ধীরে এরপর সে বাইরে বেরিয়ে গেলো। বাইরের দরজা পর্যন্ত পিছন-পিছন এগিয়ে গেলো ছোকরাটি। ফিরতেই, ডোরিস তাকে কাছে ডাকলো। কিন্তু সে এমন ভান করলো যেন শুনতে পায় নি। ডোরিস রেগে গিয়েছিলো, আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো: 'এক্ষুনি শুনে যাও এখানে।' হঠাৎ ডোরিসের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে ভৃত্যটি এসে গোমড়া মুখে দরজার পাশে দাঁড়ালো।

'মেয়েটিকে নিয়ে ও-রকম করছিলে কেন?' খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করলো ডোরিস।

'কর্তা ওকে এখানে আসতে বারণ করেছিলো।'

'তাই ব'লে, কোনো মেয়ের সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করবে নাকি! এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। তোমার কর্তাকে সব বলবো আমি।'

ভৃত্যটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে ছিলো। কিন্তু ডোরিসের মনে হ'লো সে যেন দীর্ঘ পক্ষ্মের ফাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ করছে।

'যাও এখন।'

একটিও কথা না-ব'লে ছোকরাটি তার ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

ডোরিস মনে-মনে বিরক্ত বোধ করছিলো, ব্যাকরণ পাঠে মনঃসংযোগ করা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। একটু পরে ভৃত্যটি ফিরে এলো খাবারের টেবিলে, চাদর পাততে। হঠাৎ দরজার দিকে চাইলো সে। ডোরিস জিগেস করলো, 'কী ব্যাপার?'

'কর্তা আসছেন,' বলতে-বলতে গাই-এর হাত থেকে টুপি নেবার জন্য সে বেরিয়ে গেলো। তার সতর্ক কান ডোরিসের আগেই গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তন টের পেয়েছে। গাই কিন্তু রোজকার মতো তখনি এসে ঘরে ঢুকলো না। ডোরিস বুঝলো নিজমুখে সকলের ঘটনাটা প্রথম গাইকে বলবার জন্যই ভৃত্যটি আগে নিচে নেমে গেছে।

স্বামী ঘরে ঢুকলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরিস স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। সে-মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ।

'কী হয়েছে গাই?'

হঠাৎ গাই-এর মুখে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো। 'কেন? কিছুই না।'

ডোরিস এত অবাক হ'য়ে গেলো যে যা বলবে ভেবেছিলো তার কিছুই না ব'লে স্বামীকে নিজের ঘরে চ'লে যেতে দিলো। স্নান এবং জামা-কাপড় বদলাতে অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেক বেশি সময় লাগলো গাই-এর। সে তৈরি হ'য়ে বাইরে এলে পর টেবিলে খাবার দেয়া হ'লো।

'জানো, সেদিন যে-মেয়েটিকে আমরা দেখেছিলাম, আজ ভোরে সে এখানে এসেছিলো,' খেতে-খেতে ডোরিস বললে।

'হুঁ, শুনলাম।'

'ওরা সকলে মিলে এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করছিলো। আমি গিয়ে শেষে থামাই। এ-বিষয়ে ওদের সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত।'

ডোরিসের সব কথাই ভৃত্যটি বুঝতে পারছিলো, কিন্তু তার হাবভাবে তা প্রকাশ পেলো না। যথারীতি রুটি পরিবেষণ করতে লাগলো সে।

'এখানে আসতে বারণ করা হয়েছিলো মেয়েটিকে; তাছাড়া আমিই ওদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম যে ওকে এখানে দেখলে যেন বের ক'রে দেয়,' গাই জানালো।

'কিন্তু তাই ব'লে ও-রকম জংলির মতো অসভ্যতা করবে।'

'কিন্তু শুনলাম মেয়েটি নাকি কিছুতেই যেতে চাচ্ছিলো না। ওরা বাড়াবাড়ি করে নি ব'লেই আমার ধারণা।'

'বলছো কী তুমি! একটি মেয়ের সঙ্গে কাউকে এভাবে ব্যবহার করতে দেখাও যে ভয়ানক। তাছাড়া কোলে বাচ্চা ছিলো মেয়েটির!'

'ঠিক বাচ্চা বলা চলে না, ওর বয়স তিন বছর।'

'কী ক'রে জানলে তুমি।'

'ওর সব কিছু জানি আমি। এখানে এসে সকলকে ও এভাবে ব্যস্ত করে কোন অধিকারে?'

'ও চায় কী?'

'যা করেছে, তাই করতে চায়। অর্থাৎ গোলমাল করাই ওর উদ্দেশ্য।'

ডোরিস চুপ ক'রে রইলো। স্বামীর কথার স্বর তাকে বিস্মিত করেছিলো। গাইকে যেন বাধ্য হ'য়েই এ-সব কথা বলতে হ'লো, যেন এ-সব ব্যাপারে ডোরিসের মাথা গলানো অনুচিত। স্বামীকে নির্মম মনে হ'লো তার, একটু যেন শঙ্কিত এবং বিরক্তও সেইসঙ্গে।

'আজকে আর টেনিস খেলা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না, ঝড় আসতে পারে,' গাই বললো।

ডোরিসের যখন ঘুম ভাঙলো বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছে। বেরুনো অসম্ভব। চায়ের সময় গাই নীরব ও আত্মমগ্ন হ'য়ে রইলো। ডোরিস শেলাই নিয়ে বসলো। গাই কিছু ইংরেজি কাগজ নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলো; যদিও তার আদ্যোপান্ত ইতিমধ্যেই তার পড়া হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পড়ায় মন বসছিলো না তার। উঠে কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করলো, তারপর এক সময় বারান্দায় গিয়ে অবিরল বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে রইলো। কী সে ভাবছে? ডোরিসের ঠিক ভালো লাগছিলো না।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত গাই কোনো কথা বলেনি। ইতি-মধ্যে যদিও মুখে সে উৎফুল্ল ভাব ফুটিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রয়াসের কৃত্রিমতা ঢাকা পড়ে নি। বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশে তারা উঠেছিলো। পোকার ভয়ে আলো নিবিয়ে তারা বারান্দায় এসে বসলো। কাছেই প্রশান্ত নদী; কঠিন, মন্থর, ভয়াল, নীরব আর রহস্যময়।

'তোমাকে একটা কথা বলবো, ডোরিস,' হঠাৎ গাই ব'লে উঠলো; অত্যন্ত অস্বাভাবিকতা মেশানো তার গলা। ডোরিসের মনে হ'লো গলার স্বর সংযত রাখবার জন্য স্বামীকে বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে। স্বামীর কষ্ট দেখে তীব্র বেদনায় তার হৃদয় মথিত হ'লো। নিজের হাতটি তুলে সে স্বামীর হাতের উপর রাখলো। গাই হাত সরিয়ে নিতে-নিতে বললো, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী, শুনতে তোমার হয়তো ভালো লাগবে না। বলাও আমার পক্ষে সহজ নয়। শুধু অনুরোধ আমার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য কোরো না।' অন্ধকারে গাই-এর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু অনুমান করা যায় তা সংক্ষুব্ধ। ডোরিস নীরব। গাই বলতে আরম্ভ করলো, 'এখানে যখন আসি আমার বয়স তখন আঠারো, সবেমাত্র স্কুল ছেড়েছি। প্রথম তিনমাস কুয়ালা-সলোর নামে একটা জায়গায় থাকবার পর সেমবুলু নদীর উপকূলবর্তী এক স্থানে আমাকে পাঠানো হ'লো। আমাদের একজন প্রতিনিধি সেখানে সস্ত্রীক বাস করতেন। তাঁদের কাছাকাছিই একজায়গায় আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'লো। খাওয়া-দাওয়াটা অবশ্য তাদের সঙ্গেই করতাম, সন্ধেটাও কাটতো সেখানে। কী আনন্দেই না কেটেছে সে-সব দিন। তারপর একদিন অসুস্থ হ'য়ে ভদ্রলোক কাজ ছেড়ে চ'লে গেলেন। যুদ্ধের কারণে তখন

লোকের খুব অভাব। সুতরাং কার্যভার নিতে হ'লো আমাকে। বয়সে নিতান্ত তরুণ হ'লেও স্থানীয় ভাষা আমি খুব ভালোই বলতে পারতাম। তাছাড়া আমার বাবাও সেখানকার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। সেই একক অধিকারের রাজত্বে সম্পূর্ণ অবাধ হ'তে পারাটা আমার পক্ষে খুবই সুখের হয়েছিলো।'

এ-পর্যন্ত ব'লে পাইপের ছাই ঝেড়ে নেবার জন্য গাই থামলো। তারপর নতুন ক'রে তাতে তামাক ভ'রে কম্পিত হাতে অগ্নিসংযোগ করলো। স্বামীর দিকে না তাকিয়েও ডোরিস সেই কম্পন অনুভব করলো। গাই ব'লে চললো: 'এর আগে কোনোদিন একা থাকি নি। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়াও একজন কাজকর্ম করবার লোক থাকতো। তারপর স্কুলে এসে অনেক বন্ধু জুটলো। কখনো পথে, কখনো বা নৌকোয় নানাধরনের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হ'তো। তাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা আমাদেরই মতো। সব সময় যেন লোকের ভিড়ে বাস করছি, এ-রকম একটা অনুভূতি আমার ভালোই লাগতো। নিজেও খুব হৈ-চৈ পছন্দ করতাম। মোটকথা সব সময় খোশমেজাজে থাকতেই ভালো বাসতাম আমি। যখন-তখন, যে-কোনো বিষয়ে নিজে হেসে উঠতে পারতাম এবং চাইতাম যে অন্যেও হাসুক। এখানকার পরিবেশ কিন্তু ছিলো অন্য রকমের। দিনে খুব অসুবিধা হ'তো না, তখন কাজে ব্যস্ত থাকতাম, মজুরদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে হ'তো। তখনো তাদের নৃমুণ্ড শিকারের অভ্যাস ছিলো। সে-ব্যাপারে নানা অসুবিধার মধ্যে মাঝে-মাঝে পড়তে হ'লেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে তারা দারুণ ভালো লোক ছিলো। তাদের সঙ্গে খুব ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। স্বজাতি কাউকে পেলে অবশ্য বেশি খুশি হতাম কিন্তু এখানকার লোকেরাও কিছুমাত্র খারাপ ছিলো না। আমাকে ঠিক বিদেশী আগন্তুক ব'লে ওরা মনে করতো না ব'লে ওদের সঙ্গে মেশা সহজ ছিলো আমার পক্ষে। কাজটাও আমার নিজের খুব পছন্দ ছিলো। শুধু সন্ধেবেলায় বারান্দায় একা ব'সে পান করতে-করতে কেমন নিঃসঙ্গ লাগতো। কখনো বই পড়বার চেষ্টা করতাম। চাকর-বাকররা অবশ্য থাকতো। আমার লোকটার নাম ছিলো আবদুল। আমার পিতৃদেবকে সে চিনতো। বই পড়তে-পড়তে ক্লান্ত বোধ করলে আমি তাকে কাছে ডেকে এনে গল্পগুজব করতাম।

'রাতগুলিই ছিলো আমার পক্ষে অসহনীয়। রাতের খাওয়া শেষ হ'লে, দরজা-

জানলা বন্ধ ক'রে আবদুল শুতে চ'লে যেতো। সম্পূর্ণ একা থাকতাম আমি। মাঝে-মাঝে তিতিরের তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যেতো না। অন্ধকার ভেদ ক'রে এমন হঠাৎ সেই শব্দ আসতো যে আমি লাফিয়ে উঠতাম। ক্যামপঙ থেকে ঘণ্টাধ্বনি বা বাজি পোড়ানোর শব্দও ভেসে আসতো। সেখানে সবাই ফুর্তি করছে, আমার ডেরা থেকে তাদের আস্তানাও দূরে নয়, কিন্তু তবু আমাকে একাকী রাত কাটাতে হ'তো। বই পড়তেও তখন আর ভালো লাগতো না। কারাগারের বন্দীদশা বোধহয় এত যন্ত্রণার নয়: রাতের পর রাত আমাকে কাটাতে হয়েছে এইভাবে। কখনো পর-পর তিন চার বোতল হুইস্কি খেতেও চেষ্টা ক'রে দেখেছি। একা-একা খেতে আর কাঁহাতক ভালো লাগে। তাছাড়া সেই মদ্যপান আমাকে চাঙ্গা তো করতোই না, লাভের মধ্যে পরের দিনটা মাটি হ'য়ে যেতো। রাতের খাওয়া শেষ ক'রেই ঘুমোবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, ঘুম আসতো না। বিছানায় শুয়ে উত্তপ্ত থেকে উত্তপ্ততরই শুধু হয়েছি, ক্রমে নিদ্রার সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়েছে, তবু বুঝতে পারি নি আমার কী করা উচিত। ঈশ্বর জানেন কী দীর্ঘ সেই সব রাত। জানো ডোরিস, মাঝে-মাঝে এত খারাপ লাগতো, এত কষ্ট হ'তো। উনিশ বছরের এক অপরিণতবয়স্কের চোখ জলে ভ'রে উঠতো। এখন সে-সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়।

'তারপর, তারপর একদিন সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হ'লে আবদুল তার বাকি কাজকর্ম সেরে, চ'লে যাবার আগে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত ক'রে জিগেস করলে সারারাত একা-একা থাকতে কি আমার অসুবিধে হয় না? আমি বললাম, "না তেমন আর অসুবিধা কি।" আমার অবস্থা তাকে আমি জানতে দিতে চাই নি, যদিও সে তা জানতো ব'লেই আমার বিশ্বাস। আবদুল কিন্তু চ'লে না গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই রইলো। বুঝতে পারছিলাম সে কিছু বলতে চায়। বললাম, "আমাকে কি কিছু বলবে আবদুল? বলো না?" তখন সে জানতে চাইলো সঙ্গিনী হিশেবে কোনো মেয়েকে বাড়িতে আনা আমার অভিপ্রেত কিনা। একজন আছে যে আমার সঙ্গে এসে থাকতে রাজি। মেয়েটি খুব ভালো। তাকে রাখলে কোনো অসুবিধে তো হবেই না আর বাংলোতেও একটা মানুষ থাকবে। আমার সমস্ত কিছু সে গুছিয়ে রাখবে সেদিন সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ছিলো। কোনো-কিছু করতেও ভালো লাগছিলো না। ঘুমও আসবে না সহজে। "মেয়েটিকে রাখতে আপনার বেশি খরচ পড়বে

না কর্তা," আবদুল জানালো,"ওরা গরিব, অল্প কিছু পেলেই ওর বাড়ির লোকেরা খুশি হ'য়ে যাবে। দু'শো মতো দিলেই চলবে। পছন্দ না হ'লে পরে আপনি ওকে ফেরতও পাঠাতে পারেন।" "কোথায় সে,"—প্রশ্ন করলাম। "বাইরে অপেক্ষা করছে, এক্ষুনি ডাকছি," ব'লে আবদুল দরজার প্রান্তে এগিয়ে গেলো। মেয়েটি তার মাকে নিয়ে সিঁড়ির উপর অপেক্ষা করছিলো। আবদুলের ডাক শুনে তারা এসে ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসলো। কিছু মিষ্টি খেতে দিলাম ওদের। মেয়েটি খুব লাজুক আর শান্ত। আমি কী-একটা বলায় সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। কাঁচা বয়স, সবেমাত্র শৈশব উত্তীর্ণ হয়েছে। শুনলাম বয়স পনেরো। খুবই সুশ্রী মেয়েটি। তার সব চেয়ে সুন্দর পোশাকটা সে প'রে ছিলো। আমরা কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। মেয়েটি বেশি কথা বলছিলো না,কেবল রসিকতা শুনলে হেসে-হেসে উঠছিলো। আবদুল বললো,"ভালো ক'রে আলাপ-পরিচয় হোক কর্তা, তখন দেখবেন কত কথা বলে।" আমার পাশে এসে ওকে বসতে বললো আবদুল। মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো, আসতে চাইলো না। কিন্তু মা বলতেই সে উঠে দাঁড়ালো। একটু স'রে আমার চেয়ারেই ওকে বসবার জায়গা ক'রে দিলাম। লজ্জিত আরক্তিম হাসিতে সে কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে পাশে বসলো। ভৃত্যটির মুখে এবার হাসি দেখা গেলো, বললো, "আপনাকে ওর ভালো লেগে গেছে, কর্তা। এখন বলুন, আপনি কি ওকে রাখবেন?" মেয়েটিকে জিগেস করলাম "কী, আমার কাছে থাকবে?" হেসে সে আমার কাঁধে মুখ লুকোলো। তার ক্ষুদ্র, কোমল দেহের স্পর্শ অনুভব করলাম। বললাম, "ঠিক আছে, ও এখানে থাক।"'

গাই গ্লাসে হুইস্কি ও সোডা মেশানোর জন্য একটু থামলো।

'আমি কি কথা বলতে পারি এখন?' ডোরিসের গলা শোনা গেলো।

'আরেকটু অপেক্ষা করো, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।' গাই ব'লে চললো, 'মেয়েটিকে কিন্তু কখনো আমি ভালোবাসি নি, এমনকি প্রথম-প্রথমও শুধু মাত্র সঙ্গিনী হিশেবেই ওকে এনে রেখেছিলাম। আমার মনে হ'তো একা থাকতে হ'লে পাগল অথবা নেশাখোর মাতাল হ'য়ে যাওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। নিঃসঙ্গ থাকার পক্ষে খুবই কম বয়স ছিলো আমার। তোমাকে ছাড়া আর-কাউকে কোনোদিন ভালোবাসি নি।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো গাই, তারপর আবার বললে,

'গত বছরের ছুটিতে দেশে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও এখানেই ছিলো। ওই মেয়েটিকেই তুমি এখানে ঘুরঘুর করতে ছাখো।'

'আমি তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। কোলের বাচ্চাটি কি তোমারই?'

'হ্যাঁ। মেয়ে।'

'ওই একটিই?'

'না, আরো দু'টি ছেলে আছে, ক্যামপঙ-এ সেদিন তুমি তাদের দেখেছো।'

'তাহ'লে ওর তিনটি সন্তান?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার পরিবারটি বেশ বড়োই, কী বলো?'

ডোরিস বুঝতে পারলো, কথাটা হঠাৎ শুনে গাই ন'ড়ে উঠলো।

'হঠাৎ একেবারে বউ নিয়ে এসে উপস্থিত হবার আগে কি ও তোমার বিয়ের কথা জানতো?'

'আমি যে বিয়ে করতে যাচ্ছি সেটা সে জানতো।'

'কখন?'

'যখন এখান থেকে চ'লে যাবার আগে ওকে গাঁয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলাম আমাদের সম্পর্ক শেষ হ'লো। পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো যা-কিছু দেবার কথা ছিলো আমি তাকে দিয়েছিলাম। এ-সম্পর্ক যে সাময়িক, তা তো ওর অজানা নয়। আমার ক্লান্তি এসে গিয়েছিলো। তাকে বলেছিলাম যে, নিজের জাতের একটি মেয়েকে বিয়ে করছি আমি।'

'কিন্তু তখন তো তুমি আমাকে ছাখোও নি।'

'জানি। কিন্তু স্থির করেছিলাম দেশে ফিরে গিয়েই বিয়ে করবো।' গাই তার স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে হেসে উঠে বললে, 'বলতে দ্বিধা নেই তোমাকে দেখার পর এ-ছাড়া উপায় ছিলো না। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম তোমাকে। মনে-মনে জানতুম হয় তুমি, নয়তো কেউ না।'

'কিন্তু তখন এ-সব কথা খুলে বলো নি কেন। আমাকেও যে যাচাই ক'রে নেবার সুযোগ দেয়া উচিত, তা কি তোমার মনে হয় নি? তোমার বোঝা উচিত ছিলো, এর আগে স্বামী অন্য-কোনো মেয়ের সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দশ বছর বাস করেছে এ-কথা জানলে যে-আঘাত বাজে সেটা সহ্য করা কোনো স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ভাবি নি তুমি কোনোদিন জানতে পারবে। এখানকার পরিবেশই একটু অদ্ভুত

রকমের। এসব ব্যাপার এখানে খুবই স্বাভাবিক। প্রতি ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনই এ-কাজ করছে। পাছে তোমাকে হারাই, সেই ভয়েই ব্যাপারটা গোপন করেছিলাম। তুমি তো জানো, তোমাকে কত ভালোবেসেছিলাম··· এখনো বাসি, সোনা আমার! তুমি কোনোদিন জানতে পারবে এমন সম্ভাবনা ছিলো না। আমাকে যে আবার এখানে আসতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কেননা ছুটি নিলে সাধারণত কাউকেই আর ফের সেই একই জায়গায় পাঠানো হয় না। যাই হোক, এখানেই আবার আসতে হ'লো দেখে পর্যাপ্ত অর্থ নিয়ে অন্যগ্রামে চ'লে যাবার জন্য ওকে অনুরোধ করেছিলাম। প্রথমে সে রাজিও হয়েছিলো, কিন্তু পরে কী ভেবে আর গেলো না।'

'কিন্তু এখনইবা এ-সব কথা আমাকে বললে কেন?'

'ও যা-তা শুরু ক'রে দিয়েছে। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না কী ক'রে ও টের পেলো যে এ-বিষয়ে তুমি কিছুই জানো না। এবং সেটা টের পাওয়ার পর থেকেই আমার উপর ও সুযোগ নিতে চাচ্ছে। ওর জন্য প্রচুর অর্থ আমাকে দণ্ড দিতে হয়েছে। সুতরাং বাড়ির ভিতর যাতে ও ঢুকতে না পারে চারকবাকরদের সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে বলেছিলাম। আজ ভোরে শুধু তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই মেয়েটি ও-রকম করছিলো। আমাকে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এভাবে তো আর চলতে পারে না। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা তোমার কাছে খুলে বলাটাই ভালো ব'লে মনে হ'লো।'

গাই-এর কথা শেষ হ'য়ে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে এক সময় নিজের হাত স্ত্রীর হাতের উপর তুলে দিলো গাই। 'আমার তখনকার অবস্থা তুমি বুঝতে পেরেছো ডোরিস, পারো নি? জানি, আমার অন্যায় হ'য়ে গেছে।'

ডোরিস হাত সরিয়ে নিলে না। গাই অনুভব করলে স্ত্রীর হাতে উত্তাপ নেই।

'ও কি ঈর্ষা করে?'

'আমি জোর গলায় বলতে পারি, যখন এখানে ছিলো সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যই ও ভোগ করেছে। মনে হয় তার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে এখন ওর ভালো লাগছে না। আসলে আমাদের কারোই পরস্পরের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা

ছিলো না, ও-সব আদিবাসী মেয়েদের কাছে আমাদের মতো শাদা চামড়ার লোকদের কোনো দাম নেই।'

'আর ছেলেমেয়েরা ?'

'তারা তো ভালোই আছে। ওদের জন্য সব ব্যবস্থাই আমি ক'রে রেখেছি। আরেকটু বড়ো হ'লে ওদের আমি সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দেবো স্কুলে পড়তে।'

'ওদের প্রতি কি তোমার কোনো টান নেই ?'

গাই একটু ইতস্তত করলে, তারপর আবার বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে সব খুলে বলতে চাই। ওদের ভালোমন্দ কিছু হ'লে আমার এসে যাবে বৈকি। মেয়েটির যখন প্রথম সন্তানসম্ভাবনা হ'লো, আমার মনে হয়েছিলো সেই অনাগত সন্তানকে তার মায়ের চাইতে বেশি ভালোবাসবো। হয়তো তা বাসতেও পারতাম যদি ওদের গায়ের রং শাদা হ'তো। ছোটোবেলায় বাচ্চাটা যদিও বেশ মজার আর মিষ্টি ছিলো, তবু আমারই সন্তান ব'লে ওকে কোনোদিন ভাবতে পারি নি। সুতরাং পিতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই গ'ড়ে ওঠে নি আমার মধ্যে। মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, কেননা বুঝতে পারতাম একটা ঠিক কাজ হচ্ছে না। কিন্তু সত্যি বলতে, এখন আমার কাছে তারা অন্য যে-কোনো লোকের সন্তানের মতোই। অবশ্য এ-ধরনের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নোংরা ধারণা আমার জানা আছে।'

সব শুনলো ডোরিস। গাই মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু ডোরিস চুপ ক রেই ব'সে রইলো।

'তোমার কি আর-কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?' অবশেষে গাই বললে।

'না, মাথাটা ধরেছে, একটু শুয়ে থাকতে পারলে ভালো হ'তো।' তার কণ্ঠস্বরে কোনো ভাবান্তর নেই। তারপর আবার বললে, 'কী বলবো বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত তো, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।'

'তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো ?'

'না, একটু না, শুধু—কিছুক্ষণ আমাকে একলা থাকতে দাও। তুমি উঠো না। আমি শুতে যাচ্ছি।'

ডোরিস চেয়ার থেকে উঠে স্বামীর কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'বড্ড গরম পড়েছে আজ। আজ রাতে তুমি তোমার কাপড় ছাড়ার ঘরে শোও না ? শুভরাত্রি।'

ডোরিস চ'লে গেলো। ঘরের ভিতরের দিক থেকে তালা লাগানোর শব্দ গাই-এর কানে এলো।

পরদিন ডোরিসের বিবর্ণ মুখ দেখে বোঝা গেলো সারারাত সে ঘুমোয় নি। তার ব্যবহারে তিক্ততার কোনো ছাপ ছিলো না। কিন্তু সাধারণভাবে কথাবার্তা বললেও বোঝা যাচ্ছিলো সে সহজ হ'তে পারছে না। যেন বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলছে এমনভাবে সে গাই-এর সঙ্গে এটা-ওটা বলছিলো। প্রকাশ্যে তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয় নি। কিন্তু গাই-এর মনে হচ্ছিলো কোনো বিবাদের পর, মিটমাট হওয়া সত্ত্বেও মনে ক্ষেভে থেকে গেলে কথার সুর যেমন হ'য়ে থাকে, তার স্ত্রী তেমনিভাবে কথা বলছে। ডোরিসের চোখের দৃষ্টিতে গাই বিমূঢ় বোধ করলো; যেন এক অচেনা ভয়ের কথা সেখানে লেখা আছে। নৈশভোজনের ঠিক পরেই ডোরিস বললো, 'শরীরটা খুব ভালো ঠেকছে না, আমার এখনই শুতে যাওয়া দরকার।'

'সোনা আমার, তোমার জন্য কী যে খারাপ লাগছে,' গাই ব'লে উঠলো।

'ও কিছু নয়। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'আচ্ছা পরে তাহ'লে তোমার ঘরে গিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে আসবো।'

'না, তার দরকার নেই, আমি এখনই ঘুমোবার চেষ্টা করবো।'

'তাহ'লে যাবার আগে একটা চুমু দিয়ে যাও।'

গাই দেখলো ডোরিস লাল হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো যেন ইতস্তত করছে, তারপর অন্যদিকে চোখ রেখে সে মুখ নাবালো। গাই স্ত্রীকে জড়িয়ে ধ'রে তার ঠোঁট খুঁজলো। কিন্তু ডোরিস মুখ ঘুরিয়ে থাকায় গালে চুমু খেতে হ'লো। তক্ষুনি নিজের ঘরে চ'লে গেলো ডোরিস। আবার ঘরের ভিতর দিক থেকে চাবি দেয়ার শব্দ শুনলো গাই। ধুপ ক'রে একটা চেয়ারে সে ব'সে পড়লো। চেষ্টা করলে বই পড়ার। কিন্তু স্ত্রীর ঘর থেকে সামান্যতম শব্দও ভেসে আসে কিনা শোনার জন্য সে উৎকর্ণ হ'য়ে ছিলো। যাবার সময় ডোরিস বলেছিলো শুতে যাচ্ছে কিন্তু ভিতর থেকে নড়াচড়ার কোনোরকম শব্দ গাই শোনেনি। সেই নিস্তব্ধতা তাকে শঙ্কিত ক'রে তুললো। কাছের আলোটা হাত দিয়ে একবার আড়াল করতেই ও-ঘরের দরজার তলা দিয়ে আলোর রশ্মি তার চোখে পড়লো। তখনো আলো নেবায় নি ডোরিস। কী

করছে সে এখনো ? গাই হাতের বই নামিয়ে রাখলে। ডোরিস যদি রেগে কুরুক্ষেত্র করতো কিংবা কেঁদে ভাসিয়ে দিতো, তবে তা মানিয়ে নিতে পারতো গাই। কিন্তু স্ত্রীর নীরবতাই তাকে ভীত ক'রে তুললো। স্ত্রীর চোখে পরিষ্কার ভয়ের চিহ্ন সে দেখেছে, কিন্তু কী সে ভয় ? গতরাত্রির ঘটনা সে মনে করবার চেষ্টা করলো। ভেবে পেলে না আর কী ভাবে এ-সব কথা বলা যেতো। এক্ষেত্রে অন্য কেউ যা করতো, সেও তাই করেছে। তাছাড়া ডোরিসের সঙ্গে পরিচিত হবার বহু আগেই তো সে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছিলো। অবশ্য এখন মনে হচ্ছে কাজটা সে বোকার মতোই করেছিলো, কিন্তু চোর পালাবার পর বুদ্ধিমান হ'তে তো সকলেই পারে। বুকের উপর হাতটা রাখলো গাই। কী ব্যথা সেখানে—আশ্চর্য !

'ভগ্নহৃদয় বলতে এ-ই বুঝি বোঝে লোকে,' সে ভাবলে, 'জানি না কতকাল এভাবে চলবে।'

ডোরিসের ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলবে যে তার সঙ্গে কিছু কথা আছে; খোলাখুলি মিটিয়ে দেয়াই ভালো। গাই-এর অবস্থা ডোরিসকে বোঝাতেই হবে! কিন্তু সেই স্তব্ধ পরিবেশে তার যেন ভয় করতে লাগলো। কোথাও কোনো শব্দ নেই! হয়তো এখন একা থাকাই ভালো ডোরিসের পক্ষে। সে যে মনে খুব আঘাত পেয়েছে তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। ইচ্ছে-মতো তাকে বিশ্রাম নিতে দেয়াই উচিত। ডোরিস জানে কী একনিষ্ঠভাবে গাই তাকে ভালোবাসে। হয়তো এখন ধৈর্য ধরাই উচিত। একমাত্র কাম্য নিজের সঙ্গে বাঝাপড়া করতে গিয়ে ডোরিসও হয়তো ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তাকে আরো সময় দিতে হবে ; গাই ধৈর্য ধ'রে থাকবে।

পরদিন সকালে গাই স্ত্রীকে জিগেস করলো আগের দিনের চাইতে ভালো ঘুম হয়েছে কিনা।

'হ্যা, কাল খুব ঘুমিয়েছি,' ডোরিসের জবাব।

'তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করেছো,' করুণভাবে বললে গাই। স্বামীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডোরিস উত্তর দিলে, 'একটুও না।'

'লক্ষ্মী আমার, কী খুশিই না লাগছে। জানি, আমার সেই নীচ, মনুষ্যত্বহীন পশুর মতো ব্যবহারে তুমি ঘৃণা বোধ করছো। আমাকে তবু ক্ষমা কোরো তুমি। এভাবে আর আমি থাকতে পারছি না।'

'ক্ষমা তো করেছি, গাই। আমি তোমাকে দোষ পর্যন্ত দিচ্ছি না।'

গাই-এর মুখে অনুশোচনার হাসি ফুটে উঠলো, চোখের দৃষ্টি তার চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো।

'গত দুই রাত একা-একা ঘুমোতে আমার বিশ্রী লেগেছে।'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো ডোরিস, আরো-একটু ম্লান হ'লো তার মুখ।

'আমার ঘরের খাটটাকে সরিয়ে দিয়েছি; মিছিমিছি অনেকটা জায়গা জুড়ে রাখে। সেখানে একটা ক্যাম্পখাট পেতে নিয়েছি আমি।'

'তার মানে? কী বলছো তুমি, সোনা?'

স্বামীর দিকে এবার সোজাসুজি তাকালো ডোরিস। 'তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর জীবন আর যাপন করবো না আমি।'

'আর-কখনো না?'

ডোরিস মাথা নাড়লে। গাই হতবুদ্ধি হ'য়ে তাকালো তার দিকে, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না সে। তীব্র বেদনায় ভেঙে যাচ্ছিলো তার হৃদয়।

'তুমি কিন্তু আমার উপর খুব অবিচার করলে, ডোরিস।'

'আর আমাকে এ-রকম অবস্থার মধ্যে এনে ফেলাটা কি খুব সুবিচার হয়েছিলো?'

'তা খুবই সত্যি। কিন্তু এটা তো আলাদা ব্যাপার। এটা করায় আমার বাধা নেই।'

'কিন্তু এভাবে কী ক'রে আমরা বাস করবো?'

অবনত দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো ডোরিস। তাকে গভীর চিন্তামগ্ন মনে হ'লো।

'গতরাত্রে তুমি যখন আমার ঠোঁটে চুমু খেতে চাইলে—আমি—আমার মনে হচ্ছিলো অসুস্থ হ'য়ে পড়বো,' হাসলো সে।

'ডোরিস!'

হঠাৎ একবার গাইয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালো ডোরিস। তার চোখের দৃষ্টি নিরুত্তাপ ও ক্রুদ্ধ। 'যে-বিছানায় ওই মেয়েটি তোমার তিনটি সন্তানকে আলো দেখিয়েছিলো, সেই এক বিছানায়ই কি আমি এতকাল ঘুমিয়েছি?'

ডোরিস দেখলো গাই-এর মুখ টুকটুকে লাল হ'য়ে উঠলো।

'উঃ কী জঘন্য! কী ক'রে তুমি পারলে?' যন্ত্রণায় অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত তার কুঁকড়ে-কুঁকড়ে যাচ্ছিলো। আঙুলগুলোকে দলা-পাকানো সাপের মতো

লাগছিলো। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আস্তে-আস্তে ডোরিস নিজেকে সংযত করলো ; তারপর বললে 'আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হ'তে আমি ঠিক চাই না, কিন্তু কিছু-কিছু জিনিশ আছে যা মেনে নিতে আমাকে বাধ্য করতে পারো না। আমি ভালো ক'রেই সব দিক ভেবে দেখেছি ; তোমার মুখ থেকে সব শোনবার পর সারাদিন, সারারাত, আমি আর অন্য-কিছু ভাবি নি। ভাবতে-ভাবতে আমি ক্লান্ত। প্রথমে ইচ্ছা হয়েছিলো শোনামাত্র উঠে চ'লে যাই তক্ষুনি। স্টিমারও দু-তিন দিনের মধ্যে এসে যাবে।'

'আমার ভালোবাসার কি কোনো মূল্যই নেই তোমার কাছে ?'

'আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, আর জানি ব'লেই এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি না। আরেকবার সুযোগ নিয়ে দেখতে চাই। গাই, গাই, আমি যে তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছিলাম,' ডোরিসের গলা ভেঙে গেলো, কিন্তু তবু সে কাঁদলো না। বললে, 'অন্যায় করতে আমি চাই না, ঈশ্বর জানেন নিষ্ঠুর হ'তেও আমি চাই নি। গাই, তুমি কি আমাকে সময় দেবে না ?'

'তুমি কী বলতে চাচ্ছো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে কেবল একা থাকতে দাও। আমার মনের ভাব আমাকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে।'

ভয় পেয়েছে ডোরিস, গাই ঠিকই আন্দাজ করেছিলো। ডোরিসকে সে জিগেস করলে, 'কী তোমার মনের ভাব ?'

'দয়া ক'রে আমাকে তা জিগেস কোরো না। তোমাকে আঘাত দিতে চাই না। হয়তো এ-অবস্থা আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো। ঈশ্বর জানেন, আমি তাই চাই। চেষ্টা করবো, তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো সব ভুলতে পারি কিনা। ছ'মাস সময় দাও তুমি। তোমার জন্য সব কিছু করতে রাজি আছি, শুধু ওই সময়টা আমাকে দাও, মঞ্জুর করো,' ডোরিস প্রার্থনার ভঙ্গি করলে। 'আমাদের সুখী হ'তে না পারার কোনো কারণ নেই। আমাকে যদি সত্যি ভালোবেসে থাকো তাহ'লে ধৈর্য রাখতেই হবে তোমার।'

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস গাই-এর বুক চিরে বেরিয়ে এলো।

'ঠিক আছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে তোমাকে বাধ্য করতে চাই না! তুমি যা চাও, তাই হবে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ। হঠাৎ যেন গাই-এর বয়স বেড়ে গেছে। চেষ্টা ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'আমি আপিশে চললাম।' টুপি হাতে সে বেরিয়ে গেলো।

একমাস কাটলো। পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা সাধারণত একটু বেশি চাপা। বাইরের কোনো আগন্তুকের পক্ষে ডোরিসের মানসিক অশান্তির কথা টের পাওয়া সম্ভব ছিলো না, কিন্তু গাই লুকোতে পারে নি। তার ভালোমানুষি-মাখা সুগোল মুখ ঝুলে পড়েছিলো চিন্তার ভারে। চোখের দৃষ্টিও ক্ষুধার্ত এবং দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট। কিন্তু ডোরিসকে বেশ হাসিখুশিই মনে হ'তো। গাই-এর সঙ্গে আগের মতোই রসিকতা করতো সে। একসঙ্গে টেনিস খেলতো, নানা বিষয় কথাবার্তাও বলতো তারা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যেতো সে কেবলমাত্র অভিনয় ক'রে যাচ্ছে। অবশেষে আর সহ্য করতে না-পেরে গাই আবার সেই মালয়ী 'মেয়েটির প্রসঙ্গ অবতারণা করতে চাইলো।

'আঃ, গাই, ও-সব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী লাভ,' ডোরিস অস্পষ্ট জবাব দিলো, 'যা বলার সবতো বলা হ'য়েই গেছে; তোমাকে তো কোনো কিছুর জন্য দোষী করছি না।'

'এ-ভাবে আমাকে শাস্তি দেবার অর্থ কী তাহ'লে?'

'ওগো, আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চাই না। দোষ? আমার কী দোষ বলো? যদি...' ডোরিস একবার কাঁধ ঝাঁকালো, 'মানবচরিত্র বড়ো অদ্ভুত, গাই।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে চেষ্টা কোরো না।'

কথাগুলি হয়তো একটু কর্কশ শোনালো, কিন্তু ডোরিস তার সহৃদয় স্নিগ্ধ হাসিতে তা ঢেকে দিলে। প্রতি রাতে শুতে যাবার আগে সে গাই-এর গালে হাল্কা চুমু দিয়ে যেতো। তবু ঠোঁটটুকুর আলতো স্পর্শ পেতো গাই। উড়ন্ত কোনো প্রজাপতির ক্ষণিক স্পর্শের মতো।

দ্বিতীয় মাসও এভাবে কেটে গেলো, তারপর তৃতীয়। আর হঠাৎ একদিন যে ছয় মাস অনন্ত ব'লে মনে হ'য়েছিলো তাও শেষ হ'য়ে গেলো। গাই ভাবলে, ডোরিসের কি মনে আছে? অত্যন্ত মনোযোগে ডোরিসের প্রতিটি কথা, মুখভঙ্গি ও হস্তসঞ্চালন সে লক্ষ করতে লাগলো। কিন্তু মনোযোগের পাত্রীটি নির্বাক। ছ'মাস সময় চেয়েছিলো ডোরিস, গাই আপত্তি করে নি। তবু ধরাছোঁয়ার বাইরেই ডোরিস র'য়ে গেলো।

স্টিমার নদীর মুখে এসে পৌঁছে গিয়েছিলো, যাবার পথে ডাক নামিয়ে দিয়ে গেলো। ফেরত ডাকে দেবার জন্য গাই তাড়াতাড়ি ক'রে চিঠিপত্র লিখলো।

সেদিন মঙ্গলবার, ডাক যাবে বৃহস্পতিবার। কিছুদিন থেকে একমাত্র খাবার সময়টুকু ছাড়া তাদের মধ্যে কথাবার্তা বেশি হ'তো না এবং খাওয়া শেষ হ'লে যে যার মতো বই নিয়ে ব'সে যেতো। আজ ভৃত্য কাজ সেরে চ'লে যেতেই ডোরিস তার হাতের বই নামিয়ে রেখে ব'লে উঠলো :

'তোমাকে আমার কিছু বলার আছে, গাই।'

গাই-এর বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো, বুঝতে পারলে মুখের রং বদলে যাচ্ছে।

'ওকি! তোমার মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন, সাংঘাতিক কিছু বলবো না,' ডোরিস হাসলো। কিন্তু গাই-এর মনে হ'লো তার গলার স্বর যেন কেঁপে উঠলো।

'বলো কী বলবে?' সে বললে।

'আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

'মণি আমার, তোমার জন্য পৃথিবীর যে কোনো কাজ করতে আমি রাজি,' ডোরিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে সে, কিন্তু ডোরিস তার হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমাকে ফিরে যেতে দাও।'

'তুমি?...' গাই-এর গলা ভেদ ক'রে ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এলো, 'কখন? কেন?'

'যতদিন পেরেছি সহ্য করেছি, কিন্তু আর না। সহ্যশক্তির শেষসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি আমি।'

'কতদিনের জন্য যেতে চাও? আর কি কোনোদিন ফিরবে না?'

'জানি না। হয়তো আর ফিরবো না।' ডোরিস মনের জোর এনে আবার বললে, 'হ্যাঁ, আর কোনোদিন ফিরবো না।'

'হায় ভগবান।' গাই এর গলা ভেঙে গেলো। ডোরিসের মনে হ'লো সে বুঝি কান্নায় ভেঙে পড়বে।

'আমাকে তুমি দোষী কোরো না, গাই। সত্যিই কোনো দোষ নেই আমার, এ-ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না,' বললে ডোরিস।

'তুমি ছ'মাস সময় চেয়েছিলে, আমি আপত্তি করি নি। আমার দিক থেকে কোনো অশালীন ব্যবহার হয়েছে এমন কথা বলতে পারো না।'

'না, না।'

'কী ভাবে যে আমার দিন কেটেছে, তাও আমি তোমাকে জানাই নি।'

'জানি, এবং সেজন্ত তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার ব্যবহারের তুলনা নেই। শোনো গাই, আবার বলছি, তোমাকে কিছুর জন্যই দোষ দিচ্ছি না। শত হ'লেও তোমার বয়স তখন অল্প ছিলো। বয়সের তুলনায় এমন কিছু বেশি অপরাধ তুমি করো নি। এখানকার নিঃসঙ্গতা যে কী তাও আমার জানা আছে। ওগো, যদি জানতে তোমার জন্য কত খারাপ আমার লাগছে। প্রথম থেকেই এ-সব আমি জানতাম, তাই ছ'মাস সময় চেয়েছিলাম। সাধারণ বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম তিলকে আমি তাল ভাবছি। আমি যে অবুঝ হচ্ছি, তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করছি, তাও বুঝতে পারতুম। কিন্তু এটা তো মানো, সমস্ত সত্তা যখন প্রতিবাদ ক'রে ওঠে তখন শুধুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। গ্রামের পথে যখন মেয়েটিকে আর তার ছেলেমেয়েদের দেখি, আমার গা থরথর ক'রে কাঁপে। ভাবি, ওই বিছানার উপর আমাকে ঘুমোতে হয়েছে, আমার গা ঘিনঘিন করে। তুমি জানো না, কী ভীষণ যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে।'

'ওকে চ'লে যেতে রাজি করিয়েছি। আমি নিজেও দরখাস্ত করেছি বদলির জন্য।'

'তাতে কিছু সুবিধে হবে ব'লে আর মনে হয় না। ও যাবে না, যাবে না। তুমি ওদেরই, আমার নও। একটি মাত্র সন্তান হ'লে হয়তো মানিয়ে নেয়া অসুবিধা হ'তো না, কিন্তু তিনজন! তার ছেলে দু'টি তো বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। দীর্ঘ দশ বছর তুমি ওদের সঙ্গে কাটিয়েছো,' এতক্ষণে ডোরিসের আসল মনোভাবটা বোঝা গেলো। এতদিন এর জন্যই সে নিজেকে প্রস্তুত করছিলো। স্পষ্ট গলায় সে ব'লে চললো, 'এটা দৈহিক ব্যাপার, এ যে আমার পক্ষে নাগালের বাইরে। যখন ভাবি ওই মেয়েটি একদিন তার সরু কালো হাতে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে, তখন শরীর আমার গুলিয়ে ওঠে। ওই কালো বাচ্চারা সব তোমার কোলে ব'সে আছে—উঃ, ভাবতেও ঘেন্না করে। তোমার স্পর্শও এখন আমার ঘৃণার। প্রতিরাত্রে বিদায় জানাবার আগে তোমার গালে চুমু খেতে গিয়ে আমাকে যে কী অমানুষিক আত্মনিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে,' বলতে-বলতে অসহিষ্ণুভাবে ডোরিস তার দু'হাতের আঙুলগুলি জড়াচ্ছিলো আর খুলছিলো। কণ্ঠের সমস্ত সংযম সে হারিয়ে ফেলেছে। 'জানি, দোষ আমারই। কী নির্বোধ মেয়ে আমি! ভেবেছিলাম আমি কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু পারলাম না, কোনোদিন পারবো না। তার জন্য সমস্ত দায়িত্ব

আমি নিজের উপরই নিচ্ছি। ফলাফলও আমিই ভোগ করবো। তুমি জোর করলে থাকতে আমি বাধ্য। কিন্তু এখানে থাকতে হ'লে আমি ম'রে যাবো। মিনতি করছি আমাকে চ'লে যেতে দাও।' ডোরিস ভেঙে পড়লো। তার এতদিনের নিরুদ্ধ ক্ষোভ চোখের জলের অবিরল ধারায় নেমে এলো। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো। গাই তাকে কোনোদিন কাঁদতে ছাখে নি।

'ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে আমি কখনোই আটকে রাখবো না,' ভাঙা গলায় সে বললে। ডোরিস শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। সমস্ত শরীর তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট শূন্যতার প্রতিমূর্তি। যে-মুখ স্বভাবত অত শান্ত, সেখানে অপার শোকের শূন্যতা।

'তোমার জীবন আমি নষ্ট করে দিলাম গাই, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার জীবনও নষ্ট হ'লো। অথচ, অথচ কত সুখীই না হ'তে পারতাম আমরা,—'

'কবে যাবে? বৃহস্পতিবার?'

'হ্যাঁ,' ম্লান মুখে ডোরিস বললে।

দু'হাতে মুখ ঢাকলো গাই। এক সময় মুখ তুলে বললে, 'না, আর পারছি না।'

'আমি কি তা'হলে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

একটি কথাও না বলে এরপর তারা প্রায় দু'মিনিট চুপচাপ ব'সে রইলো। অদূরে একটা তিতির প্রায় মানুষের মতো তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় সেই স্তব্ধতাকে বিদ্ধ ক'রে ডেকে উঠলো।

চমকে উঠলো ডোরিস। গাই উঠে গিয়ে বারান্দায় রেলিংএ ভর দিয়ে সামনে নদীর শান্ত জলধারার দিকে তাকিয়ে রইলো। ডোরিসের ঘরে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এলো তার।

পরদিন গাই আগে-আগে ঘুম থেকে উঠলো। ডোরিসের দরজায় টোকা দিলে সে। ভিতর থেকে সাড়া এলো, 'কে?'

'আমাকে আজ একটু নদীর দিকে বেরুতে হবে, রাত হবে ফিরতে।'

'ঠিক আছে।'

ডোরিস বুঝলো জিনিশপত্র গোছাবার সময় ইচ্ছা ক'রেই গাই বাড়ির বাইরে থাকতে চায়। চোখের সামনে দেখাও সহজ নয়। কাপড়-চোপড় গোছানো

শেষ হ'লে বসবার ঘরে এসে ডোরিস চারদিকে একবার নিজের জিনিশগুলির দিকে চেয়ে দেখলো। ওগুলোকে সঙ্গে নেয়াও কম কথা নয়। কিন্তু একমাত্র মায়ের ছবিটা ছাড়া অন্য কিছু সে নিলে না। রাত দশটার সময় গাই ফিরলো, 'ঠিক সময় খেতে আসতে পারি নি ব'লে দুঃখিত; গাঁয়ের প্রধান হিশেবে আমাকে যে কত দিকে খেয়াল রেখে চলতে হয়,' বললে সে। ডোরিস দেখলো গাই-এর চোখ সমস্ত ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়ের ছবিটা যে সরানো হয়েছে তাও সে লক্ষ করেছে।

'সব কিছু গোছানো হ'য়ে গেছে তো? আমি মাঝিকে খুব ভোরে নৌকা নিয়ে ঘাটে হাজির থাকতে ব'লে এসেছি,' গাই জানালে।

'আমাকে যাতে ঠিক পাঁচটায় জাগিয়ে দেয় তার জন্য ব'লে রেখেছি।'

'কিছু টাকা সঙ্গে রাখা ভালো,' বলতে-বলতে গাই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলো। একটি চেক লিখে এনে ডোরিসের হাতে দিলে। তারপর ড্রয়ার থেকে কিছু খুচরো টাকা বের ক'রে বললো, 'এগুলোও সঙ্গে রাখো, সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবার খরচ এতেই কুলিয়ে যাবে। চেকটা সিঙ্গাপুরে ভাঙিয়ে নিয়ো।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে কি নদীর মোহানা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবো?'

'না, তার আর দরকার নেই। এখানেই আমরা বিদায় নেবো।'

'ঠিক আছে, আমি এখন তাহ'লে একটু বিশ্রাম করতে যাই। সারাদিন যা ঝামেলা গেছে।'

গাই নিজের ঘরে চ'লে গেলো, যাবার সময় ডোরিসের হাত পর্যন্ত স্পর্শ করলে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলে সে। ডোরিস শেষবারের মতো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিলে। এই ঘরেই একদিন সে কত সুখে ছিলো, আর আজ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর উঠে নিজের ঘরে গেলো। রাতের জন্য প্রয়োজনীয় দু'একটা জিনিশ ছাড়া সবকিছুই তার গোছানো হ'য়ে গেছে।

পরদিন রাত থাকতে-থাকতেই ভৃত্য কথামতো এসে জাগিয়ে দিলে। প্রাতরাশ প্রস্তুত ছিলো, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় প'রে নিয়ে টেবিলে এলো তারা। একটু পরেই খেয়াঘাটে নৌকা এসে ভিড়লো। তাতে জিনিশপত্র তোলা হ'তে লাগলো। খাবার মতো মনের অবস্থা নয় তখন তাদের। নিয়মমাফিক টেবিলে বসলো মাত্র। ফিকে হ'য়ে আসা অন্ধকারে নদীটাকে দেখতে ভয়ংকর

লাগছিলো। পুরোপুরি ভোর না হ'লেও রাত্রি তখন শেষ হ'য়ে গেছে। সেই স্তব্ধ পরিবেশে খেয়াঘাট থেকে আদিবাসীদের গলা স্পষ্ট ভেসে আসছিলো। ডোরিসের প্লেটে অস্পৃষ্ট খাবারের দিকে তাকালো গাই, তারপর বললে, 'তোমার হ'য়ে গেলে ওঠা যাক। সময় প্রায় হ'য়ে গেছে।' নিঃশব্দে ডোরিস উঠে দাঁড়ালো। তখনও কিছু প'ড়ে আছে কি না দেখবার জন্য শেষবার নিজের ঘরে ঘুরে এলো। দু'জনে তারপর সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে লাগলো। সিঁড়ির নিচ থেকে সামনের পথটা এঁকেবেঁকে নদীর তীর অবধি চ'লে গেছে। তারা এসে ঘাটে পৌঁছুলো। স্থানীয় প্রহরীরা গাই ও ডোরিসকে সম্মান দেখাবার জন্য উজ্জ্বল পোশাক প'রে খেয়াঘাটে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। প্রধান মাঝি হাত ধ'রে ডোরিসকে নৌকায় উঠিয়ে নিলে। স্বামীকে শেষবারের মতো সান্ত্বনা দিতে, তার কাছ থেকে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিতে ডোরিসের সমস্ত মন আকুলিবিকুলি ক'রে উঠছিলো। কিন্তু একটি শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারলে না।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে গাই বললে, 'তা'হলে বিদায়, যাত্রা শুভ হোক তোমার।' গাই মাঝিদের ইঙ্গিত করতেই তারা নৌকা ছেড়ে দিলো। নদীর উপর থেকে কুয়াশার আস্তরণ স'রে-স'রে যাচ্ছে, রাতের শেষ চিহ্ন নদীর ওপারে বনভূমির গাছপালায় তখনো লেগে আছে। যতক্ষণ না ভোরের সেই আবছা আলো-আঁধারে নৌকা মিলিয়ে গেলো গাই তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ির পথে পা বাড়ালো। প্রহরীরা তাকে সম্মানপ্রদর্শন করবার জন্য অপেক্ষা করছিলো, অন্যমনস্কভাবে মাথা নোয়ালো গাই। ঘরে ফিরে ভৃত্যকে বললে, 'বাকি জিনিশপত্র গুছিয়ে ফেলো, ওগুলো রেখে আর কী লাভ?' বারান্দায় এসে বসলো সে। রোদ বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এক তিক্ত, বোবা, বিপুল বিক্ষোভে সে অভিভূত হ'য়ে পড়ছিলো। আপিশের বেলা হ'য়ে যাওয়ায় এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়লো।

মাথা ধ'রে থাকায় দুপুরে সে ঘুমোতে পারে নি, ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিলো। বন্দুক কাঁধে নিয়ে বনের দিকে একটু হেঁটে আসবার জন্য সে বেরিয়ে গেলো। কিছু শিকার করলো না, শুধু ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত হেঁটে বেড়ালো। ফিরে এলো সূর্যাস্তের আগে। দু'-তিন গ্লাশ মদ খেলো। রাতের খাবার সময় হ'য়ে গিয়েছিলো, পোশাক বদলাতে গেলো। অবিশ্যি এখন আর পোশাক বদলাবার তেমন কোনো দায় নেই। তার একার পক্ষে যে-কোনো ধরনের

পোশাকই যথেষ্ট। স্থানীয় অধিবাসীদের পোশাক পরলো সে। ডোরিসকে বিয়ে ক'রে আনার আগে, এখানে এ-ধরনের পোশাকই সে পরতো। পা-টা খালিই রইলো। খাবার খেয়ে উঠলো অন্যমনস্কভাবে। চাকর টেবিল পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেলো। হাতে একটা পত্রিকা নিয়ে বসলো। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। কিন্তু পড়তে পারলো না, কাগজটা তার হাঁটুর উপর প'ড়ে রইলো। বড্ড শ্রান্ত বোধ করছে সে, মনটা আশ্চর্য রকমের শূন্য, কিছুই যেন ভাবতে পারছে না। কাছেই বারবার ডেকে উঠছে তিতিরটা। কর্কশকণ্ঠে তার সেই হঠাৎ ডেকে ওঠা স্বর গাইকে যেন ব্যঙ্গ করছে। অতটুকু ছোটো গলায় কী ক'রে যে এমন আওয়াজ পাখিটা বের করে।

কাছ থেকে একটা চাপা কাশির শব্দ তার কানে এলো।

'কে ওখানে,' গাই চেঁচিয়ে উঠলো। একটু চুপচাপ। দরজার দিকে তাকালো গাই। বাইরে তিতিরের তীক্ষ্ণকণ্ঠ ডাক তখন বিশ্রী হাসির মতো শোনাচ্ছে। একটি বাচ্চা ছেলে এসে দরজার পাশে দাঁড়ালো। পরনে তার ছেঁড়া জামা। গাই-এর দুই ছেলের মধ্যে এটি বড়ো।

'কী চাই?' গাই জিগেস করলে।

ছেলেটি ঘরের মধ্যে এসে পা গুটিয়ে বসলো।

'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?'

'মা। আপনার কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা জিগেস করেছে।'

গাই ছেলেটির দিকে ভালো ক'রে তাকালো। ছেলেটি আর কিছু বললে না, লজ্জিতভাবে চোখ নামিয়ে সে গাই-এর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলো। তীব্র, তিক্ত চিন্তায় অস্থির গাই দু'হাতে মুখ ঢাকলো। আর কী লাভ? সব তো শেষ হ'য়েই গেছে, হ্যাঁ, শেষ। সে আত্মসমর্পণ করলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সে।

'মাকে তোমাদের সকলের জিনিশপত্র গুছিয়ে নিতে বলো। সে ফিরে আসতে পারে।'

'কখন?' ছেলেটির গলা নির্বিকার।

গাই এর সেই আমুদে, দাগভর্তি গোল মুখ বেয়ে চোখের জল নেমে আসছিলো।

'আজ রাতে,' সে বললে।

অনুবাদ: মীনাক্ষী দত্ত ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত



কয়েকটি কমলালেবু

লুইজি পিরানদেল্লো

'তেরেসিনা কি এখানে থাকে ?'

বাটলারের গায়ে তখনো কেবল শার্ট, কিন্তু এরই মধ্যে সে গলায় শক্ত কলার চাপিয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছেলেটিকে সে একবার দেখে নিলো। ছেলেটি তার মোটা কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছে, শীতে নীল হ'য়ে জ'মে গেছে তার হাত। এক হাতে একটি ছোট্ট নোংরা ব্যাগ, অন্য হাতে একটা পুরোনো অ্যাট্যাশে কেস নিয়ে সব চেয়ে উপরের সিঁড়িতে বর্বরের মতো সে বাটলারের দিকে তাকিয়ে।

বাটলারের চোখের উপর মোটা-মোটা ভুরু, দেখে মনে হয় তার গাল থেকে দাড়ি কেটে নিয়ে কেউ স্থায়ীভাবে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। সেই ভুরু তুলে সে জিগেস করলে 'তেরেসিনা ? তেরেসিনা কে ?'

ছেলেটি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে এক ফোঁটা শিশির তার নাক থেকে ঝরিয়ে দিলে। তারপর জবাব দিলে, 'তেরেসিনা—গায়িকা তেরেসিনা।'

বাটলারের মুখে বিস্ময়-মেশানো বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো।—'ও! তার নাম বুঝি তেরেসিনা—শুধুই তেরেসিনা ? আর তুমি কে বলো তো ?'

ছেলেটার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটলো, ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ বেরুলো তার নাক দিয়ে।—'সে বাড়িতে আছে না নেই বলো দেখি। তাকে গিয়ে বলো যে মিচুচ্চো এসেছে—তাহ'লেই হবে।'

বাটলারের মুখের উপর একটি সূক্ষ্ম হাসি যেন জঁমে বরফ হ'য়ে গেলো।

'কিন্তু এখন তো কেউ বাড়ি নেই। মাদাম সিনা মার্নিস এখনো থিয়েটার থেকে ফেরেন নি, আর...'

'আর মার্থা-মাসি?' মিচুচ্চো তাকে বাধা দিলে।

'ও, আপনি তার বোন-পো বুঝি?' চাকরটা তক্ষুনি সসম্মানে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। 'আজ্ঞে না, কেউ বাড়ি নেই। একটার আগে ফিরবেন মনে হয় না। আজ আপনার.. আপনার ইয়ের জয়ন্তী-রজনী কিনা ..মাদাম তাহ'লে আপনার কী না হলেন...মাসতুতো বোন না?'

মিচুচ্চো একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, 'না মানে...ওরা ঠিক আমার আত্মীয় নয়।...আমি...আমার নাম মিচুচ্চো বোনাভিনো...আমার নাম শুনলেই সে চিনবে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই আমি দেশ থেকে এসেছি।'

এর পরে বাটলার ভাবলে যে 'আজ্ঞে'-'আপনি'গুলো ব্যবহার না-করাই ঠিক হবে। রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট অন্ধকার একটা ঘরে মিচুচ্চোকে সে নিয়ে গেলো। সেখানে কার উচ্চ নাসিকাধ্বনির শব্দ আসছে। 'বোসো এখানে—আমি আলো নিয়ে আসছি।' যেদিক থেকে নাক ডাকার শব্দটা আসছিলো, মিচুচ্চো সেদিকে তাকালো, কিন্তু নাসিকাধ্বনির উৎসটি আবিষ্কার করতে পারলো না। তখন সে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলো—বাবুর্চি আর বয় মিলে ডিনার প্রস্তুত করছে। ভোজ্যবস্তুর গন্ধে সে আচ্ছন্ন হ'লো, মাথা ঝিমঝিম আর গা বমি-বমি করতে লাগলো তার; সকাল থেকে সে বলতে গেলে কিছুই খায় নি, মেসিনা থেকে একরাত্রি একদিন ট্রেনে কাটিয়ে এইমাত্র এসে পৌঁচেছে।

বাটলার আলো নিয়ে এলো। ঘরের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে একটা পর্দা খাটানো হয়েছে, তার আড়ালে এতক্ষণ নাক ডাকিয়ে যে ঘুমোচ্ছিলো সে আধো ঘুমের মধ্যে বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠলো: 'কে?'

'দোরিনা, ওঠ। সিনোর বোনা ভিঁচনো এসেছেন।'

আঙুলে ফুঁ দিতে-দিতে মিচুচ্চো বললে, 'বোনাভিনো।'

'সিনোর বোনাভিনো এসেছেন···মাদামের বন্ধু···আর তুই কিনা প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোচ্ছিস! ঘণ্টা বাজলে তোর কানে কখনো যায় না। আমি তো আর এক হাতে সব করতে পারি না। আমাকে এখন খাবার টেবিল সাজাতে হবে, আনাড়ি বাবুর্চিটার পিছনে তো আমি লেগেই আছি···এর উপর কে এলো না এলো তাও কি আমাকেই দেখতে হবে!'

বাটলারের এই বকুনির উত্তরে শোনা গেলো অনেকক্ষণ ধ'রে আড়-মোড়া ভাঙার সঙ্গে তাল রেখে হাইয়ের প্রচণ্ড শব্দ, তারপর হঠাৎ একটা তীব্র আনুনাসিক ধ্বনি। রাগে গজগজ করতে-করতে বাটলার চ'লে গেলো।

মিচুচ্চোর একটু হাসি পেলো। চোখ দিয়ে বাটলারকে সে অনুসরণ করলে—আরো-একটা আধো অন্ধকার ঘর পার হ'য়ে উজ্জ্বল আলো-জ্বলা বিশাল খাবার ঘরের প্রান্তে সে পৌঁছলো। কী সুন্দর, কী জমকালো টেবিল সেখানে পাতা। মিচুচ্চো মুগ্ধতায় আত্মবিস্মৃত হ'লো। খানিক পরে সেই নাক ডাকার শব্দে আবার তার চোখ এসে পড়লো পরদার উপরে।

বগলের তলায় ন্যাপকিনটি নিয়ে বাটলার একবার ও-ঘরে যাচ্ছে একবার এ-ঘরে আসছে। কখনো দোরিনার উদ্দেশে, কখনো বাবুর্চির উদ্দেশে তার বকরবকর চলেইছে। বাবুর্চিটি নিশ্চয়ই নতুন লোক, আজকের উৎসবের জন্যেই তাকে আনা হয়েছে—সে অবিশ্রান্ত এ কথা ও-কথা জিগেস ক'রে বাটলারকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে। মিচুচ্চোরও তাকে অনেক কথা জিগেস করবার ছিলো—কিন্তু এখন সেগুলো চেপে যাওয়াই ভালো, বাটলারকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। এ-কথাও তাকে জানানো দরকার যে সে, মিচুচ্চোই, তেরেসিনার ভাবী স্বামী। কিন্তু কথাটা বলতে সে খুব উৎসাহ পেলো না; কেন কে জানে। এ-কথা শুনলে তার সঙ্গে অত্যন্ত সসম্মান ব্যবহার না-ক'রে বাটলারের উপায় থাকবে না—সেটাই কি কারণ? যদিও এখনো সে তার কোটটি গায়ে চড়ায় নি, তবু বাটলারের ভাবভঙ্গি কী মার্জিত, কী আত্মস্থ! তার দিকে তাকিয়ে মিচুচ্চো মনে-মনে কথাটা ভাবতেও লজ্জায় যেন ম'রে গেলো। সে, তেরেসিনার ভাবী স্বামী! তবু এক সময় তার পক্ষে আর আত্মসংবরণ সম্ভব হ'লো না, সে জিগেস ক'রে ফেললো, 'কিছু মনে কোরো না···কিন্তু···এই বাড়ি···বাড়িটি কার?'

বাটলার তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'আমাদেরই, যতক্ষণ এখানে আছি, আমাদেরই।' আর মিচুচ্চো ব'সে-ব'সে মাথা নাড়তে লাগলো।

কী কাণ্ড! সব তাহ'লে সত্যি! তেরেসিনার কপাল খুলেছে! সে বড়ো-লোক! এই যে রীতিমতো ভদ্রলোকের মতো দেখতে বাটলার, ঐ বয়, বাবুর্চি, ঐ যে দোরিনা প'ড়ে-প'ড়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে—এরা সবাই তাহ'লে তেরেসিনার চাকর, তেরেসিনার কথায় ওঠে-বসে! এও কি বিশ্বাস করতে হবে? মেসিনার কথা আবার তার মনে পড়লো। একটা জঘন্য চিলেকোঠায় তেরেসিনা তার মাকে নিয়ে থাকতো। পাঁচ বছর আগে, সেই সুদূর চিলে-কোঠায় মা-মেয়ের না-খেয়ে মরার দশা হয়েছিলো। মরে নি তার জন্যই। সে, মিচুচ্চো, সে-ই আবিষ্কার করেছিলো তেরেসিনার কণ্ঠের ঐশ্বর্য। তখন সে সব সময়ই গান গাইতো, গাইতো পাখির মতো, নিজের প্রতিভা সে নিজেই জানতো না। তার গানের মধ্যে একটি উদ্ধত উৎসাহ ছিলো—গান দিয়ে সে নিজেকে ভুলিয়েছে, ভুলে থেকেছে তার দুঃখ, তার দুঃসহ দুরবস্থা। তার মা, বাবা—বিশেষ ক'রে তার মা—নিরন্তর বাধা দিয়েছেন, তবু মিচুচ্চোর প্রাণপণ চেষ্টা ছিলো কেমন ক'রে সেই দুঃখ একটুও লাঘব হবে। তেরেসিনার বাপ মারা গেলো—এর পর সে কি তাকে ত্যাগ করতে পারে? সে নিঃস্ব ব'লে তাকে ছেড়ে যাবে সে? তার তো ছোটো-খাটো একটা চাকরি আছে, মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাণ্ডে সে বাঁশি বাজায়।

মিচুচ্চোর মনে যেন দৈবপ্রেরণা এসেছিলো, সে যেন আকাশ-বাণী শুনেছিলো—তাইতো তেরেসিনার কণ্ঠস্বরকে কাজে খাটাবার কথা মনে হয়েছিলো তার। মনে পড়ে সেদিন ছিলো এপ্রিল মাস, ওদের চিলেকোঠার জানলাটি যেন ফ্রেমের মতো খানিকটা উজ্জ্বল নীল আকাশকে ধরেছে। সেই জানলার ধারে ব'সে তেরেসিনা একটা সিসিলির সুর গুনগুন করছিলো। সেদিন তাদের কথায় ছিলো উদ্দাম আবেগ। তেরেসিনার মন ভালো ছিলো না, মিচুচ্চোর মা-বাবা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না, আর এই তো সেদিন তার নিজের বাপ……।

মিচুচ্চোরও এত খারাপ লাগছিলো যে গান শুনতে-শুনতে চোখে তার জল এসেছিলো। ও-গান তেরেসিনার মুখে তো আগেও শুনেছে, কিন্তু ও-রকম সে আর-কখনো গায়নি। সেদিন তার মন এমন নাড়া খেয়েছিলো যে পরের দিনই—তেরেসিনাকে কি তার মা-কে কিছু না-ব'লে—তার এক বন্ধুকে, সেই ব্যাণ্ডের কণ্ডাক্টারকে, সে সঙ্গে ক'রে ওদের চিলেকোঠায় নিয়ে এসেছিলো। ই ভাবে আরম্ভ হ'লো তেরেসিনার সংগীতশিক্ষা—আর এরপর দু'বছর

ধ'রে মিচুচ্চো তার মাইনের প্রায় সবটাই তেরেসিনার পিছনে খরচ করেছে। সে পিয়ানো ভাড়া করলো, স্বরলিপি কিনলো, এমনকি ওস্তাদজির হাতেও বন্ধুভাবে অল্প-স্বল্প কিছু গুঁজে দিলো। কী ভালোই ছিলো সেই দিনগুলি! তেরেসিনার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল রঙে আঁকতেন তার ওস্তাদ—তেরেসিনার ইচ্ছে হ'তো দড়ি-দড়া ছিঁড়ে সেই ভবিষ্যতের দিকে ভেসে পড়ে। আর তারই সঙ্গে-সঙ্গে মিচুচ্চোর প্রতি তার কত ভালোবাসা, কত কৃতজ্ঞতা! কত সুখের স্বপ্নই দু'জনে মিলে তারা দেখেছে!

কিন্তু তেরেসিনার মা, মার্থা-মাসি, হতাশভাবে মাথা নেড়েছে। জীবনে আশার অঙ্কুর তার অনেকবার ধরেছে, অনেকবার ঝরেছে—ভবিষ্যতের উপর আর তার আস্থা নেই। মেয়ের কথা ভেবে তার আশঙ্কা হ'তো—মেয়ে যে এই দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবার স্বপ্নও দেখছে এটাও তার ভালো লাগতো না। বেশ তো—এই দুঃখই তো বেশ গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। আর মূঢ়ের মতো এই যে স্বপ্ন-দেখা, এর কত কঠিন মূল্য যে মিচুচ্চোকে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তাও মাসি জানতো।

কিন্তু দু'জনের একজনও তার কথায় কর্ণপাত করলে না। একবার এক তরুণ গায়ক-সুরকার এক জলসায় তেরেসিনার গান শুনে বললে যে এই মেয়েকে সংগীত-শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য নেপল্‌স-এ না-পাঠানো অমার্জনীয় অপরাধ। যেমন ক'রে হোক নেপল্‌স-এর গীতভবনে একে যেতেই হবে।

মার্থা-মাসির আপত্তি বিফলে গেলো। মিচুচ্চো এ নিয়ে আর দু'বার ভাবলে না। এক পুরুত-খুড়ো তাকে কিছু জমি-জমা দিয়ে গিয়েছিলেন, বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে তা-ই বেচে দিলে, তারপর তেরেসিনাকে নেপল্‌স-এ পাঠালো সংগীতশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে।

তারপর আর তার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছে, যতদিন গীতভবনে ছিলো, তেরেসিনাই চিঠি লিখতো। তারপর একবার যখন তার গানের জীবন বন্যার মতো তাকে ভাসিয়ে নিলে, মন্টিকার্লোয় তার নাম ফেটে পড়বার পর সব বড়ো-বড়ো থিয়েটারওলার সে কাম্য হ'য়ে দাঁড়ালো, তখন থেকে চিঠি লিখতো মার্থা-মাসি। বুড়ো মানুষ, ভালো ক'রে কিছুই লিখতে পারতো না, আঁকাবাঁকা অক্ষরে খানিকটা কাঁপা-কাঁপা কথা মিচুচ্চোর কাছে এসে পৌঁছতো—আর সেই সঙ্গে তেরেসিনাও এক লাইন জুড়ে দিতো—নিজে আলাদা ক'রে লিখবার সময়ই তার হ'তো না। 'মিচুচ্চো,

মা যা লিখছেন সব ঠিক কথা। ভালো থেকো, আমাকে ভালোবেসো।'
নিজেদের মধ্যে তারা ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলো যে পাঁচ-ছ' বছর মিচুচ্চো তাকে একেবারে ছেড়ে থাকবে, আর এই সময়ে সে নিজের চেষ্টায় নিজের পথ তৈরি ক'রে নেবে। দু'জনেই ছেলেমানুষ—অপেক্ষা করতে বাধা নেই। কাটলো পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরে মিচুচ্চোর আত্মীয়রা তেরেসিনার নামে, তার মার নামে নানা রকম কলঙ্ক রটাবার চেষ্টা করেছে ; এদিকে মিচুচ্চো সে-সব মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে ওদের সব চিঠিপত্র সকলকেই দেখিয়েছে, যে যখন দেখতে চেয়েছে তাকেই দেখিয়েছে। তারপর তার অসুখ করলো, বাঁচবার আশা ছিলো না। ঠিক এমনি সময়ে মার্থা-মাসি আর তেরেসিনা তার ঠিকানায় মোটা অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছিলো—সে তখন তা জানতেও পায় নি।

কিছু টাকা তাঁর অসুখে উবে গিয়েছিলো, বাকি টাকাটা সে গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছিলো তার লোভী আত্মীয়দের হাত থেকে। সে-টাকা এখন সে তেরেসিনাকে ফিরিয়ে দেবে। চায় নি, এ-টাকা সে চায় নি! দয়ার দান ব'লে যে তার অপমান হয়েছে তা নয়—তেরেসিনার পিছনে সে তো কতই খরচ করেছে—আর এখন তো দেখতে পাচ্ছে যে এ-বাড়িতে ঐ টাকা ক'টার থাকা না-থাকায় কিছুই এসে যায় না, এতগুলি বছর সে অপেক্ষা করেছে, না-হয় আরো অপেক্ষা করবে। তেরেসিনার আর্থিক স্বচ্ছলতায় এইটেই বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতের পথ তার খুলে গেছে, তবে আর দেরি করা কেন? যারা কথাটা শুনে হেসেছে তাদের অবিশ্বাস অতিক্রম ক'রে সেই পুরোনো অঙ্গীকারের উদ্‌যাপন এখনো কি হবে না?

মিচুচ্চো উঠে দাঁড়ালো। মনে-মনে যে-সিদ্ধান্তে সে পৌঁচিয়েছে, যেন তারই সমর্থনে তার কপালে কয়েকটা মোটা-মোটা রেখা ফুটলো। বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে আবার ফুঁ দিয়ে সে অসহিষ্ণুভাবে পা দিয়ে মেঝে ঠুকতে লাগলো। বাটলার তার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'কী, শীত করছে? রান্নাঘরে যাও না, ওখানে বেশ আরামে থাকবে।'

বাটলারের নবাবি হাবে-ভাবে মিচুচ্চোর কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগলো, তার সদুপদেশ শুনে একটুও খুশি হ'লো না। আবার ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলো। খারাপ লাগছিলো তার, ভাবনা হচ্ছিলো। একটু পরেই দরজার বেল জোরে বেজে উঠলো। চমকে উঠলো মিচুচ্চো।

'দোরিনা, মাদাম এসেছেন,' বাটলার তারস্বরে ব'লে উঠলো, তারপর তার কোটটি দু'হাতে ধ'রে গায়ে চড়াতে-চড়াতে ছুটে দরজা খুলতে গেলো। মিচুচ্চো তার পিছন-পিছন আসছিলো, সে বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি আসছো কেন? বোসো গিয়ে, আমি মাদামকে আগে খবর দিই।' পরদার পিছন থেকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'উ-উ-উঃ!' তারপর একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলো, মস্ত মোটা, চুলে কলপ। চোখ পর্যন্ত শাল মুড়ি দিয়ে আধো ঘুমের মধ্যে থপথপ ক'রে এগিয়ে এলো। মিচুচ্চো বড়ো-বড়ো চোখে তার দিকে তাকালো, সে-ও কপাল থেকে চোখ বের ক'রে অচেনা লোকটিকে দেখে নিলে।

'মাদাম এসেছেন,' মিচুচ্চো তাকে আরেকবার খবরটা জানিয়ে দিলে।

দোরিনা হঠাৎ যেন জেগে উঠে বললে, 'যাই।' শালটা পরদার পিছনে ছুঁড়ে ফেলে সে তার বিপুল দেহটিকে দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললো।

একে তো বাটলার তাকে ওখানে বসিয়ে রেখে গেলো, তার উপর সেই কলপ-মাখা বিকট মূর্তি! মিচুচ্চোর এতক্ষণের প্রতীক্ষা হঠাৎ যন্ত্রণাময় আশঙ্কায় পরিণত হ'লো। মার্থা-মাসির কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেলো—'খাবার-ঘরে! দোরিনা, খাবার-ঘরে!' একটু পরে বাটলার আর দোরিনা ঝুড়ি-ঝুড়ি মহার্ঘ ফুল হাতে নিয়ে তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো।

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ওদিককার ঘরে, দরজা দিয়ে মাথা বের ক'রে সে সেদিকে তাকালো। লম্বা ঝুলওলা কালো সান্ধ্য-কোর্তায় অনেকগুলি ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তাদের কথাবার্তা গোলমালের মতো শোনাচ্ছে। দৃষ্টি অস্পষ্ট হ'য়ে এলো তার। তার হৃদয় যত উদ্বেল, তার মন ততই বিস্ময়-বিমূঢ়—সে বুঝতেও পারে নি কখন তার চোখ জলে ভ'রে গেছে। একটি দীর্ঘ উচ্চ হাসি তার বুকের মধ্যে ব্যথার মতো এসে লাগলো—অন্ধকারে চোখ বুজে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে যেন সেই আঘাত সামলে নিলে। কার হাসি? তেরেসিনার? হা ঈশ্বর! ওখানে, ও-ঘরে ব'সে অমন ক'রে সে হাসছে কেন?

একটা চাপা চীৎকার শুনে সে চোখ খুললো। তার সামনে মার্থা-মাসি দাঁড়িয়ে। তাকে আর চেনা যায় না। মাথার টুপি সে এখনো খোলে নি, দামী মখমলের ক্লোকটির ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। এ কী হতচ্ছাড়া বুড়ির মতো চেহারা হয়েছে তার।

'মিচুচ্চো! তুমি?'

মিচুচ্চো প্রায় ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো, 'মার্থা-মাসি…'

বুড়ি যেন দিশেহারা হ'য়ে বলতে লাগলো, 'কী কাণ্ড! কখন এলে তুমি? একটা খবর তো দিতে হয়! তোমার কিছু হয় নি তো? এক্ষুনি এলে? সন্ধেবেলা? তাই তো…তাই তো '

'আমি এসেছিলাম…' কী বলবে ভেবে না-পেয়ে মিচুচ্চো আমতা-আমতা করতে লাগলো।

মার্থা-মাসি ব্যস্তভাবে বললো, 'তাই তো, মুশকিল হ'লো। একটু বোসো তুমি—দেখছো তো কত লোকজন এসেছে—আজ তেরেসিনার জয়ন্তী, জয়ন্তী উৎসব…একটু…একটু বোসো এখানে…'

মিচুচ্চো বলতে চেষ্টা করলো, 'মাসি, তুমি…তুমি যদি বলো, আমি না-হয় চ'লেই যাই।' কথাগুলো তার গলায় যেন আটকে-আটকে গেলো, দম বন্ধ হ'য়ে এলো তার।

'না, না, বোসো, বোসো একটু,' মাসি তাড়াতাড়ি বললে। ভারি ভালো মানুষ বেচারা, কিন্তু কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

মিচুচ্চো বললে, 'এখন…. এই রাত্তিরে….. কোথাও যাবার জায়গাও নেই আমার।'

দস্তানা-পরা হাতে মিচুচ্চোকে বসতে ইঙ্গিত ক'রে মার্থা-মাসি বেরিয়ে গেলো, তাকে খাবার-ঘরে ঢুকতে দেখে মিচুচ্চোর মনে হ'লো যেন একটা গহ্বরের মুখ হাঁ ক'রে তাকে গিলতে আসছে। খাবার-ঘরটি হঠাৎ চুপচাপ। তারপর সে শুনতে পেলো, স্পষ্ট শুনতে পেলো তেরেসিনার গলা, 'আমি এক্ষুনি আসছি—এক মিনিট।'

আবার দৃষ্টি অস্পষ্ট হ'লো। সে আসছে, তাকে দেখবে। কিন্তু তেরেসিনা এলো না, খাবার-ঘরের কলরব নতুন ক'রে আরম্ভ হ'লো। কয়েক মিনিট পরে—মিচুচ্চোর মনে হলো এক যুগ পরে—মার্থা-মাসি আবার এলো। এবারে তার টুপি, দস্তানা, ক্লোক, সব ছেড়ে এসেছে, অতটা দিশেহারা ভাবও আর নেই। মাসি বললে, 'এখানেই বসা যাক, কেমন? আমি বসি তোমার কাছে।…ওরা সব ডিনারে বসেছে কি না। তুমি-আমি এখানেই একটু খেয়ে নেবো.. কত কথা মনে পড়ছে তোমাকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না যে সেই তুমি আর সেই আমি আবার একসঙ্গে অনেক লোকজন এসেছে ওখানে, কিছু মনে কোরো না তুমি। বোঝো তো, ইচ্ছে থাকলেও ওর উপায় নেই।

জীবনে ওকে উন্নতি করতে হবে তো···আর উন্নতি করতে হ'লে এ-সব হবেই। কী সব এলাহি কাণ্ড—পড়ো নি কাগজে? হৈ-চৈ লেগেই আছে। বুড়ো হাড়ে কি এত সয়। কিন্তু আমি আর ক'দিন! কী যে ভালো লাগছে তোমাকে দেখে···বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বুড়ির কানে-কানে কে যেন ব'লে দিয়েছিলো, অনর্গল ব'কে যাও, মিচুচ্চোকে ভাবতে সময় দিয়ো না। একটানা অনেকক্ষণ বকবক ক'রে মাসি স্নেহভরা দৃষ্টিতে মিচুচ্চোর দিকে তাকিয়ে হাতে হাত ঘ'ষে একটুখানি হাসলো।

দোরিনা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে খাবার-টেবিল সাজাতে এলো—তার এক মুহূর্ত সময় নেই, খাবার-ঘরে ডিনার আরম্ভ হ'য়ে গেছে কিনা।

মুখ অন্ধকার ক'রে বেদনাদীর্ণ গলায় মিচুচ্চো বললে, 'মাসি, সে কি আসবে না? একবার তার দেখা পাবো তো?'

একটু চেষ্টা ক'রে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে মাসি বললে, 'বাঃ, তা আসবে না! একটু একা হ'তে পারলেই আসবে—আমাকে তাই বললে তো।'

এতক্ষণে যেন পরস্পরকে তারা চিনতে পারলো। সেই চেনার আলো জ্ব'লে উঠলো তাদের হাসিতে, সেই হাসিতে ভর ক'রে সব আড়ষ্টতা, সব আবেগের আন্দোলন পার হ'য়ে তাদের মন-প্রাণ পরস্পরকে স্পর্শ করলো। মিচুচ্চো তার চোখ দিয়ে বললে, 'তুমি সেই মার্থা-মাসি তো?' আর মাসির চোখ বললে, 'আহা, এই তো আমার সেই মিচুচ্চো!' কিন্তু মাসি তার চোখ তক্ষুনি নামিয়ে নিলে, পাছে মিচুচ্চো সেখানে আরো কিছু পড়ে। হাতে হাত ঘ'ষে বললে, 'খাবে নাকি এখন?' আশ্বাসের, সুখের স্বরে মিচুচ্চো বললে, 'খাবো না! খিদে পেয়েছে যে!'

'আগে গ্রেস বলো। এখানে, তোমার সামনে ব'সে আমারও বলতে লজ্জা নেই।' মাসি দুষ্টু-দুষ্টু চোখে তাকিয়ে বুকের উপর ক্রুশের চিহ্ন করতে-করতে চোখ টিপলো।

বাটলার এলো প্রথম কোর্স নিয়ে। মিচুচ্চো তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলো, মাসি কেমন ক'রে খাবারটা তুলে নেয়। কিন্তু নিজে নিতে গিয়ে মনে পড়লো যে অতটা পথ ট্রেনে আসার পর তার হাত এখনো নোংরা। লজ্জায় লাল হ'য়ে বাটলারের দিকে চোখ তুললো, বাটলার—তার ভঙ্গি এখন বিনয়-বিগলিত—মাথা নিচু ক'রে একটু হাসলো, ভাবখানা এই রকম, 'আজ্ঞে যা ইচ্ছে তুলে নিন।' ভাগ্যিস মাসি তাকে উদ্ধার করলে, নয়তো কী উপায়

হ'তো! মিচুচ্চো, আমি তোমাকে দিচ্ছি।' কৃতজ্ঞতায় তার মনে হ'লো মাসিকে চুমু খায়।

তার পাতে যেই খাবার দেয়া হ'লো আর বাটলারও বেরিয়ে গেলো, সে তক্ষুনি খুব তাড়াতাড়িতে একবার ক্রুশচিহ্ন ক'রে নিলে। মাসি খুশি হ'য়ে বললে, 'লক্ষ্মী ছেলে!'

এবারে সে সহজ হ'লো, মনটা ভারি ভালো লাগলো তার। বাটলারের কথা, নিজের নোংরা হাতের কথা আর-একবারও না ভেবে সে এমন ভাবে খেতে আরম্ভ করলো যেন জীবনে এর আগে সে কখনো খাবার ত্থাখে নি। তবু, যখনি বাটলার এ-ঘর ও-ঘর আসা-যাওয়া করতে-করতে কাচের দরজাটি খুলেছে, যখনি ও-ঘর থেকে হাসি আর কথার উচ্ছ্বসিত অস্পষ্ট ঢেউ তার কানে এসে লেগেছে, তখনি সংশয়-ভরা দৃষ্টিতে মাসির সস্নেহ চোখের দিকে সে তাকিয়েছে—ওখানে কি লেখা আছে তার প্রশ্নের উত্তর? না, তা তো নেই, বরং মাসির চোখে সে যেন এ-কথাই পড়েছে, 'লক্ষ্মী ছেলে, এখন কিছু জিগেস কোরো না—বোঝাপড়া পরে হবে।' তারপর দু'জনেই একটু হেসে আবার খেতে আরম্ভ করেছে। কত কথা তাদের! দেশের কথা, দেশের লোকদের কথা মাসি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কত যে জিগেস করতে লাগলো তার আর অন্ত নেই।

'একটা ড্রিঙ্ক নাও, মিচুচ্চো।'

মিচুচ্চো বোতলটার দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু সেই মুহূর্তে খাবার-ঘরের দরজা আবার খুলে গেলো: খশখশে রেশমি আওয়াজ, দ্রুত পদশব্দ, একটু আন্দোলন, একটু বিদ্যুৎ-চমক, ছোট্ট ঘরটি যেন হঠাৎ আলো হ'য়ে উঠে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে।

'তেরেসিনা…'

চরম বিস্ময়ে তার মুখের কথা ঠোঁটের উপর মিলিয়ে গেলো। এ কী? এ কি স্বপ্ন!

যেন একটা মূর্ছার মধ্যে সে তাকিয়ে রইলো হাঁ ক'রে। তার মুখ জ্বালা করছে, তার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। এ কি সেই? এই তেরেসিনা…এই রকম? তার বুক নগ্ন, তার কাঁধ নগ্ন, তার হাত নগ্ন…চিক চিক করছে শাটিন, ঝলমল করছে হীরে। এ কি সত্যিকার মানুষ, এ কি সত্যি?…কী বলছে সে? এই স্বপ্নের কিছুই তার চেনা নয়, না চোখ, না

হাসি, না কণ্ঠস্বর। 'কেমন আছো, মিচুচ্চো? তোমার না অসুখ করেছিলো —এখন বেশ সেরে উঠেছো তো? বেশ, বেশ।···আচ্ছা, আবার দেখা হবে। এই তো মা রইলেন তোমার কাছে। ঠিক আছে?' বলতে-বলতে তেরেসিনা ছুটে আবার খাবার-ঘরে চ'লে গেলো।

মার্থা-মাসি মিচুচ্চোকে তার বিমূঢ়তা থেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলো।— 'মিচুচ্চো, আর খাচ্ছো না যে?'

মিচুচ্চো তার দিকে ফিরেও তাকালো না।

মাসি থালার দিকে দেখিয়ে জোর করলে, 'খাও।'

মিচুচ্চো তার নোংরা কুঁচকোনো কলারের মধ্যে দু'আঙুল চালিয়ে দিয়ে গভীর নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করলে।···'খাবো?' তার থুতনির কাছে আঙুল নিয়ে কয়েকবার নাড়লো, যেন বলতে চায়, 'আর না—সত্যি আর খেতে পারবো না।' স্তব্ধ হ'য়ে সে ব'সে রইলো, চূর্ণ, ছিন্ন, কয়েক মিনিট আগেকার দেখা স্বপ্নে মগ্ন। তারপর অস্ফুটে বললে, 'কী হয়েছে ও? কী? কী হয়েছে?···'

তার চোখে পড়লো যে মার্থা-মাসি অত্যন্ত হতাশভাবে মাথা নাড়ছে, সে-ও আর খাচ্ছে না, অপেক্ষা করছে যেন।

'আর তো হবে না না অসম্ভব,' চোখ বুজে প্রায় নিজের মনে-মনে মিচুচ্চো আবার বললে।

বোজা চোখের অন্ধকারে সে দেখতে পেলো তার আর তেরেসিনার মাঝখানে অতল গহ্বর। না, না, এ তো সে নয়, তার তেরেসিনা তো এ নয়। সব চুকে গেছে—অনেক, অনেকদিন আগেই।

অনেক, অনেকদিন আগে—আর সে কিনা বুঝতে পারলো এইমাত্র। বাড়ির লোক তাকে এ-কথাই তো বলেছে, সে কিছুতেই বিশ্বাস করে নি। বোকা! বোকা!···আর এখন—এখনই বা এই বাড়িতে নির্বোধের মতো সে ব'সে আছে কেন? যদি ও-সব ভদ্রলোকেরা জানতেন, যদি বাটলারও জানতো যে সে মিচুচ্চো বোনাভিনো, দেহের প্রতিটি স্নায়ু ক্ষয় ক'রে ছত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে চ'ড়ে অত দূর থেকে এখানে এসেছে, এসেছে এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে এখনো সে তার সেই স্বপ্নরূপিণীর ভাবী স্বামী, তাহ'লে ঐ ভদ্রলোকেরা, ঐ বাটলারটা, ঐ বাবুর্চি, বয়, দোরিনা—এদের সকলেরই মুখে হো-হো-হো-হো হাসি কি সহজে থামতো! কী হাসি, কী হাসির উল্লাস, যদি তেরেসিনা

তাকে ধ'রে নিয়ে যেতো ঐ খাবার-ঘরে, ভদ্রলোকদের সামনে, নিয়ে গিয়ে বলতো, 'দেখুন আপনারা, এই গোবেচারা ছোট্ট মানুষটি, এই বাঁশিওলা —সে আমাকে বিয়ে করতে চায়!' সত্য, তেরেসিনা নিজেই কথা দিয়েছিলো, কিন্তু তখন তো ভাবাও যায় নি যে সে-মেয়ে একদিন এ-ই হবে! এ-কথাও সত্য যে তেরেসিনার এই জীবন মিচুচ্চোর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে, এখানে পৌছবার পাথেয় সে-ই জুগিয়েছিলো—কিন্তু তেরেসিনা কত দূরে, কত দূরে চ'লে এসেছে, আর সে প'ড়ে আছে সেখানেই, ঠিক সেই আগের মতোই, রবিবারে পার্কে ব'সে এখনো সে বাঁশি বাজায়। আর কি তার কাছে পৌছবার তার উপায় আছে? না, সে-কথাই আর ওঠে না। আর এই-যে তেরেসিনা আজ একজন জমকালো ভদ্রমহিলা হয়েছে, তার কাছে তার সেই সামান্য টাকা ক'টা কী? কেউ মনে করে নি তো সেই নগণ্য টাকা ক'টার বিনিময়ে আজ সে কোনো দাবি জানাতে এসেছে? ছি-ছি, কী লজ্জা! কী লজ্জা! তার মনে পড়লো তার অসুখের সময় তেরেসিনা যে-টাকা পাঠিয়েছিলো সেটা তার পকেটেই আছে। লাল হ'য়ে উঠলো তার মুখ, লজ্জায় সে যেন ম'রে যাবে। উঁচু-হ'য়ে-ওঠা বুক-পকেটে এক হাত ঢুকিয়ে সে বললে, 'মাসি, সেই যে তুমি আমাকে টাকা পাঠিয়েছিলে, সেটা ফেরত দিতেও এসেছিলাম আমি। কেন পাঠিয়েছিলে বলো তো? প্রতিদান? ঋণশোধ? তেরেসিনা তো এখন ··এখন তো সে একজন "তারা",···আমার মনে হয় · না, কিছু না, অসম্ভব। কিন্তু এই টাকাটা—এই টাকাটা কেন—কোন অপরাধে আমার এই শাস্তি? ও-সব চুকে গেছে, ও-বিষয়ে আর-একটিও কথা না ·· কিন্তু এই টাকাটা তুমি রেখে দাও, মাসি—সব নেই, কিছু কম আছে, এই আমার যা দুঃখ!'

'কী বলছো তুমি, বাছা?' জল-ভরা চোখে মার্থা-মাসি তার কথায় বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে ব'লে মিচুচ্চো বলতে লাগলো, 'ওটা আমি খরচ করি নি, মাসি। আমার অসুখের মধ্যে আমার আত্মীয়েরা···আমি কিছুই জানতুম না। কিছু কমই রইলো, আমিও তো ওর পিছনে অল্প-স্বল্প কিছু খরচ করেছিলাম।·· ঠিক আছে তাহ'লে? ·· টাকাটা নাও, মাসি, আমি চললাম।'

'সে কী! এক্ষুনি!' মাসি তাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। 'একটু বোসো—তেরেসিনার সঙ্গে কথা ব'লে যাও। তোমার সঙ্গে আবার

দেখা করবার তার কত ইচ্ছে, বুঝলে না? বোসো তুমি, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

মিচুচ্চো দৃঢ়ভাবে জবাব দিলে, 'না, কী হবে আর। ওখানে ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আছে, ওখানেই থাক, ওখানেই মানায় ওকে। আমি হতভাগা··· যাক, ওকে চোখে দেখেছি, সেটুকুই আমার যথেষ্ট,·· বেশ, বেশ, যেতে চাও তো তুমিও যাও; মাসি, তুমিও যাও ওখানে, ব'সে-ব'সে তাদের হাসি শোনো গে। আমি ওদের হাসিঠাট্টার উপলক্ষ হ'তে চাই না—আমি চললুম।'

মিচুচ্চোর এই আকস্মিক দৃঢ়সংকল্পের সবচেয়ে খারাপ অর্থটাই মাসির মনে উদয় হ'লো। মাসি ভাবলে যে মিচুচ্চোর এটা ঈর্ষার ভঙ্গি, ঘৃণার ব্যঞ্জনা। সম্প্রতি তার মনে হচ্ছিলো যে তার মেয়েকে দেখে যে-কোনো লোক তক্ষুনি ভাববে···যা ভাববে তা মুখে আনা যায় না। এই জন্যই মাসির চোখের জল আজকাল আর শুকোয় না—এত ঐশ্বর্য, এত সমারোহের ভিতরে তার দুঃখের বোঝা অবিশ্রান্ত বহন ক'রে চলেছে সে। ঐশ্বর্য! জঘন্য এই ঐশ্বর্য—এতে তার বার্ধক্য অভদ্র, অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠলো!

মাসি ব'লে ফেললো, 'মেয়েকে আমি তো আর সামলাতে পারি না,

'কেন পারো না?' জিগেস ক'রেই মিচুচ্চো মাসির চোখে প্রশ্নের উত্তর দেখতে পেলো। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্তও এ-সন্দেহ তার মনে আসে নি। মুখ কালো হ'লো তার। ও, তাই!

মাসি যেন আরও ছোট্ট হ'য়ে, আরও বুড়ো হ'য়ে নিজের দুঃখের অতলে তলিয়ে গেলো। দু'হাতে সে মুখ ঢেকে আছে, আঙুলগুলো থরথর ক'রে কাঁপছে, চোখের জল কিছুতেই আর সামলাতে পারছে না।

কাঁদতে-কাঁদতে মাসি বললে, 'তা-ই ভালো বাছা, তা-ই ভালো। তুমি চ'লে যাও। ঠিক বলেছো তুমি, ও আর তোমার নয়। তখন যদি আমার কথা শুনতে তাহ'লে আর···'

'তখন!'

মিচুচ্চো নিচু হ'য়ে মাসির মুখ থেকে জোর ক'রে একখানা হাত সরিয়ে নিলে! কিন্তু সে-মুখে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা—ঠোঁটের উপর একটি আঙুল রেখে, এমন করুণ অসহায় চোখে মাসি তার দিকে তাকিয়ে, যেন তার

দয়া-ভিক্ষা করলো যে মিচুচ্চো নিজেকে সংযত ক'রে কঠিন চেষ্টায় কণ্ঠস্বর নরম করলো, অন্যরকম স্বরে বললে, 'মাসি, আমি যেমন অপদার্থ, তুমি··· তুমিও তাহ'লে তেমনি? কিন্তু যাক গে ও-সব, আমি এখন চলি···এখন তো আরো বেশি আমার চ'লে যাওয়ার দরকার। ···মাসি, আমি একটা মূর্খ, কিছুই বুঝি নি। কেঁদো না, মাসি, কেঁদে কী হবে। টাকা···লোকে ঠিকই বলে টাকা···'

ছোট্ট অ্যাট্যাশে কেস আর ব্যাগটি টেবিলের তলা থেকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় তার মনে পড়লো যে ব্যাগের মধ্যে ভ'রে কয়েকটা কমলালেবু তেরেসিনার জন্য সে দেশ থেকে এনেছিলো।

'শোনো, মাসি—'

ব্যাগের মুখ খুলে সুগন্ধি টাটকা ফলগুলি সে টেবিলের উপর ঢাললো। 'ওখানে যারা এসেছে তাদের মুখের উপর এই ফলগুলি যদি ছুঁড়ে মারি তাহ'লে কেমন হয়?'

'পাগল নাকি!' মাসি ফোঁশ-ফোঁশ করতে-করতে আরেকবার তাকে শান্ত হ'তে বললো।

তিক্ত হেসে মিচুচ্চো শূন্য ব্যাগটি তার পকেটে ভ'রে রাখলো।—'বেশ, ছুঁড়বো না। এগুলি ওর জন্যেই এনেছিলাম, এখন তোমাকেই সব দিয়ে যাচ্ছি, মাসি।' একটা লেবু তুলে নিয়ে মাসির নাকের কাছে ধরলো। 'কেমন গন্ধ, মাসি! আমাদের দেশের মিষ্টি গন্ধটুকু পাচ্ছো কি? এর জন্যে আমাকে আবার কাস্টম্স্-এর ট্যাকশোও দিতে হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! আর না! মনে রেখো, এ শুধু তোমাকেই দিয়ে গেলাম। আর ওকে, ওকে আমার শুভকামনা জানিয়ো।'

অ্যাট্যাশে কেসটি তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু সিঁড়িতে এসেই দারুণ একটা ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। দেশ থেকে অনেক দূরে, মস্ত শহরে সে একা, সে পরিত্যক্ত—এদিকে রাত গভীর হ'য়ে আসছে। মোহ ছুটেছে তার, মান লুটিয়েছে ধুলোয়, সে পদচ্যুত, সে অবজ্ঞাত। বাইরের দরজার কাছে এসে দেখলো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে, অচেনা রাস্তায় পা বাড়াবার সাহস তার হ'লো না। পা টিপে-টিপে ফিরে এলো, এক প্রস্থ সিঁড়ি উঠে এসে উপরের ধাপে ব'সে হাঁটুতে কনুই আর হাতে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

ডিনার হ'য়ে যাবার পর, সিনা মার্নিস আবার সেই ছোট্ট ঘরটিতে এলো। দেখলো তার মা একা ব'সে-ব'সে কাঁদছে, এদিকে ওরা সবাই হাসি-গল্পে-ঠাট্টায় মশগুল। অবাক হ'য়ে বললে, 'ও কোথায়? চ'লে গেছে?' মাসি মেয়ের দিকে না-তাকিয়ে শুধু একটু মাথা নাড়লো। সিনা শূন্যের দিকে তাকিয়ে গভীর একটি নিশ্বাস ছেড়ে অস্ফুটে বললে, 'বেচারা! বেচারা!' .....

কিন্তু একটু পরেই তার মুখের ভাব বদলে গেলো।

চোখের জল লুকোবার কোনো চেষ্টা না-ক'রে মাসি বললে, 'এই ছাখ, এগুলো সে তোর জন্য এনেছিলো।'

সিনা লাফিয়ে উঠে বললে, 'ট্যাঞ্জারিন লেবু! সিসিলির ট্যাঞ্জারিন! কী সুন্দর!' দু' হাত ভ'রে যে-কটা সম্ভব চটপট সে তুলে নিলো।

মাসি আর্দ্র স্বরে বললে, 'এগুলো ওখানে নিসনে, ওখানে নিসনে।' কিন্তু সিনা একটুখানি কাঁধ-ঝেঁকে ছুটে খাবার-ঘরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'কমলা লেবু! ট্যাঞ্জারিন লেবু! সিসিলির ট্যাঞ্জারিন!'

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু



টি লোক আর একজন তরুণী

ম্যাকসিম গোর্কি

ছিলাম ছাব্বিশজন : মাটির নিচে একটা বদ্ধ, স্যাঁৎস্যাঁতে, কালো গর্তের মতো কুঠুরিতে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি আমরা ময়দা মাখি সেখানে, আর মুচমুচে বিস্কুট বা নরম রুটি তৈরি করি। কুঠুরির জানলার ঠিক সামনে ইটের পাঁজায় ভরা ঢালু একটুকরো জমি, জোলো বাতাসে আর শ্যাওলায় সবুজ হ'য়ে আছে। জানলার বাইরের দিকে ঘন ঝাঁঝরিলোহার বেড়া বসানো; শার্শিগুলো ময়দার গুঁড়োয় এমন হ'য়ে আছে যে সূর্যের আলো কিছুতেই ঢুকতে পায় না ভিতরে। যাতে কোনো ভিখিরি অথবা ক্ষুধার্ত কোনো বেকার বন্ধুকে একটুকরো রুটিও আমরা দিতে না-পারি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের মনিব জানলাগুলোয় বেড়া বসিয়ে দিয়েছেন। পাজি, হতভাগা, জোচ্চোরের দল, এইসব ব'লেই তিনি সম্ভাষণ করেন আমাদের, দুপুরে খেতে দেন মাংসের বদলে আধপচা কিছু নাড়িভুঁড়ি। দমবন্ধ-করা সেই পাথরের গর্তের মধ্যে কিছুতেই কুলোয় না আমাদের—ঠাশা-ঠাশি ক'রে থাকতে হয়। নিচু ছাদ ঘরটার, ঝুল আর মাকড়শার জালে ভর্তি। ভ্যাপশা, পুরু, নোংরা-পড়া দেয়ালের আড়ালে আমাদের জীবন কাটে দমবন্ধ, অসুস্থ ও বিষণ্ন—আনন্দের কোনো চিহ্নই নেই সেখানে।

ভোর পাঁচটায় আমাদের উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে, ভালো ক'রে ঘুমোতে পারি না ব'লে কেমন যেন অবসন্ন ব'লে মনে হয় নিজেদের ; আর ছ'টা বাজতে-না-বাজতে আমরা টেবিলের চারদিকে ব'সে গিয়েছি, অনিচ্ছুক, ভোঁতা, নিস্তেজ ভাবে তৈরি করতে আরম্ভ করেছি রুটি আর বিস্কুট। আমরা যখন ঘুমোই তখন আমাদেরই ক'জন সঙ্গী ময়দার গোলা তৈরি ক'রে রাখে। সকাল থেকে রাত্তির দশটা পর্যন্ত আমাদের কেউ-না-কেউ সেই ময়দার তাল ঘুঁটতে থাকে, শরীরে সাড় রাখবার জন্যে দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, আর অন্যেরা ময়দায় জল মেশায়, রুটি বেলে। বিস্কুট যেখানে সঁ্যাকা হয় সারাদিন সেখানে কেটলির ভিতর গরম জল উথলোয় আর কাতর ও বিষণ্ণ এক গুঞ্জন তোলে ; পিছল ময়দার পিণ্ডগুলো কেটলি থেকে তুলে এনে সঁ্যাকাওলা গনগনে ইটের উপর ছুঁড়ে দেয়, উনুনের গায়ে তার বেলচার আঘাতে হিংস্র কর্কশ আওয়াজ বেরোতে থাকে। উনুনটার একমুখে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাঠের গুঁড়ি জ্বলতে থাকে। দেয়ালগুলোর উপর নেচে-নেচে বেড়ায় লালচে আলো, যেন নিঃশব্দে বিদ্রূপ করছে আমাদের। মস্ত উনুনটাকে মনে হয় গল্পে-পড়া কুৎসিত একটা অতিকায় দৈত্যের মাথা, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, তার হাঁ-করা চোয়ালের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গনগনে অগ্নিকুণ্ড, তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমাদের সর্বাঙ্গে এসে লাগছে। তার ব'সে-যাওয়া কপালের উপর বাতাস ঢোকবার দু'টো ফুটো, সেই ফুটোয় চোখ দিয়ে সারাদিন সে আমাদের বিশ্রামহীন কাজকর্ম তাকিয়ে-তাকিয়ে ছাখে। ঠিক চোখের মতো দেখতে ফুটো দু'টো—নির্দয়, নৈর্ব্যক্তিক এক দানবের চক্ষু। ভুরু কুঁচকে, অন্ধকার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে তারা ; যেন এইসব ক্রীতদাস, যাদের কাছে একফোঁটাও মনুষ্যত্ব আশা করা যায় না, তাদের দেখে-দেখে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে তারা, আর তাই জ্ঞানবৃদ্ধের মতো ঘৃণাভরা অবহেলার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

মাটির তলায় সেই দুর্গন্ধ, গরম, দম-আটকে-আসা ঘরে, ময়দার গুঁড়ো আর আমাদের পায়ে-পায়ে উঠোন থেকে আসা কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে দিনের-পর-দিন ময়দা ডলি আমরা, রুটি তৈরি করবার সময় গায়ের ঘাম দিয়েই ভিজিয়ে নিই সেটাকে। কাজটাকে আমরা চূড়ান্ত রকম ঘৃণা করি, যা তৈরি করি তা কখনোই খাইনে ; আমাদের তৈরি রুটির চেয়ে পোড়া কালো রুটিই আমরা বেশি পছন্দ করি। লম্বা একটা টেবিলে বসি আমরা—ন'জন ক'রে এক-একদিকে—দীর্ঘ প্রহরগুলোর ভিতর দিয়ে আমাদের আঙুলগুলো যান্ত্রিকভাবে

কাজ ক'রে যায়। কাজটাতে আমরা এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে সেদিকে এখন আর কোনো মনোযোগই দিতে হয় না। পরস্পরকে আমরা এত ভালো ক'রে চিনি যে যে-কোনো মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমাদের পরিচিত। একে অন্যের প্রতি কটু ঠাট্টা করা ছাড়া কোনো কথাও বলিনে আমরা; আলোচনা করবার মতো কোনো বিষয়ও নেই আমাদের। কিন্তু ঠাট্টা করবার মতোও কিছু সর্বদা খুঁজে পাওয়া শক্ত, বিশেষত ঠাট্টার পাত্রটি যদি বন্ধু হয়। একে অন্যের খুঁতও আমরা ধরতুম না বিশেষ; আর যেখানে সকলেই প্রায় অর্ধমৃত, এমনকি পাষাণে পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়েছে, তখন ঠাট্টা করবার মতো কোনো দোষই-বা খুঁজে পাওয়া যায় কী ক'রে? যন্ত্রণার সুবিপুল ভার আমাদের সমস্ত সংবেদনাকে শুষে নিয়ে গেছে। যার সব কথা বলা হ'য়ে গেছে, নৈঃশব্দ্য তার কাছে ভয়াবহ, দুর্বিষহ; কিন্তু অনেক কথা বলার আছে যার, তার কাছে তা সহজ এবং স্বাভাবিক।

কখনো-কখনো আমরা গানও করতাম। এই ভাবে আমাদের গান শুরু হ'তো: কাজ করতে-করতে কেউ হয়তো নিশ্বাস ফেললো, বহুদূর ছুটে-আসা ক্লান্ত ঘোড়ার মতো; তারপর নিচু গলায় গাইতে আরম্ভ করলো সেই রকম একটি গান, যার বিলম্বিত লয়, বিষণ্ণ সুর সব সময় গায়কের মনের বোঝা হালকা ক'রে দেয়। একজন গান গেয়ে যায়, আর আমরা সবাই চুপ ক'রে তার ভাঙা গলার একলা গান শুনি। সেই ঘরের চেপে-ধরা ছাদের তলায় আস্তে-আস্তে তার গানের রেশ মিলিয়ে যায়, প্রথম শীতের স্যাঁৎস্যাঁতে রাত্রিতে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জ্বালানো ছোট্ট একটু আগুনের মতো, আর ধূসর আকাশ শিসের পাতের মতো পৃথিবীর উপর ঝুলে থাকে। তারপর আরেকজন প্রথম-জনের সঙ্গে গলা মেলায়, আর দু'টি বিষণ্ণ স্বর আমাদের সরু, নোংরা গর্তের মতো ঘরের মধ্যে ভেসে-ভেসে বেড়াতে থাকে। আর হঠাৎ কয়েকটি গলা একসঙ্গে যোগদান করে, ঢেউয়ের মতো উঁচু জোরালো হ'য়ে ওঠে গান, মনে হয় এই স্যাঁৎস্যাঁতে, ভারি পাথরের মতো দেয়াল ভেঙে বাইরে বেরিয়ে যাবে।

তারপর একসঙ্গে গান ধরে ছাব্বিশজন। বহুদিনের অভ্যাসে পরস্পরের সঙ্গে সুরে মেলানো উঁচু গলা সারা কারখানা ভ'রে তোলে, ছড়িয়ে যায় বাইরে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ধাক্কা মারে পাথরের দেয়ালে। হৃদয় ভ'রে গুপ্ত ও তীক্ষ্ণ বেদনায়, পুরোনো ক্ষতে আঘাত করে, আত্মায় নিহিত কোনো গোপন ব্যথাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে। ভারি, গভীর নিশ্বাস ফ্যালে

সবাই; সহসা একজন চুপ ক'রে যায়, অনেকক্ষণ ধ'রে সঙ্গীদের গান শোনে তারপর সকলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে তার গলা মিশে যায় আবার। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে একজন হয়তো চেঁচিয়ে ওঠে: 'ওঃ!' চোখ বন্ধ ক'রে সে ছাখে, গভীর, উত্তাল, তরঙ্গিত শব্দের চওড়া পথ তার সামনে বহুদূর চ'লে গেছে—প্রশস্ত, দূরগামী, সূর্যজ্বলা সেই পথের যাত্রী সে নিজে।

কিন্তু মস্ত উনুনটা থেকে লকলক করে আগুনের শিখা, স্যাঁকাওলা বেলচা দিয়ে কর্কশ শব্দ করে বিরামহীন, কেটলির মধ্যে গরম জল শোঁ-শোঁ আওয়াজ করে, আর আগুনের শিখা আগের মতোই দেয়ালের উপর নাচতে থাকে কোনো মৌন, অস্ফুট ঠাট্টার মতো। ধার-ক'রে-আনা কথা বুনে-বুনে আমরা নিষ্কাশিত করি আমাদের বোবা দুঃখকে, জীবন্ত মানুষ হ'য়ে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হবার গ্লানিকে, ক্রীতদাস হ'য়ে থাকার দুঃখকে। আর এই ভাবেই থাকি আমরা ছাব্বিশজন লোক, বিশাল একটা পাথরের বাড়ির মাটির নিচের ঘরে, এত কঠোর আর গ্লানিময় জীবন আমাদের যে মনে হয় এই বিশাল তেতলা বাড়িটার সম্পূর্ণ ভার যেন আমরা আমাদের কাঁধের উপর বহন করছি।

কিন্তু গান ছাড়া আরো-একটি জিনিশ ছিলো, যা আমরা ভালো বাসতুম, আগলে রাখতুম, এমনকি যা হয়তো আমাদের সূর্যালোকের স্থান পূরণ করতো।

এই বাড়িটার তেতলায় একটা সোনালি জরির কারখানা ছিলো। সেখানে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতো তানিয়া, বছর ষোলো বয়সের ছোট্ট একটি মেয়ে। চাকরানির কাজ করে। রোজ সকালে কাচের পাল্লার ফাঁকে উঁকি দিতো চঞ্চল নীল চোখ বসানো ছোটো একটি গোলাপি মুখ; একটি মিষ্টি রিনরিনে গলা আমাদের ডেকে বলতো:

'এই জেলঘুঘুরা! কয়েকটা রুটি দাও না আমাকে!'

আমরা সবাই সেই পরিষ্কার, সুরেলা আওয়াজের দিকে চোখ ফেরাতুম, আমাদের দিকে চেয়ে-থাকা সেই হাসি-হাসি মেয়েলি মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতুম সরল আনন্দে। জানলার কাচে চেপে-ধরা সেই নাক, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা হাসিতে বিচ্ছুরিত সেই দাঁতের সারি আমাদের নিত্যকার আনন্দের বিষয় হ'য়ে উঠেছিলো। একে অন্যকে পার হ'য়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতুম, আর কোমরে বাঁধা ঝাড়ন

একহাতে তুলে ধ'রে, মাথাটি একদিকে হেলিয়ে, ঠোঁটদু'টিতে মৃদু একটি হাসি ফুটিয়ে, তার উজ্জ্বল মূর্তি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতো। তার ঘন, লম্বা, লালচে-বাদামি রঙের চুল কাঁধের উপর দিয়ে এসে বুকের উপর ছড়িয়ে পড়তো। আর আমরা, নোংরা, কুৎসিত, আমরা উপর দিকে মুখ ক'রে—কারণ ঘর থেকে চারটে সিঁড়ি উঠে তবে দরজার চৌকাঠ—উপর দিকে মুখ ক'রে আমরা তার দিকে চেয়ে থাকতুম, আর অদ্ভুত, অনভ্যস্ত ভাষায় সম্ভাষণ করতুম তাকে—যে-ভাষা কেবলমাত্র তার সঙ্গে কথা বলবার সময়ই আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি। ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের গলা নিচু পর্দায় নেমে আসতো, ঠাট্টাগুলো শালীন ধরনের হ'য়ে যেতো। তার জন্যে আমরা যা-কিছু করতুম সমস্তই একটু বিশেষ ধরনের। এক বেলচা সবচেয়ে ভালো, খয়েরি রঙের রুটি উনুন থেকে তুলে এনে সাবধানে তানিয়ার কোঁচড়ে ঢেলে দেয়া হ'তো। 'দেখিস যেন মনিবের হাতে ধরা প'ড়ে যাসনে আবার!' আমরা সাবধান ক'রে দিতুম তাকে। দুষ্টুর মতো হেসে সে কলকল ক'রে চেঁচিয়ে উঠে বলতো—'চলি গো, জেলঘুঘুরা!' তারপর ইঁদুরের মতো দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে যেতো।

ওই পর্যন্তই। কিন্তু সে চ'লে যাবার পরও বহুক্ষণ ধ'রে আমরা তার সম্বন্ধে কথা বলতুম। গতকাল বা তার আগের দিন যে-কথা বলেছি সেই কথাই আজকেও বলতুম আমরা; কারণ সে, এবং আমরা, এবং আমাদের চারপাশে যা-কিছু সবই পুরোনো, সবই গতকাল এবং তার আগের দিনের মতো—রোজকার মতো। একজন জীবিত মানুষের চারপাশে যখন কিছুই বদলায় না, তার চেয়ে অসহনীয় আর-কিছু নেই, তার তা যদি তার আত্মাকে হত্যা করতে না-পারে, তাহ'লে যত দিন যায়, তত তার চারপাশের পরিবর্তনহীনতা তার জীবনকে আরো অসহনীয় ক'রে তোলে। আমরা মেয়েদের সম্পর্কে এমন ভাবে কথা বলতাম যে, সেই অভদ্র, নির্লজ্জ আলোচনা শুনতে-শুনতে কখনো কখনো নিজেদের উপরই ঘেন্না ধ'রে যেতো আমাদের। তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়, কারণ যে-সব স্ত্রীলোককে আমরা জানতুম এর চেয়ে ভালো কিছু দাবি করার যোগ্যতা তাদের ছিলো না। কিন্তু তানিয়া সম্পর্কে আমরা কখনো খারাপ কথা বলতাম না। আমরা কেউ তার গায়ে হাত দিতে সাহস করি নি কখনো, তার সামনে আমরা কোনো হালকা রসিকতা পর্যন্ত করতাম না। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, সে কখনোই বেশিক্ষণ থাকতো না—আমাদের মুগ্ধ চোখের সামনে সহসা আবির্ভূত হ'য়েই আকাশ-থেকে-খ'শে-

পড়া তারার মতো মিলিয়ে যেতো। অথবা সে দেখতে ভারি ছোটো আর সুন্দর ব'লেই হয়তো এটা হ'তে পারে। যা-কিছু সুন্দর তা অমার্জিত মানুষের মধ্যেও তার প্রতি সম্মান জাগিয়ে তোলে, আর তার উপর, যদিও কঠোর পরিশ্রমে পিষ্ট হ'তে-হ'তে আমরা বলদের মতো ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছিলাম, তবু মানুষই তো ছিলাম আমরা; আর তাই, যে-কোনো মানুষের মতোই, আমরাও শ্রদ্ধা করবার মতো কিছু না-পেলে বাঁচতে পারতাম না। তানিয়ার চেয়ে ভালো আর-কিছুই ছিলো না আমাদের সামনে। বাড়িটাতে অনেক লোক থাকতো, কিন্তু মাটির নিচের ঘরে প'ড়ে থাকা এই মানুষগুলির দিকে নজর দিতো না কেউই। আর তাছাড়া সবচেয়ে যা বড়ো কথা—তাকে আমরা ভাবতুম আমাদের নিজস্ব কিছু, আমাদের তৈরি রুটির বদলে প্রাপ্য একমাত্র মূল্য। আমরা পালা ক'রে রোজ একজন গরম রুটি দিতাম তাকে; এটা হ'য়ে উঠেছিলো আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রের প্রতি আমাদের একমাত্র উৎসর্গ, যেন একটি পবিত্র দায়িত্ব, আর এর সাহায্যে রোজ একটু-একটু ক'রে আমরা তার আরো কাছে এগিয়ে যেতাম। রুটি ছাড়াও আমরা তাকে প্রচুর উপদেশ দিতুম—যেন সে গরম জামাকাপড় পরে, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে না ওঠে যেন, জ্বালানি কাঠের ভারি ভারি বোঝাগুলো যেন ব'য়ে নিয়ে না-যায়। হাসি-হাসি মুখ ক'রে আমাদের কথা শুনতো সে, হাসি দিয়েই উত্তর দিতো, কিন্তু কখনোই কথা শুনতো না। আমরা তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতাম না; আমাদের স্নেহ প্রীতি তার উপর অর্পণ ক'রেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম।

প্রায়ই সে আমাদের তার জন্যে কিছু-না-কিছু ক'রে দিতে বলতো। ধরো, সে বললে ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা খুলে দিতে, অথবা কাঠ চেরাই ক'রে দিতে। এই সব, এবং আর যা-কিছু সে বলতো আমরা একটা অদ্ভুত গর্ব এবং আনন্দের সঙ্গে ক'রে দিতাম।

কিন্তু আমাদের একজন যখন একবার তার একমাত্র শার্টটি রিপু ক'রে দিতে বললো তাকে, সে একটু বাঁকা হাসি হেসে বললো: 'আচ্ছা? তাই নাকি? আর কী করতে হবে, শুনি?'

সেই বোকাটাকে নিয়ে প্রচুর মজা করলাম আমরা, এবং আর কখনো কেউ তাকে কোনো-কিছু ক'রে দিতে অনুরোধ করে নি। তাকে ভালোবাসতুম আমরা—তাই আমাদের যথেষ্ট ছিলো। মানুষ তার ভালোবাসা কারো উপর

অর্পণ করতে চায়, তাতে সে চূর্ণ হ'য়ে যায় হয়তো-বা, তার প্রেম হয়তো গলিয়ে ফ্যালে তাকে; কখনো তা বিষাক্ত ক'রে তোলে অন্য-একটি জীবন, কারণ প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত না-ক'রে সে হয়তো তার নিজের প্রেমেই মগ্ন হ'য়ে থাকে। আমরা তানিয়াকে ভালোবাসতে বাধ্য ছিলাম, কারণ ভালোবাসবার মতো আর-কেউ আমাদের ছিলো না।

সময়-সময় আমাদের কেউ এই রকম একটা তর্ক তুলতো: 'এই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছি কেন আমরা? ওর মধ্যে চোখে পড়বার মতো এমন কী আছে?'

এ-সব কথা যে বলতো তাকে তক্ষুনি সবাই মিলে থামিয়ে দিতুম—ভালোবাসতে পারি এমন কিছুর বড়ো প্রয়োজন আমাদের! আমরা তাকে পেয়েছি, আমরা তাকে ভালোবাসি, তা এই ছাবিশজনের প্রত্যেকের নিজস্ব, তা আমাদের কাছে পবিত্র থেকেও পবিত্রতর, এবং এই বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও যে উচ্চারণ করবে সে আমাদের প্রত্যেকের শত্রু! যা আমরা ভালোবাসি তা হয়তো সত্যি-সত্যি ভালো নয়, কিন্তু এই যে আমরা ছাব্বিশজন এখানে আছি, আমরা চাই যে আমাদের ভালোবাসার জিনিশ অন্য সকলের কাছেও পবিত্র হ'য়ে থাক।

আমাদের প্রেম আমাদের ঘৃণার চেয়ে কম দুর্বিষহ নয়; আর তাই হয়তো কোনো-কোনো দাম্ভিক লোক মনে করে যে আমাদের ঘৃণা আমাদের প্রেমের চেয়েও বড়ো। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহ'লে তারা আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যাক না?

এই বিস্কুটের কারখানাটা ছাড়াও আমাদের মনিবের একটা পাঁউরুটির দোকান ছিলো; এই বাড়িতেই একটা দেয়াল দিয়ে আমাদের গর্তের থেকে আলাদা করা। চারজন লোক পাঁউরুটি বানাতো সেখানে। ওদের কাজটা আমাদের থেকে অনেক পরিচ্ছন্ন, এবং সেই কারণে ওরা আমাদের তুলনায় নিজেদের অনেক উঁচু স্তরের জীব ব'লে মনে করতো; আমাদের ঘরে কখনো আসতো না ওরা, উঠোনে দেখা হ'লে নানারকম ঠাট্টা করতো। আমরাও ওদের সঙ্গে দেখা করতে যেতুম না; পাছে আমরা পাঁউরুটি চুরি করি সেই ভয়ে মনিব আমাদের মধ্যে দেখাশোনা নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ওদের আমরা ঈর্ষা করতুম, ওদের আমরা পছন্দ করতুম না;—ওদের কাজ আমাদের চেয়ে

সহজ, ওরা মাইনে পেতো আমাদের চেয়ে ভালো, খেতে পেতো আমাদের চেয়ে ভালো, ওদের কারখানাটা আমাদের চেয়ে বড়ো, আলো-বাতাস ভরা, আর ওদের আমরা ঈর্ষা করতুম কারণ ওরা সবাই পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান। আমাদের গায়ের রং হ'য়ে গিয়েছিলো হলদেটে, ময়লা; আমাদের মধ্যে তিনজনের ছিলো উপদংশ, চর্মরোগে ভুগছিলো কেউ-কেউ, আর একজন তো বাতে একেবারে পঙ্গু। আর ওদের মধ্যে দু'জনের ছিলো অ্যাকর্ডিয়ন; ছুটি-ছাটার দিনে ওরা চকচকে স্যুট আর শব্দ-করা জুতো প'রে শহরের বাগানে বেড়াতে যেতো। ছেঁড়াখোড়া কম্বলের জামা আর তালি-লাগানো জুতো দেখে পুলিশ আমাদের সে-সব জায়গায় ঢুকতেই দিতো না। এই অবস্থায় কী-ক'রে আমরা ওদের পছন্দ করবো?

একদিন আমরা শুনলাম যে ওদের সেরা লোকটিকে মাতলামির জন্যে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় মনিব এক প্রাক্তন সৈনিককে বাহাল করেছে। আমরা আরো খবর পেলাম যে এই লোকটি শাটিনের জামা এবং সোনার চেনওলা ঘড়ি পরে। এই ফুলবাবুটিকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে আমরা প্রায়ই একজন-না-একজন উঠোনে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরঘুর করতে আরম্ভ করলাম।

কিন্তু সে নিজেই আমাদের ঘরে এলো একদিন। লাথি মেরে দরজাটা খুলে হাসিমুখে চৌকাঠের উপর দাঁড়ালো সে, আমাদের দিকে চেয়ে বললে: 'কেমন আছো হে, মাস্তানরা?'

খোলা দরজা দিয়ে তুষারমেশানো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার পায়ের কাছে বাষ্পের মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে। দরজার উপর দাঁড়িয়ে সে নিচে আমাদের দিকে চেয়ে আছে, বাঁকা গোঁফের তলা দিয়ে ঝলশে উঠছে তার বড়ো-বড়ো হলদে দাঁত। তার কোটটা সত্যিই অসাধারণ; নীল রঙের জামায় সুতোর ফুল তোলা, লাল পাথরের বোতাম লাগানো—ঘড়ির চেন অবশ্য আছে সেই সঙ্গে।

চমৎকার লোক এই সৈনিকটি; লম্বা, স্বাস্থ্যবান, গোলাপি গাল, বড়ো-বড়ো ভাসা-ভাসা চোখে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি। কড়া ইস্ত্রি করা শাদা রঙের একটা টুপি পরেছে সে, পরিষ্কার ঝকঝকে অ্যাপ্রনের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে চকচকে কালো একজোড়া নতুন ধরনের বুটজুতো।

স্যাঁকাওলা নিচু গলায় তাকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে বললে। তাড়াহুড়ো না-ক'রে সেটা বন্ধ ক'রে সে আমাদের মনিবের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো। উত্তেজিত হ'য়ে আমরা সবাই একযোগে চীৎকার ক'রে

তাকে বলতে লাগলুম যে লোকটা একটা বদমাশ, গুণ্ডা, হতচ্ছাড়া, ক্রীতদাসের মতো আমাদের খাটিয়ে মারে ; মনিব সম্পর্কে যা-যা বলা উচিত তার সবই বললুম আমরা ; সে-সব কথা এখানে লেখা যায় না। গোঁফে তা দিতে দিতে শান্তভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে সৈনিকটি আমাদের কথা শুনলো।

হঠাৎ সে বললো, 'তা প্রচুর মেয়ে আছে তো তোমাদের এখানে।'

কেউ-কেউ মুখ টিপে হাসতে লাগলো, অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপলো কেউ-কেউ। একজন তাকে জানিয়ে দিলো যে, এখানে ন'টি মেয়ে থাকে।

'তা তোমরা বেশ পাও-টাও তো তাদের ?' ছোটো-ছোটো চোখ ক'রে জানতে চাইলো সৈনিকটি।

আবার হাসলুম আমরা, কিন্তু ঠিক আগের মতো প্রাণ খুলে হাসতে পারলুম না, একটু যেন বেকয়াদায় প'ড়ে গেছি। অনেকেই তাকে এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করলো যে আমরাও তার মতোই আমুদে, কিন্তু কোথায় যেন ঠেকে গেলো, শেষ পর্যন্ত কেউই পারলো না। কেউ-কেউ তো স্বীকারই ক'রে ফেললো একরকম।

'আমরা কী ক'রে—'

'হুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ও সব তোমাদের দ্বারা হবে না।' আমাদের একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ ক'রে সৈনিকটি বেশ দৃঢ়ভাবে জবাব দিলে। 'তোমরা ঠিক—যাকে ব'লে তেমন এলেমদার নও। সেই চরিত্রই নয় তোমাদের। আসল কথা কী জানো, খুবসুরৎ চেহারা চাই। মেয়েরা পুরুষদের শুধু ওই একটি কারণেই পছন্দ করে। দারুণ একখানা চেহারা নিয়ে একটা মেয়ের কাছে যাও দেখি। ব্যস, হ'য়ে যাবে। সেইজন্যেই তো ওরা তাগড়াই চেহারা ভালোবাসে। এই রকম একখানা হাত নিয়ে যাও তো!'

সে তার ডান বাহু বার ক'রে আনলে পকেট থেকে, আস্তিন গুটিয়ে বাড়িয়ে ধরলো আমাদের সামনে। উজ্জ্বল সোনালি রঙের লোমে ঢাকা বলিষ্ঠ মাংসল তার হাত।

'হাত পা বুক, সমস্তই বেশ জোরালো হওয়া চাই। তাছাড়া যদি ওদের চোখে পড়তে চাও, তাহ'লে তোমাকে বেশ ভালো কায়দাদুরস্ত জামাকাপড়ও পরতে হবে। এইজন্যই তো যত মেয়ে আমার কাছে এসে ভিড় জমায়। ছাখো না, আমি তো ওদের ডাকিও না, ছুটি-ও-না পিছন-পিছন। তবু *ওরা এক সঙ্গে* জনা পাঁচেক ক'রে আমার পায়ে-পায়ে লেগে থাকে।'

এক বস্তা ময়দার উপর ব'সে সে কথা বলছিলো। মেয়েরা সব কেমনভাবে তার সঙ্গে প্রেম করে, আর কী উদ্দামভাবে সে ওদের ব্যবহার করে, সেইসব গল্প করলে সে অনেকক্ষণ ধ'রে। তারপর সে যখন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলো, দরজাটা শব্দ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো তার পিছনে, আমরা তার এবং তার গল্প-গুলোর কথা ভাবতে-ভাবতে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। তারপর সহসা একসঙ্গে কথা ব'লে উঠলো সবাই। দেখা গেলো সবাই তাকে বেশ পছন্দ করেছে। সত্যি, কী চমৎকার লোক দেখেছো! কেমন ভাবে এলো সে ঘরের মধ্যে, আর ময়দার বস্তার উপর ব'সে কীরকম গল্প ক'রে গেলো! আর-কেউ কখনো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, কেউ কখনো এমন ভাবে কথা বলে নি আমাদের সঙ্গে। আকাশে নাক তুলে যে-সব দর্জিমেয়েগুলো আমাদের সামনে দিয়ে চলাফেরা করে, এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন আমরা কেউ নেই-ই সেখানে, লোকটি তাদের নিয়েও খেলা করবে, আমরা উৎফুল্ল-ভাবে সে কথা আলোচনা করতে লাগলাম। কিন্তু যখনি তাদের সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা হ'তো আমাদের, অথবা যদি তারা কখনো আমাদের জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতো, আমরা তাদের প্রশংসা না-ক'রে থাকতে পারতাম না। শীতের সময় লোমের জামা আর রঙমেলানো ছোটো-ছোটো টুপি পরতো তারা, গরমের দিনে টুপিতে ফুল লাগাতো, হাতে নিতো রঙিন ছাতা। কিন্তু আমরা নিজেদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে এমন ভাবে কথাবার্তা বলতাম যে সে-সব শুনতে পেলে তারা রাগে লজ্জায় লাল হ'য়ে যেতো।

স্যাঁকাওলা কথা বললো হঠাৎ। দুশ্চিন্তায় তার গলার আওয়াজ ভারি শোনালো: 'আমার মনে হয় তানিয়াকে কিছু করতে পারবে না লোকটা।'

সবাই চুপ। তার কথায় যেন বোবা হ'য়ে গেলাম আমরা। তানিয়ার কথা মনেই ছিলো না আমাদের, সুপুরুষ, সুদর্শন এই সৈনিকটির চিন্তায় তার কথা আমাদের মন থেকে মুছে গিয়েছিলো।

তার পর একটা গোলমেলে তর্কবিতর্ক শুরু হ'য়ে গেলো; কেউ-কেউ বললো যে তানিয়া কিছুতেই এত নিচে নামতে পারবে না। কেউ বললো যে লোকটাকে বাধা দেয়া ওর মতো একটি মেয়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না, আর তাই শুনে অন্যেরা বললো যে লোকটা যদি তানিয়ার পিছনে লাগে তো সবাই মিলে তাকে ধ'রে বেশ উত্তমমধ্যম দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'লো যে আমরা শুধু ওদের দু'জনকে লক্ষ ক'রে যাবো, কোনো বিপদ বুঝলে

তানিয়াকে সতর্ক ক'রে দেয়া হবে। সেদিনকার মতো আলোচনা এখানেই বন্ধ রইলো।

প্রায় একমাস কাটলো। সৈনিকটি পাঁউরুটি তৈরি করে, দর্জিমেয়েগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে যায় হামেশাই, প্রায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে, কিন্তু তার বিজয়-অভিযান সম্পর্কে আর কোনো কথাই বলে না ; শুধু গোঁফে তা দেয়, আর মাঝে-মাঝে ঠোঁট চাটে।

তানিয়া রোজই সকালবেলা আসে রুটি নিয়ে যেতে। সেইরকমই প্রফুল্ল, শান্ত, আমাদের বন্ধু তানিয়া। আমরা দু'একবার সৈনিকটির বিষয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। সে ওকে নিয়ে মজা করলে নানারকম, নাম দিলে 'ভাঁটাচোখো পুতুল', তাতে আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। দর্জিমেয়েগুলো কীভাবে ওই লোকটার সঙ্গে লেগে থাকে তা আমরা দেখেছিলুম, কাজেই তানিয়ার জন্য গর্বিত হলুম আমরা। ওর প্রতি তানিয়ার ভাবভঙ্গি আমাদেরও বেশ চেতিয়ে তুললো, আমরাও ওর সম্পর্কে একটু-আধটু ঠাট্টা ইশারা করতে আরম্ভ করলাম। আগের চেয়েও বেশি ভালোবাসলাম আমরা তানিয়াকে ; প্রত্যেক সকালে তাকে আরো বেশি প্রীতি আর স্নেহ দিয়ে সম্ভাষণ করতে লাগলাম।

একদিন সকালে সৈনিকটি বেশ একটু মাতাল হ'য়ে আমাদের ঘরে এসে ব'সে হাসতে শুরু করলে। আমরা এই উচ্ছ্বাসের কারণ জিগেস করলে সে বললে : 'দুটো মেয়ে মারামারি করেছে আমার জন্যে—ওই লীডকা আর গ্রুশকা ; দু'জনে দু'জনের কী হাল করেছে তা যদি দেখতে! আর কী চীৎকার, ওঃ! একজন আরেকজনকে চুল ধ'রে টেনে মাটিতে ফেলে, গলি দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে চ'ড়ে বসেছে! ওঃ হো-হো-হো! আঁচড়ে দিয়েছে মুখে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে। হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাচ্ছে আমার! আচ্ছা, এই মেয়েগুলো উচিতমতো লড়াই করতে পারে না কেন বলো তো? আঁচড়া-আঁচড়ি করে কেন, অ্যাঁ?'

সুখী, স্বাস্থ্যবান, চকচকে চেহারা নিয়ে একটা বেঞ্চির উপর ব'সে আছে সে, অনবরত হেসে চলেছে। আমরা কোনো কথা বললাম না। কেন যেন তাকে এবার একটু বিশ্রী লাগলো আমাদের।

'মেয়েদের ব্যাপারে আমার ভাগ্য কীরকম প্রসন্ন দেখেছো? ওঃ, হাসতে হাসতে কান্না পাচ্ছে আমার। শুধু একবার চোখ টিপলেই কাম ফতে!'

চকচকে লোমে ভরা শাদা হাত তুলে হাঁটুতে থাপ্পড় মারলো সে। এমনভাবে আমাদের দিকে চাইলো যেন প্রণয়ব্যাপারের এই অভাবিত সাফল্যে সে নিজেই অবাক হ'য়ে গেছে। তার চওড়া লালচে মুখ আনন্দে আর আত্মতৃপ্তিতে উজ্জ্বল; বারবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে সে।

স্যাঁকাওলা তার বেলচাটা হঠাৎ উত্তেজিতভাবে উনুনের উপর ঠুকলো। তারপর স্বরে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললো: 'এ-সব ছোটোখাটো ভেরেণ্ডা গাছ কেটে কী হবে—কাটো তো একটা শেগুন, তবে তো বুঝি!'

'হ্যাঁ? কী হয়েছে? কী বললে তুমি আমায়?' সৈনিকটি জিগেস করলো।

'হ্যাঁ, তুমি যদি—'

'কী বলছো তুমি?'

'ঠিক আছে, যেতে দাও; হঠাৎ ব'লে ফেলেছি—'

'ওহে, ব'লেই ফ্যালো না। ব্যাপারটা কী? শেগুন ব'লে কী বোঝাতে চাও তুমি?'

স্যাঁকাওলা কোনো জবাব দিলে না। তার হাতের বেলচা দ্রুত নড়তে লাগলো উনুনের উপর, সেদ্ধ রুটিগুলোকে নাড়তে লাগলে, স্যাঁকা হ'য়ে-যাওয়া-গুলোকে শব্দ ক'রে ছুঁড়ে দিতে লাগলো মাটিতে, সেখানে ব'সে কয়েকটা ছোকরা সেগুলোকে সুতো দিয়ে গেঁথে এক-এক ক'রে সাজিয়ে রাখছে। মনে হ'লো সে যেন সৈনিকটির কথা ভুলে গেছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সে ভীষণ চ'টে উঠলো এই ব্যাপারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে উনুনের ধারে এগিয়ে গেলো, ভীষণভাবে আন্দোলিত বেলচার হাতলটা তাকে যে আঘাত করতে পারে তা-ও খেয়াল করলো না সে।

'ওহে, শোনো, ছাখো এদিকে। মানে কী এ-সবের? আমাকে অপমান করতে চাও, কেমন? জানো না, এখানে এমন একটাও মেয়ে নেই যে আমাকে বাধা দিতে পারে? কী ক'রে এ-রকম একটা কথা তুমি বললে তাহ'লে?'

তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে সত্যি-সত্যি আহত হয়েছে। স্পষ্টতই, তার একমাত্র গর্ব ছিলো তার মেয়ে পটানোর ক্ষমতা; এছাড়া বোধহয় আর কোনো বোধ ছিলো না তার, এই একটি মাত্র ব্যাপারেই সে অনুভব করতে পারতো যে সে বেঁচে আছে।

এমন অনেক লোক আছে, মন অথবা প্রাণের কোনো রোগ ছাড়া যার জীবনের অন্য-কোনো অর্থ নেই। সমস্ত জীবন এই রোগকে তারা লালন

ক'রে চলে : এই তাদের জীবনীশক্তির একমাত্র উৎস। এই অসুখে তারা জীবন ভ'রে ভোগে, এর জন্যেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এই নিয়ে তারা প্রতিবেশীদের কাছে অভিযোগ করে আর এইভাবে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের প্রতি। এর সাহায্যে লোকের কাছ থেকে সমবেদনা আদায় ক'রে নেয়। জীবনের কাছে কেবল তাদের পাবার আছে। এই অসুখটা সেরে গেলে জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হ'য়ে উঠবে। তাদের জীবনের একমাত্র সুখ অন্তর্ধান করবে—তারা একেবারে শূন্য হ'য়ে যাবে। কোনো-কোনো মানুষের জীবন এত দরিদ্র যে নিজেদের পাপকেই পূজো করে তারা : জীবন একঘেয়ে হ'য়ে উঠবে, শুধুমাত্র এই ভয়েই তারা পাপে লিপ্ত হয়।

সৈনিকটি সোজা স্যাঁকাওলার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : 'না, বলতেই হবে তোমাকে। কে সে?'

'বলবো?' স্যাঁকাওলা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো।

'শুনি, বলো।'

'তানিয়াকে চেনো?'

'অ্যাঁ?'

'এই তো; যাও দেখি, কী করতে পারো দেখি একবার।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।'

'ওকে? ও তো কিছুই না—হ্যাঃ।'

'ঠিক আছে, আমরা তো দেখবোই!'

'দেখবে তোমরা? ওঃ হো-হো-হো!'

'সে তোমাকে—'

'ঠিক আছে, মাসখানেক সময় দাও, তারপর—'

'তুমি তো আচ্ছা ফেরেব্বাজ হে!'

'ঠিক আছে, পনেরো দিনের মধ্যেই দেখিয়ে দেবো। কী নাম বললে? তানিয়া? আরে ছ্যা ছ্যা।'

'ঠিক আছে, যাও, বেরোও, এখন কাজ করতে দাও।'

'ঠিক পনেরো দিন, তার মধ্যেই দেখো কী করি। ওঃ, তোমরা—'

'বেরোও বলছি!'

স্যাঁকাওলা হঠাৎ চ'টে গিয়ে বেলচাটাতে ভীষণ ঝাঁকি দিলে একটা।

সৈনিকটি অবাক হ'য়ে পিছিয়ে গেলো একটু। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে থেকে বললো, 'বেশ, ঠিক আছে!' ব'লে বেরিয়ে গেলো।

এই কথোপকথন চলাকালে আমরা চুপ ক'রে ছিলাম। আমাদের সমস্ত মনোযোগ ছিলো ওদের উপরেই। কিন্তু সৈনিক বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা সবাই একসঙ্গে হৈ-চৈ ক'রে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

স্যাঁকাওলাকে চেঁচিয়ে বললে একজন: 'খুব খারাপ কাজ করলে, পাভেল!'

'নিজের চরকায় তেল দাও!' স্যাঁকাওলা ফুঁশে উঠলো।'

আমরা বুঝতে পারলাম যে সৈনিকটি উত্তেজিত হয়েছে খুবই, এবং তানিয়ার বিপদ সমুপস্থিত। কিন্তু এ-কথা বুঝেও আমরা সবাই এক তীব্র কৌতূহলে টান হ'য়ে উঠলাম। তানিয়া কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? আমরা প্রায় সবাই এক সঙ্গে ভাবলাম

'তানিয়া? সে ঠিকই থাকবে। ওকে শিকার করা অত সহজ নয়!'

আমরা সবাই আমাদের এই বিগ্রহটিকে পরীক্ষা করবার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলাম। পরস্পরের কাছে আমরা জোরগলায় প্রমাণ ক'রে দিলাম যে আমাদের পূজ্য এই আদর্শটি বেশ কড়া রকমের, যে সে নিশ্চয়ই এই পরীক্ষায় সফল হবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের এমনও মনে হ'লো যে আমরা সৈনিকটিকে ভালোরকম উশকে দিই নি, সে হয়তো এই বাজির কথা ভুলে যেতে পারে, তার অহমিকাকে আরো ভালো ক'রে খুঁচিয়ে দেয়া উচিত। সেদিন থেকে আমরা উত্তেজনায় টান-টান এক জীবনে বাস করতে লাগলাম, যার স্বাদ আগে কখনো জানি নি। দিনের-পর-দিন আমরা এই নিয়ে তর্ক করতাম নিজেদের মধ্যে, সবাই আগের চেয়ে অনেক চালাক হ'য়ে উঠলাম, অনেক কথা বলতে লাগলাম, আগের চেয়ে অনেক ভালো ক'রে। মনে হচ্ছিলো তানিয়াকে বাজি ধ'রে স্বয়ং শয়তানের সঙ্গেই জুয়ো খেলছি আমরা। আর পাঁউরুটির কারখানার লোকদের কাছে যখন শুনলাম যে সৈনিকটি তানিয়ার জন্যে পাগলা হ'য়ে গেছে, তখন আমাদের উত্তেজনা এত চ'ড়ে গেলো যে আমাদের মনিব যে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে দৈনিক কাজে ময়দার বরাদ্দ চোদ্দ পাউণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে তা আমরা খেয়ালই করলাম না। এমনকি কাজ ক'রেও আর ক্লান্ত লাগতো না আমাদের। তানিয়ার নাম সমস্ত দিন আমাদের মুখে-মুখে ফিরতো। অস্বাভাবিক অধৈর্যের সঙ্গে আমরা সকালবেলায় তার আগমন প্রত্যাশা করতাম। মাঝে

মাঝে আমাদের মনে হ'তো আজ যে তানিয়া রুটি নিতে আসবে সে আমাদের চিরকালের চেনা তানিয়া নয়।

আমরা তাকে অবশ্যি এই বাজির কথা কিছুই বলি নি। কখনো কোনো প্রশ্ন করতাম না তাকে আমরা, আগের মতোই স্নেহশীল প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করতাম তার সঙ্গে। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের মধ্যে আরেকটা কিছু প্রবেশ করেছে এখন, এমন-কিছু যা তার প্রতি আমাদের পূর্বতন মনোভাব ছিলো না। এই নতুন উপাদানটি হ'লো কৌতূহল, ইস্পাতের ঠাণ্ডা, ধারালো ফলার মতো কৌতূহল।

'ও-হে! আজ যে সময় পার হ'য়ে গেলো!' একদিন সকালবেলা কাজ করতে-করতে পাভেল হঠাৎ ব'লে উঠলো।

সে না-বললেও তা আমরা জানতুম। তবু আমরা সবাই চমকে উঠলাম।

'নজর রাখো! এখুনি আসবে সে!' স্যাকাওলা বললো। ক্লিষ্ট স্বরে একজন চেঁচিয়ে উঠলো: 'এ কি আর চোখ দিয়ে দেখা যায়?'

আবার একটা গোলমেলে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হ'লো। আমাদের সমস্ত সম্পদ আমরা যে-নৌকোয় বোঝাই করেছি, তা কতখানি ভারসহ এবং নিখুঁত তা আজই আমরা জানতে পারবো। সেইদিন সকালেই হঠাৎ আমরা উপলব্ধি করলাম যে এই জুয়োয় বড্ড বেশি বাজি ধরেছি আমরা, এই পরীক্ষায় আমাদের প্রতিমা হয়তো একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই ক'দিন আমরা অনবরত শুনে আসছি যে সৈনিকটি হন্যে কুকুরের মতো তানিয়ার পিছনে লেগে আছে, কিন্তু কী জানি কেন তার প্রতি তানিয়ার মনোভাব সম্পর্কে তানিয়াকে আমরা কোনো প্রশ্নই করি নি। সে রোজ সকালে রুটি নিতে আসতো আমাদের ঘরে, আমাদের চিরপরিচিত তানিয়া।

সেদিনও আমরা একটু বাদেই তার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

'এই যে, জেলঘুঘুরা! এসেছি আমি!—'

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম আমরা, সে ঘরে ঢুকতে চিরপরিচিত রীতি লঙ্ঘন ক'রে নিঃশব্দে অভ্যর্থনা করলাম তাকে। কঠিনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা, কী বলবো, কী জিগেস করবো কিছুই ভেবে পেলাম না। ক্রূর, নিঃশব্দভাবে ভিড় ক'রে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই অভাবিত অভ্যর্থনায় স্পষ্টতই বিমূঢ় হ'লো সে, আর সহসা আমরা দেখলাম সে পাংশু হ'য়ে গেলো, উদ্বেগ ফুটে উঠলো মুখে, ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো অস্বস্তিতে।

ব'সে-যাওয়া গলায় সে কথা বললো: 'এ কি, তোমরা এমন—এমন করছো কেন?'

'কী হয়েছে তোমার?' তার চোখে চোখ রেখে, গম্ভীর গলায় পাভেল কথা বললো।

'আমার? কী আবার হবে?'

'না, কিছু না—'

'আচ্ছা, রুটি দাও তো, তাড়াতাড়ি করো।'

'অনেক সময় আছে এখনো!' একটুও না-ন'ড়ে, তার মুখের উপর থেকে চোখ না-নামিয়ে পাভেল বললো।

হঠাৎ তানিয়া ফিরে দাঁড়ালো; দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো ছুটে।

বেলচাটা তুলে নিলো পাভেল; উনুনের দিকে ফিরে শান্ত গলায় বললো, 'আর কী? হ'য়ে গেছে ওর। কিন্তু শেষ ইস্তক একটা সৈন্য! ওর মতো একটা জানোয়ারের সঙ্গেই!'

একপাল ভেড়ার মতো আমরা টেবিলে ফিরে গেলাম। নিঃশব্দে ব'সে প'ড়ে কাজে হাত লাগালাম অন্যমনস্কভাবে। কিছুক্ষণ পর একজন মন্তব্য করলে: 'হয়তো তা নয় আসলে—'

'চুপ! যথেষ্ট হয়েছে!' পাভেল চেঁচিয়ে উঠলো।

ও'ক আমরা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব'লে জানতুম। ওকে ওইভাবে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে আমরা বুঝতে পারলুম যে সৈনিকটির সাফল্যে ওর কোনো সন্দেহ নেই। বিষণ্ণ, বিবিক্ত একটি অনুভূতি আমাদের ঘিরে ধরলে।

বেলা প্রায় বারোটা হবে তখন—খাবার সময়—সৈনিকটি ঘরে এলো। সদাসর্বদা যেমন থাকে সে, ঠিক তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সর্বদা যেমন, তেমনি সোজা আমাদের চোখে চোখ রাখলো। তার দিকে তাকিয়ে বড়ো অসহায় ব'লে মনে হ'লো নিজেদের।

'এইবার বন্ধুগণ, একজন সৈনিক কী করতে পারে তা কি তোমরা দেখতে চাও?' নাক দিয়ে গর্বিত শব্দ ক'রে সে বললে, 'সামনের গলিতে গিয়ে ফুটোফাটা দিয়ে তাকিয়ে থাকো।—বুঝতে পারছো?'

পায়ে-পায়ে গলিপথে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, একে অন্যের উপর দিয়ে কাঠের ফাঁক দিয়ে বাইরে উঠোনের দিকে চেয়ে রইলাম। তানিয়াকে দেখা গেলো একটু পরেই: দ্রুত পদক্ষেপ, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি; কাদা আর তুষারগলা জল ডিঙিয়ে-

ডিঙিয়ে এগিয়ে এলো সে, ভাঁড়ারঘরের ভিতর ঢুকে গেলো। একটু পরেই অচঞ্চল পদক্ষেপে সৈনিকটি এলো, শিস দিতে-দিতে একই দিকে অদৃশ্য হ'লো। তার হাত পকেটে ঢোকানো, তার গোঁফের ডগা কাঁপছে।

বৃষ্টি পড়তে লাগলো, আমরা দেখতে লাগলাম জ'মে-থাকা জলের উপর বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়ে লাফিয়ে উঠছে। আর্দ্র, ধূসর—বড়ো বিষণ্ণ দিন। ছাদের উপর বরফ জ'মে আছে, কাদা হ'য়ে আছে এখানে-ওখানে। বাড়ির ছাদের উপরেও বরফের উপর খয়েরি রঙের ধুলোর আস্তরণ প'ড়ে আছে। ঠাণ্ডা,—অসহ্য লাগছে অপেক্ষা ক'রে থাকতে।

সৈনিকটিই প্রথমে বেরিয়ে এলো ভাঁড়ারঘর থেকে; পকেটে হাত, গোঁফ নাচাতে-নাচাতে সে ধীরে-ধীরে উঠোনটা পার হ'য়ে গেলো—নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে।

তারপর তানিয়া বেরিয়ে এলো। তার চোখ—তার চোখ আনন্দে আর সুখে চকচক করছে, তার ঠোঁটে হাসির আভাস। স্বপ্নাতুর ভঙ্গিতে, দুলতে-দুলতে, অনিশ্চিত পদক্ষেপে সে হাঁটতে লাগলো।—

আর সহ্য করতে পারলাম না আমরা। ছুটে বেরিয়ে এলাম দরজা দিয়ে, উঠোনের মধ্যে ঘিরে ধরলাম তাকে, উঁচু গলায় বন্য পশুর মতো চীৎকার ক'রে গালাগালি করতে লাগলাম তাকে, শিস দিতে লাগলাম তাকে লক্ষ ক'রে।

আমাদের দেখে সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, যেন কাদায় পা ব'সে গেছে তার! আমরা ঘিরে ফেললাম তাকে, ঘৃণাক্ত জলন্ত কুৎসিত ভাষায় তাকে গাল দিতে লাগলাম, কটু নির্লজ্জ ঠাট্টা বর্ষণ করতে লাগলাম ঝড়ের মতো দ্রুত।

একটুও তাড়াতাড়ি না-ক'রে ঠাণ্ডাভাবে এই কাজটি করতে লাগলাম আমরা; আমাদের বেষ্টনী ছেড়ে পালাবার কোনো ফাঁক নেই তার, চুটিয়ে মজা করতে লাগলাম তাকে নিয়ে। আশ্চর্য যে আমরা তার গায়ে হাত তুলি নি।

অসহায়ের মতো আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো সে, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে আমাদের গালাগালি শুনতে লাগলো। আর আমরা, আরো প্রবলভাবে, আরো ভয়ংকর হ'য়ে তার উপরে ঢালতে লাগলাম যত গরল, যত ক্লেদ আমাদের সঞ্চিত ছিলো।

কে যেন তার মুখ থেকে জীবন শুষে নিয়ে গেছে। তার যে-নীল চোখ একটু আগে সুখী আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো তা কেঁপে উঠেছে এখন, হিক্কায় পরিণত হয়েছে তার নিশ্বাস, ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে উঠছে তার।

আর আমরা ঘিরে রেখেছি ওকে, আমাদের সমস্ত মালিন্য উজাড় ক'রে দিচ্ছি ওর উপরে—ও কি আমাদের ঠকায় নি? সে আমাদের ছিলো; আমরা তাকে দিয়েছিলাম আমাদের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ। তার মূল্য যদিও কানাকড়িও নয়, কিন্তু আমরা ছিলাম ছাব্বিশজন আর সে মাত্র একজন, এমন কী সাজা আমরা তাকে দিতে পারি যা তার অপরাধের সমান? কী অপমানটাই না তাকে করলাম আমরা! একটা কথাও বললো না সে, ভীত দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইলো আমাদের দিকে, আর তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগলো।

আমরা হাসলাম, ভ্যাংচালাম তাকে, চীৎকার করতে লাগলাম। আরো কয়েকজন এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। আমাদের একজন তানিয়ার ব্লাউজের হাতা ধ'রে টান মারলো।

সহসা চোখ জ্ব'লে উঠলো তার। আস্তে হাত তুলে চুলগুলো ঠিক ক'রে নিলে সে, তারপর সোজা আমাদের দিকে তাকিয়ে, জোর গলায় কিন্তু শান্ত-স্বরে বললো: 'ওঃ, যতসব হতভাগা জেলঘুঘুর দল!'

সোজা এগিয়ে এসে এমনভাবে সে আমাদের ভেদ ক'রে গেলো যেন আমরা কেউ নেই-ই সেখানে। যেন আমরা তাকে কোনো বাধাই দিতে পারি না।

বেষ্টনী ভেদ ক'রে বেরিয়ে এসে, আমাদের দিকে না-তাকিয়ে, ঘৃণাভরা গর্বিত, তীব্রস্বরে সে বললে: 'যত সব নোংরা শুয়োরের দল—জানোয়ার সব!' তারপর—চ'লে গেলো সে: ঋজু, গর্বিত, সুন্দর।

উঠোনে কাদার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। বৃষ্টি পড়ছে, আকাশ ধূসর, সূর্যের দেখা নেই।

তারপর আমরা ধীরে-ধীরে ফিরে গেলাম আমাদের ভ্যাপশা পাথরের গর্তে। আগের মতোই—সূর্যের আলো আমাদের কুঠুরিতে ঢুকতে পারে না, আর—তানিয়াও আর আসে না।

অনুবাদ: সমীর সেনগুপ্ত



ছোট্ট হের ফ্রিডেমান

টোমাস মান

দোষটা নার্সের। সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফ্রাউ কনস্যুল ফ্রিডেমান খুব গম্ভীরভাবে তাকে বুঝিয়েছিলেন যে এই দুর্বলতা তার জয় করা উচিত। কিন্তু কী লাভটা হ'লো তাতে? বিয়ার তো বটেই, বুকের দুধের জন্য এক গেলাশ লাল মদও বরাদ্দ ছিলো; তা-ই বা কী ফল দিলো? হঠাৎ একদিন তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে তার এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে বাতির-জন্য-রাখা মেথিলেটেড স্পিরিট সুদ্ধ সে গিলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য-কাউকে বাহাল করার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘ'টে গেলো। মা আর বোনেরা এক-দিন বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন যে বিছানা থেকে প'ড়ে গিয়ে ছোট্ট য়োহানেস—তার বয়স তখন মাত্রই মাসখানেক—মেঝেয় শুয়ে কাঁদছে, কিন্তু স্বর এত ক্ষীণ যে ভয়ে নার্স-বেচারা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার এলেন; অভ্যস্ত কোমল হাতে ছোট্ট মানুষটির হঠাৎ ঝাঁকি-খাওয়া দোমড়ানো শরীর পরীক্ষা করলেন। মুখের চেহারা গম্ভীর হ'য়ে গেলো। এককোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তিন মেয়ে, আর উৎকণ্ঠিত ফ্রাউ কনস্যুল সরবে প্রার্থনা করছেন।

ছেলের জন্মের ঠিক আগটাতেই বেচারি মা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত; আকস্মিক রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। তাই এতে তিনি এত বেশি ভেঙে পড়লেন যে ছোট্ট য়োহানেস যে বাঁচবে এমন আশাই ত্যাগ ক'রে বসলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার তাঁর হাতে চাপ দিয়ে আশ্বাস দিলেন। বললেন যে এখনকার মতো সব বিপদ কেটে গেছে। মগজে আঘাত লেগেছে এমন কোনো চিহ্ন আর নেই। মুখের ভাবও বদলেছে, সেই অপলক স্থির চাউনিটাও অপসৃত। অবশ্য আর-কিছু হয় কি না তা শুধু ভবিষ্যৎই জানে, তবে ভালো হ'য়ে যাবে ব'লেই আশা করা উচিত। সব ঠিক হ'য়ে যাবে, এটাই ভাবা ভালো।

শহরটা ছোট্ট আর পুরোনো, ব্যবসা-বাণিজ্যের মস্ত ঘাঁটি; এই শহরের উত্তর তোরণের কাছে ধূসর ঢালুছাতওলা একটা বাড়িতে য়োহানেস ফ্রিডেমান বড়ো হ'য়ে উঠলো। সদর দরজার পরেই পাথরে-বাঁধানো প্রবেশ-পথ, সেখান থেকে শাদা কাঠের রেলিং-দেয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। বসার ঘরের মলিন দেয়ালঢাকা কাগজে গাছপালা আঁকা। ভারি মেহগনি কাঠের টেবিল ঘিরে খাড়া চেয়ার, আর লাল মখমল-মোড়া সোফা।

ছোটোবেলায় য়োহানেস প্রায়ই এই ঘরের জানলার ধারে ব'সে থাকতো, ঠিক তার মায়ের পায়ের কাছে, ছোট্ট পা-রাখা টুলটাতে: সব সময়ে ফুল দেখা যায় এখান থেকে; ভারি সুন্দর লাগে। মা রূপকথা বলতেন, আর সে শুনতো; হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতো তাঁর নরম আর পাকাচুলে-ভরা মাথাটির দিকে: ভারি স্নিগ্ধ আর কোমল তাঁর মুখ; তাঁর নিশ্বাসের মৃদু সুগন্ধ তার নাকে এসে লাগতো। বাবার ছবি দেখাতেন তিনি ছেলেকে, পাকা গালপাট্টাওলা বেশ সহৃদয় একজন ভদ্রলোক—মা বলতেন স্বর্গে আছেন তিনি এখন, তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন সেখানে।

একটা ছোটো বাগান আছে বাড়ির পিছনে। পোড়া চিনির গন্ধ আসে পাশের কারখানা থেকে; তবু গ্রীষ্মকালে তাঁরা অনেকটা সময় সেখানে কাটাতেন। গ্রন্থিল একটি অনেকদিনের আখরোটগাছ ছিলো সেখানে; তারই ছায়ায় নিচু কাঠের টুলে ব'সে-ব'সে য়োহানেস বাদাম ভাঙতো, আর তখন ফ্রাউ ফ্রিডেমান আর তাঁর তিন কন্যা—সবাই এখন রীতিমতো মহিলা—রোদ এড়াবার জন্য ছাইরঙের ক্যাম্বিসকাপড়ের তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিতেন।

মাঝে-মাঝে হাতের শেলাই থেকে চোখ উঠে আসতো মায়ের, স্নেহাতুর বিষণ্ণ চোখে ছেলের দিকে তিনি তাকাতেন।

ছোট্ট য়োহানেস যখন তার টুলের উপরে গুটিশুটি হ'য়ে ব'সে গভীর মনোযোগসহকারে বাদাম ভাঙতো, একরত্তি মানুষটিকে দেখতে মোটেই কিন্তু সুন্দর লাগতো না। সুশ্রী সে কিছুতেই নয়, বরং চেহারাটা তার অদ্ভুতই : বুকটা উঁচু হ'য়ে আছে, পিঠে একটা কুঁজ, আর হাত দু'টো শরীরের তুলনায় বেমানান রকম লম্বা। কিন্তু ভারি কমনীয় তার হাতপায়ের গড়ন; চোখ দু'টি হরিণীর মতো নরম লালচে বাদামি; মুখটি ভীরু; ফিকে বাদামি রঙের পাতলা চুল। কাঁধের মধ্যে মাথাটা এত ডেবে না গেলে বেশ সুশ্রী বলা যেতো।

ইস্কুলে গেলো সাত বছর বয়সে; একটানা তাড়াতাড়ি সময় কেটে গেলো সেখানে। বিকলাঙ্গদের কারো-কারো যেমন একটা মিথ্যে জাঁক থাকে, তেমনি চাল দেখিয়ে গটমট ক'রে হেঁটে যেতো ফ্রিডেমান। রাস্তার দু'পাশের ঢালুছাতওলা অদ্ভুত সব দোকান-ঘর আর বাড়ি পেরিয়ে তোরণবসানো খিলেনদেয়া পুরোনো ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে ঢুকতো সে।

ইস্কুলের পড়াশুনো শেষ হ'য়ে গেলে ফ্রিডেমান বাগানে ব'সে কাজ করে কি বই পড়ে; চমৎকার সব রঙিন ছবি আছে বইগুলির মুখপত্রে; আর বোনেরা সেই ফাঁকে রুগ্ন মায়ের হ'য়ে ঘরসংসার দেখাশুনো করে। অভিজাত সমাজের লোক ব'লে মাঝে-মাঝে আবার তাদের বেরোতেও হ'তো; কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, তিন বোনের একজনেরও বিয়ে হয় নি; কারণ একদিকে তাদের যেমন টাকাকড়িও ছিলো না, তেমনি রূপেরও জৌলুশ ছিলো না তেমন একটা।

য়োহানেসও মাঝে-মাঝে সহপাঠীদের নিমন্ত্রণ পেতো, কিন্তু তার যে তা ভালো লাগতো তা নয়। তাদের খেলাধুলো আমোদ-আহ্লাদে সে যোগ দিতে পারতো না। আর সে থাকলে তারাও সবসময়েই বিব্রত বোধ করতো, ফলে তারা তাকে দলের ব'লে ভাবতেই পারতো না।

তারপর একটা সময় এলো যখন বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে কতগুলি বিশেষ বিষয়ের আলোচনা শুনতে শুরু করলো সে। সহপাঠীরা যখন অমুক-অমুক মেয়েদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতো, উৎকর্ণ য়োহানেস তখন বিস্ফারিত চোখে চুপ ক'রে সব শুনে যেতো। এ-সব কথায় সবাই যখন একেবারে ম'জে

যেতো, সে বুঝতে পারতো যে এ-সব তার জন্য নয়। বলখেলা কিংবা স্বাস্থ্য-চর্চার মতোই এটা আরেকটা ব্যাপার। মাঝে-মাঝে তার মন খারাপ হ'য়ে যেতো। কিছুতেই অংশ না-নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কেবল দেখা, শুধুই অবলোকন—এটাই তার শেষকালে অভ্যেস হ'য়ে গেলো।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও ব্যাপারটা ঘ'টে গেলো; বয়স যখন ষোলো, হঠাৎ তখন সমবয়সী একটি মেয়ে তার মন টানলো। মেয়েটি তারই এক সহপাঠীর বোন: খুব হাসিখুশি গেছো মেয়ে, ফর্শা, সোনালি চুল। তার ভাইকে বাড়িতে ডাকতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিলো। তার সামনে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছিলো য়োহানেস; মেয়েটিও তেমনি বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলো। মেয়েটির মেকি ভদ্রতায় তার মন ভারি খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো।

গ্রীষ্মের এক অপরাহ্নে শহরের বাইরের পাঁচিলের কাছে আপনমনে বেড়াচ্ছিলো য়োহানেস; একটা জুঁইয়ের ঝাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ কাদের নিভৃত আলাপের শব্দ শুনতে পেয়ে সন্তর্পণে উঁকি মারলো। দেখলো মেয়েটি ব'সে আছে একটা বেঞ্চিতে, সঙ্গে য়োহানেসেরই চেনা লালচুলের লম্বাপানা একটি ছেলে। পরস্পরকে জড়িয়ে আছে তারা, মেয়েটির ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে ছেলেটি, চাপা হাসির মধ্যে মেয়েটি তা ফিরিয়ে দিলো। একটু তাকিয়েই য়োহেনেস ঘুরে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে চ'লে গেলো।

কাঁধের মধ্যে আরো বেশি ব'সে গেলো তার মাথা, আগের চেয়েও অনেক বেশি। হাত দু'টি থরথর ক'রে কাঁপছে, আর তীক্ষ্ণধার একটি যন্ত্রণা বুক থেকে ঠেলে গলা পর্যন্ত উঠে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু কষ্টটা গিলে ফেললো সে, সেইসঙ্গে যতটা পারে নিজের মনকে বোঝালো। 'ভালোই হ'লো,' সে ভাবলো, 'সব চুকে গেলো। কখনো আর এ-সবের মধ্যে নিজেকে জড়াবো না। যা আর সবাইকে দেয় সুখ আর আনন্দ, আমার কাছে তার অর্থ শুধু দুঃখ আর বেদনা। আমি আর ও-সবের মধ্যে নেই। সব আমার মিটে গেলো। আর না, ককখনো না।'

এই সংকল্প ক'রে তার ভালোই হ'লো। সব ফিরিয়ে দিলো সে, চিরকালের মতো ফিরিয়ে দিলো। বাড়ি চ'লে গেলো, বসলো বই খুলে; বই ছাড়া অবশ্য বেহালাও বাজানো যেতো; তার বুক বিকৃত হ'লে কী হবে, বেহালাটা সে তা সত্ত্বেও বাজাতে শিখেছিলো।

সতেরো বছর বয়সে ইস্কুল ছেড়ে ব্যবসায় ঢুকলো য়োহানেস, তার চেনাশুনো প্রত্যেকেই তাই করেছিলো। হের শ্লিফোগ্‌ট-এর মস্ত এক কাঠের কারখানা ছিলো নদীর ধারে; সেখানেই শিক্ষানবিশিতে ঢুকলো সে। ভারি ভালো মানুষ তারা, সহৃদয় আর বিবেচক; তার নিজের দিক থেকে সে-ও বন্ধুর মতো সাড়া দিতো। ফলে বেশ ভালোই সময় কাটতে লাগলো। কিন্তু তার একুশ বছর বয়সে একটানা অসুখে ভুগে মা মারা গেলেন।

আঘাতটা মর্মান্তিক ঠেকলো য়োহানেসের কাছে। দুঃখটা স্থায়ী হ'য়ে থাকলো। গোপনে সে লালন করলো এই শোক; লোকে যেমন ক'রে কোনো পরম আনন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তেমনিভাবেই ছেলেবেলার সহস্র ছোটোখাটো স্মৃতি দিয়ে এই শোক সে জিইয়ে রাখলো। তার জীবনে এই প্রথম একটা বড়ো ঘটনা ঘটলো, এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো সে।

জীবনের সারমর্মকে 'সুখ' বলা হোক বা না-হোক জীবন এমনিতেই কি যথেষ্ট নয়, আর তা কি ভালোর জন্যও নয়? য়োহানেস ফ্রিডেমান অন্তত তা-ই অনুভব করলো। জীবনকে সে ভালোবাসতো। যে-পরম সুখ জীবন আমাদের জন্য নিয়ে আসে, তাকে যে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, সে-ই য়োহানেসই অবিশ্বাস্য যত্ন ও অসীম মমতার সঙ্গে জীবনের বাকি উপচারগুলিকে সানন্দে গ্রহণ করতে শেখালো নিজেকে। শহর ঘিরে যে-সব পার্ক আছে বসন্তকালে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, ফুলের গন্ধ, পাখির গান, এত সব জিনিশেও কি একজন কৃতজ্ঞ থাকতে পারে না?

আমাদের উপভোগের ক্ষমতা যে সব সময়েই শুধু অনুশীলনসাপেক্ষ, সত্যিই যে ভালো লাগাতে শিখতে হয়—তা-ও সে জানতো, আর নিজেকে তেমনিভাবেই সে তৈরি করেছিলো। গান সে ভালোবাসে, শহরে যে-কোনো ঐকতানের আসরেই সে যায়। বেহালা সে নিজে মন্দ বাজাতো না। বাজাবার সময় তাকে কেমন হাস্যকর দেখায় তা সে গ্রাহ্যই করতো না। যে-কোনো সূক্ষ্ম সুন্দর সুর তোলায় তার আনন্দ ছিলো। এ-ছাড়া প্রচুর পড়াশুনো করার ফলে তার ভিতরে সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটি বোধ তৈরি হয়েছিলো, সেই শহরের অন্য কোনো বাসিন্দার যা ছিলো না। সব নতুন বইয়েরই খোঁজ-খবর রাখতো সে, এমনকি বিদেশী বইয়েরও। কোনো লিরিকের মোহিনী ছন্দের স্বাদ কি গন্ধ নিতে যেমন জানতো, তেমনি

কোনো সূক্ষ্ম ও চতুর গল্পের মূল রসটুকুকেও উপভোগ করতে পারতো। —হ্যাঁ, বেশ বিদগ্ধই বলা যায় তাকে।

সবকিছুরই উপভোগ্যতার নিজস্ব একটা নীতি থাকে, আর কোন অভিজ্ঞতা 'সুখের' এবং কোন অভিজ্ঞতা তা নয়, তা শনাক্ত করা অসম্ভব—এটাও সে ক্রমেই বুঝতে শিখলো। হর্ষ কি বেদনার যা-ই হোক না কেন যে-কোনো আবেগ, যে-কোনো মেজাজকে সে বরণ ক'রে নিতো। এমনকি তার সব অপূর্ণ ইচ্ছা ও কামনাকেও ভিতরে-ভিতরে লালন করতো সে। তারা যেমন, তেমন ব'লেই সে তাদের ভালোবাসতো। নিজেকে বোঝাতো পূর্ণ হ'লেই এমনকি সবচেয়ে সেরা বাসনাটিও হারিয়ে যাবে। বসন্তের শান্ত সন্ধ্যাবেলায় যে-ব্যথিত অস্পষ্ট মধুর আকুলতা ও দুরাশা জেগে ওঠে— তাদের আনন্দ কি গ্রীষ্মের সমস্ত সফলতার চাইতেও মহার্ঘ নয়? হ্যাঁ, বিদগ্ধ সে, রসিক, আমাদের ছোট্ট হের ফ্রিডেমান। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে রাস্তায় যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়, যারা সহৃদয়ভাবে মাথা হেলিয়ে তাকে নমস্কার করে, তারা জানতেই পারে না কোন করুণার আবহাওয়া তাকে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। এই যে অসুখী পঙ্গু মানুষটি কেমন একটা মজার ধরনে হালকা ওভারকোট আর চকচকে টুপি প'রে চালিয়াতের মতো চলেছে—আশ্চর্য! একটু অহংকারও ছিলো কিনা তার—লোকে জানতেই পারতো না কী গভীর মমতার সঙ্গে সে তার প্রাণের ক্ষুদ্র ধারাটিকে ভালোবেসে জড়িয়ে আছে; সত্যি, কোনো তীব্র আবেগের উত্তেজনা নেই তার জীবনে, কিন্তু এমন একটি শান্ত নিস্তরঙ্গ সুখে তা কানায়-কানায় ভ'রে আছে যা কেবল তার নিজের সৃষ্টি।

কিন্তু হের ফ্রিডেমানের সব তীব্রতা সব আকুলতা সব আসক্তি ছিলো অভিনয়ের প্রতি। নাটক সম্বন্ধে তাঁর বোধ ছিলো অসাধারণ প্রখর। নাট্য-কলার কোনো বাঙ্ময় কৌশল কিংবা শোকান্তিক নাটকের সর্বনাশের দৃশ্যে তার ছোট্ট কাঠামোটা আবেগে থরথর ক'রে কেঁপে উঠতো। নাট্যশালার প্রথম সারির বক্সে তাঁর একটি নিয়মিত আসন ছিলো; বারে-বারেই যেতেন তিনি, কখনো ক্লান্ত বোধ করতেন না। মাঝে-মাঝে বোনদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মা মারা যাবার পর সেই পুরোনো বাড়িতেই ভাইবোনেরা থাকতেন। বোনেরা ভাইয়ের ঘরদোর দেখাশুনো করতেন। খুব দুঃখের কথা যে তাঁদের

এখনো বিয়ে হয় নি। কিন্তু সব আশা চ'লে গিয়ে ততদিনে একটা আত্ম-সমর্পণের ভাব এসেছে। সবচেয়ে বড়ো হ'লো ফ্রিডেরিকা, হের ফ্রিডেমানের চেয়ে সতেরো বছরের বড়ো। পরের বোন হেনরিয়েটা আর তিনি দু'জনেই লম্বা আর খুব বেশি রোগা। ছোটো বোন প্‌ফিফি আবার খুব বেঁটে, আর মোটাশোটা। তার কথা বলার ভঙ্গিটাও আবার হাস্যকর; সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে কথা বলে আর সেই সময় মুখে জল এসে যায়।

বোন তিনজনকে নিয়ে ছোট্ট হের ফ্রিডেমান খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। গভীরভাবে ভালোবাসতেন তাঁরা পরস্পরকে, যেন আঁকড়ে ধ'রে থাকতেন, কোনো বিষয়েই মতবিরোধ হ'তো না। তাঁদের গণ্ডিতে কখনো কারো বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হ'লেই তাঁরা একবাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করতেন।

হের শ্লিফোগ্‌ট-এর কারখানা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ধরনেরই একটা ব্যবসা করছিলেন নিজে—তাতে তাঁর সময়ের অভাব হ'তো না। আজকাল মাঝে-মাঝে তাঁর হাঁপানির টান ওঠে; খাবার সময়ে যাতে সিঁড়ি ভাঙতে না-হয়, সেজন্যে বাড়ির নিচের তলায় দু'টো ঘরে তাঁর আপিশ বসিয়েছিলেন।

জুন মাসের একটি চমৎকার উষ্ণ দিনে তাঁর তিরিশ বছরের জন্মদিন এলো। খাওয়াদাওয়ার পরে বাইরে ছাইরঙের ক্যাম্বিসকাপড়ের তাঁবুতে এসে বসলেন হের ফ্রিডেমান।

বেশ ভালো একটা চুরুট মুখে, হাতে একটি বই। কিন্তু কখনো বই নামিয়ে রেখে চুপ ক'রে শুনছিলেন তিনি, বুড়ো বাদামগাছে উচ্ছ্বসিত চড়ুইপাখিরা কিচিরমিচির করছে; মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিলেন সামনে কাঁকর বিছোনো পরিষ্কার রাস্তাটার দিকে, গ্রীষ্মের ফুলে উজ্জ্বল লনের মধ্য দিয়ে পথটা বাড়ি পর্যন্ত চ'লে গেছে।

দাড়ি রাখেন না ছোট্ট হের ফ্রিডেমান। মুখের গড়ন একটু লম্বাটে, একটু চোখা হয়েছে মাত্র, এছাড়া মুখের আর-কিছুই বদলায়নি। পাতলা ফিকে বাদামি চুল, পাশে সিঁথি কাটেন।

বইটা একবার হাত থেকে খ'শে হাঁটুর উপর প'ড়ে গেলো, কোনো বাধা দিলেন না; রোদে-ভরা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে বললেন, 'বেশ, এই তাহ'লে তিরিশ বছর। ভগবানই জানেন আরো কত বছর

বাকি, দশ কি বিশ, নাকি তারো বেশি। কোনো সাড়াশব্দ না-ক'রে বাকি বছরগুলোও এমনি স্তূপ হ'তে থাকবে, আগেরগুলো যেমন ক'রে কেটে গেলো। শান্তচিত্তে এখন কেবল তাদের জন্য চেয়ে থাকবো!'

এখন, সে-বছর জুলাই মাসে সমরবাহিনীর জেলা-আপিশে এমন এক ভদ্রলোকের নিয়োগ হ'লো, সারা শহরটাতেই যাঁকে নিয়ে খুব আলোচনা চলতে লাগলো। এর আগে অনেকবছর ধ'রে যে-স্থূলকায় ও রসিক ভদ্রলোক এই পদটিতে ছিলেন, বিভিন্ন মহলে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে সবাই তাঁকে খুব দুঃখিত চিত্তে বিদায় দিয়েছিলো। ভগবানই জানেন এমন কোন মহানিয়ম অনুসারে আর-কেউ নন, স্বয়ং হের ফন রিনলিনগেনকেই রাজধানী থেকে এখানে পাঠানো হ'লো।

তা বিনিময়টা তেমন কিছু খারাপ হয় নি। নতুন সেনাধ্যক্ষ বিবাহিত বটে, কিন্তু নিঃসন্তান। দক্ষিণ এলাকায় শহরের একটু বাইরে খোলামেলা জায়গায় প্রশস্ত একটি বাড়ি ভাড়া করলেন তিনি, মনে হ'লো এখানেই বেশ গুছিয়ে বসতে চাচ্ছেন। তিনি যে মস্ত ধনী এ-রকম একটি জনরবও শোনা গেলো; এ-কথা যে সত্যি তা বোঝা গেলো যখন তিনি সঙ্গে ক'রে চারজন ভৃত্য, চড়বার জন্য এবং গাড়িটানার জন্য পাঁচ-পাঁচটি ঘোড়া, একটা ল্যাণ্ডো আর শিকারের জন্য হালকা একটি গাড়ি—এইসব নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

আসার পরে স্বামী-স্ত্রী অভিজাতমহলে সকলের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কার্ড দিয়ে এলেন। সকলেরই জিহ্বাগ্রে তাঁদের নাম ফিরতে লাগলো। কিন্তু লোকের এত কৌতূহল যাঁকে ঘিরে, তিনি হের ফন রিনলিনগেন নন, তাঁর স্ত্রী। মাথা ঘুরে গেলো পুরুষদের; এতই ঘুরলো যে মন্তব্য করার মতোও অবস্থা থাকলো না। তাঁদের গৃহিণীরা কিন্তু খুব জোর গলায় চটপট রায় দিয়ে দিলেন যে গের্ডা ফন রিনলিনগেন ঠিক তাঁদের জাতের নন।

'অবিশ্যি উনি এসেছেন রাজধানী থেকে, ফলে ওঁর চালচলন যে অন্যরকম হবে এ তো স্বাভাবিকই।' হেনরিয়েটা ফ্রিডেমানকে কথায়-কথায় বলছিলেন ফ্রাউ হাগেনস্ট্রম, আইনজ্ঞের স্ত্রী, 'সিগারেট খান, ঘোড়ায় চড়েন, এ তো হবেই। কিন্তু তাঁর হাবভাব যেন কেমন—শুধু যে বেপরোয়া তা-ই নয়, একটু যেন উগ্রও। বেশ চোখে লাগে। কুৎসিত বলতে পারবে না ওঁকে, বরং বেশ সুশ্রীই বলা যায়। কিন্তু কি চেহারায় কি কথাবার্তায় কি হাবেভাবে

কোথাও একফোঁটা শ্রী নেই ; ছেলেরা যা দেখে মেয়েদের প্রেমে পড়ে সেটা তাঁর মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। অবশ্য প্রেম ক'রে-ক'রেও বেড়ান না, আর সেইজন্য অন্তত আমি তাঁকে তাচ্ছিল্য করবো না। কিন্তু এটা ভারি আশ্চর্য, এত অল্পবয়সী একটি মেয়ের কিনা একটুও লাবণ্য বা স্বাভাবিক সৌন্দর্য নেই। মাত্র তো চব্বিশ বছর বয়স। কথাটা ঠিক ভালো ক'রে বোঝাতে পারছি না ; অথচ যা বলতে চাচ্ছি তা আমার নিজের কাছে খুব পরিষ্কার। এখন তো সব ক'টা পুরুষের মাথা ঘুরে গেছে ; সপ্তাহ কয়েক কাটুক, তারপরই দেখবে সকলেই বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে।'

'তা,' ফ্রলাইন ফ্রিডেমান বললেন, 'যা-যা দরকার সবই তো তাঁর আছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' ফ্রাউ হাগেনস্ট্রেম চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্বামীর কথাই ধরো। দেখেছো, কেমন ব্যবহার করেন তাঁর সঙ্গে ? তোমার দেখা উচিত, অবশ্য দেখতেই তো পাবে। বিয়ের পর পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সময় খানিকটা সংযত হওয়া উচিত মেয়েদের, অন্তত আমার তো তাই মত। নিজের স্বামীর সঙ্গেই বা কী রকম ব্যবহার! এমন ঠাণ্ডাভাবে ভদ্রলোকের দিকে তাকান আর করুণাময়ীর মতো এমনভাবে "বন্ধু আমার" ব'লে সম্ভাষণ করেন যে শুনেই আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। অথচ ভদ্রলোককে একবার দেখো, কেতাদুরস্ত নিখুঁত একটি সোজা সরল মানুষ, খুবই কাজের লোক, আর বয়স চল্লিশ হ'লে কী হবে, চেহারাটা এখনো কী সুন্দর রেখেছেন। জানো, মাত্র চার বছর তাদের বিয়ে হয়েছে!'

ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনকে হের ফ্রিডেমান প্রথম দেখেছিলেন শহরের বড়ো রাস্তায়, দুপুরবেলায়, দোকানের সারির মধ্যে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। কিছু দরাদরি ক'রে ফিরছেন, এমন সময় সদররাস্তায় তাঁকে দেখে সাগ্রহে তাকালেন।

হের স্টিফেন্সের পাশে-পাশে ধীরে-সুস্থে হাঁটছিলেন, যথারীতি ছোট্ট আর হোমরাচোমরা দেখাচ্ছিলো তাঁকে। হের স্টিফেন্সের ভুরু খুব ঘন, ঝোপের মতো মস্ত, গালপাট্টা আছে গালে, পাইকারি জিনিশের ব্যবসা করেন, বেশ শাঁসালো লোক। দু'জনেরই মাথায় টুপি, গরমের জন্য ওভারকোটের বোতাম খোলা। ছড়ি দিয়ে রাস্তার উপরে মৃদু আঘাত করতে-করতে রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন দু'জনে। কিন্তু রাস্তার মাঝামাঝি এসে

ষ্টিফেন্স ব'লে উঠলেন 'আরে, গাড়িতে রিনলিনগেন না? নিশ্চয়ই তাই না-হ'লে কী বলেছি!'

'ভালোই হ'লো,' আশান্বিতভাবে সামনে তাকিয়ে চড়া, কিছুটা তীক্ষ্ণ গলায় হের ফ্রিডেমান বললেন, 'কারণ এখনো আমি মহিলাটিকে দেখি নি। তা এই বুঝি সেই বিখ্যাত হলুদ গাড়িটা, যার কথা এত বেশি শুনেছি।'

সত্যি ওটা রিনলিনগেনদেরই শিকারের গাড়ি, চমৎকার দু'টি ভালোজাতের ঘোড়া গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; আজ তাকে চালাচ্ছেন স্বয়ং সেনাধ্যক্ষের স্ত্রী, পিছনে সহিস হাত গুটিয়ে ব'সে আছে। মহিলাটির পরনে ছাই রঙের একটা ঢিলে পশমি কোট আর স্কার্ট, বাদামি চামড়ার ফিতে লাগানো ছোটো গোল খড়ের টুপি, টুপির তলায় তাঁর সুন্দর ক'রে ছাঁটা ঘন ঢেউ-তোলা লালচে সোনালি চুল, ঘাড়ের উপরে গুচ্ছ ক'রে বাঁধা। মুখটি ডিমের ছাঁদের, রং মৃতের মতো ফর্শা, আর ঘননিবদ্ধ চোখের নিচে লুকিয়ে আছে আবছা নীল ছায়া। ছোটো কিন্তু সুগঠিত নাক, রোদে পুড়ে সুন্দর বাদামি দাগ হয়েছে নাকের আগায়। সব সময়েই এত অস্থির যে তার ফলে মুখটি আদৌ সুন্দর কি না তা বলা ভারি মুশকিলের।

গাড়িটা ঠিক মুখোমুখি আসতেই হের ষ্টিফেন্স অতীব শ্রদ্ধা দেখিয়ে সম্ভাষণ করলেন। ছোট্ট হের ফ্রিডেমানও টুপি তুললেন এবং আয়ত চোখে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। চাবুকটা একটু নামালেন মহিলা, মাথা হেলিয়ে নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন, তারপর রাস্তার বাড়িঘর আর দোকানের জানলা দেখতে-দেখতে আস্তে গাড়ি চালিয়ে চ'লে গেলেন।

কয়েক পা এগিয়ে হের ষ্টিফেন্স বললেন, 'গাড়ি চালিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, এখন বাড়ি ফিরছেন।' কোনো উত্তর দিলেন না ছোট্ট হের ফ্রিডেমান, চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ যেন একটু চমকে সঙ্গীর দিকে তাকালেন, জিগেস করলেন, 'কিছু বলছিলেন?' হের ষ্টিফেন্স তাঁর সুগভীর মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন।

তিনদিন পর য়োহানেস ফ্রিডেমান দুপুরবেলায় কাজ সেরে যথারীতি বাড়ি ফিরলেন। মধ্যাহ্নভোজনের সময় সাড়ে বারোটা। মধ্যের সময়টা সদর দরজার ডান দিকে তাঁর আপিশঘরে কাটান; কিন্তু দরজার কাছে পরিচারিকা এসে বললো, 'বাড়িতে লোক এসেছেন।'

'কোথায়? আমার আপিশে?' তিনি জিগেস করলেন।

'না, উপরে। দিদিমণিদের কাছে।'

'কারা?'

'হের কর্নেল ফন রিনলিনগেন আর তাঁর স্ত্রী।'

'ও, আচ্ছা!' য়োহানেস ফ্রিডেমান বললেন, 'তাহ'লে আমি—' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। বারান্দা পেরিয়ে সেই গাছপালা-আঁকা ছবিওলা-ঘরের বড়ো শাদা দরজার কড়ায় হাত রাখলেন। তারপরে পিছিয়ে এলেন, ঘুরে দাঁড়ালেন, যেমন এসেছিলেন তেমনি আস্তে চ'লে গেলেন। আর-কেউ ছিলো না সেখানে, নিজেকেই বললেন তিনি, 'না, না-হওয়াই ভালো।' আপিশে গিয়ে নিজের ডেস্কে ব'সে প'ড়ে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন, কিন্তু একটু পরে কাগজটা নামিয়ে রেখে জানলা দিয়ে দূরে একদিকে তাকিয়ে থাকলেন। এমনিভাবেই বসেছিলেন, একসময় পরিচারিকা এসে খবর দিলো খাবার তৈরি। উঠে গেলেন খাবার-ঘরে, বোনেরা এর মধ্যেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চেয়ারে ব'সে পড়লেন, দেখলেন তিনটি গানের বই প'ড়ে আছে।

শুরুয়া ভাগ করতে-করতে হেনরিয়েটা বললেন, 'কারা এসেছিলেন, জানো য়োহানেস?'

'বলো,' জিগেস করলেন ফ্রিডেমান।

'নতুন সেনাধ্যক্ষ আর তাঁর স্ত্রী।'

'তাই নাকি? খুব ভদ্র তো।'

'হ্যাঁ,' প্‌ফিফি বললেন, এর মধ্যেই মুখের কোণে জল এসে গেছে তাঁর, 'দু'জনকেই বেশ মিশুকে মনে হ'লো।'

'আর আমাদেরও দেরি না-ক'রে শিগগিরই পাল্টা যাওয়া উচিত,' ফ্রিডেরিকা বললেন, 'আমি বলি কি, পরশু সামনের রোববারেই, যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, রোববারেই যাবো,' হেনরিয়েটা আর প্‌ফিফি দু'জনেই বললেন।

'তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে, য়োহানেস?' ফ্রিডেরিকা জিগেস করলেন।

'নিশ্চয়ই যাবে।' শরীরটা একটু ঝাঁকিয়ে প্‌ফিফি বললেন। হের ফ্রিডেমানের কানে তার কথা পৌছুলোই না। একমনে শুরুয়া খেয়ে যাচ্ছিলেন তিনি; বড়ো বেশি স্তব্ধ আর বিপন্ন মনে হ'লো তাঁকে, যেন দূরের থেকে কোনো অচেনা কোলাহল ভেসে আসছে তাঁর কানে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় 'লোহেনগ্রিন'[১] হচ্ছিলো অপেরাতে। শৌখিন সমাজের কেউ বাদ নেই, সবাই এসেছে। রীতিমতো ভিড় জমেছে ছোটো প্রেক্ষাগৃহে। লোকজন, কথাবার্তার গুনগুন, গ্যাস আর প্রসাধনের গন্ধ—ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহটি এই সবেই ভ'রে আছে। প্রত্যেক সারি থেকেই লোকেরা অপেরাগ্লাস চোখে লাগিয়ে মঞ্চের ঠিক পাশেই তেরো নম্বর বক্সের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কারণ হের ফন রিনলিনগেন ও তাঁর স্ত্রী এই প্রথম কোনো অনুষ্ঠানে এলেন; সকলেই চাচ্ছে তাঁদের একবার চোখে দেখতে।

ছোটো হের ফ্রিডেমানেরও আসন তেরো নম্বর বক্সে। ঢুকেই চমকে উঠে দরজার দিকে ফিরলেন, হাতটা একবার ভুরুর কাছে উঠে এলো, যেন জ্বরের ঘোরে নাকের বাঁশি দু'টো ফুলে উঠছে। তারপরে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন, ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনের ঠিক পাশটাতেই। নিখুঁত সান্ধ্যপোশাক তাঁর পরনে, ঝকঝকে শাদা শার্ট, বুকের কাছে সামনের দিকটা ফুলে আছে। ফ্রাউ রিনলিনগেন তাঁর দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন ভাবলেন; তাঁর নিচের ঠোঁটটি একটু উল্টে আছে; তারপর স্বামীর দিকে ফিরে কী যেন বলাবলি করলেন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, কাঁধ দু'টি চওড়া, শাদাশিধে বাদামি মুখ, পাকানো গোঁফ।

অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো, একটু পরেই আরম্ভ হবে অভিনয়; ফ্রাউ রিনলিনগেন রেলিং-এর উপরে একটু ঝুঁকে পড়তেই হের ফ্রিডেমান চট ক'রে আড়চোখে তাকিয়ে একবার ভালো ক'রে দেখে নিলেন। হালকা রঙের সান্ধ্যপোশাক পরেছেন তিনি, গোটা নাট্যশালায় কেবল তাঁর ফ্রকটিই নিচুগলার। পুরো-হাতার জামা, শাদা দস্তানা দু'টি কনুই পর্যন্ত উঠে এসেছে। রানীর মতো দেখাচ্ছে তাঁকে, টিলে কোটে যেমন দেখায় তার চেয়েও অনেক বেশি রাজকীয়। ধীরে-ধীরে ওঠানামা করছে তাঁর ভরা বুক, আর ঘাড়ের কাছে লালচে সোনালি চুল ভারি গুচ্ছ ক'রে বাঁধা।

পাণ্ডুর হ'য়ে গেছেন হের ফ্রিডেমান, এমনিতে যা তার চেয়েও অনেক বেশি;

১ লোহেনগ্রিন: রিখার্ড হ্বাগনারের (১৮১৩-৮৩) বিখ্যাত বিখ্যাত গীতিনাট্যগুলির একটি। রচনাকাল যদিও ১৮৪৬ ও '৪৭-এর মধ্যবর্তী সময়, তবু নিজের এই গীতিনাট্যটি তিনি প্রথম শোনবার সুযোগ পান রচনা সম্পূর্ণ হবার তেরো বছর পরে। বোদলেয়ার ছিলেন তাঁর প্রথম ভক্তদের একজন, এবং টোমাস মান তাঁকে নিয়ে যে কেবল একাধিক প্রবন্ধই রচনা করেছেন, তা নয়; তাঁর 'ডক্টর ফাউস্ট্‌স' উপন্যাসের নায়কচরিত্রটিও হ্বাগনারকে আদর্শ ক'রেই কল্পিত ব'লে অনেকে মনে করেন।

মোলায়েম ক'রে দু-ভাগ করা বাদামিচুলের নিচে ভুরুর ঠিক উপরটাতে পুঁতির দানার মতো ছোটো-ছোটো ঘামের বিন্দু জমেছে। ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনের বাঁ-হাতটি রেলিং-এর উপর এলিয়ে আছে, তাকালেই তা চোখে পড়ে। দস্তানা খুলে ফেলেছেন তিনি, মৃতের মতো শাদা হাত, অঙ্গুরিবিহীন সুগোল আঙুল, চঞ্চল বেগুনি নীল শিরা -সব ঠিক তাঁর চোখের তলায়; না-দেখে তাঁর উপায় ছিলো না।

বেহালা গান ক'রে উঠলো; ট্রম্বোন ঝংকার দিলো; টেলরামুণ্ড বধ হ'লো, অর্কেস্ট্রায় রাজত্ব করলো সম্মিলিত বিজয়োল্লাস; আর ছোট্ট হের ফ্রিডেমান ব'সে থাকলেন নিশ্চল, শুদ্ধ ও ম্লান, মাথাটা কাঁধের ভিতর ডুবে গেছে, তর্জনী উঠে এসেছে ঠোঁটের উপর; একটি হাত সজোরে ঢুকে পড়লো ওয়েস্টকোটের ভিতরে, বুক চেপে ধরলো।

পর্দা নামলো। স্বামীর সঙ্গে বক্স থেকে বেরোবেন ব'লে ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন উঠে দাঁড়ালেন। না-তাকিয়েই তাঁকে দেখতে পেলেন য়োহানেস ফ্রিডেমান, রুমাল বের ক'রে কপাল মুছলেন, তারপর হঠাৎ উঠে বিশ্রাম-ঘরের দরজা পর্যন্ত গেলেন; অথচ আর না-গিয়ে সেখানেই ফিরে দাঁড়ালেন, চ'লে এলেন আবার চেয়ারের কাছে, ব'সে পড়লেন, আগে যেভাবে বসেছিলেন তেমনি।

যখন ঘণ্টা বাজলো, তাঁর পাশের লোকেরা ফিরে এলেন; হের ফ্রিডেমান অনুভব করলেন যে ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ফলে শেষটায় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তাঁকে মাথা তুলতে হ'লো, চোখে চোখ পড়তেও ফ্রাউ রিনলিনগেন চোখ সরালেন না। অসংকোচে অপলকে তাকিয়ে থাকলেন, আর ফলে শেষকালে তীব্র অবমাননা বোধ ক'রে ফ্রিডেমানই নিজের চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। আরো এক পোঁচ রক্ত স'রে গেলো মুখ থেকে। ঘৃণা, ক্রোধ, আর যন্ত্রণার এক অচেনা মধুর অনুভূতি তাঁকে বিদ্ধ করলো। আবার বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা।

সেই অঙ্কের যবনিকা পড়ার ঠিক আগটায় ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন তাঁর হাতের পাখাটা ফেলে দেবার সুযোগ ক'রে নিলেন, পড়লো ঠিক হের ফ্রিডেমানের পায়ের কাছে। দু'জনেই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন, কিন্তু পাখাটা প্রথম হাতে ঠেকলো ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনের। ঠাট্টার ভঙ্গিতে ছোট্ট একটু হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ,' খুব কাছাকাছি এসেছিলো দু'জনের মাথা, মুহূর্তের জন্য

তাঁর বুকের উষ্ণ সৌরভ পেলেন ফ্রিডেমান, যেন টান লাগলো তাঁর মাথায়, সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেলো, আর তাঁর হৃৎপিণ্ড এমন ভীষণভাবে ধ্বকধ্বক ক'রে উঠলো যে দম বন্ধ হ'য়ে গেলো। একটুও না-ন'ড়ে মুহূর্তকাল তিনি নিশ্চল ব'সে থাকলেন। তারপর শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ঠেলে, আর বাইরে চ'লে গেলেন।

সুর যেন তাঁকে তাড়া ক'রে এলো; লবি পেরিয়ে এলেন; পোশাকের ঘর থেকে হালকা ওভারকোট, ছড়ি আর টুপি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ধাপে-ধাপে নিচে নেমে এলেন, শেষে একেবারে বাইরে।

শুষ্ক উষ্ণ হ'য়ে আছে সন্ধ্যাবেলা। গ্যাসের বাতি-জ্বলা রাস্তায় ঢালুছাতওলা বাড়িগুলো উঁচু হ'য়ে আছে আকাশের দিকে, তারারা যেখানে নরম আলো ছড়াচ্ছে। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই; যারা আছে, বাঁধানো রাস্তা তাদের পায়ের শব্দ ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাঁকে কী যেন বললো কে একজন। কিন্তু কিছুই তাঁর কানে পৌঁছুলো না। চোখেও কিছু পড়ছিলো না। মাথা ঝুঁকে পড়েছে, সজোর নিশ্বাসে ভীষণভাবে কেঁপে-কেঁপে উঠছে তাঁর কদাকার বুকটা। বারে-বারে কেবল ফিশফিশ ক'রে বললেন:

'ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!'

নিজের ভিতরটাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি, যেন আতঙ্কে ভ'রে গিয়ে তাকিয়ে থাকলেন, আবিষ্কার করলেন যে-সব অনুভূতিকে তিনি এতদিন গভীর মমতার সঙ্গে লালন করেছেন, অত্যন্ত সাবধানে তিনি যাদের নিজের আয়ত্তে রেখেছিলেন, সেই তারা এখন বিক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত হ'য়ে ধ্বংস ঘটালো তাঁর নিজের মধ্যে, মরুভূমি ক'রে দিলো ভিতরটা। তাঁর আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণা, তীব্রতা এবং আকুলতা এত বলবান যে হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে তিনি তার কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। ঝিম ধ'রে আছে মাথা, মাতালের মতো লাগছে; ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠলো, কেবল একটি নাম বেরিয়ে এলো অস্ফুট, 'গের্ডা!'

স্তব্ধতা এখন সম্পূর্ণ। দূরে-কাছে কাউকে দেখা যায় না। নিজেকে সংযত ক'রে ছোট্ট হের ফ্রিডেমান হাঁটতে লাগলেন; রাস্তাটা সোজা গড়িয়ে গেছে নদীর দিকে; নাট্যশালাটাও ওই রাস্তাতেই পড়ে, তারপর সেখান থেকে বড়ো রাস্তার পাশাপাশি উত্তরদিকে তাঁর বাড়ির গা ঘেঁষে চ'লে গেছে।

কেমন ক'রে তাকিয়েছিলো তাঁর দিকে! সত্যি বলতে কি সে-ই তাঁকে

চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলো। দৃষ্টি দিয়ে তাকে একেবারে রিক্ত, আর দীন ক'রে দিলো; কিন্তু পুরুষই বা কে, আর মেয়েই বা কে—সে নিজেই তো পুরুষ, তা-ই নয় কি? আর তার আশ্চর্য দু'টি বাদামি চোখ—সত্যি কি কোনো অপবিত্র উল্লাসে তারা ঝকঝক ক'রে ওঠে নি?

বুঝলেন যে শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয়, প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে আবার অক্ষম ও অসহায় ঘৃণার তরঙ্গ উঠলো, সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করলো তাঁকে। তাঁদের পরস্পরের মাথা যখন স্পর্শ করেছিলো, যখন নিশ্বাসে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর শরীরের সুগন্ধ, সেই মুহূর্তটিতে আবার ফিরে গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হ'লো। পিছন দিকে হেলে পড়লো সেই কদাকার মূর্তি, চাপা দাঁতের মধ্য দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে অসহায়ভাবে মরিয়ার মতো তাঁকে বলতেই হ'লো, না-ব'লে কিছুতেই পারলেন না—

'ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!'

তারপর আবার চলতে লাগলেন, আস্তে, কলের মতো, যতক্ষণ না নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন; সন্ধ্যার ভারি বাতাসের মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় তাঁর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকলো। ঢোকার মুখে একটু থেমে ভিতরের ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়ায় নিশ্বাস নিলেন, তারপর চ'লে গেলেন আপিশ ঘরে।

খোলা জানলার ধারে নিজের ডেস্কটিতে গিয়ে বসলেন: সামনেই একটি কাচের গেলাশের জলে কে যেন মস্ত একটি হলদে গোলাপ রেখে গেছে, তার দিকে সোজা তাকিয়ে থাকলেন। এক সময়ে হাতে তুলে নিলেন, চোখ বুজে গন্ধ নিলেন তার, তারপরে অবসন্ন বিষাদের সঙ্গে নামিয়ে রাখলেন। না, না! ও-সব চুকে গেছে। এমনকি সেই সুগন্ধও বা তার কাছে এমন আর কী! এতদিন যা তাঁর কাছে আনন্দের উৎস হ'য়ে ছিলো, তারাই বা এখন আর কতটুকু?

ঘাড় তুলে নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মাঝে-মাঝে পায়ের শব্দ কাছে আসে, দূরের দিকে চ'লে যায়, তারপরে একেবারে মিলিয়ে যায়। তারারা ফুটে আছে স্থির ও দীপ্তিমান। এত দুর্বল লাগলো নিজেকে, অবসাদে যেন মৃতপ্রায়। মাথার ভিতরটা একেবারে ফাঁকা ঠেকছে। তারপরে একসময়ে হঠাৎ তাঁর হতাশা এক স্নিগ্ধ আর বিস্তীর্ণ বিষাদে গ'লে গেলো। অস্থিরভাবে তাঁর চেতনায় জ্ব'লে উঠলো কোন-এক কবিতার কয়েকটি লাইন; কানে

শুনতে পেলেন লোহেনগ্রিনের তীব্র স্বর; চোখের সামনে দেখলেন ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনের মুখ, লাল মখমলের উপরে তাঁর সুগোল শাদা হাত—তারপর তাঁকে আচ্ছন্ন করলো ঘুম—ভারি, দুর্বহ, ছেঁড়া-ছেঁড়া ও জরাতুর।

মাঝে-মাঝে প্রায় জেগে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলেন জাগতে, কোনো-রকমে চেষ্টা ক'রে আবার তলিয়ে যাচ্ছিলেন বিস্মরণে। কিন্তু চারদিক যখন আলোয় ভ'রে গেলো চোখ মেলে চাইলেন তিনি, বিস্ফারিত বেদনাবিদ্ধ চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন; সব, স ব মনে পড়লো তাঁর—যেন সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে কোনোই বিরতি আনে নি নিদ্রা।

ভার-ভার লাগছে মাথাটা, চোখ দু'টি জ্বালা করছে। হাতমুখ ধোবার পর অডিকোলন দিয়ে মাথাটা যখন ধুয়ে নিলেন, তখন অনেকটা ভালো লাগলো; জানলাটা খোলাই ছিলো, তার পাশে গিয়ে আসনটিতে বসলেন; খুব ভোর তখন, মাত্র পাঁচটা বাজে বোধহয়। যারা রুটি ফিরি ক'রে বেড়ায়, মাঝে-মাঝে কেবল তারাই আনাগোনা করছে, তাছাড়া রাস্তায় আর-কাউকে দেখা যায় না। উল্টোদিকের জানলার খড়খড়ি নামানো। পাখিরা ডাকাডাকি করছে, আকাশে উজ্জ্বল নীল, চমৎকার সুন্দর একটি রোববারের সকাল।

মনে-মনে আস্থা আর আরাম অনুভব করলেন ছোট্ট হের ফ্রিডেমান। কেন কষ্ট দিচ্ছিলেন নিজেকে? সব কি তেমনি নেই, আগের মতোই, যেমনটি ছিলো? কালকের ধাক্কাটা খুব খারাপ হয়েছিলো। মেনে নেয়া গেলো। কিন্তু আর যেন না-হয়—এখানেই এর শেষ হওয়া উচিত। এখনো সময় আছে, এখনো হয়তো-বা এড়ানো যায় সর্বনাশকে। নতুন ক'রে যাতে আবার আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হ'তে না হয়, সেজন্যে সব তাঁকে এড়িয়ে চলতে হবে—কিছুতেই কোনো সুযোগ ক'রে দেবেন না। তিনি যে এ-প্রতিজ্ঞা রাখতে সক্ষম হবেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকলো না তাঁর। নিজের দুর্বলতাকে শুধু যে জয় করার শক্তিই তাঁর আছে, তা-ই নয়, তাকে পুরোপুরি দমন করার ক্ষমতাও তিনি রাখেন।

সাড়ে সাতটা বাজলো। ফ্রিডেরিকা ঘরে ঢুকলেন কফি নিয়ে। ঘরের কোণে পিছনের দেয়াল ঘেঁষে চামড়ার সোফার সামনে গোলটেবিলে রাখলেন। বললেন:

'সুপ্রভাত, য়োহানেস। এই যে তোমার ছোটো হাজরি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বললেন ছোট্ট ফ্রিডেমান। আর তারপর আবার বললেন, 'লক্ষ্মী ফ্রিডেরিকা, শোনো, অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করছি বলতে, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়েই তোমরা দেখা করতে যেয়ো। শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না আমার। তাছাড়া রাতেও ভালো ঘুম হয়নি, মাথাটাও কেমন ধ'রে আছে। অর্থাৎ এককথায় বলতে চাই যে—'

'কী দুঃখের কথা!' উত্তর করলেন ফ্রিডেরিকা, 'তুমি তবে আরেকদিন যেয়ো। তোমাকে কিন্তু বেশ অসুস্থই দেখাচ্ছে। কোনো ওষুধ দেবো? আমার মেন্থল পেন্সিলটা?'

'ধন্যবাদ।' হের ফ্রিডেমান বললেন, 'ও এমনিই সেরে যাবে।' ফ্রিডেরিকা চ'লে গেলেন।

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে কফিতে চুমুক দিলেন তিনি, তারপর একটা ক্রুয়াসাঁ[১] মুখে তুললেন।

খুব তৃপ্ত বোধ করলেন নিজে। নিজের দৃঢ়তায় বেশ খানিকটা গর্বও অনুভব করলেন। কফি শেষ ক'রে একটা চুরুট ধরিয়ে আবার সেই খোলা জানলার পাশে বসলেন। খাবারটা খেয়ে ভালোই হ'লো। বেশ ভালো লাগছে, সুখী, আশান্বিত, নিরুদ্বেগ। বই নিয়ে বসলেন একটা—চুরুট খেতে-খেতে বই থেকে মুখ তুলে আধ-বোজা চোখে মাঝে-মাঝে রোদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। পুরোপুরি সকাল হ'য়ে গেছে। মাঝে-মাঝে ঝনঝন শব্দ তুলে চ'লে যাচ্ছে মালগাড়িগুলো। অনেকের গলা শোনা যাচ্ছে; শোনা যাচ্ছে চলতি ট্রামের ঘণ্টার আওয়াজ; আর আছে পাখিদের কিচিরমিচির; ঝকঝকে নীল আকাশ; হালকা নরম একটু হাওয়া—একটার সঙ্গে আরেকটা এমনভাবে মিশে গেছে যে সবকিছুকে যেন একই সঙ্গে বুনে রাখা হয়েছে।

দশটার সময় তিন বোন সদর পেরিয়ে গেলেন। ব'সে-ব'সে তিনি তারই শব্দ শুনলেন। সামনের দরজার পাল্লাদুটি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে উঠলো। অলসচোখে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর জানলার পাশ দিয়ে তারা চ'লে যাচ্ছেন। এক ঘণ্টা কাটলো। আরো, আরো অনেকবেশি সুখী বোধ করতে লাগলেন।

১ ক্রুয়াসাঁ একধরনের মিষ্টি রুটি, চা কিংবা কফির সঙ্গেই ভালো চলে; চাঁদের বাঁকা টুকরোর মতো দেখতে; মিষ্টি, কিন্তু কিশমিশ বা পেস্তা দেয়া নয়।

তাঁর অহংকার চূড়ায় পৌঁছুলো। শুধু তা-ই নয়, আর-কোনো ভয়ও রইলো না। স্বর্গের থেকে হাওয়া আসছে যেন ; কী সুন্দর গাইতে পারে পাখিরা! একটু হেঁটে বেড়ালে হয়। হঠাৎ নামহীন কোনো মাধুর্যের সঙ্গে আতঙ্কিত ভাবনাটা জেগে উঠলো ; অবস্থার কোনো হেরফের হ'লো না ; 'আচ্ছা, যদি তার কাছেই যাই।' যেন সত্যি-সত্যিই পেশি-সঞ্চালন ক'রে তিনি তাঁর নিজের ভিতরকার সব সাবধানী স্বরকে দাবিয়ে রেখে সেই অলৌকিক সুখের সিদ্ধান্তটি নিলেন : 'তার কাছেই যাবো, যাবোই।'

রোববারের পোশাক প'রে নিলেন, নিলেন তাঁর টুপি আর ছড়ি, তারপর রুদ্ধশ্বাসে শহরের মধ্য দিয়ে একেবারে দক্ষিণ শহরতলিতে গিয়ে পৌঁছুলেন। কারো দিকে না-তাকিয়েই টুপি তুলছেন, মাথা নোয়াচ্ছেন, প্রত্যেকটি সাগ্রহ পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গেই তাই করছেন। যতক্ষণ না বাদামগাছের ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়ে লাল ইটের সেই খোলামেলা বাড়িটাতে পৌঁছুলেন, যেখানে ফটকের গায়ে সেনাধ্যক্ষ ফন রিনলিনগেনের নাম লেখা আছে, ততক্ষণ তিনি নিজের সেই অবস্থায় আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট হ'য়ে রইলেন।

কিন্তু এখানে আসতেই শিহরণ তাঁকে অধিকার ক'রে নিলো, ধ্বকধ্বক ক'রে উঠলো হৃৎপিণ্ড, বুকের ভিতরটা বুঝি ফেটে গুঁড়িয়ে যাবে। কর্ণদর্ভট পেরিয়ে ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে ঘণ্টা টিপলেন। পাশার দান তো প'ড়ে গেলো, এখন আর ফেরবার পথ নেই। 'যা আসবে, আসুক,' ভাবলেন তিনি। নিজের ভিতরে অনুভব করলেন মৃত্যুর স্তব্ধতা।

হঠাৎ খুলে গেলো দরজাটা। কর্ণদর্ভট পেরিয়ে দাসী তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো, তারপর তাঁর কার্ড নিয়েই তাড়াতাড়ি লাল কার্পেটে-ঢাকা সিঁড়ি বেয়ে চ'লে গেলো ; আর, দাসী ফিরে না-আসা পর্যন্ত, সেই ঝলমলে রঙের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন হের ফ্রিডেমান। দাসী এসে জানালো কর্ত্রী উপরে যেতে অনুরোধ করেছেন। বসার ঘরে ঢোকার আগে দরজার পাশে ছড়িটা রেখে নিজেকে দেখবার জন্য আড়চোখে আয়নায় তাকালেন। ফ্যাকাশে হ'য়ে আছে মুখ, চোখ দু'টো লাল, ভুরুর উপর চুল লেপ্টে আছে, আর যে-হাত টুপিটা ধ'রে আছে, থরথর ক'রে কাঁপছে সেটি।

দাসী দরজা খুলে দিলে তিনি ঢুকলেন ; দেখলেন পর্দা-টানা একটা মস্ত ঘরের আবছা অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডানদিকে একটা পিয়ানো, ঘরের

ঠিক মাঝখানে গোলটেবিল ঘিরে বাদামি রঙের রেশমি কাপড়ে ঢাকা কতগুলি আরামচেয়ার ; বাঁ দিকে দেয়াল ঘেঁষে সোফা, তার ঠিক উপরে গিল্টির কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো একটি ল্যাণ্ডস্কেপ, দেয়ালকাগজের রঙ কালোর দিকে, দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটি প্রকোষ্ঠ, সেখানে টবের মধ্যে পামগাছ।

মিনিটখানেক গেলো ; তারপর ডানদিকের দরজার পর্দা সরিয়ে ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন ঢুকলেন, পুরু বাদামি কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন ; লালকালো চৌখুপি পশমের শাদাশিধে ফ্রক পরা। চোর-কুঠুরির দিক থেকে নৃত্যপর ধূলিকণায় ভর্তি আলোর একটা রশ্মি ভেসে এসে তাঁর ঘন লাল চুলের উপর এমনভাবে পড়লো যে তা সোনার মতো ঝলমল ক'রে উঠলো। তাঁর আশ্চর্য অন্তর্ভেদী চোখ দু'টি স্থির হ'য়ে থাকলো অভ্যাগতের মুখের উপর ; ঠোঁটও অহংকারে যথারীতি একটু বেঁকে আছে।

'সুপ্রভাত, ফ্রাউ রিনলিনগেন,' শুরু করলেন হের ফ্রিডেমান ; মহিলাটির ঠিক বুক পর্যন্ত আসেন ব'লে তাঁকে মাথা তুলে তাকাতে হ'লো তাঁর দিকে, 'আমিও আপনাকে সম্ভাষণ জানাতে এলাম। বোনেরা যখন এসেছিলেন, আমি তখন দুর্ভাগ্যবশত বাইরে ছিলাম। আন্তরিক দুঃখিত বোধ করছি···'

আর কী যে বলা যায় মোটেই ভেবে পেলেন না, আর মহিলাটি অকরুণ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে মনে হ'লো তাঁকে তিনি প্রগল্‌ভ ক'রে তুলতে চান। ফ্রিডেমানের মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেলো, 'সব, স ব দেখে ফেলছে আমার,' ভাবলেন তিনি 'যন্ত্রণা দেবে আমাকে, ঘৃণা করবে, কীরকম অস্থিরভাবে জ্বলছে ওর ওই চোখ দু'টো···'

কিন্তু অবশেষে স্বচ্ছ উঁচু গলায় তিনি বললেন :

'আপনি যে কষ্ট ক'রে এসেছেন এ আপনার অনুগ্রহ। গত দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ব'লে আমারো খুব খারাপ লেগেছে। বসুন না।'

তাঁর পাশেই বসলেন ফ্রাউ রিনলিনগেন, পিছনে হেলান দিয়ে, চেয়ারের হাতলে হাত রাখলেন। ফ্রিডেমান বসলেন ঝুঁকে, হাঁটুর উপর টুপিটা রেখে। ফ্রাউ রিনলিনগেন বললেন, 'মিনিট পনেরো আগে আপনার বোনেরা এসেছিলেন, জানেন তো? তাঁরা বললেন আপনি অসুস্থ।'

'হ্যাঁ,' ফ্রিডেমান বললেন, 'তেমন সুস্থ লাগছিলো না যে বাইরে যেতে পারি। পারবো ব'লে তো মনে হয় নি। আসতে সেজন্য দেরি হ'লো।'

'এখনো কিন্তু আপনাকে তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।' চোখ না-সরিয়ে শান্ত

গলায় বললেন রিনলিনগেন, 'ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে আপনাকে। চোখ দু'টো লাল হ'য়ে আছে। আপনি বোধহয় তেমন সবল নন।'

হের ফ্রিডেমান তোতলাতে থাকলেন, 'না···মানে ··তেমন কোনো অসুস্থতা বোধ করি না।'

চোখ না-ফিরিয়েই ফ্রাউ রিনলিনগেন ব'লে চললেন, 'আমারো বেশ অসুস্থ লাগে নিজেকে। কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারে না। বড়ো অস্থির বোধ করছি। মাঝে-মাঝে ভারি অদ্ভুত সব কথা মনে হয়।'

থামলেন তিনি। বুকের কাছে নেমে এলো চিবুক, আর চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। হের ফ্রিডেমান কিছু বললেন না, শুধু স্বপ্নে-পাওয়া স্থিরচোখে তাকিয়ে ব'সে রইলেন। আশ্চর্য তাঁর কথা বলার ধরন, স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর, চেতনায় ছড়িয়ে যায়, রোমাঞ্চিত করে, নাড়া দেয়। আরো শান্ত হ'য়ে এলো তাঁর বুকের শব্দ; মনে হ'লো যেন কোনো স্বপ্নের মধ্যে আছেন। ফ্রাউ রিনলিনগেন আবার শুরু করলেন:

'কাল মনে হ'লো অপেরা শেষ হবার আগেই আপনি চ'লে গেলেন। নিশ্চয় ভুল মনে হয় নি?'

'হ্যা, চ'লে গিয়েছিলাম।'

'দেখে আমার খারাপ লেগেছিলো। সত্যিকার সংগীত-রসিকের মতো প্রাণ দিয়ে শুনছিলেন আপনি। অবশ্য ওরা যেমন গাইছিলো, তা মোটামুটি চলনসই মাত্র। গান ভালোবাসেন নিশ্চয়। পিয়ানো বাজাতে পারেন?'

'একটু-আধটু বেহালা জানি কেবল।' বললেন হের ফ্রিডেমান, 'মানে, তেমন কিছু নয়।'

'বেহালা বাজাতে জানেন?' ফ্রাউ রিনলিনগেনের অন্যমনস্ক দৃষ্টি তাঁকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো। 'আচ্ছা, আমরা তো তা'হলে একসঙ্গে বাজাতে পারি।' হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'আমি অবশ্য নামেই বাজাই। এখানে কোনো সঙ্গী পেলে ভালো লাগতো—আসবেন আপনি?'

'আপনার কাজে লাগতে পারলে খুব আনন্দিত হবো।' আড়ষ্টভাবে বললেন হের ফ্রিডেমান। এখনো যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নেমে এলো, আর তারপর হঠাৎ ফ্রাউ রিনলিনগেনের মুখের ভাব বদলে গেলো। ফ্রিডেমান তাঁর মুখে ফুটে উঠতে দেখলেন একটা নিষ্ঠুর ও অস্ফুট ব্যঙ্গের ছাপ। আবার সেই মারাত্মক অন্তর্ভেদী ঝকঝকে দৃষ্টিতে ফ্রিডেমানের

দিকে তিনি তাকিয়ে থাকলেন। মুখ যেন তাঁর পুড়ে গেলো; কোনদিকে যে তাকাবেন ভেবে পেলেন না। কাঁধের ভিতর মাথা ডুবিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তের মতো কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর সারাক্ষণ সেই অক্ষম রাগের দীপ্ত মাধুর্য আর যন্ত্রণা তাঁর শিরায়-শিরায় ছুটোছুটি করতে লাগলো।

মরিয়ার মতো চেষ্টা ক'রে চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন ফ্রাউ রিনলিনগেন তাঁর মাথার উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রচণ্ড চেষ্টা ক'রে মাত্র কয়েকটা কথা বের করতে পারলেন, 'তাহ'লে আমাদের এখানে আপনার খুব একটা খারাপ লাগছে না।'

'ও, না,' অন্যমনস্কভাবে বললেন ফ্রাউ রিনলিনগেন, 'না, নিশ্চয়ই না। খারাপ লাগবে কেন? তবে সত্যি বলতে মাঝে-মাঝে একটু অস্বস্তি লাগে। যেন সবাই আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। কিন্তু—ও হ্যাঁ, ভালো কথা। ভুলে যাওয়ার আগেই ব'লে রাখা ভালো।' তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন তিনি, 'আগামী সপ্তাহে আমরা ক'জনকে এ-বাড়িতে আসতে বলেছি। ছোটো একটা ঘরোয়া আসর। হয়তো কিছু গান, খানিকটা গল্পগুজব ভারি সুন্দর একটা বাগান আছে পিছনদিকে; একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত চ'লে গেছে। আপনি আর আপনার বোনেরা অবশ্য সময়মতো নিমন্ত্রণ পাবেন, তবু আপনাকে আমি এক্ষুনি অনুরোধ জানিয়ে রাখছি। আপনারা এলে আমাদের খুব ভালো লাগবে।'

হের ফ্রিডেমান যখন এই আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন তখন বাইরে থেকে কে যেন সজোরে দরজার হাতল চেপে ধরলো। দেখা গেলো সেনাধ্যক্ষ ঢুকছেন। দু'জনেই উঠে দাঁড়ালেন, ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন পুরুষ দু'জনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সমান সৌজন্যের সঙ্গে মাথা নুয়ে দু'জনকে সম্ভাষণ জানালেন তাঁর স্বামী। ব্রোঞ্জের মতো মুখ তাঁর, গরমে চকচক করছে।

দস্তানা খুলতে-খুলতে হের ফ্রিডেমানকে উদ্দেশ ক'রে কথা বলতে শুরু করলেন। গলার স্বর শুধু জোরালোই নয়, খানিকটা তীক্ষ্ণ; শূন্য আয়ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে হের ফ্রিডেমানের মনে হ'লো যে এক্ষুনি বুঝি-বা প্রাণখোলাভাবে তাঁর কাঁধ চাপড়ে দেবেন। স্ত্রী-র দিকে ফিরলেন সেনাধ্যক্ষ, গোড়ালি দু'টো গায়ে-গায়ে লেগে আছে, শরীরটা কোমরের উপর একটু ঝুঁকে পড়লো, কোমল গলায় বললেন:

'আমাদের ছোট্ট আসরটাতে ওঁকে আসতে অনুরোধ করেছো তো? উনি

কি আসবেন? তুমি যদি বলো তাহ'লে আসছে সপ্তাহে দিন ঠিক করি। আবহাওয়া ভালো থাকবে আশা করছি, বাগানেই তাহ'লে আসর জমানো যাবে।'

'তুমি যা বলো,' ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন বললেন। দৃষ্টি তাঁকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো।

মিনিট দুই পরে হের ফ্রিডেমান যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে আরেকবার মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ করলেন। দেখলেন ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন এখনো তাঁর দিকে তেমনি স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সে-চোখে কোনো ভাষা নেই।

হের ফ্রিডেমান বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু শহরে ফিরলেন না। বড়ো রাস্তা থেকে যে-পথটা নদীর ধারে পুরোনো কেল্লার দিকে বেরিয়ে গেছে, নিজের অজান্তে সেই পথে ঢুকে পড়লেন। রাস্তার দু'পাশে খানিকটা ক'রে যত্নে-রাখা ঘাসের জমি, আর মধ্যে-মধ্যে সেই ছায়া-ঢাকা রাস্তায় সারি-সারি বেঞ্চি বসানো।

মাথা নিচু ক'রে আনমনাভাবে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন। ভয়ানক গরম লাগছে। যেন ভিতরে যে আগুন জ্বলছে তার টগবগে শিখাগুলি কিছুতেই তাঁকে স্বস্তি দেবে না। সেইসঙ্গে মাথাটাও কেমন দপদপ ক'রে উঠছে।

যেন এখনো তেমনিভাবেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন—এখন তা আর আগের মতো ভাষাহীন নয়; বরং এখন তা যেন আবার নিষ্ঠুরতায় ঝকঝক ক'রে উঠলো—সেই আশ্চর্য শান্ত কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে যার একটুও রেশ ছিলো না। আচ্ছা, তাঁকে অসহায় দেখলে কি সে খুশি হয়, তাঁকে অমন আত্মহারা দেখতেই কি সে ভালোবাসে? অমন ক'রে যে তাঁকে তন্নতন্ন ক'রে ছাখে, তাতে কি তার একটুও দয়া হয় না?

নদীর পাড় ধ'রে-ধ'রে একেবারে শ্যাওলা-ধরা দেয়ালের তলায় চ'লে গেলেন। সেখানে চাঁদের অর্ধেকের মতো গোল হ'য়ে জুঁই-এর ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, আর তারই মধ্যে একটা বেঞ্চি পাতা। ফ্রিডেমান তার উপরে বসলেন। চাপা মিষ্টি গন্ধ তাঁকে ঘিরে ধরলো। অস্থির ছলোছলো জলের উপর অলস রোদ এলিয়ে আছে।

অবসন্ন লাগলো বড্ড; একেবারে জীর্ণ হ'য়ে গেছেন যেন; অথচ ভিতরটা তীব্র

বিক্ষোভ আর যন্ত্রণায় ভ'রে আছে। তার চেয়ে এই কি ভালো নয়—শেষ বারের মতো একবার তাকিয়ে নিয়ে এই শান্ত জলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া? যুদ্ধ করতে হবে একটুক্ষণ, কিন্তু তার পরেই তো মুক্তি, তার পরেই তো নিরাপত্তা, তার পরেই তো শান্তি। আঃ, শান্তি, শান্তি, তা-ই তো চাচ্ছেন তিনি। বোবা ফাঁকা শূন্যতার যে-শান্তি, তা নয়। সূর্যের আলোয় ভরা স্নিগ্ধ শান্তি—শুভ আর প্রসন্ন চিন্তায় পরিপূর্ণ।

কী মমতার সঙ্গেই না জীবনকে ভালোবেসেছিলেন, আর কী প্রচণ্ডভাবেই না ফিরে চেয়েছিলেন সেই অন্তর্হিত সুখ যা শূন্যে মিলিয়ে গেছে—এখন এই মুহূর্তে সেই মমতা আর আকুতি তাঁর ভিতরে শিহরণ তুলে দিলো। কিন্তু তার পরেই নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন; দেখলেন সবখানেই শুদ্ধ প্রকৃতির অন্তহীন উদাসীন শান্তি; দেখলেন নদী কেমন ক'রে রোদের মধ্য দিয়ে নিজের পথে চ'লে যাচ্ছে, কেমন ক'রে কেঁপে উঠছে ঘাস, আর কেমন ক'রেই বা মুখ তুলে নিজের জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে আছে ফুলেরা—শুধু কেবল একদিন বিবর্ণ হ'য়ে ঝ'রে-পড়ার জন্য। দেখলেন প্রাণের অভিলাষের কাছে সব কিছুই কেমন বশংবদের মতো মাথা নত ক'রে আছে। হঠাৎ কেন যেন নিয়তির সব আঘাতের তুলনায় নিজেকে অনেক বড়ো ব'লে মনে হ'লো—আর এই মুহূর্তেই অনিবার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আর বোঝাবুঝি গ'ড়ে উঠলো, এই বোধই তো মানুষকে নিয়তির চেয়েও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

মনে প'ড়ে গেলো তিরিশ বছরের জন্মদিনের অপরাহ্ণটি। আশা অথবা উৎকণ্ঠা কিছুই তখন তাঁকে বিক্ষুব্ধ ক'রে রাখেনি। আয়ু যতটুকু বাকি আছে জীবনের, কেমন প্রশান্ত সুখের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে। সেখানে না-ছিলো কোনো আলো, না কোনো ছায়া, শুধু স্নিগ্ধ গোধূলির বিচ্ছুরণ অন্ধকারের গায়ে আস্তে ঝ'রে পড়ছিলো। এই যে সেদিন অত্যন্ত শান্তভাবে গর্বের সঙ্গে হেসে জীবনের বাকি দিনগুলো কেমন ক'রে কাটবে আন্দাজ ক'রে নিয়েছিলেন, সেইদিন এখন কোথায়, কোনখানে, কত দূরে?

তারপরে সে এলো, আসতেই হ'তো তাকে, আগে থেকেই এটা নির্ধারিত হ'য়েছিলো যে সে আসবে, কেননা সে-ই তো তার নিয়তি, শুধু সে, সে একা। তাকে দেখার প্রথম মুহূর্তটি থেকেই তিনি তা জেনেছেন। এসেছে সে, আর যদিও নিজের শান্তিটুকুকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন ফ্রিডেমান, তবু তার আবির্ভাব বুকের ভিতর সেইসব বোধকে জাগিয়ে তুললো, যৌবন

থেকেই যাদের তিনি অবদমন করবার চেষ্টা করেছেন, কেননা তাঁর মনে হয়েছিলো এইসব অনুভূতি আর বোধ শুধু ধ্বংস আর নিগ্রহই ছড়ায়। তারা তাঁকে টেনে চেপে ধরেছে ভীষণ অপ্রতিরোধ্য জোরের সঙ্গে, ছুঁড়ে ফেলেছে মাটিতে।

এরাই তাঁর সর্বনাশ, এটা তো জানাই। তাহ'লে আর যুদ্ধ কেন? কেনই বা নিজেকে এমন ক'রে নির্যাতন করা? যা হবার তা-ই হোক। নির্ধারিত পথ ধ'রে তিনি চ'লে যাবেন, হাঁ-করা শূন্যতার সামনে চোখ বুজে থাকবেন, অদৃষ্টের কাছে মাথা নোয়াবেন, মাথা নোয়াবেন সেই সর্বগ্রাসী অলঙ্ঘনীয়ের কাছে, সেই প্রচণ্ড ক্ষমতার কাছে যা প্রতিরোধের অতীত, যা মধুর কিন্তু কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক।

ঝিকমিক করছে জল; জুঁইগাছের ঝোপ থেকে তীব্র চড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, গাছের আগায় পাখিদের চ্যাঁচামেচি; ডালপালার ফাঁক দিয়ে পুরু মখমলের মতো নীল আকাশ উঁকি মারছে; একরত্তি কুঁজো মানুষটি অনেকক্ষণ ব'সে থাকলেন বেঞ্চির উপর, নিচু হ'য়ে ব'সে থাকলেন, দু'হাতের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে।

রিনলিনগেন-দম্পতির আতিথ্য যে চমৎকার, এ-বিষয়ে কারোই দ্বিমত থাকলো না। মস্ত খাবার-ঘরে সুন্দর সাজানো লম্বা টেবিলে জন তিরিশেক অভ্যাগত বসেছেন; এই উপলক্ষে যে দু'জন ভৃত্যকে নিয়োগ করা হয়েছে তারা খানশামার সঙ্গে ট্রে হাতে ক'রে ঘুরে-ঘুরে আইসক্রীম দিচ্ছে নিমন্ত্রিতদের। ঝনঝন শব্দ হচ্ছে রেকাবির, গেলাশের টুংটাং; বিবিধ সুখাদ্য আর প্রসাধনের গন্ধে হাওয়া আচ্ছন্ন আর উষ্ণ। ধনী ব্যবসায়ীরা এসেছেন স্ত্রী-কন্যা সহ, সেনানিবাসের প্রায় সব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আর এসেছেন বিভিন্ন বৃত্তির কয়েকজন, ব্যবহারজীবী, পরিবারের পুরোনো বন্ধু জনপ্রিয় চিকিৎসক —এক কথায় অভিজাত সমাজের প্রায় সবাই।

সেনাধ্যক্ষের এক ভাগিনেয় বেড়াতে এসেছিলেন ছুটিতে, গণিতের ছাত্র, ফ্রাউ হাগেনস্ট্রেমের সঙ্গে গভীর আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন তিনি। টেবিলের এক প্রান্তে হের ফ্রিডেমানের ঠিক মুখোমুখি ব'সে আছেন। দামী মখমলের গদিতে ব'সে আছেন য়োহানেস ফ্রিডেমান, পাশেই বসেছেন ঔপনিবেশিক অধ্যক্ষের কুরূপা পত্নী। ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনও বেশি দূরে নন, তাঁকে টেবিলে নিয়ে এসেছেন বাণিজ্যদূত স্টিফেন্স। এই ক'দিনেই ছোট্ট

হের ফ্রিডেমান এমন বদলে গেছেন যে অবাক হ'তে হয়। এর জন্যে খানিকটা দায়ী হয়তো ঘরের লণ্ঠনের আলো। গাল বসা দেখাচ্ছে; এমনিতে যতটা, তার চাইতেও বেশি বিকলাঙ্গ মনে হচ্ছে; উদ্দীপ্ত চোখ দু'টি কোনো-এক ভাষাতীত বিষণ্ণ আলোয় জ্ব'লে উঠেছে, চারপাশে আংটির মতো কালো দাগ। অনেকটা মদ্যপান করেছেন; কথা প্রায় বলছেন না, শুধু মাঝে-মাঝে আশে-পাশে দু-একটা ছোট্ট মন্তব্য করছেন।

ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। হঠাৎ এখন ঝুঁকে প'ড়ে তাঁকে ডেকে বললেন, 'আপনার বেহালা আর আপনার জন্যে এ-ক'দিন শুধু-শুধুই অপেক্ষা ক'রে কাটালাম।'

উত্তর দেবার আগে শূন্যচোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে; হালকা রঙের ফ্রক প'রে আছেন গৃহস্বামিনী, নিচু গলা, শুভ্র গ্রীবা অনাবৃত, চকচকে চুলে পুরো ফোটা একটি মার্শাল-নীল গোলাপ গোঁজা, গাল দু'টি ঈষৎ রক্তাভ, কিন্তু চোখের কোনায় সেই নীল ছায়া তেমনি লুকিয়ে আছে।

নিজের রেকাবির দিকে তাকালেন হের ফ্রিডেমান, প্রচণ্ড চেষ্টা করলেন কোনো-একটা উত্তর দেবার; পরক্ষণেই স্কুল-অধীক্ষকের স্ত্রী তাঁকে জিগেস করলেন বেটোফেন তাঁর ভালো লাগে কিনা। এ-কথারও একটা উত্তর দিতে হবে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই টেবিলের কোনা থেকে সেনাধ্যক্ষ তাঁর স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে গেলাশে টোকা দিয়ে বললেন:

'মহিলা ও মহোদয়গণ, পাশের ঘরে ব'সে কফি পান করার প্রস্তাব করছি আমি। অবশ্য বাগানেও এখন খুব ভালো লাগবে, আর, কেউ যদি একটু খোলা হাওয়া চান তো আমিও তাঁর দলে।'

সবাই এমন ভাবে চুপ ক'রে রইলেন যে অস্বস্তিটাকে চাপা দেবার জন্য লেফটেনাণ্ট ফন ডাইডেশাম ছোট্ট ও নিপুণ একটি রসিকতা ক'রে বসলেন। হাসতে-হাসতে সবাই উঠে পড়লেন। ঘর ছেড়ে সবশেষে বেরোলেন হের ফ্রিডেমান আর তাঁর সঙ্গিনী। পুরোনো আমলের ধূমপানের ঘরের মধ্য দিয়ে সঙ্গিনীকে নিয়ে ঝাপশা আলো-জ্বলা মনোরম বসবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

সাজগোজ করেছিলেন অতি সযত্নে। সান্ধ্যপোশাকটি নিখুঁত, ঝকঝকে শাদা শার্ট, সুগঠিত পাতলা পা দু'টি পেটেণ্ট চামড়ার হালকা নাচের জুতোয় ঢাকা, মাঝে-মাঝে পায়ের লাল রেশমি মোজাটাও বেরিয়ে পড়ছে।

বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অভ্যাগতরা অনেকেই সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নেমে যাচ্ছেন ; কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুরুট ধরিয়ে ধূমপান-ঘরের দরজার কাছে এমন একটি জায়গায় দাঁড়ালেন যেখান থেকে বসার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়।

অনেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ঘরের মধ্যে ; আর দরজার ডানপাশে ছোটো একটা টেবিল ঘিরে ছোটোখাটো একটি জটলা তৈরি হয়েছে, মাঝখানে ব'সে সোৎসাহে কথা বলছেন গণিতশাস্ত্রের সেই শিক্ষার্থীটি। একটা বিন্দু থেকে কোনো সরলরেখার সমান্তরাল একাধিক রেখা টানা যায়, এই কথাটা প্রমাণ করার জন্য একের পর এক যুক্তি দিচ্ছেন তিনি। ফ্রাউ হাগেনস্ট্রেম তো তক্ষুনি অসম্ভব ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন, আর তাতে আরো উৎসাহ পেয়ে এতদূর নিশ্ছিদ্রভাবে এটাকে তিনি প্রমাণ ক'রে দিলেন যে তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী এমন ভাব দেখানোর চেষ্টা করতে লাগলেন যেন এই ব্যাপারটি তাঁরা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন।

পিছন দিকে লাল ঘেরাটোপ-দেয়া বাতির পাশে একটা সোফায় ব'সে গের্ডা ফন রিনলিনগেন হের স্টিফেন্সের ছোটো কন্যার সঙ্গে কথা বলছিলেন। হলদে রেশমি গদিতে হেলান দিয়ে হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে ব'সে আছেন, মাঝে-মাঝে আলতো টান দিচ্ছেন সিগারেটে, নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন, নিচের ঠোঁটটা ওল্টানো। ষ্টিফেন্স-তনয়া ব'সে আছে আড়ষ্ট, যেন খোদাই-করা প্রতিমা, চেষ্টা ক'রে একটা হাসি ফুটিয়ে রেখেছে মুখে, মাঝে-মাঝে দু'-একটা ছোটো উত্তর দিচ্ছে।

ছোটো হের ফ্রিডেমানকে কেউ লক্ষ করছিলো না, কাজেই তাঁর আয়ত চোখ দু'টি যে ফ্রাউ ফন রিনলিনগেনের দিকেই নিবদ্ধ তা কেউ দেখতে পায় নি। ঝুঁকে ব'সে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন ফ্রিডেমান ; রাগ বা অনুরাগের কোনো চিহ্ন নেই চোখে, এমনকি কোনো বেদনা পর্যন্ত নেই, ম্লান হ'য়ে আছে তাঁর চোখ, যেন কোনো গুরুভার তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে—কোনো অসহায় ও অক্ষম আরাধনার অন্তহীন ভার।

মিনিট দশেক কেটে গেলো। তারপর ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে তাঁর কাছে এসে এমনভাবে মুখোমুখি দাঁড়ালেন যে মনে হ'লো সারাক্ষণ তিনি যেন গোপনে তাঁকে লক্ষ করছিলেন। উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে ফ্রিডেমান তাঁর কথা শুনতে পেলেন।

'আমার সঙ্গে বাইরে বাগানে যাবেন, হের ফ্রিডেমান? অবশ্য যদি কোনো অসুবিধে না থাকে।'

'সানন্দে,' তিনি উত্তর দিলেন।

'আগে কখনো আপনি আমাদের বাগান ছাখেন নি, না?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে তিনি জিগেস করলেন, 'মস্ত বাগানটা। বেশি লোকজন নেই আশাকরি। একটু খোলা হাওয়া চাই আমার। খাবার সময় মাথা ধ'রে গিয়েছিলো। লাল মদটা বোধ হয় আমার পক্ষে বেশি কড়া হ'য়ে গেছে। চলুন, এদিক দিয়ে যাই।' একটা কাচের দরজা পেরোলেন হু'জনে। তার পর ছাতওলা সরু গলি, ছোটো একটা ঠাণ্ডা উঠোন, তারপর আরো কয়েক ধাপ নেমে বাইরে এলেন।

সেই আশ্চর্য উষ্ণ তারা-ফোটা রাত্রে মালঞ্চ থেকে গন্ধ উঠলো। জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে সমস্ত বাগান; শাদা বাঁধানো পথে পায়চারি করছেন অভ্যাগতরা—সিগারেট টানছেন, আলাপ করছেন; একদল ভিড় করেছেন পুরোনো ফোয়ারাটার চারপাশে; সবাই যাঁকে পছন্দ করে সেই প্রবীণ চিকিৎসকটি সেখানে পাল-তোলা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে তাঁদের হাসাচ্ছেন।

সামান্য মাথা হেলিয়ে তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে ফ্রাউ ফন রিনলিনগেন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন; হাত তুলে দেখালেন সামনের দিকে, যেখানে সযত্ন রক্ষিত গন্ধমদির বাগান মিশে গেছে দূরের অন্ধকারে।

'মাঝের রাস্তা ধ'রে যাবেন?'

চ্যাপ্টা, নিচু, ছোটো হু'টি থাম হুই পাশে শোভা পাচ্ছে। তারপরে গেছে পথ দীর্ঘ বাদাম গাছের সারির মধ্য দিয়ে; তার শেষ প্রান্তে বীথিকার পাশে চাঁদের আলোতে নদীর জল ঝলমল করছে সবুজে সোনায়। তাঁদের ঘিরে শুধু অন্ধকার আর শীতলতা। গাছের ডালের মতো পথ বেরিয়েছে এখানে-ওখানে; সব ক-টাই ঘুরে-ঘুরে বোধহয় নদীতে নেমে গেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে কোনো-খানে কোনো শব্দ নেই।

'নেমে জলের ধারে গেলে,' তিনি বললেন, 'ভারি সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া যায়, মাঝে-মাঝে সেখানে গিয়ে বসি আমি। এখনো সেখানে গিয়ে একটু গল্প করা যায় অবশ্য। দেখুন, দেখুন, ডালপালার ফাঁক দিয়ে কেমন তারা ঝিকমিক করছে।'

হের ফ্রিডেমান কোনো কথা বললেন না, হাঁটতে-হাঁটতে চকচকে অস্থির সবুজ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্থির চোখে। নদীর ওপারে শহরের দেয়াল ঘেঁষে পার্ক দেখা যাচ্ছে। বীথিকা ছাড়িয়ে চ'লে গেলেন তাঁরা, গড়ানো ঢালু ঘাসে-ভরা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালেন, আর, তিনি বললেন :

'এই যে, আসুন এখানেই বসি। ডানদিকে ঘেঁষে চলুন; কেউ নেই ওখানে।'

বেঞ্চিটা বসানো জলের দিকে মুখ ক'রে; পিছনে, ছয় পা দূরে, গাছের সার। বাইরে আরো গরম। ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে, নদীর পারে টুকরো টুকরো নলখাগড়ার ঝোপ। জ্যোৎস্নালোকিত জল নরম একটা আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ দুইজনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপরে তাঁর গলা শুনতে পেলেন ফ্রিডেমান; সেই মৃদু কোমল বিষণ্ণ স্বর, এক সপ্তাহ আগে যা শুনেছিলেন; চিনতে পেরে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো তাঁর শরীর, এবারও নাড়া খেলেন অদ্ভুতভাবে, সেবারে যেমন হ'য়েছিলো :

'এই পঙ্গুতা আপনার কবে থেকে, হের ফ্রিডেমান? জন্ম থেকে?'

গলা আটকে গেলো, বুঝি দম বন্ধ হ'য়ে যাবে; কিছু বলার আগে ঢোক গিললেন, তারপর সবিনয়ে আস্তে বললেন :

'না, ছেলেবেলায় একবার আমাকে ওরা প'ড়ে যেতে দিয়েছিলো।'

'এখন আপনার বয়স কত?' আবার শুধোলেন ফ্রাউ ফন।

'তিরিশ।'

'তিরিশ?' আউড়ে নিলেন তিনি, 'আর এই তিরিশ বছরে আপনি কখনো সুখ জানেন নি?'

মাথা নাড়লেন ছোটো হের ফ্রিডেমান, ঠোঁট দু'টি কেঁপে উঠলো :

'না,' বললেন তিনি, 'যা জেনেছি তার সবটাই মিথ্যে, আমার মনগড়া।'

'তা'হলে নিজেকে আপনি সুখী ব'লেই ভাবতেন?' তিনি জিগেস করলেন।

'চেষ্টা করেছিলাম সুখী হ'তে,' ফ্রিডেমান উত্তর দিলেন। বেদনার সঙ্গে সাড়া দিলেন ফ্রাউ ফন :

'মনের জোর আছে আপনার।'

মিনিটখানেক কেটে গেলো; ঝিঁঝি ডাকছে; পিছনে গাছপালায় ক্ষীণ মর্মর উঠলো।

'কষ্ট কাকে বলে তার অনেকটাই আমি জানি,' ফ্রিডেমানকে বললেন তিনি, 'জলের ধারে এইসব গ্রীষ্মের রাতগুলোই হয়তো এর পক্ষে সবচেয়ে ভালো।' সোজাসুজি কোনো উত্তর দিলেন না ফ্রিডেমান, দুর্বলভাবে হাত তুলে জলের উপর দিয়ে অন্যতীরের দিকে দেখালেন অন্ধকারের ভিতর যেখানে শান্তিতে সব শুয়ে আছে।

'একদিন ওখানে আমি বসেছিলাম। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়।' তিনি বললেন।

'সেদিন আমার কাছ থেকে চ'লে যাবার পর, তাই না?' তিনি শুধোলেন। ফ্রিডেমান শুধু মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন।

তারপর আচমকা আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন ফ্রিডেমান, সারা শরীর কাঁপছে, ফুঁপিয়ে উঠলেন একটু, আর্ত বিলাপের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, কিন্তু তবু তা যেন কোনো তীব্র চাপের হাত থেকে মুক্তি দিলো তাঁকে। তারপর আস্তে গের্ডা ফন রিনলিনগেনের সামনে মাটিতে নির্জীবের মতো ঢ'লে পড়লেন। গের্ডার যে-হাতখানি তাঁর পাশে পড়েছিলো আগে সেটা ছুঁয়েছিলেন, শুধু এখন যেন তাকে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর হাঁটু মুড়ে তাঁর সামনে ব'সে অন্য হাতটিও তুলে নিলেন; কাঁপছেন তিনি, শিউরে উঠছে তাঁর পঙ্গু বিকলাঙ্গ ছোট্ট শরীরটুকু; মুখ ডুবিয়ে দিলেন গের্ডার কোলে, যেন দম বন্ধ হ'য়ে গেলো, হাঁ ক'রে নিশ্বাস নিতে গিয়ে তারই ফাঁকে-ফাঁকে অমানুষিক গলায় থেমে-থেমে ব'লে উঠলেন :

'তুমি ··তুমি জানো, তুমি বোঝো···আমাকে ··আর পারি না ভগবান! হা ভগবান!'

ফ্রাউ ফন বাধাও দিলেন না, মুখও নামিয়ে আনলেন না; একটু পিছন হেলে সোজা হ'য়ে থাকলেন। আলো কাঁপছে নদীর জলে, আর যেন তারই ছায়া পড়েছে তাঁর ঘননিবদ্ধ চোখ দু'টিতে, যার দৃষ্টি ফ্রিডেমানকে ছাড়িয়ে শূন্যে, অনেক দূরে, নিবদ্ধ!

তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ঠেলে দিলেন ফ্রিডেমানকে, ছোট্ট ক'রে হেসে উঠলেন অবজ্ঞায়। ফ্রিডেমানের আগুনের মতো উত্তপ্ত আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিলেন নিজের হাত, তারপর তাঁর হাত চেপে ধ'রে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; একবারও তাকালেন না আর, লাফিয়ে উঠে তক্ষুনি গাছ-পালার আড়ালে ঘন বীথির মধ্যে মিলিয়ে গেলেন গের্ডা ফন রিনলিনগেন।

ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকলেন ক্রিডেমান, হতচেতন, হৃতপৌরুষ; শিহরণের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীরে। জোর ক'রে কোনো মতে উঠে দাঁড়ালেন; দু'-পা এগোলেন, কিন্তু প'ড়ে গেলেন আবার, একেবারে জলের গা ঘেঁষে। এই মুহূর্তে কেমন লাগছিলো তাঁর, কে ম ন লাগছিলো? এর আগে যখন সে দৃষ্টির অবজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বিঁধেছিলো তখনকার সেই ঘৃণার বিলাস আর প্রচণ্ডতা, এখন—যখন তিনি তাঁর সামনে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লেন আর সে তাকে কুকুরের মতো সরিয়ে দিলো—পরিবর্তিত হ'লো এক উন্মত্ত ক্রোধে, হ'লো রূপান্তরিত ও পরিবর্ধিত, যে-ক্রোধ যেমন ক'রেই হোক ফেটে পড়তে চায়, এমনকি তার আপন সত্তার বিরুদ্ধে! বুঝি-বা নিজের প্রতি এক তীব্র বিতৃষ্ণা তাঁকে আপ্লুত করলো আত্মহননের ভীষণ পিপাসায়, যেন টুকরো ক'রে ছিঁড়বেন নিজেকে, এক্ষুনি মুছে দেবেন নিঃশেষে।

পেটে ভর দিয়ে শরীরটাকে আরেকটু টেনে নিলেন, একটু তুললেন উপরের দিকে; জলের মধ্যে প'ড়ে গেলো, তাকালেন না। মাথাও তুললেন না, পাও নাড়লেন না। পা-দু'টি তেমনি নিশ্চল প'ড়ে থাকলো ডাঙায়।

জল ছিটকে ওঠার ছোট্ট শব্দে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হ'লো ঝিল্লি; তারপরে আগের মতোই টেনে-টেনে ডাকতে লাগলো; শরশর শব্দ ক'রে কেঁপে উঠলো গাছের ডালপালা, আর দূর থেকে দীর্ঘ বনবীথি বেয়ে ভেসে এলো হাসির অস্পষ্ট শব্দ।

অনুবাদ: সুপ্রিয়া সেন





ঈশ্বরের প্রতি র‍্যাচেলের তিরস্কার

স্টেফান ৎস্‌হ্বাইগ

অস্থিরচিত্ত জেরুজালেমবাসীরা আবার ভুলে গেছে তাদের প্রভুকে, আবার তারা বলিদান করেছে পেতলে মোড়া পুতুলের পায়ে। শুধু এই অধর্ম আচরণ ক'রেই তারা ক্ষান্ত হয় নি ; ঈশ্বরের যিনি অনুচর সেই সলোমনের নিজের হাতে তৈরি মন্দিরে পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠা করেছে কলের মূর্তি, প্রাঙ্গণের নালাগুলি ভেসে যাচ্ছে পশুবলির রক্তস্রোতে। ঈশ্বর যখন দেখলেন যে তাঁরই মন্দিরে তাঁকেই উপহাস করা হচ্ছে তখন তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। ছড়িয়ে দিলেন তাঁর দুই হাত, তাঁর গলার শব্দে কেঁপে উঠলো আকাশ। আর তাঁর ধৈর্য নেই ; এই পাপে নিমজ্জিত নগরীর উপর তিনি ধ্বংসের অভিশাপ হানবেন : বাতাসে যেমন ভূষি ওড়ে তেমনি উড়ে যাবে নগরবাসীরা। বেজে উঠলো তাঁর বজ্র, আর এই বার্তা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। যে-মুহূর্তে সর্বশক্তিমান তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করলেন, সেই মুহূর্তেই ভয়ে মাটি কেঁপে উঠলো। খুলে গেলো স্বর্গের দরজা, যেমন খুলেছিলো পিতা নোয়ার কালে : গভীর সমুদ্রের বুক থেকে উত্থিত ঝর্নাধারা ছড়িয়ে গেলো পথভ্রষ্ট হ'য়ে, আর উঁচু-উঁচু পাহাড়-পর্বত ন'ড়ে উঠলো থরথর ক'রে। শূন্যের পাখি খ'সে

পড়লো মাটিতে; প্রভুর ক্রোধের এই প্রকাশে এমনকি দেবদূতেরাও ভীত হলেন।

অনেক, অনেক নিচে, অভিশাপগ্রস্ত সেই নগরীর লোকেরা বজ্রকণ্ঠ শুনলো, কিন্তু বুঝলো না। জানলো না যে তারা চরম দণ্ড পেয়েছে। শুধু এইটুকু উপলব্ধি করলো যে পৃথিবী যেন সমূলে উৎপাটিত হ'তে চলেছে; দেখলো ভরা দুপুরে নেমে এসেছে মধ্যরাত্রির অন্ধকার; প্রবল ঝড়ের আঘাতে শক্ত শক্ত সিডার গাছগুলি শিকড়সুদ্ধু এলিয়ে পড়ছে খড়ের কুচির মতো। পাছে ঘরের ছাদ মাথায় ভেঙে পড়ে সেই ভয়ে তারা ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে; আর বাইরে এসে আতঙ্কে শিউরে উঠলো ঝড়ের ঝাপটা, ঝরঝর বৃষ্টি আর গন্ধকের গন্ধভরা ঘোর অন্ধকার বাতাস দেখে। নত হ'য়ে, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে কিছু ফল হ'লো না। প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উন্মত্ত ক্রোধ একটুও হ্রাস পেলো না তাতে, কমলো না সেই ভয়ংকর অন্ধকার।

ঈশ্বরের ক্রোধের বজ্র এমনই ভয়ানক যে শেষ-বিচারের দিনটির জন্য গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে যে-সব মৃতেরা অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা পর্যন্ত উঠে বসলেন। শেষ-বিচারের আদেশ এলো মনে ক'রে তাঁরা উড়ে চললেন স্বর্গের দিকে, ঝটিকাক্ষুব্ধ বাতাস ঠেলে উপরে উঠে দেখলেন, না, এখনো সেদিন আসে নি। কিন্তু তবু, পিতৃপুরুষদের আত্মারা প্রভুকে ঘিরে দাঁড়ালেন, তাঁদের সন্তান আর তাঁদের পবিত্র শহর যাতে মুছে না-যায় সেই প্রার্থনা নিবেদন করলেন তাঁর কাছে। আব্রাহাম আইজ়াক আর যাকব অগ্রণী হলেন। কিন্তু তাঁদের মৃদু স্বর ডুবিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো ঈশ্বরের নির্ঘোষ : তিনি আবার বললেন যে অনেকদিন তিনি সহ্য করেছেন তাঁর প্রজাদের অবাধ্যতা। যারা অকৃতজ্ঞ, যাদের তিনি ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে পারেন নি, মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে আজ তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন।

ঈশ্বর তাঁর সবচাইতে প্রিয় মানুষদের আত্মাদের যখন এই ভাবে চুপ করিয়ে দিলেন, তখন এগিয়ে এলেন সেইসব সাধুসন্ত যাঁরা জীবৎকালে ঈশ্বরের বাণী মানবসমাজে প্রচার করেছেন—এগিয়ে এলেন মোজেস, স্যামুয়েল, এলিজা আর এলিসা—সেইসব মানুষ যাঁদের মুখের কথা অগ্নিতুল্য, হৃদয় যাঁদের প্রজ্জলিত। কিন্তু তাঁদের কথাতেও কান দিলেন না প্রভু, তাঁর ক্রোধের প্রবল বাত্যায় মুখের কথা ফিরে এসে তাঁদের মুখে বাড়ি মারলে। উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো সেই মন্দিরগ্রাসী বিদ্যুৎ।

সাধুসন্তরাও আর সাহস পেলেন না। ঝড়ে যেমন ক'রে ঘাস কাঁপে তেমনি কেঁপে উঠলো তাঁদের প্রাণ; পদদলিত ঝরা পাতার মতন নিষ্প্রাণ হ'য়ে পড়লেন। আর-একটা কথাও উচ্চারণ করার স্পর্ধা হ'লো না কারুর। কিন্তু কথা ব'লে উঠলো এক রমণীর আত্মা, র‍্যাচেলের আত্মা। ইস্রাইলের মাতৃরূপিণী র‍্যাচেল— অন্য সকলের মতো রাহ্‌মায় তার কবরের তলায় শুয়ে শুনলো ঈশ্বরের ঘোষণা, বেরিয়ে এলো সে; তার সন্তানদের জন্য যে চোখের জল সে ফেললো, কোনো সান্ত্বনাতেই তা প্রবোধ মানলো না। প্রেম তাকে শক্তি জোগালো; ঈশ্বরের মুখ না-দেখেও নিজেকে সে দাঁড় করালো তাঁর কাছাকাছি, যদিও একমাত্র দেবদূতেরা ছাড়া আর-কেউ শেষ-বিচারের দিন উপস্থিত হওয়ার আগে ঈশ্বরের মুখ দেখতে পায় না। হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো সে, দুই হাত তুলে বললে:

'হে সর্বশক্তিমান, তোমাকে এইভাবে সম্বোধন করতে আমার হৃদয় যেন হিম জলস্রোতে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু প্রভু, আমার এ-ভীরুতাও যে তোমারই দান; আর তুমিই সেই, যে আমাকে দিয়েছে আমার বাক্‌শক্তি, যাতে আমি আমার ভয়ার্ত হৃদয় নিয়েও উচ্চারণ করতে পারি আমার প্রার্থনা। আমার সন্তানদের তীব্র প্রয়োজনই আমার প্রেরণা। তুমি আমাকে জ্ঞান দাও নি, বুদ্ধি দাও নি, কী ক'রে তোমার ক্রোধ নির্বাপিত করতে হয় তাও আমি জানি না। কিন্তু তুমি, তুমি তো জানো আমি কী বলতে চাই, কারণ যে-কোনো শব্দ মানুষ উচ্চারণ করে তা সর্বপ্রথম জন্ম নেয় তোমার অন্তরে, তুমি পূর্ব থেকেই জানতে পারো মানুষের সকল কর্ম ও সংকল্প। কিন্তু তবু, হে প্রভু, আমি এই প্রার্থনা জানাই যে ঐ পাপী মানবকুলের জন্য আমার কথা তুমি শোনো।'

এই ব'লে র‍্যাচেল তার মাথা নোয়ালো। ঈশ্বর তাতে দেখলেন তার বিনয়, লক্ষ করলেন তার চোখের জল গাল বেয়ে নেমেছে। তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন, র‍্যাচেলের প্রার্থনা শুনে চুপ করলেন তিনি।

স্বর্গে ব'সে ঈশ্বর যখন কিছু শোনেন তখন মহাশূন্য ফাঁকা হ'য়ে যায়, কাল থেমে থাকে। তাই বন্ধ হ'য়ে গেলো বাতাসের চীৎকার, বজ্রের গর্জন, থেমে গেলো বুকে হাঁটা প্রাণীদের গতি, আকাশের পাখিদের ডানা গুটোলো, এমনকি নিশ্বাসটুকুও ফেলার সাহস হ'লো না কারুর, স্তব্ধ হ'লো প্রহরের গতি, দেবশিশুরা দাঁড়িয়ে রইলো মর্মরমূর্তির মতো নিশ্চল। এমনকি চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রও থেমে থাকলো, স্তব্ধ হ'লো নদীর স্রোতের গতি।

অনেক নিচে, দণ্ডপ্রাপ্ত সেই নগরীর অধিবাসীরা জানতেও পারলো না র‍্যাচেল তাদের হ'য়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে, জানলো না সর্বশক্তিমান শুনছেন তার সেই প্রার্থনা। কারণ স্বর্গে যা ঘটে পৃথিবীর মানুষেরা তার কিছুই জানতে পারে না। তারা শুধু এইটুকু জানলো যে ঝড় থেমে গেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো তারা; কিন্তু তাকিয়ে যা দেখলো তা হচ্ছে পুঞ্জ-পুঞ্জ কালো মেঘ: শবাধারের আচ্ছাদনের মতো তা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে। নিশ্ছিদ্র সেই অন্ধকার দেখে ভয়ে তারা নতুন ক'রে শিউরে উঠলো; ভয় বাড়লো, কারণ এই নিস্তব্ধতা যেন তাদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো— শবদেহকে যেমন আচ্ছন্ন করে শববস্ত্র।

কিন্তু র‍্যাচেলের ভয় কেটে গেলো; ঈশ্বর তার বিনতি ও মিনতিতে কান দিয়েছেন দেখে মাথা তুললো সে; ব'লে চললো:

'প্রভু, তুমি তো জানোই, পূর্বদেশে হারান ব'লে একটা জায়গায় আমি থাকতাম। আমার বাব লাবানের অনেক ভেড়া ছিলো। ভেড়া চরানোর দায়িত্ব ছিলো আমার। একদিন সকালে আমরা, কুমারী মেয়েরা, সবাই মিলে ভেড়ার পালকে জলের কাছে নিয়ে গেলাম, কিন্তু কুয়োর মুখে একটা পাথর চাপা ছিলো, সেটা সরানো আমাদের শক্তিতে কুলোলো না। সেই সময় সেখানে উপস্থিত হ'লো এক তরুণ, সম্পূর্ণ অপরিচিত; তার সুঠাম দেহটি যেন লাফিয়ে এগিয়ে এলো আমাদের সাহায্য করতে, আর এমন অনায়াসে সেই পাথরটা গড়িয়ে দিলো যে তার শক্তিতে আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম। নাম তার যাকব, আমার বাবার বোন রেবেকার ছেলে। পরিচয় পেয়ে আমি তাকে আমার পিতৃগৃহে নিয়ে এলাম। আর সেই কুয়োতলায় দেখা হবার একঘণ্টার মধ্যে আমাদের হৃদয় পরস্পরের জন্য আর্ত হ'লো। সেই রাত্রে হৃদয়ে কামনা নিয়ে আমি জেগে রইলাম,—এ-কথা বলতে আমি লজ্জা পাচ্ছি না, কেননা আমি তো জানি যে তোমারি ইচ্ছায় আমাদের হৃদয়ে তুষের আগুনের মতো আবেগ জ্ব'লে ওঠে। প্রভু, তোমারি ইচ্ছায় নারী কামনা করে পুরুষের আলিঙ্গন, তোমারি ইচ্ছায় তরুণ-তরুণীরা যেন মায়াবলে আকৃষ্ট হয় পরস্পরের প্রতি। আর সেইজন্যই, সে-আগুন আমরা নেবাবার চেষ্টা করলুম না, সেই প্রথম দিনই আমি আর যাকব পরস্পরের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম।

'প্রভু, তুমি তো জানোই, আমার বাবা কোন ধরনের মানুষ ছিলেন; যে-

পাথুরে মাটিতে তিনি চাষ করতেন তার মতো, যে-বলদের গলা লাঙ্গলে বাঁধতেন তার শিঙের মতো কঠিন ছিলো তাঁর প্রাণ। যাকব যখন আমাকে বিয়ে করতে চাইলো, তখন প্রথমে তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন যে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী এই যুবকটি, তাঁর এই ভাগ্নে, ঠিক তাঁরই মতো কিনা; জানতে চাইলেন, তার কঠোর শ্রম করার ক্ষমতা আর অসীম ধৈর্য আছে কিনা। লাবান যাকবের কাছে আমার বদলে সাত বছরের শ্রম দাবি করলেন। ভয়ে আমার প্রাণ কেঁপে উঠলো আর যাকবের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো; অল্প বয়স আমাদের, সহজেই ধৈর্য হারাই, আমাদের কাছে সাত বছর অপেক্ষা ক'রে থাকাটা অনন্ত ব'লে বোধ হ'লো। প্রভু, তোমার কাছে সাত বছর একমুহূর্ত মাত্র, যা তোমার নেত্রপাতে শেষ হয়, কারণ তুমি চিরন্তন, তোমার কাছে কালের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু আমাদের মর-জীবনে (হে ঈশ্বর মহাপ্রভু, মনে রেখো এ-কথা) সাত বছর হ'লো জীবনের দশভাগের একভাগ। আমাদের জীবনের ক্ষেত্র এত সীমিত যে দু-চোখ ভ'রে তোমার পবিত্র আলো দেখে নেবার আগেই প্রাণে মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসে। বসন্তের প্লাবনের মতোই মানুষের জীবন, যে-ঢেউ একবার ব'য়ে যায় সে-ঢেউ আর ফিরে আসে না। সাত বছর—সাত বছর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস ক'রেও বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে আমাদের, চুম্বনের গাঢ় বাসনা বুকে নিয়ে দূরে স'রে থাকতে হবে। কিন্তু তবু, যাকব তার মাতুলের ইচ্ছা মেনে নিলে, আর আমি আমার পিতার নির্দেশ শিরোধার্য করলাম। সাত বছর প্রতীক্ষা, বাধ্যতা আর ধৈর্যের ব্রত গ্রহণ করলাম আমরা—পরস্পরকে আমরা এত ভালোবেসেছিলাম।

'তবু বলবো, তুমিই আমাদের দিয়েছো দুরন্ত আবেগ, আর স্বল্পায়ু ব'লে আমাদের প্রাণ সতত শঙ্কাকুল, তাই ধৈর্য ধরা আমাদের পক্ষে সহজ হয় না। আমরা তো জানি যে আমাদের জীবনে বসন্ত শেষ হ'তে-না-হ'তে হেমন্ত এসে যায়, জানি আমাদের জীবনের গ্রীষ্ম কত ক্ষণিক। সেইজন্য আমরা জীবনের হাত থেকে আনন্দের চঞ্চল মুহূর্তগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করি, তাৎক্ষণিক সুখটুকু যথাসাধ্য উপভোগ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। প্রতি পদক্ষেপে যারা বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, ধীরচিত্তে অপেক্ষা করা কি তাদের কাছে সহজ? ভিতরে-ভিতরে জ্বলে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যাই আমরা, কারণ তোমার অনুশাসনে সময় সতত আমাদের গ্রাস করছে। তাড়া না

ক'রে কী করবো বলো, মৃত্যু যে আমাদের ধাওয়া করে। তবু, আমরা জয় করলাম প্রকৃতি, আর প্রতিদিনের অপেক্ষা বোধ হ'তে লাগলো সহস্র দিনের অপেক্ষার সমান। কিন্তু অবশেষে একদিন যখন সেই সাত বছর শেষ হ'লো তখন মনে হ'লো মাত্র একটি দিনই বুঝি পিছনে ফেলে এসেছি। প্রভু, এই-ভাবে যাকবের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আমি, আর যাকব এইভাবে আমাকে ভালোবেসেছিলো।

'সপ্তম বছর শেষ হ'য়ে এলে আমি আনন্দিত চিত্তে আমার বাবা লাবানের কাছে গিয়ে বিবাহবাসর প্রস্তুত করার জন্য মিনতি জানালাম। কিন্তু লাবান, আমার বাবা, আমার সুখ দেখে উৎসাহিত হলেন না—ভুরু কুঁচকে, মুখ বুজে ব'সে রইলেন। তারপর এক সময় আমাকে আদেশ করলেন।

'প্রভু, তুমি তো জানো, আমার দু'বছরের বড়ো লিয়া ছিলো নিতান্ত হতভাগিনী। কোনো পুরুষ কখনো ওকে প্রণয় নিবেদন করে নি ব'লে ওর দুঃখের শেষ ছিলো না। ওর দুঃখ আর ওর কোমল ব্যবহারের জন্য আমি ওকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু বাবা যখন লিয়াকে ডাকতে হুকুম করলেন তখন চকিতে আমার মনে হ'লো যে বাবা বোধহয় আমাকে আর যাকবকে ঠকাবার মতলব করেছেন। কী বলেন, শোনবার জন্য আমি তাই তাঁর তাঁবুর পাশে লুকিয়ে রইলাম। আমার বাবা বললেন :

'"আমার ভাগ্নে যাকব তো র‍্যাচেলকে বিয়ে করার অভিলাষে সাত বছর অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাজ করলো আমার কাছে। কিন্তু তোর কথা ভেবে আমি এতে রাজি হ'তে পারছি না। কারণ বড়োর আগে ছোটো জনের বিয়ে হওয়ার চল তো আমাদের দেশে নেই। সৃষ্টির প্রথমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের নতুন প্রাণ সৃষ্টির আদেশ দিয়েছিলেন যাতে এই পৃথিবী ভ'রে তুলে মানুষ তাঁর পবিত্র নামগান করতে পারে। মৃত্তিকা ও নারী যেন বন্ধ্যা না-থাকে—এই ছিলো তাঁর ঈপ্সা। বন্ধ্যা গোরু-ভেড়াকে পর্যন্ত আমি আমার ক্ষেতের শাকসব্জি খেতে দিই না। আর আমার প্রথম মেয়েকে আমি অনুর্বর হ'য়ে থাকতে দেবো? লিয়া, তুই তৈরি হ'য়ে নে। বিয়ের চেলি পর, যাকব (না-জেনে) র‍্যাচেলের বদলে তোকে বিয়ে ক'রবে।" লিয়াকে এইকথা বললেন আমার বাবা, আর লিয়া ভয়ে-ভয়ে চুপ ক'রে সব শুনলো।

'আড়ি পেতে সব শুনে আমার বাবা আর বোনের প্রতি আমার রাগের আর সীমা রইলো না। ক্ষমা করো প্রভু—আমার এই কন্যার অযোগ্য, ভগ্নীর

অযোগ্য মনোভাবকে ক্ষমা করো, কিন্তু ভেবে ছাখো আমি আর যাকব পরস্পরের জন্য কীভাবে সাত-আট বছর অপেক্ষা করেছি, আর এখন, এই কঠিন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমার বোন লিয়াকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে—তার জীবন যে আমার কাছে নিজের জীবনের চাইতেও মূল্যবান। হে ঈশ্বর, তোমার জেরুজালেমবাসী প্রজারা যেমন তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে আমিও তেমনি বিদ্রোহ করলাম আমার পিতার বিরুদ্ধে—তুমি যে এমন ভাবেই আমাদের সৃষ্টি করেছো, হে প্রভু, যে আমাদের প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ ক'রেছে ভাবলেই আমাদের মেজাজ গরম হ'য়ে ওঠে। গোপনে যাকবের সঙ্গে দেখা ক'রে আমি তাকে আমার বাবার মতলব জানিয়ে দিলাম। আর তা যাতে ব্যর্থ হ'য়ে যায় সেইজন্য আমি তাকে এক গোপন ইঙ্গিত লিখিয়ে দিলাম যাতে সে সত্যিই আমি কিনা বুঝতে পারে। "বিয়ের পরে," আমি বললাম তাকে, "বাসরে ঢোকার আগে নববধূ তোমার কপালে তিনবার চুমু খাবে।" যাকব ব্যাপারটা বুঝে এই ইঙ্গিতের সমর্থন করলো।

'সেদিন সন্ধ্যায় লিয়াকে বিয়ের সাজে সাজালেন লাবান। সুকৌশলে প্রসাধন-চর্চিত করা হ'লো তার মুখ যাতে ঘরে ঢুকে তার কাছাকাছি হওয়ার আগে যাকব তাকে চিনতে না-পারে। পাছে ভৃত্যরা কেউ আমাকে আগে থেকে সাবধান ক'রে দেয় এই ভয়ে আমাকে আটকে রাখলেন গোলাঘরে। অন্ধকারে প্যাঁচার মতো ব'সে থাকতে হ'লো আমাকে, আর রাত যত এগিয়ে এলো রাগ আর ব্যথা ততই কুরে-কুরে খেতে লাগলো আমাকে। প্রভু, তুমি জানো, যে আমার বোন যাকবকে পেলো ব'লে তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ ছিলো না—কিন্তু সাত বছরের দাসত্বের পরে আমার প্রিয়তমকে এইভাবে ঠকানো হচ্ছে এ-কথা ভেবে আমি আমার ক্রোধ দমন করতে পারছিলাম না। ফুর্তির সুরে বেজে উঠলো বিয়ের বাজনা, আর নিজের হাত কামড়ে রক্ত বার ক'রে ফেললাম আমি : সিংহ যেমন তার শিকার ছিঁড়ে খায়, আমার রাগ, আমার দুঃখ ঠিক তেমনি ভাবেই আমার অন্তর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছিলো।

'এইভাবে বন্দী হ'য়ে, বিস্মৃত হ'য়ে আমি সেই দীর্ঘ, তিক্ত সময় কাটাচ্ছিলাম, এমন সময় বাইরে যখন প্রায় আমার হৃদয়ের মতোই দুর্ভেদ্য অন্ধকার নেমে এসেছে তখন আস্তে দরজা খুলে গেলো, লিয়া ঢুকলো। হ্যাঁ, লিয়া, আমার বোন ; সে এসেছিলো তার বিয়ের আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে। পায়ের

শব্দ চিনেও ওকে শত্রু ভেবে আমি মুখ ঘুরিয়ে রইলাম, কারণ ওর বিরুদ্ধে তখন আমার হৃদয় কঠোর হ'য়ে আছে। আস্তে-আস্তে আমার চুলে হাত বুলোলো লিয়া, চোখ তুলে ওর হাতে ধরা প্রদীপের আলোয় দেখলাম লিয়ার মুখ মেঘাচ্ছন্ন। প্রভু, অস্বীকার করবো না যে তা দেখে কুটিল আনন্দে আমার মন ভ'রে উঠলো। এই ভেবে ভালো লাগলো যে লিয়া অস্বস্তি বোধ করছে তার বিয়ের দিনে, লিয়া (লিয়াও) যন্ত্রণা পাচ্ছে কিন্তু বেচারি লিয়া সরল লিয়া আমার এই মনের ভাব বুঝতে পারলে না। একই মায়ের বুকে থেকে কি পরস্পরকে ভালোবাসিনি আমরা ? সহজ বিশ্বাসে সে জড়িয়ে ধরলো আমাকে, ম্লান মুখে বললে :

' "র‍্যাচেল, বোন আমার, এর পরিণতি কী ? বাবার এই পরিকল্পনা আমাকে যে কী যন্ত্রণা দিচ্ছে তা বলতে পারি নে। তোর প্রেমিককে কেড়ে নিচ্ছেন তিনি, যাকবকে দিচ্ছেন আমার হাতে ; ওকে এইভাবে ঠকাবার কল্পনাও যে ভয়ংকর। তোর জায়গায় নিজেকে বসাবার সাহস তো আমার নেই। আমার পা কাঁপবে। আতঙ্ক হচ্ছে আমার, ও নিশ্চয়ই এই প্রতারণা ধ'রে ফেলবে। আমাকে যদি ও ঘর থেকে বার ক'রে দেয় তখন সে-লজ্জা আমি রাখবো কোথায় ? এরপরে দু'তিন পুরুষ ধ'রে লোকে আমায় বিদ্রূপ করবে ; বলবে, 'ঐ যে লিয়া, কুৎসিত লিয়া ! ওর গল্প জানো না ? জোর ক'রে বর বাগাতে গিয়েছিলো, কিন্তু বর কিছুতেই ওকে নেবে না, শেষকালে জোচ্চুরি ধ'রে ফেলে ঘেয়ো কুত্তার মতো ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলো।' র‍্যাচেল লক্ষ্মী, কী করি আমি বল ? করবো এই কাজ, না কি বাবার আদেশ অমান্য করবো ? (বাবার নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা কে না জানে) ? যাকব সঙ্গে-সঙ্গেই ধ'রে ফেলবে, আমি নির্দোষ হ'য়েও লজ্জা লুকোবার জায়গা পাবো না। বোন আমার, তুই সহায় হ, মিনতি করছি, পরম করুণাময় ঈশ্বরের নামে মিনতি করছি।"

'প্রভু, তখনো আমার রাগ কমলো না ; বোনকে ভালোবাসতাম ঠিকই কিন্তু আমার মনে পাপ ছিলো ব'লে তার এই উদ্বেগ আমার কাছে মধুর বোধ হ'লো। কিন্তু তবু, যে-মুহূর্তে সে উচ্চারণ করলো তোমার পবিত্র নাম, তোমার পবিত্রতম নাম, আমাকে অনুনয় করলো পরম করুণাময়ের নামে, সেইমুহূর্তে তোমার করুণা, তোমার শুভ প্রভাব আমার ধমনীতে মদের স্রোতের মতো প্রবাহিত হ'য়ে আমার কালো আত্মাকে আলোকিত ক'রে

তুললো। প্রভু আমার, তোমার চিরন্তন অলৌকিক ক্ষমতাগুলির মধ্যে এও একটি : যে-মুহূর্তে আমরা অপরের দুঃখ সহানুভূতি দিয়ে দেখি, তাদের জ্বালা-ভরা হৃদয়ের বেদনায় অংশ নিই, তখনি আমাদের পরস্পরের মধ্যকার ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে যায়। আমার বোনের গভীর আশঙ্কা আমার মধ্যেও সংক্রমিত হ'লো, নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে আমি ওর চরম বিপদের কথা অনুভব করতে পারলাম। ওর বিপদের ভাগ নিয়ে আমি, তোমার মূর্খ সৃষ্টি (এ-কথা মনে রেখো, হে প্রভু আমার) আমি যেমন তোমার সামনে অশ্রুসিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তেমনি ভাবে চোখের জলে ভেসে লিয়া যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো তখন সমবেদনায় আমি অভিভূত হয়েছিলাম। অভিভূত হয়েছিলাম, কারণ আমার দয়া প্রার্থনা করেছিলো সে, যেমন এখন আমি প্রার্থনা করছি তোমার দয়ার জন্য। নিজের মনোভাব ভুলে গেলাম আমি, শিখিয়ে দিলাম আমাদের গোপন সংকেত : "ঘরে ঢোকার আগে," আমি বললাম, "ওর কপালে তিনবার চুমু খেয়ো।" এই ভাবে, তোমার প্রেমের জন্য আমি আমার ঈর্ষা জয় ক'রে আমার প্রিয়তমকে ঠকিয়েছি।

'আর লিয়াকে এই গোপন কথা জানাতে সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলো না, হাঁটু ভেঙে মাটিতে ব'সে প'ড়ে আমার হাত ধরলো, চুমু খেলো আমার জামার প্রান্তভাগে; কারণ তুমি তোমার সৃষ্টির এই মানুষকে এমন ক'রেই তৈরি করেছো যে যখনি অন্যের হৃদয়ে তোমার শুভ প্রভাবের প্রতিফলন দেখতে পায় তখনি বিনয়ে, কৃতজ্ঞতায় তারা অভিভূত ও বিহ্বল হ'য়ে যায়। পরস্পরকে আমরা জড়িয়ে ধরলাম, দু'জনের অশ্রু এক সঙ্গে মিশে পরস্পরের গাল নোনাজলে ভাসিয়ে দিলো। লিয়া শান্ত হ'লো, প্রস্তুত হ'লো বিদায় নেবার জন্য। কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই আবার নতুন দুঃখে মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এলো তার মুখ, ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখালো।

' "বোন আমার, তোর এই ভালোবাসায় ভরা দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই," সে বললো, "তোর কথামতো কাজ করবো। কিন্তু এই সংকেতেও যদি তার বিশ্বাস না হয়, তাহ'লে কী হবে? আমাকে তোর আরো উপদেশ দিতে হবে, র‍্যাচেল। সে যদি আমাকে তোর নামে ডাকে তাহ'লে কী করবো? নববিবাহিত স্বামীরূপে সে যখন তার বধূকে সম্বোধন করবে, তখন আমি জোর ক'রে নিঃশব্দ থাকবো কী ক'রে? অথচ যে-মুহূর্তে আমি মুখ খুলবো, সে-মুহূর্তে সে বুঝে যাবে স্ত্রী ব'লে যাকে সে গ্রহণ করেছে সে লিয়া, র‍্যাচেল নয়।

তোর গলায় তো আমি জবাব দিতে পারবো না ; বোন আমার, তুই আমার সহায় হ, তোর বুদ্ধির তো শেষ নেই ; পরম করুণাময়ের নামে বলছি আমার সহায় হ তুই।"

'আবার সে তোমার সকল নামের মধ্যে তোমার পবিত্রতম নাম উচ্চারণ ক'রে আমাকে মিনতি জানালো ; আর আবার সেই মাদক আগুন হ'য়ে ব'য়ে গেলো আমার অন্তরে, আবার বিগলিত হ'লো আমার হৃদয়, নিষ্ঠুরভাবে আমার নিজের সকল বাসনা আমি পায়ে মাড়িয়ে গেলাম। চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমি বললাম :

' "শান্ত হও, লিয়া। তারও উপায় আছে। পরম দয়াময়ের নাম স্মরণ ক'রে আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে যাকব র‍্যাচেল ভেবে তোমাকে গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত লিয়া ব'লে সে তোমাকে চিনতে পারবে না। আমার পরিকল্পনাটা শোনো। যাকবের ঘরে তোমার বাসরশয্যার তলায় অন্ধকারে আমি লুকিয়ে ব'সে থাকবো। সে তোমাকে কিছু বললে জবাব দেবো আমি। তাহ'লে তার মনে আর-কোনো সন্দেহ থাকবে না, তোমাকে আলিঙ্গন করবে সে, তোমার দেহে রোপণ করবে নিজের বীজ। তোমার জন্য এই আমি করবো লিয়া, সেই আশৈশবের ভালোবাসার জন্য, পরম দয়াময়ের ভালোবাসার জন্য এই কাজ করবো, যাতে তিনি আমার সন্তান, আমার সন্তানের সন্তানদের উপর করুণা করেন। যখন তারা তাঁকে ডাকবে তাঁর পবিত্র নামে।"

'প্রভু, তখন লিয়া আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো। এক নতুন নারীজন্ম লাভ ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো। দুশ্চিন্তামুক্ত হ'য়ে তার সেই প্রতারক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে সে যাকবের কাছে নিজেকে উৎসর্গিত করতে গেলো। আর আমি, যে-শয্যায় শায়িত হ'য়ে আমার প্রেমিক আমারই বোনের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যাবে, তার আড়ালে লুকিয়ে দুঃখের ভরা পেয়ালায় চুমুক দিলাম। সদ্যবিবাহিত দম্পতির সম্মানে একটু পরেই আবার বেজে উঠলো বাজনা, আর তার পরেই তারা বাসরঘরের দরজায় যুগলে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু ঘোমটা তুলে আশীর্বাদ করার আগে যাকব আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গোপন সংকেতের জন্য অপেক্ষা করলো। তখন লিয়া তার কপালে তিনবার চুমু খেলো। এই ইঙ্গিতে সন্তুষ্ট যাকব সপ্রেমে জড়িয়ে ধরলো তার স্ত্রীকে, দুই হাতে তুলে নিয়ে এলো শয্যায়, যার তলায় আমি

লুকিয়ে আছি। কিন্তু তখনো, লিয়া যা ভেবেছিলো তাই হ'লো, সেই পরম আলিঙ্গনের আগে সে জিগেস করলে: "যাকে আমার দুই হাত জড়িয়ে ধ'রে আছে সে কি র‍্যাচেল?" প্রভু, তখন (তুমি তো সর্বজ্ঞ প্রভু, তুমি তো জানো কত কষ্ট আমার হয়েছে এই কথা বলতে), আমি ফিশফিশ ক'রে বললাম: "হ্যাঁ, আমি, যাকব, স্বামী আমার।"

'সে আমার স্বর চিনলো; আমাকে পাবার জন্য সে সাত বছর কষ্ট করেছে, আমার স্বর জেনে সে আমার বোন লিয়াকে নিজের ব'লে গ্রহণ করলো—পূর্ণযৌবনে ভরা পুরুষের সকল বীর্য দিয়ে। প্রভু, কাস্তে যেমন ঘাস কাটে, তোমার দৃষ্টিও তেমনি অন্ধকার ভেদ ক'রে যায়। তুমি তো আমার অবস্থা দেখেছিলে যখন আমি ওদের থেকে সামান্য একটু দূরেই গুঁড়ি মেরে বসেছিলাম, তখন আমারই দেহে প্রবেশ করেছে মনে ক'রে সে পরম আবেগভরে লিয়াকে গ্রহণ করেছিলো,—কী তীব্রভাবেই না আমি কামনা করেছি তার বাহুবন্ধন। সর্বভূতে বিরাজমান ঈশ্বর, প্রার্থনা জানাই, তুমি মনে ক'রে দেখো সেই স্মরণীয় রাত, যে-রাতে সাত ঘণ্টা ধ'রে তীব্র শূন্যতাবোধ আমাকে কুরে খেয়েছে; আমি অনুভব করেছি, আমার প্রাপ্য যে-সম্ভোগ থেকে আমি বঞ্চিত হলাম, তাতে আরেকজন সম্ভারে ভ'রে উঠেছে। সাত ঘণ্টা, সাত যুগ আমি দমবন্ধ ক'রে শুয়ে থেকেছি ওদের শয্যাপার্শ্বে, প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি কান্নার সঙ্গে, আর সারারাত, ভোরের আলো ফোটার আগে পর্যন্ত, তীব্র কামনায় যাকব উত্তাল থেকে উত্তালতর হ'য়ে উঠেছে। সাত বছরের প্রতীক্ষা যাকবের কাছে যত দীর্ঘ মনে হ'য়েছিলো, তার চাইতে অনেক, আরো অনেক দীর্ঘ ব'লে বোধ হ'লো, সেই রাত্রির সাত ঘণ্টা। কোনোমতেই সইতে পারতাম না সেই রাত, ধৈর্য-পরীক্ষার সেই রাত, যদি-না আমার নীরব অন্তরে আমি বারংবার উচ্চারণ করতাম তোমার পবিত্র নাম, যদি-না তোমার অন্তহীন ধৈর্যের কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে দৃঢ় করতাম। এই আমার একমাত্র কীর্তি প্রভু, এ ক মা ত্র কীর্তি—আমার সমস্ত মানব-জীবন ধ'রে যাকে আমি আমার শ্রেষ্ঠ কর্মের সম্মান দিয়েছি। সহগুণে আর করুণায় আমি আমার সৃষ্টিকর্তার সমান সমান হ'য়েছিলাম। প্রভু, সেই রাত্রেই, যে-তীব্র যন্ত্রণা তুমি আমাকে দিয়েছিলে আর কখনো কোনো মেয়ের বুক সেইরকম মানসিক যন্ত্রণার বোঝায় ভারি হয়েছে কিনা সন্দেহ। তবু আমি যথাসাধ্য সহ্য করেছি। অবশেষে এক

সময় মুরগি ডেকে উঠলো, অবসন্ন দেহে আমি উঠে দাঁড়ালাম, শয্যায় শায়িত দম্পতি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাড়াতাড়ি বাবার বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলাম আমি, কারণ প্রতারণা ধরা পড়তে আর বেশি দেরি হবে না; যাকবের রাগের কথা কল্পনা ক'রেও দাঁতে দাঁত লেগে গেলো আমার। হায়, আমার ভয় অকারণ হয় নি। আমি বাবার হেপাজতে নিরাপদ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতারিত নতুন বরের চীৎকার ক্রুদ্ধ বৃষের আর্তনাদের মতো তীব্র হ'য়ে ভোরের বাতাসকে তছনছ ক'রে ছিঁড়ে ফেললো। হাতে একটা কুঠার নিয়ে এদিকে-সেদিকে আমার বাবা লাবানের খোঁজে ছোটাছুটি করতে লাগলো সে, আর বাবা তার ক্রুদ্ধ জামাতাকে দেখে ভয়ে মোহ্যমান অবস্থায় মাটিতে ব'সে প'ড়ে তোমার পবিত্র নাম ডাকতে লাগলেন। আরো একবার, প্রভু আমার, তোমার নামে এই প্রার্থনা! আমার ম'রে-আসা সাহস আবার জেগে উঠলো, আমাকে জোগালো দৃঢ়তা আর প্রেরণা। যাকব আর লাবানের মাঝে নিজেকে প্রায় ছুঁড়ে দিলাম আমি, যাতে আমার প্রেমিকের রাগটা আমার উপর এসে প'ড়ে আমার পিতার প্রাণ রক্ষা করে। রাগে লাল চোখে প্রতারক প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে যাকব আমার মুখে ঘুষি মারল, আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। প্রভু, তুমি তো জানো যে নিঃশব্দে এই আঘাত আমি সহ্য করেছিলাম, কারণ তার ভীষণ ক্রোধ তার ভীষণ ভালোবাসারই প্রকাশমাত্র। সে যদি মেরেও ফেলতো আমাকে—আর সত্যি বলতে কি, আমাকে মারবার জন্য কুঠারও সে তুলেছিলো—তাহ'লেও আমি তোমার সিংহাসনের সামনে বিনা অভিযোগে এসে দাঁড়াতাম। কিন্তু যে-মুহূর্তে বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে সে আমাকে প'ড়ে থাকতে দেখলো সেই মুহূর্তে তার মন মমতায় ভ'রে উঠলো। শিথিল হাত থেকে খ'সে পড়লো কুঠার। আমার উপর ঝুঁকে প'ড়ে প্রেমচুম্বনে আমার ঠোঁটের রক্ত মুছে নিলো সে। আমার জন্য সে ক্ষমা করলো আমার বাবা লাবানকে; আর লিয়াকে তাড়িয়ে দিলো না। এক সপ্তাহ পরে, আমার বাবা দ্বিতীয় স্ত্রী-রূপে আমাকে তার হাতে তুলে দিলেন। যাকব আমার গর্ভসঞ্চার করলো, তার সন্তানের জন্ম দিলাম আমি, বুকের দুধ দিয়ে আমি তাদের বড়ো করলাম; প্রভু, তোমারই অনুশাসনে আমি ওদের শিখিয়েছি তোমার অনির্বচনীয় নাম-রহস্য, শিখিয়েছি বিপদের দিনে তোমাকেই ডাকতে। আর আজ, হে প্রভু, হে সর্বশক্তিমান, পরম দয়াময় ঈশ্বর, আজ আমার নিজের চরম প্রয়োজনের দিনে

যাকব যা করেছিলো আমি তাই করতে বলছি তোমাকে : তোমার ক্রোধের কুঠার নামিয়ে ফ্যালো, সরিয়ে দাও তোমার বিরূপতার মেঘ। র‍্যাচেল দয়া করেছিলো তার বোন লিয়াকে, তুমি কি র‍্যাচেলের সন্তানসন্ততিকে দয়া করবে না? আমি যদি ধৈর্য ধরতে পারি, তাহ'লে তুমি কি একটুও ধৈর্য ধরবে না, রক্ষা করবে না এই পবিত্র শহরকে? ওদের দয়া ক'রো প্রভু; জেরুজালেমকে দয়া করো।'

স্বর্গলোক ভ'রে ধ্বনিত হ'তে থাকলো র‍্যাচেলের কণ্ঠস্বর। তার শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে এসেছে : শ্রান্ত র‍্যাচেল হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো, তার কম্পিত শরীর বেয়ে ছড়িয়ে গেলো কালো স্রোতের মতো তার চুল। এই ভঙ্গিতে র‍্যাচেল প্রতীক্ষা করলো ঈশ্বরের উত্তরের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর উত্তর দিলেন না। তিনি নীরব রইলেন। স্বর্গে পৃথিবীতে, তাদের মাঝখানকার গ্রহজগতে, ঈশ্বরের নীরবতার চাইতে ভয়ংকর আর-কিছু নেই। ঈশ্বর নীরব হ'লে কালের গতি স্তব্ধ হ'য়ে যায়; আলো মিশে যায় অন্ধকারে; দিন মিশে যায় রাত্রিতে; এই বিশ্বজগতের সকল বাসযোগ্য জগতে বিরাজ করে সৃষ্টিপূর্বের বিশৃঙ্খলা। জঙ্গম জড়ে পরিণত হয়, থেমে যায় নদীর গতি, ফুল ফোটে না, ঈশ্বরের বাণীর শক্তি বিনা এমনকি জোয়ার-ভাঁটাও বন্ধ থাকে। কোনো মরণশীলই ঈশ্বরের স্তব্ধতা সইতে পারে না, এই ভীতিপ্রদ শূন্যতায় সকল প্রাণীর প্রাণস্পন্দন বন্ধ হ'য়ে যায়, কিছুই থাকে না ঈশ্বর বিনা, আর এমনকি তিনিও, সকল জীবনের প্রাণকেন্দ্র ঈশ্বরও, নীরব হ'লে আর জীবিত থাকেন না।

পরম ধৈর্যশীলা র‍্যাচেলও তার অন্তহীন প্রয়োজনের বিবৃতির জবাবে ঈশ্বরের এই অনন্ত নীরবতা সইতে পারলো না। অদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মাতৃস্বরূপিণী দুই হাত তুলে ধরলো সে, প্রবল উষ্মায় তার মুখের কথা অগ্নিতুল্য বোধ হ'লো।

'তুমি কি শুনলে না আমার কথা, সর্বভূতে বিরাজমান প্রভু? আমার কথা কি তুমি বোঝো নি, সর্বজ্ঞ তুমি? তোমাকে বোঝাবার জন্য তোমারই সৃষ্ট এক সামান্য মানুষকে কি আরো সহজ ক'রে কথা বলতে হবে? শোনো তাহ'লে (তোমার শ্রবণশক্তি যদিও দুর্বল, তবু শোনো) আমার যা প্রাপ্য যাকব তা আমার বোন লিয়াকে দান করেছিলো ব'লে আমি ঈর্ষাকাতর হয়েছিলাম, ঠিক যেমন তুমি ঈর্ষাকাতর হয়েছো আমার সন্তানেরা তোমার বদলে অন্য দেবতার পুজো দিয়েছে ব'লে! কিন্তু আমি এক দুর্বল স্ত্রীলোক,

আমি জয় করেছি আমার ঈর্ষা, তোমার কথা স্মরণ ক'রে আমি দয়া করেছি—তোমার কথা স্মরণ ক'রে, যাকে আমি জানি পরম দয়াময় ব'লে। আমি দয়া করেছি লিয়াকে, যাকব দয়া করেছে আমাকে। মন দিয়ে শোনো, সর্বশক্তিমান! আমরা সবাই, অসহায় মরণশীল মানুষ হ'য়েও, জয় করেছি আমাদের ঈর্ষাকাতর পাপী মনোবৃত্তি। কিন্তু তুমি সর্বশক্তিমান, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকর্তা, তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তোমাতেই সূচনা এবং সমাপ্তি, শুরু আর শেষ, তোমার সমুদ্রে আমরা বুদ্বুদ মাত্র,—সেই তুমি একটুও করুণা করতে পারো না! জানি আমার সন্তানরা জেদি, নির্বোধ, বারংবার তারা বিদ্রোহ করেছে তোমার বিরুদ্ধে। কিন্তু, প্রভু, তুমি ঈশ্বর, তুমি প্রভু, প্রাচুর্যের অধীশ্বর, তুমি কি সহ্য করবে না তাদের জেদ, ওদের অন্যায়ের সঙ্গে সমতালে কি চলবে না তোমার ক্ষমার মাহাত্ম্য? তা তো হ'তে পারে না, প্রভু; হ'তে পারে না যে দেবদূতদের সমক্ষে তুমি নিজেকে এমন লজ্জাকর অবস্থায় উন্মোচিত করবে যাতে তারা বলতে পারে: "এক সময় পৃথিবীতে র‍্যাচেল নামে একটি মেয়ে ছিলো, ক্ষীণপ্রাণ এক মর্তবাসী হ'য়েও সে নিজের ক্রোধ দমন করেছিলো। কিন্তু যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি এই বিশ্বের অধীশ্বর, প্রভু এবং স্বামী, তিনি নিজের প্রবৃত্তির দাস হ'য়েছিলেন।" না, প্রভু, তা যেন না-হয়, কারণ তোমার দয়া অনন্ত না-হ'লে তুমি নিজে কী ক'রে অনন্ত হ'বে—অনন্ত না-হ'লে কী ক'রে তুমি ঈশ্বর থাকবে? সেই ঈশ্বর থাকবে না যাকে আমি তৈরি করেছি অশ্রুজলে, যে আমাকে ডেকেছে আমার বোনের চোখের জলের মধ্য থেকে। তুমি তাহ'লে হবে এক অ দ্ভু ত দে ব তা—শাস্তি আর প্রতিহিংসার দেবতা; আর আমি র‍্যাচেল, আমি ভালোবেসেছিলাম শুধু সেই ঈশ্বরকে যিনি প্রেমের দেবতা, আমি শুধু সেই ঈশ্বরের দাসী যিনি পরম করুণাময়; তাই আমি আজ দেবতাদের সাক্ষী রেখে তোমাকে পরিত্যাগ করলাম। তাঁরা এবং তোমার সাধুসন্তরা হয়তো লজ্জিত হবেন। কিন্তু আমি র‍্যাচেল, আমি মা, আমি লজ্জিত হচ্ছি না। মাথা উঁচু ক'রে আমি তোমাকে অগ্রাহ্য করছি, হে ঈশ্বর, তোমাকে আমি তিরস্কার করছি, যদি না তুমি আমার সন্তানদের মাথার উপর থেকে তোমার বিষম মূর্ছার অভিশাপ তুলে নাও। ভগবান, তোমার কথা তোমার আপন স্বভাবের বিরোধী, তোমার ক্রুদ্ধ মুখ তোমার অন্তরের ঈপ্সার অবমাননা। বিচার করো, ভগবান, তোমার সঙ্গে তোমার মুখের কথার তুলনা করো। যদি সত্যি তুমি এই হও, অসূয়াপন্ন, বিদ্বেষী, হিংসুক

দেবতা হও, তাহ'লে আমি এই মুহূর্তে ঝাঁপ দেবো ঐ অতল অন্ধকারে, ভাগ নেবো আমার সন্তানদের সর্বনাশা দণ্ডের। ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের রূপ আমি ধ্যান করতে চাই নে, হিংসুক ঈশ্বরের চিন্তামাত্রে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু তুমি যদি করুণাময় হও, তুমি যদি সেই ঈশ্বর হও, যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, যার মন্ত্র শুনে আমি পা ফেলেছি, তাহ'লে তোমার সেই রূপ আমার কাছে উদ্ভাসিত করো; সুবিচার করো, রক্ষা করো আমার সন্তানদের। দয়া করো জেরুজ়ালেমের উপর।'

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই কথা ক-টি ব'লে র‍্যাচেলের শক্তি আবার নিঃশেষিত হ'লো। পরম পিতার উত্তর প্রতীক্ষা ক'রে রইলো সে, মৃত চোখের মতো বুজে এলো তার চোখের পাতা।

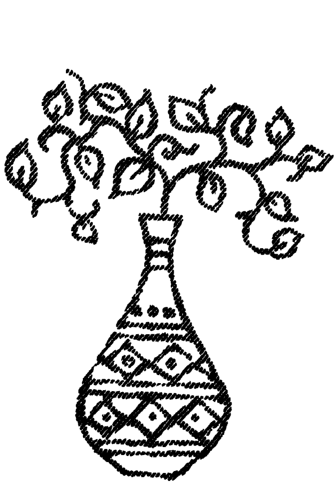
সাধুসন্তরা, পিতৃপুরুষেরা সভয়ে স'রে গেলেন; তাঁদের মনে কোনো সংশয় রইলো না যে ঈশ্বরকে তিরস্কার করার স্পর্ধা যার হয়েছে তার আত্মা এই মুহূর্তে জ্ব'লে যাবে ঈশ্বরের বিদ্যুতে। ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন উপরে সিংহাসনের দিকে। কিন্তু সেখানে কোনো সান্ত্বনা পেলেন না।

ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ভয় পেয়ে দেবদূতেরা তাদের ডানায় মাথা গুঁজলো। তারপর উঁকি মেরে দেখতে লাগলো সেই মেয়েটিকে, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা যে অস্বীকার করেছে। তারা দেখলো তার কপাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো: আলো আসছে ভিতর থেকে, র‍্যাচেলের মায়ের স্নেহে ভরা গালের উপর লাল আভায় জ্বলছে তার চোখের জল ভোরের আলো-পড়া শিশিরের মতো। ব্যাপারটা কী? এবারে দেবদূতেরা বুঝতে পারলো। ঈশ্বর র‍্যাচেলের কাছে উদ্ভাসিত করছেন তাঁর প্রেমময় রূপ। তারা বুঝলো যে ঈশ্বর ভালোবাসেন তাঁর কথার প্রতিবাদকারিণীকে, শুধু এইজন্য ভালোবাসেন যে, সে নির্ভয় আর অস্থির। তাকে তিনি অনেক বেশি ভালোবেসেছেন সাধুসন্তদের চাইতে, সেইসব পুণ্যাত্মাদের চাইতে যাঁরা পরম আনুগত্যে তাঁর কথা মেনে নিয়েছেন। ভয় দূর ক'রে দেবদূতেরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চোখ তুলে তাকালো, দেখলো অপরূপ আলোকোজ্জ্বল এক শান্তি আবার ঘিরে রয়েছে ঈশ্বরকে, আর তার মৃদু হাসির শান্তি-প্রদায়িনী উজ্জ্বল নীল ভ'রে ফেলেছে স্বর্গের অন্তহীন মহাশূন্য। সহাস্যে চোখ খুলে উড়ে চললো দেবশিশুরা, তাদের ডানার মৃদু মর্মর গান হ'য়ে ছড়িয়ে গেলো আকাশে। সারা আকাশ

যেন জ্ব'লে উঠলো, ঈশ্বরের মুখের প্রখর উজ্জ্বলতায় কোনো নর-চক্ষু সে-আলো সইতে পারে না। দেবদূতেরা একসঙ্গে এবার গান শুরু করলেন এবং যে-সব মৃতেরা তাঁদের কবর থেকে উঠে এসেছিলেন তাঁরাও যোগ দিলেন এই নাম-গাথায়, তাঁদের সঙ্গে মিশলো সেইসব অগণিত মানুষের গলার স্বর ঈশ্বর যাদের এখনো পৃথিবীতে জন্ম নেবার আদেশ দেন নি।

কিন্তু এখন যারা বাস করছে পৃথিবীতে, অনেক নিচের সেইসব মরণ-ক্ষীণ মানুষেরা স্বর্গে যে কী ঘ'টে গেলো লক্ষ করলো না (সবসময়ই যা হয়)। জানলো না কী হচ্ছে তাদের মাথার উপর। আবৃত, কাতর, দুঃখিত মুখে তারা অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তাকালো। তারপর তাদেরই মধ্যে দু'-একজনের কানে এলো একটা মৃদু শব্দ, যেন মর্মরধ্বনি ভেসে আসছে ফাল্গুনের বাতাসে। মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো তারা: ঘন মেঘ টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশে, আর শূন্য জগৎ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ফুটে আছে এক রামধনু; মাতৃসমা র‍্যাচেলের অশ্রুজলে ঈশ্বরের আলোকের প্রতিফলনে তৈরি সেই রামধনু।

অনুবাদ: মীনাক্ষী দত্ত





সূর্য

ডি. এইচ. লরেন্স

ডাক্তারদের উপদেশ, 'ওঁকে সূর্যের আলোর দেশে নিয়ে যান।'

তার নিজের সূর্যের ওপর তেমন বিশ্বাস নেই। তবু সাগর পারে যখন তাকে রওনা ক'রে দেওয়া হ'লো তখন সে আপত্তি করলে না। সঙ্গে গেলো তার ছেলেটি, তার মা ও একজন নার্স।

জাহাজ ছাড়লো মাঝ রাত্রে। তার আগে দু-ঘণ্টা তার স্বামী তার সঙ্গেই ছিলো। ছেলেটিকে তখন শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, যাত্রীরা জাহাজে আসতে শুরু করেছে। গম্ভীর অন্ধকার রাত্রি, হাডসান নদীর জল সেই অন্ধকারে গাঢ় কালির মতো দুলছে। তার ওপর আলোর ছোটো-ছোটো ধারা যেন ছিটিয়ে পড়েছে। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিলো : এই তো সমুদ্র! সবাই যা ভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর। কত স্মৃতি যে এর মধ্যে মিশে আছে, কেউ জানে না। সেই মুহূর্তে সমুদ্র শাশ্বত কালের প্রলয় নাগের মতো একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো।

স্বামী তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, 'সত্যি, এই বিদায় নেওয়া ব্যাপারটা

ভারি বিশ্রী, আমার এ-সব কখনো ভালো লাগে না।' স্বামীর কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা, উদ্বেগ এবং তারি সঙ্গে হতাশার আশার সুর।

মেয়েটি নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বললে, 'আমারও না।' তার মনে পড়লো, পরস্পরের প্রতি কী বিতৃষ্ণা নিয়েই না তারা ছাড়াছাড়ির জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলো। এই বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে তার মনটা বুঝি একটু নরম হ'য়েই এসেছিল, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষতটা তাতে শেষ পর্যন্ত আরও গভীর হ'য়েই উঠলো।

তারা তাদের ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে চাইলে, বাপের চোখ সজল হ'য়েও উঠলো। কিন্তু চোখ একটু সজল হ'য়ে ওঠা-না-ওঠায় কিছু এসে যায় না। যাতে এসে যায় তা হ'লো, বর্ষব্যাপী, জীবনব্যাপী বজ্রকঠিন অভ্যাসের ছন্দ—অন্তর্লীন শক্তির গভীর আবর্তন।

তাদের দু'জনের জীবনের শক্তির এই আবর্তন পরস্পরের বিরোধী। দুই বিভিন্ন ছন্দের যন্ত্রের মতো তারা এই পরস্পরকে শুধু ধ্বংসই করছে। যারা জাহাজের যাত্রী নয়, খালাশিরা এবার চীৎকার ক'রে তাদের ডাঙায় নেমে যেতে বলছে, শোনা গেলো।

মেয়েটি বললে, 'মরিস, এবার তুমি নেমে যাও।' সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হ'লো, ওর এখন ডাঙায় নামার পালা, আর আমার অকূলে পাড়ির।

জাহাজ ধীরে-ধীরে কূল থেকে স'রে যাচ্ছে, মরিস জেটির ওপর থেকে রুমাল ওড়াচ্ছে—জেটির মধ্যে রাত্রির বিজনতায় সহস্রের মধ্যে একজন। আলোর সার-বসানো বড়ো বড়ো থালার মতো খেয়া নৌকোগুলো তখনো হাডসান নদীর ওপর দিয়ে পারাপার করছে। অন্ধকারের একটা কালো গহ্বর দেখা যাচ্ছে—ঐটেই বোধহয় ল্যাকাওয়ান্না স্টেশন।

জাহাজ মন্থরভাবে ভেসে চলেছে, হাডসান যেন আর ফুরোয় না। অবশেষে তারা বাঁকটা ঘুরে গেলো। ব্যাটারির নাতিপ্রচুর আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। 'লিবার্টি' যেন বদমেজাজে তার মশালটা তুলে ধরেছে। সাগরের ঢেউয়ের আভাস এবার পাওয়া যাচ্ছে।

আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুর মতো সমস্ত আটলান্টিকের ম্লান বিবর্ণ রূপ। তবু শেষ পর্যন্ত সে সূর্যের দেশে এসে পৌঁছলো। এমনকি নীলতম সমুদ্রের ধারে একটা বাড়িও তার জুটলো। সে বাড়িতে বিরাট বাগান, বাগান কেন দ্রাক্ষা কুঞ্জই তাকে বলা যায়। ধাপে-ধাপে শুধু আঙুর আর জলপাইবীথি সমুদ্রতীর

পর্যন্ত নেমে গেছে। আর সে-বাগানে কত নিরালা গোপন জায়গা। বিদীর্ণ মাটির গহ্বরে লেবুগাছের কুঞ্জ, কোথাও-বা লুকানো সবুজ জলের কুণ্ড। হঠাৎ কোথাও-বা ছোটো একটা গুহা থেকে একটা ঝরনা বেরিয়ে এসেছে। গ্রীকরা আসবার আগে এখানেই হয়তো আদিম 'সিকিউল'রা জলপান করতো। প্রাচীন একটা কবরে ছাইরঙা একটা ছাগল ডাকছে। বাতাসে 'মিমোসা'র গন্ধ, আর দূরে আগ্নেয়গিরির চূড়ায় তুষারপুঞ্জ।

সবই সে দেখলো, একদিক দিয়ে এ-সবে মনটা কতকটা জুড়িয়ে যায়। তবু এ-সবই বাইরের, সত্যিই এ-সবের প্রতি তার কোনো টান নেই। সে যা ছিলো এখনো তাই আছে—সেই জ্বালা, সেই ব্যর্থতা, সেই সত্যকার কিছু অনুভব করবার অক্ষমতা। ছেলেটির ওপরও সে বিরক্তি বোধ করে। তার জন্যেও তার মনের শান্তি যেন নষ্ট হয়। এই ছেলের দায়িত্বই তার অত্যন্ত কুৎসিত, অত্যন্ত দুঃসহ লাগে, যেন তার প্রত্যেক নিশ্বাসের জন্যেও তাকে দায়ী থাকতে হবে। এই দয়িতার পক্ষেও যেমন যন্ত্রণা ছেলেটির পক্ষেও তাই। আর-সবাইও এই এক কারণে উত্ত্যক্ত হ'য়ে ওঠে।

মা একদিন বললেন, 'তোমার মনে আছে তো, জুলিয়েট, ডাক্তার তোমায় সব কাপড়-চোপড় খুলে রোদে শুয়ে থাকতে বলেছেন। কই, ডাক্তারের কথামতো কাজ করছো কই?'

জুলিয়েট ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'করবার মতো অবস্থা হ'লেই করবো। তোমরা কি আমায় মেরে ফেলতে চাও?'

'তোমায় মেরে ফেলতে? মোটেই না, শুধু তোমার ভালো করতেই চাই।'

'দোহাই তোমাদের, আর আমার ভালো ক'রে তোমাদের দরকার নেই।'

মা শেষ পর্যন্ত রাগে-দুঃখে তাকে ছেড়ে চ'লেই গেলেন।

সমুদ্র শাদা হ'য়ে গেলো, তারপর আর তা দেখাই গেলো না, শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সূর্যের উদ্দেশে গড়া সেই বাড়ি হিমের মতো ঠাণ্ডা। তারপর একদিন আবার সমুদ্রের শেষ প্রান্ত উদ্ভাসিত ক'রে উঠলো গলিত উলঙ্গ সূর্য। বাড়িটা দক্ষিণ-পূর্ব-মুখী। জুলিয়েট বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এই সূর্য ওঠা দেখলো। এমন সূর্যোদয় সে যেন কখনো ত্যাখেনি। দিক্‌প্রান্তে সাগর-সীমায় দাঁড়িয়ে উলঙ্গ সূর্য রাত্রিবাস ছেড়ে ফেলেছে। এই দৃশ্য তার কাছে অপূর্ব।

তাই গোপনে তার মনে নগ্ন দেহে রৌদ্র-স্নানের বাসনা জেগে উঠলো। অতি গোপনে সেই বাসনা সে মনে পোষণ ক'রে রাখলে।

কিন্তু বাড়ি থেকে, মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে গিয়ে সূর্যকে সে অভিনন্দিত করতে চায়। তবে এ-দেশে লুকিয়ে কোথাও যাওয়া সহজ নয়। প্রতি জলপাই গাছের এখানে যেন চোখ আছে, মানুষের দৃষ্টি কোথাও এড়ানো যায় না। অবশেষে একটা জায়গা সে খুঁজে পেলো। বড়ো বড়ো ফণিমনসা জাতের গাছে ঢাকা পাহাড়ের একটা খোঁজ, সমুদ্রের ওপর ঝুলে আছে। ফণিমনসার এই সব ঝোপের ভিতর থেকে নীল আকাশ ছুঁয়ে একটা সরল, ঋজু 'সাইপ্রাস' উঠেছে, সমুদ্রের পাহারাদারের মতো। অথবা মনে হয়, সে যেন একটা বিরাট রুপালি দীপাধার, আলোর বদলে অন্ধকার যার শিখা—যেন পৃথিবীর প্রগাঢ় বেদনার উদ্ধত অঙ্গুলি সংকেত।

জুলিয়েট সেই দেবদারু তলায় ব'সে সব আবরণ খুলে ফেললে। তার চারদিকে বীভৎস ও অপরূপ ফণিমনসার কাঁটা ঝোপের প্রাচীর। সেখানে ব'সে সে তার হৃদয় সূর্যের দিকে উন্মুক্ত ক'রে দিলে। তবু বেদনার দীর্ঘশ্বাস একবার যেন পড়লো—এমন ক'রে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হওয়ায় নিষ্ঠুরতার জন্যে বেদনা।

সূর্য সদর্পে নীলাকাশ পার হ'তে-হ'তে অজস্র আলোর ধারায় তাকে স্নান করিয়ে গেলো। সেই তার বুক, কোনোদিন যা পূর্ণ বিকশিত হবে না ব'লে মনে হয়েছে, তার ওপর সমুদ্রের কোমল বাতাসের স্পর্শ সে অনুভব করলে। তবু সূর্যের অনুভূতি সেখানে এখনো যেন নেই। পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই শুকিয়ে যাওয়া যেন তার নিয়তি। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বুকের মধ্যে সূর্যকে যেন সে সত্যই অনুভব করতে পারছে মনে হ'লো, প্রেমের চেয়েও তপ্ত সে অনুভূতি; তার শিশুর হাতের আদর, প্রথম দুগ্ধ-সঞ্চারের অনুভূতির চেয়েও তীব্র। সত্যই তপ্ত রৌদ্রপায়ী দীর্ঘ শুভ্র দ্রাক্ষাফলের মতো এখন যেন তার রূপ। সম্পূর্ণ আবরণমুক্ত হ'য়ে সে সূর্যালোকে শুয়ে থাকে আর মাঝে-মাঝে আঙুলের ফাঁক দিয়ে কেন্দ্রীয় সূর্যকে দেখবার চেষ্টা করে, সেই নিটোল স্পন্দিত বহ্নিমণ্ডল; ক্ষণে-ক্ষণে যার বিচ্ছুরিত জ্যোতি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনে হয় নীল বহ্নিমুখ নিয়ে সূর্য যেন তার দিকে চেয়ে আছে, তার সর্বাঙ্গ যেন সে বেষ্টন ক'রে ধরেছে।

চোখ বন্ধ ক'রে সে শুয়ে থাকে। চোখের পাতার ভিতর দিয়ে রক্তাভ সূর্য শিখা তবু দেখা যায়। এ যেন অসহ্য, চোখের ওপর সে কয়েকটা পাতা কুড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দিলে। তারপর আবার শুয়ে রইলো নিশ্চিন্তভাবে, সে যেন

শুভ্র কোনো একটা ফল, সূর্যালোকে সোনার মতো যাকে পরিপক্ক হ'য়ে উঠতে হবে।

সূর্য তার দেহের মধ্যে অস্থি পর্যন্ত ভেদ ক'রে প্রবেশ করছে সে টের পায়, শুধু অস্থি কেন, তার চিন্তায় পর্যন্ত যেন সূর্যের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ। হৃদয়ের গভীর সব আবেগ যেখানে তার জট পাকিয়ে গিয়েছিলো, সূর্যের উত্তাপে সেখানে যেন সমস্ত জট খুলতে শুরু ক'রে। যেখানে তার মনে চিন্তার ধারা রক্তের মতো জমাট বেঁধে গিয়েছিলো, সেখানেও সূর্য যেন ধীরে-ধীরে সব গলিয়ে দেয়। অন্তর, বাহির সমস্ত যেন তার তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কী যে তার মধ্যে হচ্ছে তা বুঝতে পেরেই বিস্ময়ে সে যেন অভিভূত হ'য়ে থাকে। তার ক্লান্ত হিম-শীতল হৃদয় এত দিনে গ'লে যাচ্ছে, গলতে-গলতে বাষ্পাকারে মিশে যাচ্ছে।

পোশাক পরবার পর আবার একবার শুয়ে প'ড়ে সে খানিকক্ষণ 'সাইপ্রাস' গাছটার মাথার দিকে চেয়ে থাকে। বাতাসে সরু লিকলিকে ডগাটা এধার থেকে ওধারে দুলছে সে দেখতে পায়, আর টের পায় মহিমান্বিত সূর্য সগৌরবে আকাশ পার হ'য়ে চলেছে।

বাড়িতে যখন সে ফেরে তখন প্রখর সূর্যালোকে চোখ তার ধাঁধিয়ে গেছে, কেমন যেন সে প্রায়ান্ধ, বিহ্বল। তার এই অন্ধতা যেন তার কাছে একটা পরম ঐশ্বর্য ; তার এই তপ্ত গাঢ়, অর্ধসচেতন আচ্ছন্নতা যেন মহামূল্য সম্পদ।

'মা! মা!' ব'লে তার ছেলেটি তার দিকে দৌড়ে আসে। তার গলায় পাখির মতো মা-কে পাবার একটা ব্যাকুলতা—মা কে সে সব সময়ই পেতে চায়। এই প্রথম তার ডাকে জুলিয়েটের তন্দ্রাজড়িত হৃদয় বুঝি আপনা হ'তে ব্যাকুল আগ্রহে সাড়া দিয়ে ওঠে না। জুলিয়েট নিজেই অবাক হ'য়ে যায়। ছেলেকে সে কোলে তুলে নেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে হয়, শুধু একটা তুলতুলে এমন মাংসের ডেলা না-হ'য়ে সূর্যের ছোঁয়া পেলে সে সত্যই সজীব ভাবে বেড়ে উঠতে পারতো।

ছেলেটি হাত দিয়ে তার গলা আঁকড়ে ধরতে চায়, জুলিয়েটের সেটা মোটেই ভালো লাগে না। তার হাত থেকে গলাটা সে জোর ক'রেই ছাড়িয়ে নেয়। কোনো স্পর্শই সে যেন এখন সহ্য করতে পারবে না।

ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সে বলে, 'যাও, রোদ্দুরে গিয়ে খেলা করো।'

ছেলেটির সব পোশাক সে তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলে উলঙ্গভাবে তাকে রৌদ্র-তপ্ত

বাগানে ছেড়ে দিয়ে আবার বলে, 'রোদে খেলা করো।' ছেলেটি ভয় পেয়ে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে ওঠে। কিন্তু জুলিয়েট তা গ্রাহ্য করে না। তার সমস্ত শরীরে মধুর একটা তপ্ত অবসাদ, মন যেন তার সম্পূর্ণ নির্বিকার। লাল টালিগুলোর ওপর দিয়ে সে একটা কমলালেবু গড়িয়ে দেয়, নরম তুলতুলে পায়ে ছেলেটি টলতে-টলতে সেটা ধরতে ছুটে যায়। কমলালেবুটা হাতে তুলে নিয়ে সে আবার সেটা ফেলে দেয়, তারপর মার দিকে চেয়ে চোখ মুখ কুঁচকে কাঁদবার উপক্রম করে। এমন ক'রে উলঙ্গ ক'রে দেওয়ার জন্যই সে যেন ভয় পেয়েছে।

জুলিয়েট তাকে ডেকে বললে, 'নিয়ে এসো তো কমলাটা, মা-মণিকে কমলাটা এনে দাও।' ছেলের এই ভয় পাওয়া সম্বন্ধে নিজের সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য টের পেয়ে সে সত্যই অবাক হ'য়ে যায়।

মনে-মনে সে বলে, মাটির তলায় যে পোকা কখনো সূর্যের সাক্ষাৎ পায় না, তার মতো ওকে কিছুতেই বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। ও যেন কিছুতেই ওর বাপের মতো না হয়।

নিজের ছেলের দায় সারাক্ষণ তার মনে ভার হ'য়ে চেপে ব'সে থাকে, এ দায়িত্ব যেন একটা যন্ত্রণা ; যেন তাকে জন্ম দিয়েছে ব'লেই তার সমস্ত জীবনের জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। ছেলের একটু সর্দি হ'লেও তার মন যেন বিরূপ হ'য়ে ওঠে, মরমে ম'রে গিয়ে তার যেন বলতে ইচ্ছা করে : হায় কী সন্তানেরই মা তুমি হয়েছো।

এখন কিন্তু একটা পরিবর্তন তার মধ্যে আসছে। ছেলেটি সম্পর্কে আর সেই উদ্বেগ তার মনে নেই, ছেলেটিরও তাতে ভালো বই মন্দ হচ্ছে না।

তার সত্তার মধ্যে এখন আরেক চিন্তার আলোড়ন চলছে, সে-চিন্তা ভাস্বর সূর্যের, সূর্যের সঙ্গে তার মিলনের। তার সমস্ত জীবন এখন যেন একটা অনুষ্ঠান। ভোর হবার আগেই জেগে উঠে সে বিছানা থেকে দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে। কখন আকাশের ধূসরতা দূর হ'য়ে গিয়ে সোনালি রঙে দিকপ্রান্ত রঙিন হ'য়ে উঠবে তাই সে শুয়ে-শুয়ে ছাখে। পূর্বাচলে গলিত নগ্ন সূর্য যখন উদিত হয়, কোমল আকাশে তার নীলাভ শুভ্র জ্যোতি সে বিকিরণ করে, তখন জুলিয়েটের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

তার ভাগ্য ভালো। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, কখনো সকাল একটু

মেঘলা হ'য়ে থাকে, কখনো সন্ধ্যা একটু ধূসর, সূর্যহীন দিন তার যায় না। প্রায় সব দিনগুলিই শীতের রোদে উজ্জ্বল। ছোটো-ছোটো বন্য ক্রোকাস্ ফুলে মাটি এখন ছেয়ে গেছে, চারিদিকে বন্য নার্সিসাসের তারার মতো ফুলগুলি ঝোলে।

প্রতিদিন সেই পাহাড়ের ধারে ফণিমনসার ঝোপে 'সাইপ্রাস' গাছটির তলায় সে যায়। এখন সে অনেক চালাক হয়েছে। শুধু একটি ফিকে ধূসর চাদর গায়ে জড়িয়ে চটি পায়ে দিয়ে সে আজকাল সেখানে যায়, যাতে কোনো গোপন নিরালা কোণে এক মুহূর্তে সূর্যালোকে নগ্ন হ'য়ে সে দাঁড়াতে পারে। ধূসর চাদরের সুবিধা অনেক। একবার ঢাকা দিলেই এক মুহূর্তে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিশে অনায়াসে মিশে অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়া যায়।

আকাশে সূর্যের অভিযান চলে, আর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সেই বিশাল 'সাইপ্রাস' গাছের তলায় সে শুয়ে থাকে। তার দেহের প্রতিটি তন্তু দিয়ে সে যেন এখন সূর্যকে চিনে নিয়েছে। কোথাও এতটুকু হিমেল ছায়া আর তার মধ্যে নেই। আর তার হৃদয় সেই উদ্বিগ্ন, বিড়ম্বিত হৃদয়, একেবারে যেন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে; বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে সেই ফুলের মতো, যা সূর্যালোকে ঝ'রে প'ড়ে শুধু একটি পরিপক্ক বীজাধার ছাড়া আর-কোনো চিহ্ন রেখে যায় না।

আকাশের অগ্নিবর্ষি শুভ্র শিখামণ্ডিত, গলিত নীল সূর্যকে সে জানে। সমস্ত পৃথিবীতে সে সূর্য আলো দেয়, কিন্তু নিরাবরণ হ'য়ে যখন সে শুয়ে থাকে, তখন মনে হয় সূর্যের সমস্ত জ্যোতি তারই ওপর যেন কেন্দ্রীভূত।

সূর্যের উপলব্ধি তার জীবনে যত গভীর হ'য়ে উঠতে থাকে, যত এ-বিশ্বাস তার মনে দৃঢ় হয়, যে, সূর্যও তার অনন্ত কামনার মধ্য দিয়ে তাকে জানে, ততই সাধারণ মানুষের জগৎ থেকে নিজেকে সে কেমন বিচ্ছিন্ন বোধ করে। মানুষের ওপর কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে জাগে। তারা যেন মাটির তলার জগতের পোকার মতো, সূর্যের স্পর্শ তারা পায় নি, আদিম মৌলিক ধাতু তাদের মধ্যে নেই।

এমনকি যে-সব চাষিরা প্রাচীন পাহাড়ি রাস্তা ধ'রে প্রতিদিন তাদের গাধাগুলি নিয়ে যাতায়াত করে, গায়ের রঙ তাদের সূর্যের আলোয় ঝলসানো হ'লেও তাদের অন্তর পর্যন্ত সূর্যের স্পর্শ যেন পৌঁছয় নি। খোলার নিচে নরম শামুকের দেহের মতো তাদের মর্মের মাঝখানে কোথায় যেন কোমল শাদা একটু ভয়ের কেন্দ্র এখনও আছে, যে-কেন্দ্রে মানুষের আত্মা মৃত্যু-ভয়ে

জীবনের স্বাভাবিক বহ্নিদীপ্তির ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকে। পরিপূর্ণভাবে বাইরে আসবার সাহস তার নেই, ভেতরে-ভেতরে সব সময়ই সে সঙ্কুচিত। সব মানুষই এই এক রকম।

কী দরকার মানুষকে মানবার।

মানুষের সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্য নিয়ে আজকাল আর সে, কে দেখলো না-দেখলো, সে-বিষয়ে সাবধান হওয়ার দরকার বোধ করে না। মারিয়ানা নামে তার যে পরিচারিকা গ্রামে তার জন্য হাটবাজার করতে যায়, তাকে সে ব'লে দিয়েছে, যে, ডাক্তারের পরামর্শ-মতো সে সূর্যস্নান করে। এইটুকু বলাই যথেষ্ট।

মারিয়ানার বয়স প্রায় ষাট। তবু সে এখনও সোজা হ'য়ে হাঁটে। লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো শাদা চুল। কালো চোখ দেখলে মনে হয়, হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় তার দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছে, আর তার মুখে সেই হাসি, যা শুধু সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মায়। জীবনের বেদনাময় নিষ্ফলতা, অভিজ্ঞতার অভাব ছাড়া তো আর-কিছু নয়।

মারিয়ানা জুলিয়েটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, 'কোনো পোশাক না-প'রে রোদ পোয়ানো ভারি চমৎকার, না?' মারিয়ানার চোখে একটা ধূর্ত হাসির ঝিলিক। মারিয়ানা বৃহত্তর গ্রীসের মেয়ে। তার ইতিহাস সুদূর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সে আবার বলে, 'কিন্তু তার আগে নিজেরও সুন্দর হওয়া দরকার। নইলে সূর্য অপমানও বোধ করতে পারে, কেমন, তাই না?' মারিয়ানা অদ্ভুত-ভাবে হেসে ওঠে—প্রাচীন যুগের মেয়েদের সেই দুর্বোধ হাসি।

'কে জানে আমি সুন্দর কিনা,' বলে জুলিয়েট।

কিন্তু সুন্দর হোক বা না-হোক, সে মনে-মনে জানে যে সূর্য তাকে গ্রহণ করেছে। তারপর আর-কিছু ভাববার দরকার নেই।

কোনো কোনো দিন দুপুর বেলা, সূর্য যখন মাঝ-গগনে, সে পাহাড়ের ধার দিয়ে নিচের ঠাণ্ডা গভীর কোনো জলাশয়ের কাছে নেমে যায়, আর চিরন্তন ছায়ায় ঢাকা সেই লেবুগাছের পত্রাচ্ছাদিত সবুজ গোধূলি আলোর জগতে গায়ের আবরণ খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নেয়। হঠাৎ তখন সে দেখতে পায় তার সমস্ত দেহ গোলাপি থেকে ক্রমেই সোনালি হ'য়ে উঠছে। সে যেন আরেকজনের মতো, সে যেন সত্যিই আর-কেউ।

গ্রীকদের কথা তার মনে পড়ে। রোদ না-লাগা মাছের মতো শাদা গায়ের রঙ তারা অস্বাস্থ্যকর মনে করতো।

গায়ে একটু জলপাই-তেল মেখে, সেই অন্ধকার লেবুগাছের বনে সে ঘুরে বেড়ায়, নিজের নাভিতে কখনো বা একটা লেবুফুল রেখে নিজের মনে-মনেই হাসে। হয়তো কখনো কোনো চাষার চোখে সে প'ড়েও যেতে পারে। কিন্তু তাতে সে নিজে যত না ভয় পাক, তার চেয়ে সেই চাষিই যে বেশি ভয় পাবে, সে জানে। পোশাকে ঢাকা মানুষের বুকের ভেতর ভয়ের গোপন কেন্দ্রের কথা তার অজানা নয়। তার নিজের ছেলেটির ভেতরও এই ভয় যে আছে সে জানে। সে জানে যে তার ছেলেও তাকে আর বিশ্বাস করে না, কারণ তার মুখে এখন সূর্যের উজ্জ্বলতা, তার হাসিতে রৌদ্রের ঝিলিক! আজকাল সে জোর ক'রে প্রতিদিন ছেলেটিকে রোদে নগ্নভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার ছোট্ট শরীরটি এর মধ্যেই গোলাপি হ'য়ে উঠেছে, গায়ের চামড়ায় সোনালি আভা লেগেছে, তারই ভেতর গাল দুটি পাকা পেয়ারার শাঁসের মতো লালচে। সোনালি ঘন চুলগুলি কপালের ওপর থেকে পেছন দিকে আঁচড়ানো। তার সুস্থ, সবল, গোলাপি, সোনালি ও নীলে মেশানো অপরূপ শ্রী দেখে চাকর-বাকরেরা মোহিত। তাদের কাছে সে স্বর্গের দেবশিশু। কিন্তু মা তার দিকে চেয়ে হাসে, তাই মাকে সে বিশ্বাস করে না। তার সেই বড়ো বড়ো নীল চোখের দৃষ্টিতে জুলিয়েট ভয়ের সেই কেন্দ্র দেখতে পায়। তার ধারণা কোনো পুরুষই এই ভয় থেকে মুক্ত নয়। জুলিয়েট এই ভয়ের নাম দিয়েছে সূর্যাতঙ্ক।

ছেলেটি পাখির মতো নানা রকম শব্দ করতে-করতে ট'লে ট'লে রোদের মধ্যে খেলা ক'রে বেড়ায়, আর তাকে দেখে জুলিয়েটের মনে হয়, সে যেন সূর্যের কাছ থেকে খোলশের মধ্যে শামুকের মতো নিজেকে বন্ধ ক'রে লুকিয়ে রাখছে। তাকে দেখলে তার বাপের কথা মনে প'ড়ে যায়। জুলিয়েট যদি তাকে এই খোলশের ভেতর থেকে বার ক'রে আনতে পারতো। জীবনকে উদ্দামভাবে অভিনন্দিত করবার সাহস নিয়ে সে যদি বেরিয়ে আসতো!

জুলিয়েট ঠিক করলে এখন থেকে তাকে সে ফণিমনসার জঙ্গলে সেই 'সাইপ্রাস' গাছের তলায় নিয়ে যাবে। কাঁটাগুলোর জন্যে সেখানে তাকে একটু চোখে-চোখে রাখা দরকার বটে। কিন্তু, সেখানে তার খোলশ থেকে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসতে পারবে। সভ্যতার ভ্রূকুটি-কুঞ্চনটুকু তার কপাল থেকে যাবে মিলিয়ে।

মাটিতে একটা কম্বল পেতে সে ছেলেটিকে বসিয়ে দেয়, তার পর নিজের চাদর খুলে ফেলে ব'সে ব'সে ঊর্ধ্ব আকাশে চেয়ে থাকে। একটা বাজ নীল শূন্যে

উড়ছে। 'সাইপ্রাস' গাছের সরু ডগাটা নুয়ে আছে। ছেলেটি কম্বলের ওপর পাথর নিয়ে খেলা করে। উঠে প'ড়ে যখন সে হাঁটবার চেষ্টা করে, তখন জুলিয়েটও উঠে বসে। ছেলেটি ফিরে তার দিকে তাকায়, তার গায়ের রঙ আর শাদা নেই, সোনালি গোলাপিতে মিশে তাকে সত্যই সুন্দর দেখায়।

'দেখো সোনামণি, গায়ে কাঁটা যেন না লাগে।'

ছোট্ট একটি দেবশিশুর মতো ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় বলবার চেষ্টা করে, 'কাঁটা।'

'হ্যাঁ, বিশ্রী কাঁটা।'

ছেলেটি এ-কথারও প্রতিধ্বনি করবার চেষ্টা করে। তারপর চটি পায়ে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রায় ফণিমনসার ঝোপের ওপর পড়ো-পড়ো হয়। জুলিয়েট এক লাফে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। নিজের ক্ষিপ্রতায় নিজেই সে অবাক হ'য়ে যায়। রোদ থাকলে প্রত্যেকদিনই সে ছেলেটিকে 'সাইপ্রাস' গাছের কাছে নিয়ে যায়। কোনোদিন মেঘলা করলে বাদলার হাওয়ায় জুলিয়েট না-বেরুতে চাইলে, ছেলেটি বারবার 'সাইপ্রাস' গাছের কাছে যাবার জন্য বায়না ধরে। 'সাইপ্রাস' গাছের কাছে না-যেতে পারলে তারও জুলিয়েটের মতো কষ্ট হয়।

এ তো শুধু স্নান নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। তার গভীর অন্তরে কি যেন উন্মুক্ত, বিকশিত হ'য়ে তার চেতনা ও কামনার অতীত কোনো শক্তি যেন তাকে সূর্যের সাথে যুক্ত ক'রে দিচ্ছে, তার ভেতর থেকে এক স্বতঃস্ফূর্ত রহস্য-ধারা প্রবাহিত।

তার চেতন যে সত্তা, তা যেন দ্বিতীয় একজন দর্শক মাত্র। তার গভীর দেহ-মন থেকে সূর্যের দিকে প্রবাহিত এই রহস্য-ধারাই যেন আসল জুলিয়েট। চিরদিন নিজের ওপর দখল তার ছিলো। নিজে কী করছে সে-সম্বন্ধে সব সময়ই সে সচেতন। নিজের শক্তির রাশ দৃঢ় মুষ্টিতে সে চিরদিনই ধ'রে রেখেছে। এখন সে যেন তার ভেতরে আরেক ধরনের শক্তি অনুভব করে। স্বতঃপ্রবাহিত সে-শক্তি তার চেয়ে অনেক প্রবল। নিজের অতীত এই শক্তির কাছে সে যেন অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে।

ফেব্রুআরির শেষে হঠাৎ খুব গরম প'ড়ে গেলো। একটু হাওয়া লাগতে না লাগতেই গোলাপি তুষারের মতো, বাদাম গাছের ফুল ঝ'রে পড়ে। রেশমি

খুদে খুদে 'অ্যানিমোন' আর লম্বা ডাঁটা-ওয়ালা 'অ্যাস্‌ফোডেলে'র কুঁড়ি চারিদিকে ফুটে ওঠে। সমুদ্র অপরূপ নীল দেখায়।

জুলিয়েট আজকাল আর কোনো কিছুর জন্যই ভাবে না। এখন বেশির ভাগ দিনই সে ছেলেটির সঙ্গে নিরাবরণ হ'য়ে রোদে-রোদে কাটায়। এর বেশি তার কোনো কামনাও নেই। কখনো-কখনো সে সমুদ্রে স্নান করতে যায়, কখনো বা দুই পাহাড়ের মাঝখানের খাদে--লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘুরে বেড়ায়। এক-একদিন কোনো চাষির সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে যায়; গাধা নিয়ে যেতে যেতে সেও তাকে দেখে। কিন্তু জুলিয়েট ছেলেটির সঙ্গে এত সহজ শান্তভাবে চলা-ফেরা করে, যে এ-ব্যাপার নিয়ে আজকাল আর কোনো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া সূর্যালোকে দেহ ও মন নিরাময় হওয়ার কথা এর মধ্যেই স্থানীয় লোকদের মধ্যে বেশ প্রচার হ'য়ে গেছে।

ছেলেটির ও তার, দু'জনের রঙই রোদে পুড়ে এখন বেশ গাঢ় সোনালি হ'য়ে উঠেছে। নিজের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে জুলিয়েট নিজের মনেই ব'লে ওঠে, 'আমি আর একজন'।

ছেলেটিও যেন আরেক রকম হ'য়ে গেছে। তার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত, প্রশান্ত, সূর্য-গাঢ় তন্ময়তা। নিঃশব্দে সে নিজের মনেই খেলা করে; জুলিয়েটের তার দিকে লক্ষ করবারও দরকার হয় না। একলা আছে কি না আছে ছেলেটি যেন টেরও পায় না।

বাতাস বন্ধ হ'য়ে গেছে, নিথর গাঢ় নীল সমুদ্র। 'সাইপ্রাস' গাছটার শিকড়-গুলো যেন কোনো শ্বাপদের থাবা। তারই কাছে ব'সে প্রখর রোদে ঝিমিয়ে পড়লেও তার মনে হয় তার হৃদয় যেন সজাগ, নতুন রস-সঞ্চারে তার বুক যেন পরিপূর্ণ। নিজের ভেতর কী যেন একটা চাঞ্চল্য সে অনুভব করছে, কী যেন একটা স্রোতাবেগ, যা তাকে জীবনের নতুন পথে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চায়। তবু এ-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে সে সচেতন হ'তে চায় না। সভ্যতার বিরাট হৃদয়হীন যন্ত্র-জটিলতার কথা সে ভালো ক'রেই জানে, জানে যে তা এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়।

ছেলেটি পাথুরে পথের রেখা ধ'রে একটা বিরাট ফণিমনসার আড়ালে কয়েক পা এগিয়ে গেছে। আজকাল সে হাঁটতে গিয়ে আর টলে না, নিজেকে নিজে অনায়াসে সামলাতে পারে। স্বর্ণাভ দেবশিশুর মতো ছেলেটি কতগুলি বন্য ফুল তুলে সারি-সারি সাজিয়ে রাখছিলো। হঠাৎ জুলেয়েট তার চীৎকার

শুনতে পেলো, 'মা, ছাখো, ছাখো।' তার গলার স্বর কেমন একটু অদ্ভুত। জুলিয়েট একটু ঝুঁকে প'ড়ে সেদিকে চেয়ে আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। ছেলেটি ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর তারই হাত দুয়েক দূরে একটা সাপ মাথা তুলে দো-ফলা জিভ বার ক'রে থেকে-থেকে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ শব্দ করছে।

ছেলেটি সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'দেখেছো মা!'

'হ্যাঁ সোনামণি, ওটা একটা সাপ,'—জুলিয়েটের স্বর অত্যন্ত ধীর, গম্ভীর।

ছেলেটি মার দিকে তাকিয়ে রইলো, বড়ো-বড়ো তার নীল চোখে তখনো একটা দ্বিধার আভাস—ভয় পাবে কিনা। মায়ের চোখের প্রশান্তিতেই শেষ পর্যন্ত সে আশ্বস্ত হয়—এ-প্রশান্তি বুঝি সূর্য থেকে পাওয়া। ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় ব'লে উঠলো, 'সাপ?'

'হ্যাঁ, বাবা, সাপ! ছুঁয়ো না যেন, তাহ'লে কামড়ে দিতে পারে।'

সাপটা তখন মাথা নামিয়ে ধীরে-ধীরে তার সোনালিধূসর দেহটা পাথরের ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে টেনে নিয়ে একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। ছেলেটি সেদিকে ফিরে খানিক নিঃশব্দে তাকে লক্ষ ক'রে বললে, 'সাপ যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওকে যেতে দাও, ও একলা থাকতে চায়।'

সাপটা ফাটলের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পর ছেলেটি আবার ফিরে বললে, 'সাপ চ'লে গেছে।'

'হ্যাঁ, চ'লে গেছে। মা-র কাছে একবার এসো তো লক্ষ্মীটি।'

ছেলেটি এসে মা-র কোলের ওপর বসলো। জুলিয়েট কোনো কথাই বললে না। কোনো উদ্বেগ আর তার নেই, এইটুকুই শুধু সে জানে। সূর্যের অপরূপ শক্তিতে সমস্ত মন তার স্নিগ্ধ। অদ্ভুত কোনো জাদুর মতো সেই স্নিগ্ধতা যেন তার চারদিক ভ'রে আছে। সাপটাও যেন তার এবং তার সন্তানের মতো এই জায়গারই একটা অঙ্গ।

আরেকদিন জলপাই-এর বাগানের পাথরের দেয়ালে একটি কালো সাপ সে ছাখে।

'মারিয়ানা, আমি একটা কালো সাপ দেখেছি। এগুলো কি বিষাক্ত?'

'না, কালো সাপের বিষ নেই। কিন্তু হলদে সাপ একবার কামড়ালে আর রক্ষে নেই। তবে কালো সাপ দেখলেও আমার ভয় করে।'

জুলিয়েট এখনও ছেলেটিকে নিয়ে 'সাইপ্রাস' গাছটির কাছে যায়। তবে সেখানে বসবার আগে চারিদিক সে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ছাখে। তারপর সূর্যের দিকে মুখ রেখে সে শুয়ে পড়ে। কোনো ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবতে চায় না। তার এই বাগানটির বাইরে, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবার গরজ তার নেই। কাউকে সে চিঠিও লিখতে চায় না। চিঠি লেখার ভার সে তার নার্সের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

মার্চ মাস। সূর্যের তেজ আরো প্রচণ্ড হ'য়ে উঠছে। খুব গরমের সময় সে গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে। কখনো-কখনো সেই ঠাণ্ডা লেবুগাছের কুঞ্জে নেমে যায়। ছেলেটি দূরে-দূরে তারই সঙ্গে দৌড়ে বেড়ায়; সে যেন বন্য কোনো প্রাণীর শাবক, প্রাণ-স্রোতের গভীরতায় নিমগ্ন।

একদিন পাহাড়ের একটি জলের কুণ্ডে স্নান ক'রে, পাথরের একটি ধাপের ওপর ব'সে সে রোদ পোয়াচ্ছে, আর ছেলেটি নিচে হলুদ-বরন 'আক্‌সালিস্' ফুলগুলির মাঝে আলো-ছায়ায় আলপনা-কাটা বনে লেবু কুড়িয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে, এমন সময় দূরে পাহাড়ের ধার থেকে মারিয়ানার ডাক শোনা গেলো। মাথায় একটা কালো কাপড় বেঁধে মারিয়ানা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। জুলিয়েটকে নগ্ন দেহে উঠে দাঁড়াতে দেখে মারিয়ানা একবার বুঝি থমকে দাঁড়ালো, তারপর দ্রুতপায়ে পাহাড়ের পথে নেমে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে জুলিয়েটের সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ ক'রে বললে, 'সত্যি তুমি কী সুন্দর! তোমার স্বামী এসেছে যে।'

'আমার স্বামী!' জুলিয়েট ব'লে উঠলো।

বৃদ্ধা একটু যেন বিদ্রূপ ক'রেই হেসে উঠে বললে, 'কেন, তোমার স্বামী কেউ নেই?'

'হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু কোথায় তিনি?'

মারিয়ানা পেছন ফিরে তাকিয়ে বললে, 'আমার সঙ্গেই তো আসছিলো, তবে মাঝখানে পথ হারিয়ে ফেলেছে বোধহয়।' আবার সে হেসে উঠলো, সেই ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি।

জুলিয়েট একটু চিন্তিতভাবে মারিয়ানার দিকে চেয়ে বললে, 'বেশ, আসুন না তিনি।'

'আসবে এখানে? এখন?' মারিয়ানার চোখে চাপা বিদ্রূপের হাসি। তারপর

আবার একটু মুখভঙ্গি ক'রে সে বললে, 'বেশ, তোমার যেমন খুশি। তবে তাঁর পক্ষে এ একেবারে আজব দৃশ্য সন্দেহ নেই।' মারিয়ানা একটু হেসে উঠলো। তারপর ছেলেটিকে দেখিয়ে বললে, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ওকে দেখে বেচারা নিশ্চয়ই খুশি হবে! আমি তাহ'লে তাকে নিয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, নিয়ে এসো,' বললে জুলিয়েট।

মারিয়ানা আবার পাহাড়ের রাস্তায় উঠে গেলো। আঙুরের বাগানের ভেতর মরিস পথ খুঁজে না-পেয়ে বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীকদের সেই প্রাচীন, জগতে, সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে তাকে যেন বড্ড খাপছাড়া মনে হচ্ছে।

মারিয়ানা তাকে ডেকে বললে, 'চলো, তোমার স্ত্রী নিচে অপেক্ষা করছে।'

ঘাসের ভেতর দিয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে দ্রুতপদে মারিয়ানা তাকে পথ দেখিয়ে কিছু দূরে নিয়ে গেলো। তারপর হঠাৎ উৎরাইয়ের পথের কাছে এসে নিচের লেবুগাছগুলোর দিকে দেখিয়ে বললে, 'এই পথ দিয়ে নেমে যাও।'

মরিসের বয়স চল্লিশ হবে। দাড়ি-গোঁফ কামানো, একটু ফ্যাকাশে রঙ, খুব শান্ত আর সত্যই লাজুক। জীবনে নিজের কাজটা সে সযত্নে ভালোভাবেই ক'রে যায়, অসাধারণ কোনো সাফল্য যদিও সে অর্জন করে নি। তবে নিজের মনের কথা কাউকে বলবার পাত্র সে নয়। মারিয়ানা একবার দেখেই তাকে চিনেছে। মনে মনে বলেছে—মানুষটা ভালো বটে, তবে বেচারা সত্যিকারের পুরুষ নয়।

নিয়তির মতোই যেন অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে মারিয়ানা বললে, 'ঐ তোমার স্ত্রী।' মরিস নিতান্ত সাধারণভাবে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সাবধানে পাহাড়ের পথে নেমে গেলো। মারিয়ানা দুষ্টুমির হাসির সঙ্গে মুখভঙ্গি ক'রে বাড়ির দিকে ফিরলো।

ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে নামতে-নামতে মরিস একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ তার স্ত্রীর দেখা পেলো। নিরাবরণ জুলিয়েট তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সারা দেহে তার সূর্যের দীপ্তি, প্রাণের উত্তাপ। ব্লটিং কাগজের ওপর কালির ফোঁটার মতো মরিস সেখানে এসে প'ড়ে তাকিয়েই কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর অন্যপাশে চেয়ে একটু কেশে বললে, 'এই যে জুলি, বাঃ চমৎকার, চমৎকার।' মাঝে-মাঝে তার দিকে চাইলেও মুখটা বেশির ভাগ অন্যদিকে ফিরিয়ে মরিস স্ত্রীর দিকে

এগিয়ে গেলো। জুলিয়েটের সমস্ত শরীরে রেশমের মতো মসৃণ একটা দীপ্তি। কোনো আবরণ যে তার নেই, এ-কথা মনেই যেন তার হয় না। সূর্যের গোলাপি সোনালি আভাই তার শরীরে যেন নতুন আবরণ দিয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে একটু স'রে গিয়ে জুলিয়েট বললে, 'এই যে মরিস, তুমি এত শিগগির আসবে তা আমি ভাবি নি।'

মরিস উত্তরে বললে, 'হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসবার সুবিধে হ'য়ে গেলো,' আবার সে একটু অপ্রস্তুতভাবে কাশলো।

পরস্পরের কয়েক হাত দূরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নীরব। কিছুক্ষণ বাদে মরিসই বললে, 'বাঃ! কী বলে—এত চমৎকার! তোমায় কী বলে—চমৎকার দেখাচ্ছে। ছেলেটা কোথায়?'

ছেলেটি একদিকে ঘন গাছের ছায়ায় একগাদা লেবু জড়ো করছিলো। তার ভীরু চাপা মন সত্যই কী যেন একটা আনন্দ শিহরণ অনুভব করলো। ছেলেটিকে সে ডাক দিলে। কণ্ঠস্বরটা কিন্তু কেমন দুর্বল শোনালো।

বাপের ডাকে ছেলেটি ফিরে তাকালো। তার গোলগাল হাত দুটি থেকে কয়েকটা লেবু গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু কোনো রকম সাড়া সে দিলে না।

'মনে হচ্ছে ওর কাছেই আমাদের যেতে হবে।' ব'লে জুলিয়েট ফিরে সেই দিকে এগিয়ে গেলো। মরিস পেছনে যেতে-যেতে জুলিয়েটের সুঠাম দেহের গতিভঙ্গি লক্ষ ক'রে একদিকে যেমন মুগ্ধ, বিহ্বল, আরেকদিকে তেমনি যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলে। নিজেকে নিয়ে কী সে করবে? তার পোশাক, তার শহুরে ব্যবসাদারের মতোই বিবর্ণ কৃচ্ছ-সাধন-ক্লিষ্ট চেহারা সবই যেন এখানে খাপছাড়া।

লেবুগাছগুলোর তলায় সমস্ত মাটি হলুদবরন 'অকসালিস্' ফুলে ছেয়ে আছে। তারই ভেতর দিয়ে ছেলেটির কাছে এসে জুলিয়েট বললে, 'কেমন লাগছে? ভালোই, না?'

'হ্যাঁ, ভালো, ভালো, চমৎকার! কী গো বাপু, বাবাকে চিনতে পারছো?' নিচু হ'য়ে ব'সে মরিস হাত বাড়িয়ে দিলে।

ছেলেটি আধো-আধো ভাষায় বললে, 'লেবু! দু'টো লেবু!'

মরিস বললে, 'দু'টো লেবু! এসো দেখি, বাবার কাছে এসে একবার বলো, এই যে বাবা।'

ছেলেটি বললে, 'বাবা চ'লে যাচ্ছে?'

'চ'লে যাচ্ছে ? না না, আজকে নয়।' ব'লে মরিস ছেলেকে কোলে তুলে নিলে।

ছেলেটি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ ক'রে বললে, 'বাবা কোট খুলে ফ্যালো।'

'বেশ তাই হবে, বাবা কোট খুলে ফেলেছে,' ব'লে কোটটা খুলে সাবধানে এক জায়গায় রেখে মরিস আবার ছেলেকে কোলে তুলে নিলে। স্বামীর কোলে উলঙ্গ শিশুর দিকে জুলিয়েট একবার চাইলে। মরিসের গায়ে শুধু শার্ট। ছেলেটি তার টুপিটাও টেনে ফেলে দিয়েছে। কাঁচা-পাকা মেশানো মরিসের সযত্নে পাটকরা চুলগুলো বিশেষ ক'রে জুলিয়েটের চোখে পড়লো। এতটুকু এলোমেলো নয়, একটি চুলও এদিক ওদিক হয় নি। দেখলে একান্ত ভাবে কেবলই বদ্ধ ঘরের কথা মনে হয়। অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো। ছেলেটি বাপকে ভালোবাসে, তারই সঙ্গে কথা ক'য়ে চলেছে।

হঠাৎ জুলিয়েট ব'লে উঠলো, 'তুমি কী করবে ঠিক করেছো ?'

মরিস আড়চোখে স্ত্রীকে একবার দেখে নিয়ে বললে, 'কী সম্বন্ধে জুলি ?'

'সব কিছু সম্বন্ধে! এই ব্যাপার সম্বন্ধেও। আমি আর নিউইয়র্কের সেই ইস্ট ফর্টিসেভেন্‌থ রাস্তায় ফিরে যেতে পারবো না।'

মরিস একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'কি বলে—না, তা অবশ্য নয়—অন্তত এখন তো নয়ই।'

'কখনোই নয়,' বললে জুলিয়েট। দু'জনেই তারপর খানিকক্ষণ নীরব।

সবশেষে মরিস বললে, 'মানে—কি বলে – ঠিক বুঝতে পারছি না।'

জুলিয়েট জিগেস করলে, 'তোমার কী মনে হয় ? তুমি এখানে আসতে পারো না ?'

একটু ইতস্তত ক'রে মরিস বললে,'হ্যাঁ, মাস খানেক আমি কোনো রকমে ব্যবস্থা ক'রে থাকতে পারি।' আরেকবার জুলিয়েটের দিকে সলজ্জভাবে তাকিয়ে সে আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে।

জুলিয়েট স্বামীর দিকে তাকালো। তার সমস্ত বুক যেন একটা অসহিষ্ণুতার আবেগে কেঁপে উঠলো। ধীরে-ধীরে সে বললে, 'আমি ফিরে যেতে পারি না, এই সূর্যকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। তুমি যদি এখানে না-আসতে পারো—' জুলিয়েট কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিলে।

মরিস আড়চোখে কয়েকবার স্ত্রীর দিকে তাকালে। বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে ক্রমশই সে যেন আরো মুগ্ধ হ'য়ে উঠছে।

অবশেষে মরিস বললে, 'না, এই তোমার পক্ষে ভালো। তোমায় অপরূপ লাগছে। তুমি ফিরে যেতে পারবে আমার মনে হয় না।'

তাদের নিউইয়র্কের ফ্ল্যাটের কথা সে ভাবছিলো। জুলিয়েটের সেখানে আরেক রূপ সে দেখেছে। সারাক্ষণ তার সেই মৌন বিবর্ণ রূপ মরিসকে যেন উৎপীড়িত করেছে। সে নিজে অত্যন্ত ভীরু শান্তপ্রকৃতির। ছেলেটি হবার পর থেকে জুলিয়েটের নীরব বিরুদ্ধতায় তাই সে গভীরভাবে শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। জুলিয়েট নিজেই এ-ব্যাপারে নিরুপায় বুঝে সে আরো বেশি ভয় পেয়েছে। মেয়েরা এই রকমই। তারা নিজেই নিজেদের পর্যন্ত বিরোধী হ'য়ে ওঠে, আর তখন তা একেবারে দুঃসহ ভয়ংকর! যে-মেয়ের মন তার নিজের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা সত্যই ভয়ংকর! জুলিয়েটের এই অনিচ্ছাকৃত বিরুদ্ধতার যাঁতাকলে সে যেন নিষ্পিষ্ট হ'য়ে গেছে। নিজেকেও জুলিয়েট নিষ্পেষিত করেছে, তার সঙ্গে তার সন্তানটিকেও। না, না, এ-অবস্থার চেয়ে আর যা-কিছু হয় হোক, তাই ভালো।

জুলিয়েট জিগেস করলে, 'কিন্তু তোমার কী হবে?'

'আমি? ও, আমার কথা বলছো! আমি ব্যবসা চালাবো, আর কি বলে ছুটি-ছাটায় এখানে আসবো—যতদিন অবশ্য তুমি এখানে থাকতে চাও। তুমি যদ্দিন খুশি এখানে থাকো।' অনেকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মরিস আবার জুলিয়েটের দিকে তাকালে। তার চোখে অস্বস্তির সঙ্গে কেমন একটা কাতরতার আভাস।

'বরাবর থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, কি বলে, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। বরাবর মানে অবশ্য অনেক কাল। তারিখ ধ'রে তো দেওয়া যায় না।'

'আর যা খুশি আমি করতে পারি?' জুলিয়েট সোজা মরিসের চোখের দিকে তাকালো—তার দৃষ্টিতে যেন দ্বন্দ্বের আহ্বান। মরিস জুলিয়েটের সমস্ত শরীরের নগ্ন নবার্জিত দীপ্তির সামনে কেমন যেন অসহায় বোধ করছে। কোনোরকমে উত্তর দিলে, 'কি বলে—তা পারো বই কি! তুমি নিজে খুশি থাকলেই হ'লো, আর ছেলেটাও যেন অখুশি না হয়।'

আবার সে তেমনি কাতরভাবে জুলিয়েটের দিকে তাকালে। ছেলেটির কথাই সে ভাবছে, কিন্তু নিজেও যেন কিছু আশা রাখে।

জুলিয়েট উত্তর দিলে, 'না, ওকে আমি অখুশ করবো না।'

'হ্যাঁ আমারও মনে হয় তা তুমি করবে না।'

দু'জনেই তারপর খানিকক্ষণ নীরব। গ্রাম থেকে দ্বিপ্রাহরিক ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। 'কিমোনো'টা প'রে চওড়া সবুজ কোমর-বন্ধটা জুলিয়েট বেঁধে নিলে। তারপর ছেলেটার গায়ে একটা ছোটো নীল শার্ট পরিয়ে দিয়ে সবাই মিলে বাড়ির দিকে চললো। খাবার-টেবিলে ব'সে জুলিয়েট স্বামীকে ভালো ক'রে লক্ষ ক'রে দেখলো। মরিসের মুখে নগর-জীবনের পাণ্ডুরতা, তার কাঁচা-পাকা পাটকরা চুল, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তার সংযম, খাবার-টেবিলের আদব-কায়দা সম্বন্ধে তার সজাগ দৃষ্টি কিছুই তার দৃষ্টি এড়ালো না। মরিস মাঝে-মাঝে জুলিয়েটের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলো। ছেলেবেলায় ধরা প'ড়ে যে-পশুশাবককে আজীবন বন্দীদশায় কাটাতে হয়েছে, মরিসের সোনালি-ধূসর চোখে যেন তারই মতো দৃষ্টি।

কফি খাবার জন্যে তারা বারান্দায় গেলো। দূরে একটা বাদাম গাছের তলায় সবুজ গমের খেতের পাশে, মাটিতে কাপড় বিছিয়ে এক চাষি আর তার স্ত্রী খেতে বসেছে। সামনে তাদের মস্ত বড়ো একটা রুটি আর গ্লাসে কালো মদ। জুলিয়েট এমন ভাবে বসার ব্যবস্থা করলে যাতে স্বামীর পিঠ তাদের দিকে পড়ে, কারণ বারান্দায় আসবামাত্র সেই চাষিকে মুখ তুলে চাইতে সে দেখেছে।

এই চাষিকে দূর থেকে সে বেশ ভালো রকমই চেনে। চওড়া, একটু মোটা গোছের চেহারা, বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, একসঙ্গে বড়ো বড়ো রুটির গ্রাস মুখে দিয়ে চিবোনো তার অভ্যাস। তার স্ত্রী দেখতে সুন্দর, গম্ভীর প্রকৃতির, কেমন যেন একটু কঠিন ব'লেই মনে হয়। কোনো ছেলেপুলে তাদের নেই। জুলিয়েট তাদের সম্বন্ধে এই পর্যন্তই জেনেছে।

খাদের ওপারের জমিতে চাষিটি একা-একাই কাজ করে বেশির ভাগ। পরনে তার শাদা প্যাণ্ট, রঙিন শার্ট, আর একটা পুরোনো টুপি। পোশাক তার সব সময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাকে এবং তার স্ত্রীকে দেখলেই মনে হয় তাদের মধ্যে এমন একটি শান্ত আভিজাত্য আছে, যা শ্রেণীগত নয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

তার সজীবতাই হ'লো তার প্রধান আকর্ষণ। মোটা ও চওড়া হ'লে কী হয়,

এমন একটি অদ্ভুত প্রাণশক্তি তার মধ্যে আছে যার পরিচয় তার সমস্ত চলা-ফেরায় পাওয়া যায়। প্রথম-প্রথম, রৌদ্র-স্নান করার সংকল্প করার আগে একদিন খাদের ওপারে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে জুলিয়েটের হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেছে। জুলিয়েট তাকে দেখবার আগেই সে তাকে দেখেছিলো নিশ্চয়ই। জুলিয়েট মুখ তুলে তাকাতেই দেখেছে, সে টুপি খুলে সলজ্জ অথচ সগর্ব দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চওড়া রোদে-পোড়া, মুখ-ছাঁটা মেটে রঙের গোঁফ, চওড়া কপালের ওপর প্রায় গোঁফের মতোই পুরু মেটে রঙের ভুরু।

জুলিয়েট সেদিন প্রথম একটু চমকে গিয়ে তারপর বলেছিলো, 'এখানে আমি বেড়াতে পারি তো?'

চাষি উত্তর দিয়েছিলো, 'নিশ্চয়ই, এ-জমিতে আপনি যেখানে খুশি বেড়াতে পারেন।' যেমন ক্ষিপ্র তার চলাফেরা তেমনি তার কথা বলার ধরন।

জুলিয়েট সেদিন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গিয়েছিলো। কিন্তু তার আগেই সেই চাষির লাজুক অথচ সজীব, উদার প্রকৃতির পরিচয়, তার সামান্য মাথা হেলাবার ভঙ্গি থেকেই যেন সে পেয়ে গেছে।

তারপর থেকে সে প্রতিদিনই দূর থেকে দেখেছে, দেখে বুঝেছে যে সে বেশির ভাগ একা-একা থাকতে ভালোবাসে। তার স্ত্রী তাকে উগ্রভাবে ভালোবাসে। ঈর্ষা-প্রধান সে-ভালোবাসা প্রায় ঘৃণার মতোই তীব্র। ঈর্ষার কারণ বোধহয় এই যে নিজের সীমা তার সংকীর্ণ, তার স্বামীর বিস্তৃতি সে সংকীর্ণতার মাঝে আবদ্ধ থাকতে চায় না।

একদিন একদল চাষির মাঝখানে এক গাছতলায় জুলিয়েট তাকে একটি শিশুর সঙ্গে সানন্দে নাচতে দেখেছে। তার স্ত্রীও ব'সে-ব'সে দেখছিলো—চোখে তার গভীর অপ্রসন্ন দৃষ্টি।

ক্রমে-ক্রমে দূর থেকেই জুলিয়েট তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। পরস্পরের সম্বন্ধে তারা সচেতন। কখন সে তার গাধাটিকে নিয়ে আসবে, জুলিয়েট তা জানে। জুলিয়েট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবামাত্র সে ফিরে তাকায়। কিন্তু সম্ভাষণ তারা কেউ কাউকে করে না। তবু কোনোদিন সকালে সে খেতে কাজ করতে না-এলে, জুলিয়েটের কেমন ফাঁকা ঠেকে।

দুই পারের দুই জমির মাঝখানের খাদে গরমের দিনের এক সকাল বেলায় জুলিয়েট নিরাবরণ হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তার সামনে এসে পড়ে। তার গাধাটি পাশে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর সে নুয়ে প'ড়ে সবল

হাতে গাধার পিঠে চাপাবার জন্যে কাঠের বোঝা তুলছে। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ তোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সে জুলিয়েটকে দেখতে পায়—জুলিয়েট তখন পিছনে স'রে যেতে ব্যস্ত। একটা শিখা তার চোখে যেন খেলে গেলো, আরেকটা শিখা যেন জুলিয়েটের দেহের ওপর দিয়ে, তার সমস্ত অস্থি গলিয়ে দিয়ে ব'য়ে গেলো। কিন্তু জুলিয়েট নীরবে ঝোপগুলোর আড়ালে গিয়ে, যেদিক থেকে এসেছিলো, সেই দিকেই গেলো ফিরে; ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গলের মধ্যে অমন নিঃশব্দে কী ক'রে সে কাজ ক'রে যায় তা ভেবে জুলিয়েট অবাক যেমন হয়েছে, তেমনি বিরক্তও হয়েছে একটু। বন্য প্রাণীদের মতো এই আশ্চর্য ক্ষমতা তার আছে।

তার পর থেকে নিজেরা স্বীকার করতে না চাইলেও তারা দু'জনেই নিজেদের দেহে, পরস্পরের সম্বন্ধে সচেতনতার একটা সুস্পষ্ট বেদনা অনুভব করেছে। তারা কিছুতেই তা প্রকাশ না-করলেও সেই চাষির স্ত্রী যেন আপনা থেকে সজাগ হ'য়ে উঠেছে।

আর জুলিয়েট ভেবেছে, কী তাতে ক্ষতি একবার যদি তার সঙ্গে আমার এক দণ্ডের দেখা হয়, যদি তার সন্তানের জননী আমি হই? এক পুরুষের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন, কেনই বা জড়িয়ে আমায় রাখতে হবে? এই কামনাময় মুহূর্তে বারেকের দেখা কেনই বা তার সঙ্গে হবে না। স্ফুলিঙ্গ তো আমাদের দু'জনের মধ্যে জ্ব'লেই উঠেছে।

কিন্তু বাইরে কোনো প্রকাশই তার দেখা যায় নি। আজ এখন আবার জুলিয়েট তাকে দেখতে পেলে। মাটিতে শাদা কাপড় বিছিয়ে তার কালো পোশাক পরা স্ত্রীর মুখোমুখি ব'সে সে মুখ তুলে মরিসের দিকে তাকিয়ে আছে। তার স্ত্রীও মুখ ফিরিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালে।

কেমন একটা বিরাগে জুলিয়েটের মন তিক্ত হ'য়ে উঠলো। আবার মরিসের সন্তান তাকে বহন করতে হবে। স্বামীর চোখে সে ইঙ্গিত সে পেয়েছে, তার কথার জবাবে স্বামী যা বলছে তা থেকেও সে তা বুঝেছে।

'তুমিও কি পোশাক ছেড়ে সূর্যস্নান করবে?' জুলিয়েট জিগেস করেছে।

'কেন—কি বলে—হ্যাঁ করবো! এখানে যখন আছি তখন তা তো ভালোই লাগবে। জায়গাটা একেবারে নিরিবিলি, কী বলো?'

মরিসের চোখে কেমন একটা দীপ্তি, তার কামনার কেমন একটা নিরাশ্বাস দুঃসাহসের ইঙ্গিত, তার দৃষ্টিতে। তার নিজের দিক দিয়ে বিচার করলে সেও

মানুষ, পৃথিবীর সম্মুখীন হবার পৌরুষ তার সম্পূর্ণ নির্বাপিত নয়। হাস্যকর-ভাবে হ'লেও সূর্যস্নান করবার সাহস সে রাখে।

কিন্তু স্থূল পৃথিবীর কলঙ্কস্পর্শ থেকে সে মুক্ত নয়, সেখানকার সমস্ত শৃঙ্খল, সমস্ত নীচ ভীরুতা তার সঙ্গে জড়িত। তার গায়ে যে-ছাপ পড়েছে তা চরম উৎকর্ষের নয়।

জুলিয়েট এখন পরিপক্ক ফলের মতো সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সমস্ত শরীরে তার সূর্যের সোনালি-গোলাপি আভা, হৃদয় তার সদ্য ঝ'রে পড়া পূর্ণ বিকশিত গোলাপের মতো। সে চেয়েছিলো দুরন্ত যার রক্তস্রোত সেই লাজুক চাষিপুরুষের কাছে গিয়ে তার সন্তানের জননী হ'তে। কিন্তু তার মনের কামনাগুলি পাপড়ির মতো ঝ'রে গেছে। সেই রৌদ্রদগ্ধ মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস সে দেখেছে, দেখেছে বহ্নিশিখা তার নীল চোখে, আর তার উত্তরে, তার নিজের ভেতর থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটে বেরিয়েছে। জুলিয়েটের কাছে সে আরেক সূর্যস্নানের মতোই হ'তে পারতো, আর তাই জুলিয়েট চেয়েছিলো।

কিন্তু তার পরের সন্তান মরিসেরই হবে। অমোঘ ঘটনা-শৃঙ্খলে তাই হ'তে বাধ্য।

অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র



ব্যবচ্ছেদ

গেয়র্গ্ হাইম্

অস্ত্রোপচার-কক্ষের পীড়াদায়ক শুভ্রতার মধ্যে একটা শাদা টেবিলের উপর ভগ্নদেহে একা শুয়ে আছে মৃত লোকটি; অস্ত্রোপচার-কক্ষের নিষ্ঠুর গাম্ভীর্যে তখনো যেন সব অনিঃশেষ যন্ত্রণার আর্তনাদে স্পন্দিত হ'য়ে উঠছে।

তাকে আচ্ছন্ন করেছিলো মধ্যাহ্নের সূর্যালোক, আর তার কপালের উপরে ফুটে উঠছিলো কালচে নীল কতগুলি দাগ; যেন এই সূর্যালোক জাদুবলে তার অনাবৃত উদরের মধ্যে থেকে এক উজ্জ্বল সবুজ আভা বিচ্ছুরিত করছে আর জলপূর্ণ একটা বিরাট থলের মতো স্ফীত হ'য়ে উঠছে সেটা। তার শরীরটা যেন একটি বিশাল ফুলের অত্যুজ্জ্বল বহিরাবরণ, যেন ভারতবর্ষের একটি রহস্যময় অরণ্যগুল্ম মৃত্যুর বেদীতে সসঙ্কোচে কেউ নিবেদন ক'রে গেছে। লাল এবং নীল বর্ণের দ্যুতিময় আভা ফুটে উঠছিলো তার কটিদেশে, আর সেই উত্তাপে তার নাভির নিচের সেই বিরাট ক্ষতটা—যেখান থেকে ভয়ংকর এক গন্ধ নির্গত হচ্ছে, একটা বিশাল লাল খাতের মতো ফাঁক হ'য়ে খুলে যাচ্ছিলো।

ডাক্তাররা প্রবেশ করলেন। শাদা কোট পরিহিত, ক্ষতচিহ্ন-পরিকীর্ণ আর সোনার প্যাঁশনে-পরা কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তি।

মৃত ব্যক্তিটির কাছে গেলেন তাঁরা, তারপর অতিশয় উৎসুকভাবে তার দিকে তাকিয়ে পেশাদারি মন্তব্য করতে লাগলেন। শাদা আলমারি থেকে শব-ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রপাতি বের ক'রে নিলেন তাঁরা ; শাদা বাক্স ভর্তি হাতুড়ি, কঠিন দাঁতযুক্ত হাড় কাটার করাত, উখো, সাংঘাতিক সব চিমটে আর ছোটো-ছোটো বাক্স ভর্তি প্রকাণ্ড ছুঁচগুলো যেন শকুনের বাঁকা ঠোঁটের মতোই মাংসের জন্যে অবিশ্রান্ত বিলাপ করছে।

তাঁদের বীভৎস কাজ শুরু করলেন তাঁরা। তাঁরা যেন কয়েকজন ভয়ংকর অত্যাচারী : রক্তাক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো তাঁদের হাতগুলো আর সেই ঠাণ্ডা শবদেহের আরো অন্তঃস্তলে তাঁরা তাঁদের হাত ডুবিয়ে দিলেন, শাদা-পোশাক-পরা রাঁধুনি যেমন ক'রে মেয়ে-হাঁসের পেট থেকে সব কিছু বের ক'রে আনে, তেমনি ক'রে তাঁরা বের ক'রে আনলেন সেই শবদেহের সব অন্তঃসার।

অন্ত্রনালীগুলো তাঁদের হাতে জড়িয়ে গেলো সবুজে-হলুদ সাপের মতো আর উষ্ণ, পচা তরল বিষ্ঠার ছিটে লাগলো তাঁদের কোটের হাতায়। মূত্রাশয় ফুটো করলেন তাঁরা। হলুদ মদের মতো ঠাণ্ডা প্রস্রাব সেখানে চকচক করছে। বিশাল গামলার মধ্যে সেটাকে তাঁরা ঢেলে রাখলেন ; অ্যামোনিয়ার মতোই তীব্র আর কটু দুর্গন্ধ তার। কিন্তু সেই মৃত লোকটি ঘুমিয়েই রইলো। তাকে নিয়ে তাঁদের এদিক-ওদিক টানাহেঁচড়া, চুল ধ'রে টান দেয়া, সবই সে সহিষ্ণুভাবে সহ্য করছিলো। ঘুমিয়েই রইলো সে।

তারপর যখন হাতুড়ির আঘাত অনুরণিত হ'তে লাগলো তার মাথায়, তখন তার এ খ নো-অ ব শি ষ্ট ভালোবাসা স্বপ্নের মতো জেগে উঠলো তার প্রাণে, যেন তার রাত্রির তিমির ভেদ ক'রে এক দীপ্তশিখার মশাল জ্ব'লে উঠলো।

সামনে বিরাট জানলাটা দিয়ে বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশ দেখা যাচ্ছে, প্রশান্ত অপরাহ্ণের আলোয় ছোটো-ছোটো শাদা টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শুভ্র দেবতার মতো।

মৃত লোকটির পচ-ধরা নীল কপাল থেকে কালো রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। এই উত্তাপে ঘনীভূত হ'য়ে সেগুলো বীভৎস পিত্তে পরিণত হ'তে লাগলো আর মৃত্যুর অপ্রতিরোধ্য ক্ষয় তার বাঁকা ঝকঝকে নখযুক্ত থাবা নিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠে আসতে লাগলো তাঁর শরীরে। ফেঁপে ফুলে ফাঁক হ'য়ে যেতে লাগলো তার চামড়া, ডাক্তারদের লুব্ধ আঙুলের তলায় তার উদর

বানমাছের মতোই শাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠলো, আর তার আর্দ্র মাংসের মধ্যে ডাক্তারদের হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ভিজে উঠলো।

ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হ'য়ে গেলো। যেন সে মৃদু হাসলো। এক পরম আনন্দময় নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখছিলো সে, স্বপ্ন দেখছিলো এক সুরভিত গ্রীষ্মকালীন গোধূলিবেলার। তার গ'লে যাওয়া ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠলো, যেন খুব আলগাভাবে কেউ সেখানে চুম্বন করছে।

কত ভা লো বে সে ছি লা ম তোমাকে, কী ভীষণ ভালোবেসেছিলাম। কত ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, শুনবে তুমি? যখন পপিফুলের খেতের মধ্যে দিয়ে তুমি হাঁটছিলে, যেন তুমি নিজেই পপিফুলের একটি উজ্জ্বল শিখা, তখন সেই সন্ধেবেলাটা যেন তোমার মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিলো সম্পূর্ণভাবে। গোড়ালির উপরে উড়ছিলো তোমার পোশাক, অস্তগামী সূর্যের দীপ্ত আলোয় মনে হচ্ছিলো যেন সেটা একটা আগুনের ঢেউ। তুমি তোমার মাথাটা একটু হেলিয়েছিলে সেই আলোয় আর তোমার চুলে আমার চুম্বনের আগুন সহস্র শিখায় জ্ব'লে উঠেছিলো। আবার কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। এখানে, এই গির্জার জানলার নিচে, এখানে, যেখানে মোমবাতির আলো গ'লে পড়ছে, তোমার চুলকে মনে হচ্ছে যেন এক সোনালি অরণ্য; এখানে, যেখানে নার্সিসাস ফুল তোমার গোড়ালির উপর জড়িয়ে ধরছে, কোমল চুম্বনের মতোই স্নিগ্ধ ও মেদুর স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে।

প্রতি রাত্রেই গোধূলির সময় আবার আমার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কোনোদিন আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে যাবো না। কত ভালোবাসি তোমাকে। শুনবে তুমি, কত ভালোবাসি তোমাকে?

মৃত লোকটি তার লাশ-কাটার টেবিলে শুয়ে-শুয়ে এক পরম আনন্দের অনুভূতিতে ঈষৎ শিহরিত হ'লো, আর এবার ডাক্তারের হাতের বাটালিতে তার রগের হাড় ভেঙে খুলে এলো।

অনুবাদ: সত্রাজিৎ দত্ত



পরম আনন্দ

ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড

যদিও বার্থা ইয়ঙের বয়স তিরিশ তবু এখনো কখনো-কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন তার হাঁটার চেয়ে দৌড়োতেই বেশি ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে শান-বাঁধানো রাস্তায় কখনো এদিকে কখনো ওদিকে পা ফেলে-ফেলে নাচের ভঙ্গিতে চলতে, হঠাৎ একটা ঘুরপাক খেয়ে যেতে। উপরে কিছু একটা ছুঁড়ে দিয়ে পরক্ষণেই সেটা লুফে নিতে, কিংবা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে অকারণ ফুর্তিতে হেসে উঠতে—অকারণে, একেবারেই অকারণে।

কী করতে পারো তুমি, যদি বয়স তোমার তিরিশ হয় আর তোমার বাড়ির রাস্তার মোড় ঘুরতেই হঠাৎ অপূর্ব এক আনন্দ তোমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে ফ্যালে—পরম এক আনন্দ!—যেন তুমি পড়ন্ত বিকেলের সেই উজ্জ্বল সূর্যের একটা টুকরো হঠাৎ গিলে ফেলেছো আর তোমার বুকের মধ্যে জ্বলতে-জ্বলতে তা প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ঝর্নার মতো অজস্র স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে—ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটি হাতের আঙুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত।

ঈশ, এমন কি কোনো উপায় নেই, যাতে তুমি 'মত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল' না-হ'য়েও তাকে প্রকাশ করতে পারো? কী নিরেট বোকামি এই সভ্যতা ব্যাপারটা!

এই শরীরটা কেন দেয়া হ'লো যদি তাকে দুষ্প্রাপ্য, অতি দুষ্প্রাপ্য একটা বেহালার মতো সর্বদা বাক্সবন্দী ক'রেই রাখতে হয় ?

'না, ঐ বেহালা সম্পর্কে আমি ঠিক এ-কথাটা বলতে চাইনি,' দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে-উঠতে আর ব্যাগের মধ্যে চাবিটা হাতড়াতে-হাতড়াতে —সেটা অবশ্য যথারীতি সে ভুলে ফেলে এসেছে—আর চিঠির বাক্সটা ঘটঘট করতে-করতে সে ভাবলো, 'ঠিক এ কথাটা বলতে চাই নি আমি—ধন্যবাদ, মেরি,'—হলঘরটায় ঢুকলো সে। 'ধাই ফিরেছে ?'

'হ্যাঁ, মা।'

'আর ফলগুলো এসে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সব কিছুই এসে গেছে।'

'তাহ'লে ফলগুলো খাবার ঘরে নিয়ে এসো, কেমন ? উপরে যাবার আগে বরং আমি ওগুলো গুছিয়ে রাখি।'

খাবার ঘরটা আধো-অন্ধকার আর বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বার্থা কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেললো ; এই আঁটো বন্ধন সে যেন আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছিলো না : এবার তার বাহুতে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পেলো সে।

কিন্তু তার বুকের মধ্যে তখনো সেই দীপ্তশিখার আগুন জলছিলো—ছোটো ছোটো অজস্র স্ফুলিঙ্গ ঝর্নার মতো অবিরল ঝ'রে পড়ছিলো সেখান থেকে। প্রায় অসহনীয় মনে হচ্ছিলো তার। এই দীপ্তি আরো উর্ধ্বমুখী হবে—এই ভয়ে সে যেন নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত পারছিলো না, এবং তা সত্ত্বেও জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিলো সে, অত্যন্ত গভীরভাবে। শীতল আয়নাটার দিকে তাকাতেও সে ভয় পাচ্ছিলো। কিন্তু তবু তাকালো। আর আয়নায় যে-দীপ্তিময়ী নারীর ছবি ফুটে উঠলো, তার সহাস্যকম্পিত ঠোঁটে, বড়ো-বড়ো কালো দুই চোখে যেন আলো ঝরছে, তার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হ'য়ে কী যেন শুনছে। যেন কোনো স্বর্গীয় সংঘটনের প্রতীক্ষা করছে সে, সে জানে যে তা ঘটবেই। নিশ্চিতভাবে ঘটবে।

মেরি ট্রে-তে ক'রে ফলগুলো নিয়ে এলো, একটা কাচের বাটি আর ভারি সুন্দর একটা নীল থালাও সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো ; থালাটা থেকে অদ্ভুত এক জেল্লা ফুটে বেরোচ্ছিলো—যেন সেটাকে দুধে ডুবিয়ে নিয়ে আসা হ'য়েছে।

'আলোটা কি জেলে দেবো, মা ?'

'না, অনেক ধন্যবাদ। এমনিতেই আমি বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি।'

স্ট্রবেরির বেগুনি ছোপ-লাগা আপেল আর কমলালেবু ছিলো ট্রে-তে। আর ছিলো রেশমের মতো মসৃণ হলুদ নাশপাতি। আর রুপোলি আভা-জড়ানো কিছু শাদা আর বেশ বড়ো এক গুচ্ছ লালচে বেগুনি রঙের আঙুর।

শেষেরটা তার খাবার-ঘরের নতুন কার্পেটের রঙের সঙ্গে খাপ খায় ব'লে কিনেছিলো সে। কথাটা রীতিমতো বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে, কিন্তু সত্যি-সত্যি ওগুলো সে ঐ কারণেই কিনেছিলো। দোকানে গিয়ে তার মনে হ'লো: 'আমাকে ঐ লালচে বেগুনি রঙের গুলো কিনতেই হবে, তাহ'লে কার্পেটটা বেশ টেবিল অবধি টেনে আনা যাবে।' আর কথাটা তখন কিছুই অদ্ভুত মনে হয় নি তার।

যখন তার গোছানো শেষ হ'লো আর এই উজ্জ্বল গোলাকার বস্তুগুলো দিয়ে দুটো পিরামিড রচিত হ'লো, তখন, ব্যাপারটা কী-রকম দাঁড়ালো— দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলো সে, আর সাজানোটা সত্যিই অদ্ভুত ভালো হয়েছিলো।

কালো টেবিলটা যেন মিশে গিয়েছিলো সেই নিষ্প্রভ আলোয়। আর কাচের পাত্র আর নীল থালাটা যেন হাওয়ায় ভাসছিলো। বলাই বাহুল্য, বর্তমান মানসিক অবস্থায় সমস্ত দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর মনে হচ্ছিলো তার… সে হাসতে শুরু করলো।

'না, না। আমি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হ'য়ে পড়ছি।' তাড়াতাড়ি তার ব্যাগটা আর কোটটা টেনে নিয়ে এক দৌড়ে উপরে উঠলো সে, তারপর বাচ্চার ঘরে ঢুকলো।

ধাই তখন ছোট্ট বি-র স্নানের পর তাকে একটা নিচু টেবিলে বসিয়ে রাত্রের খাওয়া খাওয়াচ্ছিলো। বাচ্চাটির পরনে একটা শাদা ফ্লানেলের ফ্রক আর নীল পশমের জামা। আর তার কালো, ফুরফুরে চুলগুলো আঁচড়িয়ে একটা মজার ঝুঁটি বাঁধা। সে চোখ তুলেই মাকে দেখতে পেলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে আরম্ভ করলো লাফালাফি।

'এ-রকম করে না সোনা, লক্ষ্মী মেয়ের মতো সবটুকু খেয়ে নাও তো।' ধাই ব'লে উঠলো। তার চাপা ঠোঁট দুটোর পরিচিত ভঙ্গি দেখে বার্থা বুঝতে পারলো যে, এর মানে হ'চ্ছে—আরো একবার নিতান্ত একটা অসময়ে সে বাচ্চার ঘরে এসে প'ড়েছে।

'ধাই, ও বেশ লক্ষ্মী হ'য়ে ছিলো তো?'

'সমস্ত বিকেলটাই খুব লক্ষ্মী সোনা হ'য়ে ছিলো,' ফিশফিশ ক'রে ধাই জানালে। 'আমরা পার্কে গিয়েছিলাম আর আমি একটা চেয়ারে বসেছিলাম আর ওকে প্র্যাম থেকে তুলে নিয়েছিলাম। আর এত্তবড়ো একটা কুকুর এলো আর আমার হাঁটুতে মাথা রাখলো আর ও তার কান দুটো মুঠো ক'রে ধ'রে টানতে লাগলো। ঈশ, তখন যদি ওকে একবার দেখতেন আপনি!'

বার্থার একবার জিগেস করতে ইচ্ছে হ'লো যে, একটা অজানা-অচেনা কুকুরের কান মুঠো ক'রে ধরাটা কি একটু বিপজ্জনক নয়। কিন্তু সাহস হ'লো না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে তাদের লক্ষ করতে লাগলো, তার হাত-দুটো দু-পাশে ঝোলানো, পুতুল হাতে নিয়ে ব'সে-থাকা বড়োলোকের বাচ্চা মেয়ের সামনে একটি গরিব বাচ্চা মেয়ে ঠিক যেমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাচ্চাটি আবার চোখ তুলে তাকালো, তাকিয়ে রইলো, তারপর এত মিষ্টি ক'রে হাসলো যে বার্থা আর থাকতে পারলো না, চেঁচিয়ে উঠলো, 'না ধাই, বাকিটা আমিই ওকে খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ বরং ওর স্নানের জিনিশ-গুলো সরিয়ে নিয়ে যাও।'

'দেখুন মা, খাওয়ার সময় ওকে হাত বদল না-করাই ভালো,' যথারীতি ফিশফিশ ক'রে ধাই জানালে, 'তাতে ও চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এ-রকম করলে ও বিগড়ে যাবে।'

সমস্ত ব্যাপারটাই কী বাজে! বাচ্চা হওয়া কেন, যদি তাকে দুষ্প্রাপ্য, অতি দুষ্প্রাপ্য বেহালার মতো সযত্নে আড়াল ক'রে না-রেখে সদাসর্বদা অন্য একজন মহিলার হাতেই ছেড়ে দিতে হয়?

'বলছি আমাকে দাও।' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

অত্যন্ত আহত হ'য়ে ধাই বাচ্চাকে তার হাতে তুলে দিলে।

'যাই হোক, খাওয়ার পরে ওকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। আপনার তো আবার এরকম অভ্যাস একটু আছে, মা। আর তারপর ওকে নিয়ে আমাকে যা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।'

ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ! স্নানের তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে ধাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। 'সোনামণি, এখন তুমি শুধু আমার,' তার বুকের মধ্যে এলিয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো বার্থা।

পরমানন্দে খাচ্ছিলো সে, মুখ তুলে চামচের জন্য ঠোঁট ফাঁক করছিলো আর তার পর প্রবলবেগে হাত নাড়ছিলো। কখনো-কখনো আবার চামচটাকে

কিছুতেই ছাড়ছিলো না, কিংবা বার্থা চামচেতে খাবার তোলা মাত্র হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

ঝোলটা শেষ হবার পর বার্থা আগুনের দিকে ঘুরে বসলো। 'লক্ষ্মী মেয়ে, আমার সোনা মেয়ে,' সেই উষ্ণ ছোট্ট শরীরে চুমু খেতে-খেতে বলতে লাগলো সে, 'আমি ক ত ভা লো বা সি তোমাকে, ভীষণ ভালোবাসি।'

আর, সত্যিই, ছোট্ট বি-র প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় ভ'রে উঠেছিলো— যখন সে সামনে ঝুঁকে পড়ছিলো তখন তার ঘাড় আর আগুনের আভায় উজ্জ্বল ঝকঝকে পায়ের আঙুলগুলো দেখতে-দেখতে ভালোবাসায় অধীর হ'য়ে উঠছিলো সে, আর এই অনুভূতির সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই পরম সুখবোধ আবার ফিরে এলো। আর আবার সে ভেবে পেলো না এই তীব্র সুখ সে কী ক'রে প্রকাশ করবে—কী করে সে এখন একে নিয়ে।

'আপনার টেলিফোন এসেছে,' বিজয়গর্বে ঘরে ঢুকলো ধাই, আর তার বাচ্চাকে তার কাছ থেকে টেনে নিলো।

একদৌড়ে নিচে নামলো সে। নিশ্চয়ই হ্যারি।

'এই যে বার নাকি! এই, ছাখো, আমার একটু দেরি হ'য়ে যাবে। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি চ'লে আসছি, কিন্তু খাওয়ার সময়টা মিনিট দশেক পেছিয়ে দাও, কেমন? ঠিক আছে তো!'

'হ্যাঁ, ঠি—ক আছে। আর, শোনো, হ্যারি!'

'বলো?'

কিন্তু কী বলার আছে তার! কিচ্ছু নেই। সে শুধু আরো এক মুহূর্ত এই সান্নিধ্যকে ধ'রে রাখতে চেয়েছিলো। অর্থহীনভাবে সে তো আর চেঁচিয়ে উঠতে পারে না: 'কী অপূর্ব হয়েছে আজকের দিনটা, তাই-না?'

'কী বলো?' তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শোনা গেলো।

'কিছু না, ঠিক আছে,' বার্থা বললে, তারপর রিসিভারটাকে নামিয়ে রাখতে-রাখতে ভাবলে সভ্যতা ব্যাপারটাকে বোকামি বললেও কম বলা হয়।

রাতে ছয়জনকে খেতে বলা হয়েছিলো। নরম্যান নাইট দম্পতি—অত্যন্ত প্রগাঢ় তাদের দাম্পত্যজীবন—ভদ্রলোক একটা থিয়েটার খোলবার তোড়জোড় করছেন আর ভদ্রমহিলা ঘর-সাজানোর কাজে মারাত্মক উৎসাহী; এডি ওয়ারেন ব'লে একটি যুবক, অত্যন্ত সম্প্রতি যার একটি ছোট্ট কবিতার বই

প্রকাশিত হয়েছে এবং সকলেই যাকে এখন রাতে খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে; আর বার্থার একটি 'নবাবিষ্কৃত' বান্ধবী, যার নাম পার্ল ফুলটন। মেয়েটি কী করে, বার্থার জানা নেই। ক্লাবে একদিন ওদের দু'জনের দেখা হয়েছিলো এবং অবিলম্বে বার্থা তার প্রেমে প'ড়ে যায়; কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে, বিশেষ ক'রে তার মধ্যে যদি অদ্ভুত কিছু একটা থাকে, সদাসর্বদাই বার্থা তার প্রেমে পড়তে প্রস্তুত।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'লো যে, যদিও অসংখ্যবার তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আর সহস্র কথা বলেছে তারা, তবু বার্থা কিছুতেই মেয়েটিকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি; একটা সীমা পর্যন্ত মিস্ ফুল্টন সত্যিই অসাধারণ রকম সরল, চমৎকার খোলামেলা, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্তই—সেটা ছাড়িয়ে সে কিছুতেই যায় না। কিন্তু তা ছাড়িয়ে কি সত্যিই কিছু আছে! হ্যারি বলে, 'না।' তার মতে মেয়েটি নিতান্তই হাবাগোবা, আর 'যে-কোনো সোনালি চুল-ওলা মেয়ের মতোই শীতল, এবং, হয়তো, মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ রক্তাল্পতা-দোষ আছে।' কিন্তু বার্থা তার সঙ্গে একমত হ'তে পারে না, অন্তত এখনো পারে নি।

'না, হ্যারি, একপাশে মাথা হেলিয়ে মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটিয়ে যে-ভঙ্গিতে ও ব'সে থাকে, তাতেই বোঝা যায় কিছু-একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে এর পিছনে, আর আমাকে বের করতেই হবে সে-ব্যাপারটা কী?'

'সম্ভবত তার একমাত্র কারণ, মেয়েটির পেটের গোলমাল নেই।'

সর্বদাই এই ধরনের উত্তর দিয়ে বার্থার পিছনে লাগতে হ্যারি খুব তৎপর… 'ওগো মেয়ে, যকৃৎটাই আসলে জ'মে গেছে,' কিংবা 'বোঝাই যাচ্ছে, পেট ফেঁপেছে' কিংবা 'কিডনিতেই গণ্ডগোল,'… এই ধরনের আরো কত কি মন্তব্য করে সে। আর কী এক অজানা কারণে বার্থার এ-সব শুনতে বেশ ভালোই লাগে, স্বামীর এই স্বভাবের সে একজন রীতিমতো গুণগ্রাহীই বলা যায়।

বসার ঘরে গিয়ে সে আগুনটা জ্বালিয়ে দিলে; তারপর যে-কুশনগুলো মেরি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলো, সেগুলোকে একটা-একটা ক'রে তুলে নিয়ে আবার চেয়ার আর সোফার উপরেই ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। এতেই সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে বদলে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠলো। শেষ কুশনটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে সে নিজেই হঠাৎ অবাক হ'য়ে দেখলো যে, প্রবল, অত্যন্ত প্রবল এক আবেগে সেটাকে জড়িয়ে ধ'রে সে যেন

তার বুকের মধ্যে পিষে ফেলছে ; কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে-আগুন জলছিলো, তা মোটেই নিভলো না তাতে, বরং তার উল্টোটাই হ'লো !

বসার ঘরের জানলাগুলো খুললেই বাগানের ঠিক উপরে একটা ঝোলানো বারান্দা। বাগানটার একেবারে শেষ প্রান্তে, পাঁচিলের ঠিক গায়েই, একটা দীর্ঘ কৃশকায় নাশপাতি গাছে অজস্র, অসংখ্য ফুলের সমারোহ ; ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা, যেন হাল্কা-সবুজ আকাশের পটভূমিতে শান্ত স্থির, হ'তে পেরেছে সে। অতদূর থেকেও বার্থা স্পষ্ট অনুভব না-ক'রে পারলো না যে, একটিও না-ফোটা কুঁড়ি নেই গাছটায়, একটি বিবর্ণ পাপড়িও না। ঠিক নিচেই, বাগানের জমির উপরে, লাল আর হলুদ টিউলিপ ফুলে-ছাওয়া গাছগুলো যেন গোধূলির প্রায়ান্ধকারে তাদের শরীর এলিয়ে দিয়েছে। একটা ধূসর রঙের বেড়াল জমির উপরে তার শরীরটাকে প্রায় মিশিয়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিলো, আর আরেকটি কালো রঙের—তারই ছায়া সেটা—ঠিক তার পিছনে-পিছনেই যাচ্ছিলো। এত একাগ্র আর তৎপর তাদের ভঙ্গি যে, সেদিকে চোখ পড়তেই এক অদ্ভুত শিহরণে বার্থার শরীর কেঁপে উঠলো।

'বেড়ালগুলোর চুপিসাড়ে চলা দেখলে গা শিরশির করে,' একটু থেমে-থেমে বললে বার্থা, তারপর জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগলো।

জোংকুইল ফুলের তীব্র গন্ধে উষ্ণ ঘরটা একেবারে ভ'রে গেছে। খুবই কি তীব্র ? মোটেই না। কিন্তু তবুও তা যেন সম্পূর্ণ অভিভূত করলে তাকে, একটা সোফার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দু'হাতে সে নিজের চোখ ঢাকলো।

'কী সুখী আমি, কী অসম্ভব সুখী !' গুনগুন করলো সে।

আর তার চোখের পাতায় যেন সেই আশ্চর্য সুন্দর পাশাপাশি গাছটা ফুটে উঠলো, প্রস্ফুটিত ফুলে-ছাওয়া সেই গাছটা যেন তার নিজের জীবনেরই প্রতীক।

সত্যি, সত্যিই সে সব পেয়েছে। বয়স তার কম। হ্যারি আর সে পরস্পরকে আগের মতো, চিরদিনের মতোই, ভালোবাসে। চমৎকার কেটেছে তাদের যুগল জীবন, সত্যিই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদের সম্পর্ক। ভারি সুন্দর একটি বাচ্চাও আছে তার। টাকাকড়ি নিয়ে কখনো কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয় নি তাদের। ঠিক মনের মতো এ-রকম একটা বাড়ি আর বাগান পেয়েছে তারা। আর কত বন্ধুবান্ধব পেয়েছে—সবাই একেবারে আধুনিক, রীতিমতে রোমাঞ্চকর

তাদের সঙ্গ ও সান্নিধ্য—লেখক, শিল্পী, কবি কিংবা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক—ঠিক যে-ধরনের বন্ধু তারা চেয়েছিলো, সে-রকমই পেয়েছে। আর এ ছাড়াও কত বই, কত গানবাজনায় ভরা তাদের জীবন, আর সে কী আশ্চর্য ও ভালো একজন পোশাক তৈরি করার লোক পেয়েছে, তাছাড়া এই গ্রীষ্মে তারা সাগর পাড়ি দিচ্ছে, তার উপর তাদের নতুন রাঁধুনিটি কী অপূর্ব অমলেট ভাজে ··

'কী সব আজেবাজে ভাবছি আমি।' সে উঠে বসলো ; কিন্তু কীরকম যেন বিহ্বল বোধ করছিলো সে, যেন তার বেশ নেশা হয়েছে। এই বসন্তকালটাই নিশ্চয়ই এর পিছনে কাজ করছে।

ঠিক, সবটাই এই বসন্তের জন্য। এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো সে যে পোশাক পরার জন্য নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে সে যেন আর উপরে উঠতেও পারছিলো না।

একটা শাদা পোশাক, সবুজ পাথরের একটা মালা, একজোড়া সবুজ জুতো আর মোজা। সমস্তটাই ইচ্ছাকৃত। বসার ঘরের জানলায় এসে দাঁড়াবার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই সে মনে-মনে ভেবে রেখেছিলো। তার পোশাকের ফুলের পাপড়িতে খশখশে আওয়াজ তুলে সে হলঘরে ঢুকলো। তারপর মিসেস নাইটকে চুমু খেলো. তিনি তখন অত্যন্ত মজার একটা কমলা রঙের কোট গা থেকে খুলছিলেন : কোটটার প্রান্তে চারদিক ঘিরে সারিবদ্ধ কালো বাঁদরের মিছিল, সামনের দিকেও সোজাসুজি উপরে উঠে গেছে তাদের শোভাযাত্রা।

'কেন! কেন! কেন এই মধ্যবিত্তেরা এত ভারিক্কি ধরনের হয়—রসবোধের এত অভাব কেন তাদের মধ্যে! জানো, আমি যে শেষপর্যন্ত এখানে এসে পৌঁচেছি তা নিতান্ত একটা বরাতজোর— নরম্যান হচ্ছে আমার সেই প্রতি-রক্ষাকারী বরাত। কেননা আমার এই বাঁদরমশাই সমস্ত ট্রেনে এমনই একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলো যে শেষপর্যন্ত সে একজন ভদ্রলোকের উপরেই গিয়ে ভর ক'রে বসলো। দু'চোখ দিয়ে সে যেন আমাকে গিলে খাচ্ছিলো একেবারে। হাসলো না, কৌতুক পর্যন্ত বোধ করলো না যে আমার ভালো লাগবে। কিছু না, শুধু ড্যাবড্যাব ক'রে তাকিয়ে রইলো—এই বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে আমাকে একেবারে হয়রান ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু সবচেয়ে সেরা ব্যাপার হ'লো,' কচ্ছপের খোলায় বাঁধানো একটা এক-চোখো চশমা চোখে লাগাতে-লাগাতে নরম্যান ব'লে উঠলেন, 'তুমি কিছু মনে

করবে না তো, ভেটকি, যদি ব্যাপারটা বলি? করবে?' (নিজেদের বাড়িতে এবং বন্ধুমহলে তারা পরস্পরকে ভেটকি আর হাঁদা ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকে।) 'সবচেয়ে সেরা ব্যাপার হ'লো যে, শেষপর্যন্ত ও পুরোপুরি তিতিবিরক্ত হ'য়ে ওর পাশে বসা মহিলাটির দিকে ফিরে প্রশ্ন ক'রে বসলো, "আপনি বুঝি এর আগে কখনো বাঁদর দেখেন নি?"'

'হ্যা হ্যা!' মিসেস নরম্যান নাইটও সমবেত হাসিতে যোগ দিলেন। 'এটা একেবারে দারুণ মজার ব্যাপার হয়েছে, তাই না!'

কিন্তু এর চেয়েও মজার ব্যাপার হ'লো এই যে, কোটটা খুলে ফেলার পর এখন তাঁকেই একটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান বাঁদরের মতো দেখাচ্ছিলো—এতটাই বুদ্ধিমান যে, কলার খোশা ছাড়িয়ে তা থেকে হলুদ সিল্কের একটা পোশাক বানানোও তার পক্ষে সম্ভব হ'য়েছে। আর তাঁর অ্যাম্বারের কানের দুল—ঠিক যেন ছোটো বাদাম ঝুলছে।

'সেই অধঃপতন নিতান্তই দুঃখের!' ছোট্ট বি-র প্যারাম্বুলেটরের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে হাঁদা ব'লে উঠলেন। 'প্র্যামের যবে হয় আগমন—' উদ্ধৃতির বাকি অংশটা তিনি হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন।

ঘণ্টা বেজে উঠলো। রোগা ফ্যাকাশে এডি ওয়ারেন (যথারীতি) বিষম যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় উপস্থিত।

'ঠিক বাড়িতেই এসেছি, তাই না?' ব্যাকুলভাবে সে প্রশ্ন করলে।

'হ্যা, আমার তো তা-ই মনে হয়, অন্তত সেইরকমই তো আশা করি,' হাস্যোজ্জ্বল বার্থা জানালো।

'একটা ট্যাক্সিওলাকে নিয়ে এমন এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হ'লো আমার, কী বলবো! অতিশয় বদ লোকটা। গাড়ি থামাতেই পারছিলাম না আমি। আমি যতই টোকা দিই, লোকটা ততই আরো জোরে চালায়। আর চাঁদের আলোয় সেই অদ্ভুত মুখটা তার চ্যাপ্টা মাথা নিয়ে ছোটো হুইলটার উপর ঝুঁকে পড়েছে......' সে শিউরে উঠে পকেট থেকে একটা শাদা সিল্কের স্কার্ফ বের করে আনলো।

'সত্যি, কী ভয়ংকর ব্যাপার!' বার্থা ব'লে উঠলো।

'সত্যিই তাই, রীতিমতো ভয়ংকর,' তাকে অনুসরণ ক'রে বসার ঘরে যেতে-যেতে এডি বললো, 'আমার মনে হচ্ছিলো যেন অনন্তকাল ধ'রে কালহীন একটা ট্যাক্সি ক'রে আমি চলেছি।'

নাইট দম্পতিকে আগে থেকেই চিনতো সে। সত্যি বলতে কি, নরম্যান নাইটের মাথায় থিয়েটারের মতলবটা আসার পর সে তাঁর জন্যে একটা নাটক লিখতেও আরম্ভ করেছিলো।

'এই যে ওয়ারেন, আপনার নাটক কত দূর?' নরম্যান নাইট তাঁর এক-চোখো চশমাটা নামিয়ে রেখে চোখটাকে মুহূর্তের জন্যে একটু উপরে ভেসে ওঠার সুযোগ দিলেন, পরক্ষণেই অবশ্য তা আবার ডুবে গেলো।

আর শ্রীমতী নরম্যান নাইট ব'লে উঠলেন, 'ওমা, মিস্টর ওয়ারেন, আপনার মোজাগুলো কী সুন্দর!'

'আপনার ভালো লেগেছে? অত্যন্ত খুশি হলাম,' পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চাঁদ ওঠার পর থেকে ওগুলোকে আরো অনেক বেশি শাদা দেখাচ্ছে।' তারপর তার কৃশ বিষণ্ণ মুখ বার্থার দিকে ফিরিয়ে ব'লে উঠলো, 'চাঁদ উঠেছে। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই।'

বার্থার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো: 'খুব লক্ষ করেছি—খুউব!'

ওয়ারেন লোকটা সত্যিই খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু ভেটকিও তো তা-ই, আগুনের সামনে তাঁর সেই কলার খোশা জড়িয়ে গুটিশুটি হ'য়ে বসেছিলেন তিনি। আর হাঁদাও কিছু কম যান না, সিগারেট খেতে-খেতে আর ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বিড়বিড় ক'রছিলেন, 'বরের গায়ের রংটা কেন আলকাতরা?'

'এই যে, এসে গেছে।'

বাইরের দরজাটা দড়াম ক'রে খুললো এবং বন্ধ হ'লো। হ্যারি চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে, সবাই এসে গেছো তো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।' সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় ক'রে তার ওঠার আওয়াজ শোনা গেলো। বার্থার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সে জানে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কাজ করতে ও কী ভীষণ ভালোবাসে। আর পাঁচ মিনিট বেশি লাগলে কী-ই বা এমন এসে যায়? কিন্তু ও এমন ভাব করে যেন মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। অথচ এর পরেই বসার ঘরে আসার সময় বাড়াবাড়ি রকম শান্ত, সংযত হ'য়ে আসা বিষয়ে সে আবার বেশি মাত্রায় মনোযোগী।

জীবন সম্পর্কে হ্যারির উদ্দীপনা এইরকমই প্রবল; ওর মধ্যে এই জিনিশটা অসম্ভব ভালো লাগে বার্থার। সব রকম বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আসক্তিও ওর কী প্রচণ্ড। যা-কিছু তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তার মধ্যেই নিজের সাহস আর শক্তি পরীক্ষার সুযোগ খুঁজে বেড়ায় সে,—তার স্বভাবের

এই দিকটাও বার্থা পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি, কখনো-কখনো, ক্বচিৎ কদাচিৎই অবশ্য, যারা তাকে ভালো ক'রে জানে না, তাদের কাছে নিজেকে হয়তো হাস্যাস্পদও ক'রে তোলে সে, কেননা কখনো কখনো এ-রকম হয়, যখন আসলে যুদ্ধ করার কিছু না-থাকলেও সে যুদ্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাসতে-হাসতে আর গল্প করতে-করতে বার্থা ভুলেই গিয়েছিলো যে, পার্ল ফুলটন এখনো আসে নি। হ্যারি ঘরে ঢোকা মাত্র (ঠিক যেমন ভেবেছিলো, তেমনি ভাবেই ঘরে ঢুকলো সে) কথাটা তার মনে পড়লো।

'কী ব্যাপার বলো তো, মিস্ ফুল্টন কি ভুলে গেলেন নাকি ?'

'আমার তা-ই মনে হয়', হ্যারি বললো, 'ফোন করা যায় না ওকে ?'

'এই তো; একটা ট্যাক্সি এলো।' একটু নতুন ধরনের আর রহস্যময় বন্ধু জোগাড় করার পর বার্থা সাধারণত মালিকানার সর-মেশানো যে মৃদুহাস্য ক'রে থাকে, সেই রকম মৃদু হেসে জানালে, 'সারাদিন ট্যাক্সিতেই থাকে ও।'

'খুব খারাপ করে, মোটা হ'য়ে যাবে,' শান্ত ভঙ্গিতে খাবার ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে হ্যারি মন্তব্য ক'রলো, 'সোনালি চুল-ওলা মেয়েদের পক্ষে সেটা সাংঘাতিক বিপদের কথা।'

'হ্যারি, ও-রকম বোলো না,' তার দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বার্থা শাসালো। আবার সেই ছোট্ট মুহূর্তটা এলো যখন অপেক্ষা করতে-করতেই হাসি গল্প করতে হ'লো তাদের। একটু বেশিরকম সহজ ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলছিলো সবাই, একটু অতিরিক্ত অসচেতনভাবে। আর, তারপর, মিস্ ফুল্টন ঘরে ঢুকলো, পুরোপুরি রুপোলি রঙের পোশাক পরেছে সে। হাল্কা সোনালি চুলগুলো একটা রুপোলি ফিতে দিয়ে বাঁধা। মাথাটা একপাশে অল্প একটু হেলিয়ে হাসতে-হাসতে সে ঘরে ঢুকলো।

'আমি কি দেরি ক'রে ফেলেছি !'

'না, না, একটুও না,' বার্থা ব'লে উঠলো, 'ভিতরে এসো।' তার হাত ধ'রে খাবার ঘরে নিয়ে এলো সে।

কী ছিলো সেই ঠাণ্ডা বাহুর স্পর্শে, যা আবার দাউ-দাউ ক'রে সেই তীব্র আনন্দের আগুন জ্বালিয়ে দিলো তার প্রাণে ? একে নিয়ে কী করবে বার্থা ভেবে পায় না।

মিস্ ফুল্টন তার দিকে তাকালো না ; এমনিতেই অবশ্য লোকের দিকে সোজাসুজি সে কদাচিৎ তাকায়। ভারি চোখের পাতায় তার চোখ যেন

ঠিক কী ঘটতে পারে, সে-সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিলো না। এইসব ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সে লক্ষ করলে যে, অনর্গল কথা বলছে আর হাসছে সে। হাসতে তার এত ইচ্ছে করছিলো যে, কথা না-ব'লে কোনো উপায় ছিলো না।

'হাসতে না-পারলে আমি ম'রে যাবো।'

কিন্তু হঠাৎ ভেটকির ভারি মজার একটা অভ্যেস লক্ষ করলো সে—জামার বুকের কাছটায় কী যেন গুটিয়ে রেখেছেন তিনি, যেন সেখানেও বাদাম রাখার একটা ছোট্ট গুপ্ত ভাণ্ডার আছে তাঁর; যেহেতু বেশি হাসা উচিত নয়, সেই-জন্যে বার্থা নিজের হাতে নখ বসিয়ে দিয়ে হাসি থামাতে চেষ্টা করলো।

অবশেষে আহারাদি সমাপ্ত হ'লো। 'চলুন, আমার নতুন কফির যন্ত্রটা দেখাই আপনাদের,' ব'লে উঠলো বার্থা।

'পনেরো দিনে মাত্র একবার কফির যন্ত্রটা বদলাই।' হ্যারি জানালো। এবার ভেটকি বার্থার হাত ধরলেন, মাথা হেলিয়ে মিস্ ফুল্‌টন তাঁদের অনুসরণ করলো।

বসার ঘরের আগুনটা তখন নিভু-নিভু হ'য়ে একটা লাল দপদপে—ভেটকির বক্তব্য অনুসারে 'ফিনিক্স-শিশুর বাসায়'[১] পরিণত হয়েছিলো।

'আলোটা এখন একটু নিভোনোই থাক, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে,' ব'লে তিনি আবার আগুনের ধারে গুটিশুটি হ'য়ে বসলেন। সর্বদাই তিনি শীতে জড়োশড়ো; 'এখন অবশ্য লাল ফ্লানেলের জামাটাও পরা নেই ওঁর,' বার্থা ভাবলে।

আর তক্ষুনি মিস্ ফুলটন সেই 'আভাসটা দিলেন'।

'তোমাদের একটা বাগান আছে না!' ঠাণ্ডা, নিদ্রাতুর গলায় ব'লে উঠলো সে। এমন এক নিখুঁত সূক্ষ্মতা ছিলো তার মধ্যে যে, আজ্ঞানুবর্তী হওয়া ছাড়া বার্থার যেন আর-কিছুই করার ছিলো না। ঘরটা পার হ'য়ে পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিলো সে, তারপর সেই দীর্ঘ জানলাগুলো খুলে দিলো।

'এই যে!' নিশ্বাস নিতে-নিতে সে ব'লে উঠলো।

তারপর সেই দু'জন নারী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঐ তন্বী কুসুমাকীর্ণ গাছটার

১ কিংবদন্তীর পাখি। আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে এরা ভস্ম থেকে পুনরুজ্জীবন লাভ করতো ব'লে ।।

দিকে তাকিয়ে রইলো। যদিও গাছটি নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো তবু মনে হচ্ছিলো যেন মোমবাতির শিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী হ'য়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে সে, প্রদীপ্ত হাওয়ায় শিহরিত হচ্ছে তার শরীর, তাদের দৃষ্টির সামনেই যেন ক্রমশ দীর্ঘ, দীর্ঘতর হ'য়ে উঠছে—যেন গোল রুপোলি চাঁদের কানাকে সে এক্ষুনি ছুঁয়ে যাবে।

কতক্ষণ তারা দাঁড়িয়েছিলো সেখানে! এক অপার্থিব আলোর কুহেলি আচ্ছন্ন করেছিলো তাদের, পরস্পরের ভাবনাকে তারা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারছিলো। যেন তারা অন্য কোনো জগতের জীব। সেই জগতে দাঁড়িয়ে তারা কী করবে ভেবে পাচ্ছিলো না; কী করবে তারা এই পরম আনন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে, যা তাদের বুকের মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে, তাদের চুল, তাদের হাত থেকে অজস্র রুপোলি ফুলের মতো ঝ'রে পড়ছে চারদিকে?

চিরকাল ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো? না কি এক মুহূর্তের জন্যে? আর মিস্ ফুলটন কি সত্যিই অস্ফুটে ব'লে উঠেছিলো, 'হ্যাঁ, ঠিক তা ই,' না কি সেটা বার্থার নিজেরই কল্পনা?

এর পর আলোটা হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো আর ভেটকি কফি তৈরি করতে লাগলো। হ্যারি ব'লে উঠলো, 'শুনুন মিসেস নাইট, আমার বাচ্চার কথা আপনি আমাকে জিগেস করবেন না। তার সঙ্গে আমার কখনো দেখাই হয় না। যদ্দিন না ওর একটি প্রেমিক জুটছে, তদ্দিন পর্যন্ত ওর সম্পর্কে সামান্যতম ঔৎসুক্য বোধ করবো না আমি।' হাঁদা তাঁর কাচঘর থেকে চোখটাকে মুহূর্তের জন্যে মুক্তি দিলেন, তারপরেই আবার সেটা কাচের আড়ালে ঢাকা পড়লো, আর এডি ওয়ারেন কফিটা শেষ ক'রে এমন যন্ত্রণা-কাতর মুখে সেটাকে নামিয়ে রাখলো যেন একটা মাকড়শা চোখে পড়েছে তার আর সেটা সুদ্ধুই সে চুমুক দিয়েছে।

'তরুণ ছোকরাদের নিয়ে একটা নাটক করার যে ইচ্ছে আমার। আর লণ্ডন শহরটা তো এখন দুর্দান্ত সব অলিখিত নাটকে গিশগিশ করছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। আমি শুধু তাদের বলতে চাই, "এই নাও থিয়েটার, বাস্, এবার চালাও পান্‌সি"।'

'ওগো, জানো, আমি ঠিক করেছি, একটা ঘর আমি জ্যাকব নাথানদের জন্যে সাজিয়ে রাখবো। আঃ, ভাজা মাছের একটা পরিকল্পনা আমাকে যা প্রলুব্ধ করছে, কী বলবো! চেয়ারের পিছন দিকগুলোর চেহারা ঠিক মাছ-ভাজার

প্যানের মতো হবে। আর পর্দাগুলো ভ'রে ভারি সুন্দর সব আলু-ভাজার নক্সা করা থাকবে।'

'আমাদের সব তরুণ লেখকদের দোষটা কী জানো? বড্ড ভবালু তারা এখনো। সমুদ্রের উপর দিয়ে ভাসতে হ'লে সমুদ্রপীড়া আর বেসিন ছাড়া তো আর চলে না। তাহ'লে এই বেসিনের মতোই সহিষ্ণুতা আর সাহস তাদের থাকবে না কেন!'

'একটি মেয়ে সম্পর্কে ভয়ংকর একটি কবিতা, যে-মেয়েটি একটা ছো ট্টো বনে এক নাকহীন ভিখিরি দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলো…'

সবচেয়ে নিচু, সবচেয়ে গভীর, একটা চেয়ারে মিস ফুলটন তার শরীরটা ডুবিয়ে দিয়ে ব'সেছিলো, আর হ্যারি বিলি করছিলো সিগারেট।

যে-ভঙ্গিতে সে মিস ফুলটনের কাছে গিয়ে তার রুপালি সিগারেটের বাক্সটা নাড়াতে-নাড়াতে হঠাৎ ব'লে উঠলো: 'মিশরীয়? তুর্কী? না ভার্জিনিয়া? সব-গুলো মিশে গেছে এখানে,' তা দেখেই বার্থা বুঝতে পারলো যে, ওর সঙ্গ হ্যারির কাছে শুধু ক্লান্তিকরই নয়, সত্যি-সত্যি সে বেশ অপছন্দই করে ওকে। আর মিস ফুলটন যে-ভঙ্গিতে উত্তর দিলো,'না, অনেক ধন্যবাদ, আমি এখন সিগারেট খাবো না,' তা দেখে সে বুঝলো যে, সে-ও এটা অনুভব ক'রে আহত হয়েছে।

'এই, হ্যারি, ওকে একটুও অপছন্দ কোরো না। ওকে তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। চমৎকার মেয়ে ও। ভারি চমৎকার। আর তাছাড়া, আমি যাকে এত ভালোবাসি তুমি তার সম্পর্কে এ-রকম নিস্পৃহ হও কী ক'রে! রাতে আমরা যখন বিছানায় শুতে যাবো, তখন আমি তোমাকে বলবো কী ঘটেছে, দু'জনে আজ আমরা অভিজ্ঞতা ভাগ ক'রে নিয়েছি…'

এই শেষ কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য, প্রায় সভয়, একটা ভাবনা বিদ্যুতের মতো বার্থার মনে সঞ্চারিত হ'য়ে গেলো। আর এই মধুর, গোপন ভাবনা যেন তার কানে ফিশফিশ ক'রে বলতে লাগলো, 'এক্ষুনি সবাই চ'লে যাবে। বাড়িটা নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়বে—একেবারে নিস্তব্ধ। আলোগুলো নিভিয়ে দেয়া হবে। তারপর সে আর তুমি সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা—আর সেই উষ্ণ বিছানা…'

চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে সে পিয়ানোর কাছে ছুটে গেলো।

'ঈশ, পিয়ানোটা বাজাচ্ছে না কেন কেউ!' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'কী ভালো হ'তো কেউ বাজালে!'

তার জীবনে এই প্রথম বার্থা তার স্বামীকে এইভাবে কামনা করলো।

আ, সে তাকে ভালো তো বাসেই, চিরদিনই বাসতো। অন্য আর-সব অর্থেই ভালোবাসতো তাকে। কিন্তু ঠিক এমনিভাবে কখনোই নয়। আর সঙ্গে-সঙ্গে সে এটাও অবশ্য বুঝতো যে, হ্যারি একেবারে অন্যরকম। কত দিন এই নিয়ে আলোচনা করেছে তারা। প্রথম-প্রথম নিজের এই শীতলতা নিয়ে সে ভীষণ দুশ্চিন্তা করতো। কিন্তু পরে ক্রমশ, এ নিয়ে যেন আর-কিছু এসে যেতো না তার। তারা দু'জন পরস্পরের কাছে এত স্পষ্ট আর খোলামেলা, এত অন্তরঙ্গ সঙ্গী তারা পরস্পরের—এই তো যথেষ্ট। আধুনিক হবার এটাই সবচেয়ে ভালো দিক।

কিন্তু এখন—আকুল, আকুল হ'য়ে উঠেছে তার সমস্ত সত্তা। এই শব্দটাই যেন তার আকুল শরীরে একটা দীর্ঘস্থায়ী বেদনা সঞ্চারিত করছে। সেই পরম আনন্দের অনুভূতি বুঝি তাহ'লে এরই পূর্বাভাস? কিন্তু তাহ'লে, তাহ'লে—

'লক্ষ্মীসোনা, জানোই তো আমাদের লজ্জার কথা,' মিসেস নরম্যান নাইট ব'লে উঠলেন, 'সময় আর ট্রেনের হাতধরা আমরা। হ্যাম্পস্টেডে থাকতে হয়, বুঝতেই পারছো। এত ভালো কাটলো, কী বলবো!'

'চলুন, হল পর্যন্ত এগিয়ে দিই আপনাদের,' বার্থা বললে, 'আপনারা থাকলে ভীষণ ভালো লাগতো. কিন্তু শেষ ট্রেনটা ছাড়া আপনাদের কখনোই উচিত নয়। সাংঘাতিক বাজে ব্যাপার, তাই না!'

'যাবার আগে একটা হুইস্কি চলবে নাকি, নাইট?' হ্যারি হাঁক দিলে।

'না, অনেক ধন্যবাদ হে, ছোকরা।'

এই কথা বলার জন্যে করমর্দন করার সময় বার্থা তার হাতে কৃতজ্ঞভাবে চাপ না-দিয়ে পারলে না।

'শুভরাত্রি, বিদায়,' উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সে মনে-মনে বুঝতে পারলো যে, তার এখনকার এই রূপ আসলে ওদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে।

যখন সে বসার ঘরে ফিরে এলো, অন্যেরাও তখন উঠে পড়েছে।

' আপনি তাহ'লে আমার ট্যাক্সিতে কিছুটা পথ আসতে পারেন।'

'একবার যে-ভয়ংকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তারপরে একা আরেকবার ট্যাক্সি চড়ার সম্মুখীন না-হ'তে হ'লে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'রাস্তার ঠিক শেষেই সারি সারি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে, ওখান থেকেই একটা নিয়ে নেবেন। কয়েক গজের বেশি হাঁটতে হবে না আপনাদের।'

'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। আমি গিয়ে কোটটা প'রে আসি।'

মিস্ ফুলটন হলের দিকে এগোলে, বার্থা তাকে অনুসরণ করলো, এই সময় হঠাৎ হ্যারি তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলো।

'আমি আপনাকে সাহায্য করছি।'

বার্থা বুঝতে পারলো যে নিজের রূঢ় আচরণের জন্যে হ্যারি অনুশোচনা করছে —বার্থা তাকে যেতে দিলে। কোনো-কোনো ব্যাপারে কী ছেলেমানুষ যে ও —ঝোঁকের-মাথায়-চলা, সরল।

আগুনের ধারে তখন সে আর এডি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। 'আপনি বোধহয় রিলকের নতুন কবিতাটা পড়েন নি?' সাধারণ নরম গলায় এডি ব'লে উঠলো, 'ভারি চমৎকার কবিতা। একেবারে সাম্প্রতিক কবিতা সংকলনটায় আছে। আপনার কাছে আছে কি বইটা! এত দেখাতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। একটা অবিশ্বাস্য সুন্দর লাইন দিয়ে কবিতাটা শুরু হয়েছে, টোম্যাটোর ঝোল ছাড়া কভু কেন অন্য কিছু নয়?'

'হ্যাঁ, আছে,' বললে বার্থা। আর বসার ঘরের দরজাটার উল্টোদিকে একটা টেবিলের দিকে নিঃশব্দ পায়ে এগোলো সে। এডিও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলে। ছোট্ট বইটা তুলে নিলে বার্থা, তারপর এডির হাতে দিলে; কেউই কোনো শব্দ করলে না।

যখন এডি সেটাতে চোখ বুলোচ্ছিলো, বার্থা ঘাড় ফিরিয়ে হলের দিকে তাকালো। আর দেখলো·· হ্যারির হাতে মিস্ ফুলটনের কোট আর মিস্ ফুল্‌টন তার দিকে পিছন ফিরে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোটটা ছুঁড়ে ফেললো হ্যারি, দু'হাত রাখলো তার কাঁধে, প্রবলভাবে আকর্ষণ ক'রে তাকে নিজের দিকে ফেরালো। তার ঠোঁট যেন ব'লে উঠলো: 'ভালোবাসি তোমায়,' আর মিস্ ফুল্‌টন তার চাঁদের আলোয়-গড়া আঙুল ছোঁয়ালো হ্যারির গালে, তার মুখে ফুটে উঠলো সেই নিদ্রাতুর, স্মিত হাসি। কেঁপে উঠলো হ্যারির নাসারন্ধ্র; এক কুৎসিত বিকৃত হাসিতে তার ঠোঁটদুটো যেন পিছন দিকে দুমড়ে গেলো, ফিশফিশ ক'রে সে বললে, 'আগামীকাল,' আর মিস্ ফুলটন যেন তার চোখের পাতা দিয়ে জানালে, 'হ্যাঁ'।

'এই যে, পেয়েছি,' ব'লে উঠলো এডি, ' "টোম্যাটোর ঝোল ছাড়া কভু কেন

অন্য কিছু নয় ?" কী গভীর সত্য আছে এর মধ্যে, বুঝতে পারছেন আপনি ! এই টোম্যাটোর ঝোল ব্যাপারটাই কী ভয়ংকর রকম চিরন্তন, ভাবুন !'

'যদি চান,' হল থেকে হ্যারির উঁচু, জোরালো গলা শোনা গেলো, 'আমি ফোন ক'রে একটা ট্যাক্সিকে এখানে আসতে বলতে পারি।'

'আরে না, তার কিচ্ছু দরকার নেই,' মিস্ ফুল্‌টন ব'লে উঠলো, তারপর বার্থার কাছে এগিয়ে এলো সে, তার পাতলা আঙুলগুলো বার্থাকে মুঠো ক'রে ধরতে দিলে।

'বিদায়। অনেক ধন্যবাদ।'

'বিদায়,' বললে বার্থা।

মিস ফুল্‌টন আরো-এক মুহূর্ত তার হাতটা ধ'রে রইলো।

'কী সুন্দর তোমার নাশপাতি গাছটা।' অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠলো সে। তারপর সে চ'লে গেলো, এডি তাকে অনুসরণ করলে, সেই ধূসর বেড়ালটাকে কালো বেড়ালটা যেমন ক'রে অনুসরণ করেছিলো।

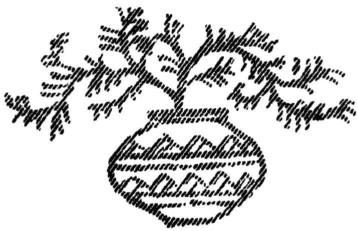
'আমি সব ঠিকঠাক ক'রে গুছিয়ে রাখছি,' অত্যধিক শান্ত, সংযত ভঙ্গিতে হ্যারি ব'লে উঠলো।

'কী সুন্দর তোমার নাশপাতি গাছটা—নাশপাতি গাছটা—না শ পা তি গা ছ টা !'

এক দৌড়ে সেই দীর্ঘ জানলাগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বার্থা।

'উঃ, কী হবে এবার ?' চেঁচিয়ে উঠলো সে। কিন্তু নাশপাতি গাছটা ঠিক আগের মতোই সুন্দর, আগের মতোই পুষ্পাস্তীর্ণ আর নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে

অনুবাদ : সত্রাজিৎ দত্ত





ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বারের ক্ষণসুখের জীবন

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

দুপুরের খাবার সময়। ঘন সবুজ রঙের খাবার-তাঁবুর মধ্যে সবাই এমনভাবে বসেছিলো যেন একটু আগে কিছুই ঘটে নি।

'কী খাবে? পাতি লেবু না কমলার রস?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'আমার জন্য গিমলেট[১]।' রবার্ট উইলসন জানালো।

'আমিও তাই। একটা কড়া-কিছু দরকার আমার।' জানালেন ম্যাকোম্বারের স্ত্রী।

ম্যাকোম্বার ওদের দু'জনের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'তাই ভালো। তিনটে গিমলেটই মেশাক।'

ছোকরা পাচকটি ততক্ষণে ঠাণ্ডা ক্যাম্বিস-কাপড়ের থলি থেকে বোতল বার ক'রে মদ মেশাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। গাছের ছায়া পড়েছে তাঁবুর গায়ে— গাছের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া থলির উপর লেগে বিন্দু-বিন্দু হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে।

১ গিমলেট জীন-সংযোগে প্রস্তুত একরকম পানীয়।

'ওদের কী দেয়া উচিত?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।
'চিবোনোর জন্য খানিকটা তামাকপাতা দিলেই যথেষ্ট হবে,' উইলসন বললে, 'লোকগুলোর মাথা খেয়ে লাভ নেই।'
'ওদের সর্দারই ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে দেবে তো?'
'নিশ্চয়ই।'
ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার আধঘণ্টা আগে তাঁর রাঁধুনি, পরিচারকবৃন্দ, চামার এবং কুলিদের কাঁধে চেপে বিজয়গৌরবে তাঁবুতে আনীত হয়েছেন। বন্দুকবাহকেরা অবশ্য এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে নি। দেশীয় ভৃত্যেরা তাঁকে তাঁর তাঁবুর দরজার কাছে নামিয়ে দিলে, তিনি তাঁদের সকলের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে স্ত্রী না-আসা পর্যন্ত বিছানায় ব'সে রইলেন। তাঁর স্ত্রী ভিতরে ঢুকে একটাও কথা বললেন না, এবং ম্যাকোম্বার তৎক্ষণাৎ তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছোটো বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে খাবার-তাঁবুর ধারে চ'লে এলেন। তারপরে খোলা হাওয়ায় আর ছায়ায় ক্যাম্বিস-কাপড়ের লম্বা চেয়ারে আয়েস ক'রে গা এলিয়ে দিলেন।
'আপনার সিংহ তো পেলেন,' রবার্ট উইলসন বললে, 'এবং যাকে ব'লে একেবারে জাঁদরেল সিংহ।'
ম্যাকোম্বারের স্ত্রী চট ক'রে একবার উইলসনের দিকে দেখে নিলেন। শ্রীমতী ম্যাকোম্বার একজন অত্যন্ত রূপসী মহিলা এবং সযত্নলালিতও বটে। রূপ এবং সামাজিক মর্যাদার জন্য পাঁচ বছর আগে তিনি একটি প্রসাধনদ্রব্যকে নিজের ছবিসমেত প্রশংসাপত্র দিয়ে পাঁচ হাজার ডলার পেয়েছিলেন—যদিও নিজে কখনো সে-বস্তুটি ব্যবহার করেন নি। ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে এগারো বছর আগে।
'সিংহটা সত্যিই ভালো, তাই না?' ম্যাকোম্বার বললেন। তাঁর স্ত্রী একবার তাঁর দিকে তাকালেন। এমনভাবে তিনি দুটি পুরুষের দিকে তাকালেন যেন এদের এই প্রথম দেখছেন।
একজন হ'লো শ্বেতাঙ্গ শিকারী উইলসন—তাকে সত্যি আগে কখনো, ভালো ক'রে, দ্যাখেন নি। লোকটি মাঝারি ধরনের লম্বা, বালিরঙের চুল, পুরু গোঁফ, অত্যন্ত রক্তিম মুখমণ্ডল। চক্ষুদ্বয় ভয়ংকররকম ঠাণ্ডা ও নীল। চোখের কোলে অস্পষ্ট শাদাটে দাগ, হাসলে ফুর্তিতে সেগুলি লম্বা দেখায়। উইলসন এবার শ্রীমতী ম্যাকোম্বারের দিকে তাকালো, আর তিনি তার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চোখ

নামিয়ে আনলেন · দেখলেন ঢোলা জামার তলায় তার ঘাড় ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে, জামার যেখানে বুকপকেট থাকা উচিত ছিলো সেখানে চারটে বড়ো কার্তুজ, তারপর দেখলেন তার বৃহৎ ধূসর রঙের বাহু, পুরোনো পাতলুন এবং অতিশয় ময়লা জুতো ; তারপর আবার তার রক্তিম মুখের দিকে তাকালেন। লক্ষ করলেন তার মুখের ঝলসানো লাল রঙের একটা সীমারেখা পড়েছে স্টেটসন টুপির শাদা গোল দাগে,—যে-টুপিটা এখন ঝুলছে তাঁবুর খুঁটির পেরেকে।

'আচ্ছা, সিংহটার কথাতেই আসা যাক,' রবার্ট উইলসন বললে। আবার ম্যাকোম্বারের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, এবং তিনি না-হেসে কৌতূহলের সঙ্গে স্বামীর দিকে তাকালেন।

ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার অত্যন্ত দীর্ঘকায়, খুব সুগঠিত শরীর—হাড়গুলো একটু বেশি লম্বাচওড়া, গায়ের রং গাঢ়, চুলগুলো মাঝিদের মতো কোঁকড়ানো, চিক্কণ ওষ্ঠাধর, সুদর্শন পুরুষ হিশেবেই তাঁকে গণ্য করা হয়। তিনিও উইলসনের মতো একই রকমের শিকারের পোশাক প'রে আছেন, শুধু তাঁর পোশাকটি একেবারে আনকোরা নতুন। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ, বেশ সাবলীল রেখেছেন নিজের শরীরকে, প্রাঙ্গণের খেলাধুলোয় তিনি বেশ ভালো, বড়ো মাছ ধরার ব্যাপারে অনেকবার প্রথম হয়েছেন, এবং এই একটু আগে তিনি নিজেকে একেবারে সর্বসমক্ষে অত্যন্ত কাপুরুষ হিশেবে প্রমাণ করেছেন।

'হ্যাঁ, সেই সিংহের কথাই বলছিলাম। তুমি যা করেছো তার জন্য তোমাকে যে কী ব'লে ধন্যবাদ দেবো জানি না।' তিনি বললেন। তাঁর স্ত্রী মারগট তাঁর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে উইলসনের দিকে তাকালেন। 'সিংহের কথা এখন থাক।' মারগট বললেন।

উইলসন তাঁর দিকে না-হেসে তাকালেন এবং এবার তিনি উইলসনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'আজকের দিনটা ভারি অদ্ভুত,' মারগট বললেন। 'আপনার কি আজ দুপুরে তাঁবুর তলাতেও টুপি মাথায় বসা উচিত ছিলো না? আপনি আমাকে তাই বলেছিলেন।'

'পরলেই হ'তো।' উইলসন বললে।

'জানেন মিস্টর উইলসন, আপনার মুখ বড়ো বেশি লাল।' এই ব'লে আবার হাসলেন তিনি।

'মদ! মদের জন্য।' উইলসন বললে।

'আমার তা মনে হয় না। ফ্রান্সিসও তো প্রচুর মদ খায়, কিন্তু তার মুখ তো কখনো লাল হয় না।'

'আজ আমার মুখ লাল হ'য়ে গেছে,' ম্যাকোম্বার ঠাট্টা করার চেষ্টা করলেন।

মারগট বললেন, 'না; আজ আমার মুখ লাল হয়েছে। কিন্তু মিস্টর উইলসনের মুখ সব সময় লাল।'

'নিশ্চয়ই কোনো জাতিগত কারণ আছে। আমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করবেন না কি?' উইলসন বললে।

'এই তো সবে আরম্ভ করলাম।'

'ছাড়ুন।'

'আলোচনার বিষয় ঠিক করাই ক্রমশ মুশকিল হ'য়ে উঠছে।' মারগট বললেন।

'বোকামি কোরো না, মারগট!' তাঁর স্বামী বললেন।

'মুশকিলের কী আছে?' উইলসন বললে, 'অমন চমৎকার একটা সিংহ পাওয়া গেছে আজ।'

মারগট তাঁদের দু'জনের দিকে তাকালেন, এবং তাঁরা দু'জনেই বুঝতে পারলেন যে তিনি এবার কাঁদতে শুরু করবেন। বহুক্ষণ থেকেই উইলসন তাঁর অবস্থা লক্ষ করছিলো, এবং সে আশঙ্কিত হয়েছিলো। ম্যাকোম্বারের আশঙ্কা বহু-দিন আগে থেমে গেছে।

'কেন এমন হ'লো? হায়, কেন এমন হ'লো?' বলতে-বলতে মারগট তাঁবুর দিকে চ'লে যেতে লাগলেন। তাঁর কান্নার কোনো শব্দ হ'লো না, কিন্তু পিছন থেকে তাঁরা দেখতে পেলেন যে গোলাপি রঙের রোদ-আটকানো জামার তলায় তাঁর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

'মেয়েরা অমন ভেঙেই পড়ে,' লম্বা লোকটিকে বললো উইলসন, 'তাতে কিছু এসে যায় না। নার্ভের উপর খানিকটা চাপ পড়েছে, আর একটা জিনিশের সঙ্গে আরেকটা মিশিয়ে ফেলেছে।'

ম্যাকোম্বার বললেন, 'না। মনে হচ্ছে সারা জীবন আমাকে এর মূল্য দিয়ে যেতে হবে।'

'কী আজেবাজে ভাবছেন! চলুন, আজকের জাঁদরেল শিকারটির খোঁজ নিয়ে আসা যাক। এ-সব ভুলে যান। আরে, এতে আর কী আছে!'

'চেষ্টা ক'রে দেখবো। তবে তুমি আজ আমার জন্য যা করেছো তা কোনোদিন ভুলবো না।'

'কিছুই করি নি,' উইলসন বললে, 'কী যে বলছেন!'

তারপর তাঁরা তাঁবুর পাশে মস্ত-সব সোনাঝুরি গাছের ছায়ায় ব'সে রইলেন; পিছনে একটা নুড়িতে ভরা পাহাড়, সামনে অনেকটা তৃণক্ষেত্র একটা নুড়িতে ভরা নদীর পাড় পর্যন্ত বিস্তারিত এবং পিছনে অরণ্য; তাঁরা সদ্য ঠাণ্ডা-হওয়া লেবু মেশানো জীন পান করতে লাগলেন এবং পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে চললেন। ইতিমধ্যে ছোকরা-চাকর খাবারের টেবিল সাজিয়ে দিলে। উইলসন বুঝতে পারলো, এই ছোকরাগুলো এর মধ্যেই পুরো ব্যাপারটা জেনে গেছে, এবং সে যখন দেখলো যে ম্যাকোম্বারের খাশ চাকর অত্যন্ত কৌতূহলের ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে, তখন সে সোয়াহিলি ভাষায় তাকে প্রচণ্ডভাবে ধমকে দিলে। ছেলেটা তাড়াতাড়ি ফ্যাকাশে মুখে পালিয়ে গেলো।

'কী বলছিলে ওকে?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'কিছু না। বলছিলুম ওর এমন মড়ার মতো চেহারা বদলে একটু জ্যান্ত চেহারা না-করলে ওকে গোটা পনেরো ঘা দেবার ব্যবস্থা করবো।'

'সেটা আবার কী? চাবুক নাকি?'

'যদিও সেটা বেআইনি। ওদের কোনো দোষ হ'লে জরিমানা করার কথা।'

'এখনো চাবুক-টাবুক মারো নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওদের আপত্তি থাকলে ওরা দল বেঁধে প্রতিবাদ করতে পারতো, কিন্তু ওরা তা করে না। জরিমানার চেয়ে ওরা বেত খাওয়াকেই বেশি পছন্দ করে।'

'ভারি অদ্ভুত তো।'

'অদ্ভুত কিছুই না। আপনি হ'লে কী করতেন? মাইনে ছেড়ে দিতেন, না বার্চের ডাল দিয়ে পিটুনি খেতেন?'

কথাটা জিগেস ক'রেই উইলসন লজ্জিত হ'য়ে গেলো, এবং ম্যাকোম্বার কোনো জবাব দেবার আগেই আবার বললো, 'আমরা সবাই রোজ চাবুক খাচ্ছি—এক-একজন এক-একরকম ভাবে।'

এটা আরো খারাপ হ'লো। 'হা কপাল!' উইলসন ভাবলে, 'আমার তো কূটনীতি কিছু জানা ছিলো, ছিলো না?'

'হ্যাঁ, মার আমরা সকলেই খাই।' ম্যাকোম্বার তখনো ওর দিকে না-তাকিয়ে উত্তর দিলেন। 'আজকের সিংহ শিকারের ব্যাপারটায় আমি খুবই দুঃখিত। আশা করি এটা আর বেশি দূর গড়াবে না, কী বলেন? মানে, আমি বলছি …বলছি কি আর-কেউ কি ঘটনাটা জানতে পারবে?'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, ঘটনাটা আমি ম্যাটিগা ক্লাবে গিয়ে বলবো কি না?' এবার উইলসন কঠিনভাবে তাঁর দিকে তাকালো। এটা সে আশা করে নি। লোকটা যেমনি নোংরা তেমনি কাপুরুষ, সে ভাবলে। আজকের আগে পর্যন্ত একে কিনা আমি আবার বেশ পছন্দও করতুম। কিন্তু কোনো আমেরিকানকে বোঝা বড়ো শক্ত। মুখে বললো, 'না, আমি একজন পেশাদার শিকারী। মক্কেলদের কথা আমরা বাইরে বলাবলি করতে যাই না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অবশ্য এ-সব কথা না-বলতে অনুরোধ করাটা ভদ্রতা নয়।'

এখন স'রে-পড়াটাই সহজ হবে ব'লে তার মনে হ'লো। খাবারটা তো সে নিজের ঘরে ব'সে বই পড়তে-পড়তেই খেতে পারে। ওরা ওদের খাবার আলাদা খাবে। শিকার-অভিযানে ওদের সঙ্গে নিতান্ত চুক্তিমাফিক ব্যবহার করবে—কী যেন বলে ফরাশিরা? বিশেষ খাতির—এই সমস্ত পচা ন্যাকামোর চাইতে সেটা ঢের সহজ। লোকটাকে অপমান ক'রে নিপুণভাবে সব সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে ফ্যালো। তারপর খেতে-খেতে বই পড়ো, এবং তখনো ওদেরই হুইস্কি পান করো। শিকার অভিযান ব্যর্থ হ'লেও এই-ই কোরো, আর-কিছু নয়। যে-কোনো পেশাদার শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে জিগেস করো, 'তোমার শিকার-টিকার কেমন চলছে'—সে উত্তর দেবে, 'ওঃ, আমি এখনো ওদের হুইস্কি শাবাড় করছি।' তাহ'লেই বোঝা যাবে যে শিকারের বারোটা বেজে গেছে!

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' এই ব'লে ম্যাকোম্বার আমেরিকান মুখ তুলে তাকালেন, যে-মুখ প্রৌঢ়ত্বের আগে পর্যন্ত নাবালকের মতোই থেকে যাবে! আর উইলসন লক্ষ করলো তাঁর নাবিকের মতো কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ চতুর সুন্দর চোখ, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট এবং সুদৃশ্য চোয়াল। 'আমি আগে এটা বুঝতে পারি নি ব'লে দুঃখিত। এখনো আমার অনেক কিছু জানতে বাকি আছে।'

তাহ'লে কী করা যায়, উইলসন ভাবলে। তাড়াতাড়ি এবং মসৃণভাবে সব

ভেঙে দিতে রাজি ছিলো, আর একটু আগে তাকে অপমান ক'রে কাঙালটা এখন আবার মাপ চাচ্ছে! উইলসন আরেকবার চেষ্টা করলে, 'আমি কাউকে ব'লে দেবো ভেবে চিন্তিত হবেন না। আমাকে আবার রুটি রোজগার করতে হবে তো। আফ্রিকায় এমনকি মেয়েরাও সিংহ হাতছাড়া করে না এবং কোনো শ্বেতাঙ্গই কখনো ভয়ে পালায় না।'

'কিন্তু আমি আজ খরগোশের মতো পালিয়েছিলাম।'

মহামুশকিল, উইলসন ভাবলে, এ-ধরনের কথা যে বলে তাকে নিয়ে আর কী করা যায়? উইলসন তার প্রশস্ত নীল গোলন্দাজ চোখ তুলে ম্যাকোম্বারের দিকে তাকালে, আর ম্যাকোম্বার তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। দুঃখিত হ'লে তাঁর চোখ দুটো কেমন দেখায় তা লক্ষ না-করলে হাসিটুকু মনোহর ব'লে মনে হবে।

'হয়তো মহিষ শিকারে আমি সার্থক হ'তে পারবো,' ম্যাকোম্বার বললেন। 'এরপর আমরা তো ওদিকেই যাবো, তাই না?'

'যদি ইচ্ছে করেন তো কাল সকলেই যাওয়া যায়।' উইলসন বললে। হয়তো তার ভুল হয়েছিলো। কোনো আমেরিকানকে চেনা বড়ো শক্ত। তার মন আবার ম্যাকোম্বারের দিকে হেললো। তবে সকালের ব্যাপারটা যদি ভোলা যেতো। কিন্তু ভোলা যাবে না। সকালটা একেবারে যত খারাপ হ'তে পারে!

'ওই যে, মেমসাহেব আসছেন।' উইলসন বললো। মারগট হেঁটে আসছেন তাঁর তাঁবু থেকে। সতেজ, প্রফুল্ল এবং বেশ সুশ্রী দেখাচ্ছে তাঁকে। মুখের গড়ন নিখুঁত, ডিম্বাকার, এমন নিখুঁত যে তাঁকে নির্বোধ ব'লে ভুল হয়। কিন্তু নির্বোধ ও নয়, ভাবলো উইলসন, না, নির্বোধ মোটেই নয়।

'আমার সুন্দর লালমুখো উইলসনের খবর কী? ফ্রান্সিস, এখন একটু ভালো বোধ করছো তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ভালো লাগছে।' ম্যাকোম্বার বললেন।

'পুরো ব্যাপারটা আমি মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছি,' টেবিলে বসতে-বসতে বললেন ভদ্রমহিলা। 'ফ্রান্সিস ভালো সিংহশিকারী হোক না-হোক তাতে কী এসে যায়? সিংহ-শিকার ওর পেশা নয়। ওটা মিস্টর উইলসনের পেশা। সত্যি, মিস্টর উইলসন ভারি চমৎকারভাবে যে-কোনো জিনিশ মারতে পারেন। আপনি সব-কিছুই মারেন, না?'

'হ্যাঁ, সব কিছুই। যে-কোনো জিনিশ।' উইলসন বললে। এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত শিকার, উইলসন ভাবলে। চরম শক্ত, চরম নিষ্ঠুর, চরম লুণ্ঠনকারিণী, আবার প্রচণ্ড আকর্ষণীয়। আর এদের পুরুষেরা হয় নরম— কিংবা যখন ওরা শক্ত হ'তে থাকে তখন পুরুষেরা ঘাবড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো হ'য়ে যায়। অথবা এরা কি ঠিক সেইরকম পুরুষই বেছে নেবে যাদের ওরা ইচ্ছামতো চালাতে পারে? কিন্তু বিয়ের সময় নিশ্চয়ই এতটা ভাববার মতো বয়স ওদের হয় না। এই ভেবে নিজের কাছেই কৃতজ্ঞ হ'লো যে আমেরিকান মেয়ে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছে, কারণ এটি একেবারে দারুণ চিত্তাকর্ষক।

'কাল সকালে আমরা মোষ মারতে যাচ্ছি।' উইলসন বললে।

'আমিও যাবো।'

'না, আপনি যাবেন না।'

'হ্যাঁ, যাবো। যাবো, ফ্রান্সিস?'

'কেন, তুমি তাঁবুতেই থাকো না?'

'না, কিছুতেই না।' মারগট বললেন, 'আমি আজকের মতো এমন কাণ্ড দেখার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবো না।'

যখন মারগট চ'লে গেলো, উইলসন ভাবলে, যখন ও কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে গেলো তখন ওকে একেবারে দারুণ আদর্শ রমণী ব'লে মনে হচ্ছিলো। যেন সে সব-কিছুই বোঝে, জানে, তার স্বামীর অপমানে দুঃখিত হয়, কোন জিনিশের কতটা দাম তা বুঝতে পারে। মাত্র কুড়ি মিনিট—এর মধ্যেই আবার সে মুখে আমেরিকান মেয়েদের নিষ্ঠুরতা মেখে ফিরে এসেছে। সব জাহান্নমের জীব। সত্যি, জাহান্নমেরই জীব!

'তোমার জন্য কাল আরেকটা নাটক তৈরি করবো আমরা,' বললেন ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার।

'কাল আপনি যাচ্ছেন না,' উইলসন বললে।

'বড্ড ভুল করছেন। আপনার শিকার দেখতে এত ইচ্ছে আমার। আজ সকালে সত্যিই আপনাকে চমৎকার লাগছিলো। অবশ্য কোনো-কিছুর মুণ্ডু উড়িয়ে দেয়াটাকে যদি চমৎকার বলা চলে।'

'খাবার তৈরি, আসুন।' উইলসন বললে, 'আপনাকে আজ বেশ প্রফুল্ল লাগছে।'

'কেন হবো না? আমি এখানে মন-মরা হ'য়ে থাকবার জন্য আসি নি।'

'মনমরা হবার কী আছে?' উইলসন বললে। দূরের নদীর ভিতরের ছোট্ট নুড়িগুলি আর তার পিছনে গাছপালায় ভরা উঁচু পাড় পর্যন্ত দেখতে পেয়ে তার সকালের কথা মনে প'ড়ে গেলো।

'হ্যাঁ, ভারি চমৎকার লাগছে,' মারগট বললেন, 'আর আগামী কাল…ওঃ, আপনি জানেন না, কালকের জন্য আমি কী-রকম ছটফট করছি।'

'আজ আপনাকে আপনার স্বামী কৃষ্ণসার হরিণ উপহার দিচ্ছেন।'

'সেই বড়ো-বড়ো গোরুর মতো জন্তুগুলো-তে, যারা খরগোশের মতো লাফায়, না?'

'হ্যাঁ, ঠিক বর্ণনাই দিয়েছেন।' উইলসন বললে।

'এর মাংস খুব ভালো।' বললেন ম্যাকোম্বার।

'এটাকে তুমি মেরেছো, ফ্রান্সিস?'

'হ্যাঁ।'

'এগুলো নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নয়?'

'যদি না এরা হঠাৎ গায়ের উপর এসে পড়ে।' উইলসন জানালে।

'খুব খুশি হলাম।'

'তোমার এই কুত্তিপনায় একটু ঢিলে দাও না, মারগট,' কিছুটা মাংসখণ্ড কেটে নিয়ে উপুড়-করা কাঁটা দিয়ে সেটা বিঁধে তার উপর চটকানো আলুসেদ্ধ, ঝোল আর গাজর ছড়াতে-ছড়াতে ম্যাকোম্বার বললেন।

'ঢিলে দেয়া যায়,' বললেন তাঁর স্ত্রী। 'বিশেষ, তুমি এত সুন্দর ক'রে যখন বললে কথাটা।'

'আজ রাতে সিংহের সম্মানে আমরা শ্যাম্পেন পান করবো,' উইলসন বললে। 'দুপুরে একটু গরম পড়েছে।'

'ওঃ, সেই সিংহ!' বললেন মারগট, 'সিংহের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!'

উইলসন মনে-মনে ভাবলে, তাহ'লে ও আজ লোকটাকে ভালোরকম দেবে, দেবে না? না কি এ-সব দেখানোপনা? স্বামীটি ভীতুর বেহদ্দ, এই তথ্যটি জেনে ফেলার পর একজন স্ত্রীলোকের কী করা উচিত? ভয়ানক নিষ্ঠুর স্ত্রীলোকটি, কিন্তু ওরা সকলেই তো তাই। অবশ্য ওরাই শাসন করে, এবং শাসন করতে গেলে নিষ্ঠুর হ'তেই হয়। তবুও, আমি ওদের ভয়-দেখানো খেলা অনেক দেখেছি।

'আরেকটু হরিণের মাংস নিন।' নম্রভাবে মারগটকে অনুরোধ করলে উইলসন।

সেই দিনই একটু গাঢ় সন্ধেবেলায় উইলসন আর ম্যাকোম্বার এক দেশীয় চালক আর বন্দুকবাহক দু'জনকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে গেলেন। শ্রীমতী ম্যাকোম্বার র'য়ে গেলেন শিবিরে। 'এত গরমে বাইরে যাওয়া যায় না,' বললেন তিনি। কাল সকালে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন। যেতে-যেতে উইলসন দেখলো বড়ো গাছটার তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, গোলাপি-খাকি রঙের পোশাকে তাঁকে—সুন্দরী নয়—মিষ্টি দেখাচ্ছে। ঘন কালো চুল : কিছু এসে কপালে পড়েছে, কিছু গোছা বেঁধে ঘাড়ের কাছে জমানো। মুখ এত সতেজ যেন মনে হচ্ছে এখনো বুঝি নিউ-ইংল্যাণ্ডেই আছেন। তাঁদের দু'জনকে দেখে মারগট হাত নাড়লেন, আর ততক্ষণে তাঁদের গাড়ি উঁচু ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরে ছোটো-ছোটো টিলার মতো ঘন বৃক্ষকুঞ্জের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো।
গাছগুলির ওপাশে তাঁরা একঝাঁক বুনো ভেড়া দেখতে পেলেন ; এবং গাড়ি ছেড়ে একটা বড়োশড়ো ছড়ানো শিং-ওলা ভেড়ার পিছু নিলেন। অত্যন্ত নিপুণভাবে গুলি ছুঁড়ে সেটাকে মারলেন ম্যাকোম্বার ; প্রায় দু'শো গজ দূরে চ'লে গিয়ে সেটা মুখ গুঁজে প'ড়ে গেলো। বাকি ভেড়ার পাল তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলো.. লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে একে অন্যের পিঠে প'ড়ে পালালো তারা ; এমন অবিশ্বাস্য এবং এমন ভাসমান তাদের এই পলায়ন যে সাধারণত এ-রকম দৃশ্য স্বপ্নেই দেখা যায়।
'চমৎকার গুলি ছোঁড়া হয়েছে,' উইলসন বললে। 'লক্ষ্যটা এত ছোটো!'
'কিন্তু এর মাথাটা কি লোককে দেখাবার মতো?'
'চমৎকার। আপনি ঠিক এ-রকম গুলি ছুঁড়বেন, তা'হলে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।'
'কী মনে হয়? কাল আমরা মোষ পাবো?'
'সম্ভাবনা তো যথেষ্টই আছে। খুব ভোরবেলা ওরা খেতে আসে ; আর আমাদের ভাগ্য থাকলে খোলা মাঠেই ওদের পাবো।'
'আমি ওই সিংহের ব্যাপারটার নিকেশ করতে চাই।' ম্যাকোম্বার বললেন, 'ও-রকম একটা বিশ্রী ব্যাপার কারুর বউ দেখে ফেলেছে, এটা মোটেই ভালো লাগার মতো নয়।'

তার চেয়েও খারাপ ও-রকম একটা কাজ করা, উইলসন ভাবলে। বউ থাক বা না-থাক, এমনিতেই ওটা খারাপ; কিংবা ক'রে ফেলে আবার তা নিয়ে কথা বলাও কুচ্ছিৎ। কিন্তু মুখে বললে, 'ও-ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না। যে-কেউই প্রথম সিংহের সামনে প'ড়ে ভ্যাবাচ্যাকা হ'য়ে যেতে পারে। সে এখন চুকে গেছে।'

কিন্তু সেই রাত্রে খাবার পর এবং ঘুমোতে যাবার আগে আগুনের পাশে ব'সে খানিকটা হুইস্কি আর সোডা পান ক'রে, খাটের উপর শুয়ে মাথার উপর খাটিয়ে-রাখা মশারির দণ্ডগুলি দেখতে-দেখতে আর রাত্রির শব্দ শুনতে-শুনতে ম্যাকোম্বার বুঝতে পারলেন, না, সব চুকে যায় নি। সব শেষও হ'য়ে যায় নি, আরম্ভও হয় নি। যেখানে যেমন হয়েছিলো, অসংশোধনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সব ঠিক সেখানেই আছে, এবং তার জন্য মর্মান্তিক লজ্জা বোধ করলেন তিনি। কিন্তু লজ্জার চেয়েও বেশি অনুভব করলেন ভয়, নিজের মধ্যে একটা ভয়, শীতল শূন্যগর্ভ একটা আতঙ্ক। একটা ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল সুড়ঙ্গের মতো এখনো র'য়ে গেছে সেই আতঙ্ক—যেখানে এক সময় আত্মবিশ্বাস ছিলো, এখন সেখানে সম্পূর্ণ শূন্যতা। অসুস্থ বোধ করলেন তিনি: এখনো সেই পীড়া তাঁর মধ্যে আছে।

তার সূচনা হয়েছিলো কাল রাতে যখন তিনি জেগে উঠে দূরে নদীর পাড়ে সিংহের গর্জন শুনেছিলেন। গম্ভীর সেই নির্ঘোষ, শেষের দিকে ঠিক কাশির আওয়াজের মতো—যাতে মনে হচ্ছিলো শব্দটা ঠিক তাঁবুর পাশ থেকেই আসছে—এবং জেগে উঠে ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার সেই ডাক শুনে ভয় পেয়েছিলেন। শুনতে পাচ্ছিলেন ঘুমন্ত স্ত্রীর শান্ত ও নিয়মিত নিশ্বাস। তিনি যে ভয় পেয়েছেন, এ-কথা জানার কেউ ছিলো না; তাঁকে ভয় পাবারও কেউ নেই—আর সেই নিঃসঙ্গ শয্যায় তিনি এমনভাবে শুয়েছিলেন যেন তিনি সেই সোনালি প্রবচনটি শোনেন নি যার সারমর্ম হ'লো এই যে, একজন সাহসী লোক সিংহের কাছে তিনবার ভয় পায়: যখন সে প্রথম সিংহের পায়ের ছাপ দ্যাখে, যখন সে প্রথম তার গর্জন শোনে আর যখন সে প্রথম তার মুখোমুখি হয়। তারপর খুব ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগে, লণ্ঠনের আলোয় যখন তাঁরা প্রাতরাশ শেষ করছিলেন, সিংহ আবার গর্জন করলে, আর ফ্রান্সিসের মনে হ'লো সেই গর্জন এলো যেন তাঁর ঠিক পাশ থেকেই।

'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে ঝানু জানোয়ার,' কাপ থেকে চোখ তুলে উইলসন বলেছিলো। 'কাশির আওয়াজটা শুনুন!'

'কী? খুব কাছে নাকি?'

'মাইলখানেক হবে, নদীর ধারে।'

'দেখা যাবে?'

'একবার দেখবো।'

'ওদের ডাক এতদূর পর্যন্ত যায়? মনে হচ্ছে যেন তাঁবুর মধ্যেই ডেকে উঠলো!'

'সে বহুত দূর যায়।' উইলসন বলেছিলো, 'অদ্ভুতভাবে ওদের শব্দ পৌঁছোয়। খতমযোগ্য বেড়াল, আশা করা যাক। ছোকরারা বলছিলো, এখানে নাকি মস্ত একটা ছিলো।'

ম্যাকোম্বার জিগেস করেছিলেন, 'যদি আমি ওকে পাই তো ওকে ঘায়েল করার জন্য কোথায় গুলি মারবো?'

'ঘাড়ের কাছে।' উইলসন বলেছিলো, 'যদি ঠিকমতো পান তো একেবারে কাঁধের উপর। হাড়ে মারবেন, মেরে মাটিতে ফেলে দেবেন।'

'আশা করি ঠিকমতো লাগাতে পারবো,' ম্যাকোম্বার বলেছিলেন।

'আপনার টিপ তো খুবই ভালো। সময় নেবেন, আগে নিশ্চিত হ'য়ে নেবেন। প্রথমটাই আসল।'

'কত দূরে থাকবে?'

'তা বলা যায় না। সিংহটাই তা বলতে পারে। কাছাকাছি না-হ'লে, নিশ্চিত না-হ'য়ে, মারবেন না।'

'একশো গজের মধ্যে?'

চকিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো উইলসন। 'একশো গজ ঠিক আছে,' সে বলেছিলো, 'আরো কাছেও হ'তে পারে। তার বেশি দূর হ'লে চেষ্টা করবেন না। একশো গজ খুব ভালো তফাত। তাহ'লে আপনি যেখানে ইচ্ছে লাগাতে পারবেন। এই-যে, মেমসাহেব আসছেন।'

'সুপ্রভাত,' মারগট বলেছিলেন, 'আজ আমরা সিংহের খোঁজে যাচ্ছি তো?'

'যত তাড়াতাড়ি আপনি খাওয়া সেরে নেবেন,' উইলসন বলেছিলো, 'কেমন লাগছে আপনার?'

'চমৎকার। খুব উত্তেজিত বোধ করছি।'

'এখুনি গিয়ে দেখে আসছি সব ঠিক আছে কিনা।' উইলসন রওনা হ'তেই আবার ডেকে উঠেছিলো সিংহটা।

'বিষম চিল্লায় দেখছি।' উইলসন বলেছিলো, 'এখুনি গিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবো।'

'ফ্রান্সিস, কী হয়েছে তোমার?' তাঁর স্ত্রী জিগেস করেছিলেন।

'কিছু না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। তুমি অমন করছো কেন?'

'কিছু না।'

'আমাকে বলো। শরীর ভালো নেই?'

'ওই জাহান্নমের আওয়াজ। সারা রাত ধ'রে হচ্ছে, তুমি জানো?'

'আমাকে জাগিয়ে দাও নি কেন? আমার শুনতে খুব মজা লাগতো।'

'ওই নরকটাকে আমার মারতে হবে,' করুণভাবে ব'লে উঠেছিলেন ম্যাকোম্বার।

'হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো তুমি এখানে এসেছো, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার বড্ড অস্বস্তি লাগছে। ওর ওই বিকট ডাক আমার স্নায়ুতে সহ্য হচ্ছে না।'

'বাঃ, তাহ'লে উইলসন যা বললো, মেরে ওর ডাক ঠাণ্ডা ক'রে দাও!'

'হ্যাঁ, সোনামণি, কাজটা খুব সোজা মনে হচ্ছে, তাই না?'

'তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাও নি। না কি, পেয়েছো?'

'মোটেই না। সারারাত ধ'রে ওর ডাক শুনে আমার অসহ্য লাগছে।'

'তুমি ওকে সুন্দরভাবে মারতে পারবে, আমি জানি তুমি পারবে। আমার দারুণ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আমরা এক্ষুনি রওনা হবো।'

'এখনো তো আলো ফোটেনি। এ তো ভারি অদ্ভুত সময়।'

ঠিক তখনি গভীর চাপা শব্দে ডেকে উঠেছিলো সিংহটা, যেন হঠাৎ একটা কর্কশ, উচ্চগ্রাম তরঙ্গ বাতাস কাঁপিয়ে দিলে; ডাকটা শেষ হয়েছিলো ভারি শব্দে, গুমরোনো দীর্ঘশ্বাসের মতো।

'আওয়াজটা যেন একেবারে পাশ থেকে হ'লো,' ম্যাকোম্বারের স্ত্রী বলেছিলেন।

'ওঃ, ভগবান, আওয়াজটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।'

'ভারি আকর্ষণীয় ডাক।'

'আকর্ষণীয়? মোটেই না, বরং ভয়ংকর!'

রবার্ট উইলসন তার বেঁটে, কুচ্ছিৎ, অস্বাভাবিক চওড়া মুখ '৫০৫ গীবস অ্যাণ্ড গ্রিনিং বন্দুকটা নিয়ে হাজির হয়েছিলো। 'চ'লে আসুন। আপনার লোকটা স্প্রীংফিল্ড আর বড়ো বন্দুকটা নিয়েছে। সব গাড়িতে আছে। গুলি নিয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তৈরি।' বলেছিলেন শ্রীমতী ম্যাকোম্বার।

উইলসন বলেছিলো, 'আপদটার গোলমাল থামাতেই হবে। আপনি সামনে বসুন। মেমসাহেব আমার সঙ্গে পিছনে বসতে পারেন।'

তাঁরা যখন মোটরে উঠে বসলেন, তখন দিনের প্রথম ধূসর আলো নদীর পাড় দিয়ে উঠে বনের ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যাকোম্বার তাঁর রাইফেলের খোপ খুলে দেখলেন ধাতুমোড়া গুলি ভরা আছে। বন্ধ ক'রে সেফটি লাগিয়ে রেখে দিলেন। দেখলেন তাঁর হাত কাঁপছে। আরো কার্তুজ খোঁজার ছলে পকেটে হাত দিয়ে কার্তুজের খোপে-খোপে আঙুল বোলাতে লাগলেন। দরজাবিহীন, বাক্সের মতো চেহারার মোটরগাড়িটার পিছনে যেখানে তাঁর স্ত্রী উইলসনের সঙ্গে ব'সে আছেন সেদিকে তাকালেন: দু'জনেই ছটফট করছেন উত্তেজনায়। উইলসন ঝুঁকে ফিশফিশ ক'রে বললে, 'দেখুন, দেখুন, পাখিগুলো নিচে নেমেছে। তার মানে, বুড়ো খোকাটি জন্তুটা মেরে ফেলে গেছে।'

ম্যাকোম্বার দেখতে পেলেন, দূর-নদীর পাড়ে বৃক্ষের মাথায় শকুনির ঝাঁক ঘুরে-ঘুরে নিচে নামছে।

'বিশ্রাম করতে যাবার আগে ও নদীতে জল খেতে আসতে পারে,' উইলসন ফিশফিশ ক'রে বললে, 'ভালো ক'রে নজর রাখুন।'

পাথর-ছড়ানো নদীর খাড়া পাড় দিয়ে এঁকেবেঁকে আস্তে-আস্তে তাঁদের গাড়ি চলছিলো। নদীর অপর পাড় দেখছিলেন ম্যাকোম্বার, এই সময় উইলসন তাঁর হাত ধরলে। গাড়ি থেমে গেলো।

'ওই-যে, ওই দেখুন,' তিনি তাঁর ফিশফিশানি শুনলেন, 'সামনে, ডান দিকে। নেমে পড়ুন, তারপর মারুন। চমৎকার সিংহ।'

এবার সিংহটাকে দেখতে পেলেন ম্যাকোম্বার: বিশাল মাথাটা উঁচু ক'রে তাঁদের দিকে ঘুরিয়ে চওড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাতঃকালীন যে-বাতাস

তাঁদের দিকে ব'য়ে আসছিলো তাতে তার ঘন কেশর কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো। বিশাল দেখাচ্ছিলো সিংহটাকে, ভোরের ধূসর আলোয় নদীর খাড়া পাড়ে ছায়ামূর্তির মতো : ভারি তার কাঁধ, মসৃণ শরীর, চিক্কণ ও সতেজ।

'কত দূরে আছে ?' রাইফেল তুলে ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'প্রায় পঁচাত্তর গজ। নেমে প'ড়ে মারুন!'

'এখানে ব'সে গুলি করলে হয় না ?'

'গাড়িতে ব'সে সিংহ মারা যায় না,' শুনলেন উইলসন তাঁর কানে-কানে বলছে, 'নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন। ও আপনার জন্য সারাদিন ব'সে থাকবে না।'

ম্যাকোম্বার তাঁর সামনের সীটের বাঁকানো ধার দিয়ে পাদানিতে পা রাখলেন প্রথমে, তারপর নিচে নামলেন। তখনো তেমনি শান্তভাবে, রাজার মতো, এই বিপুলাকার গণ্ডারের দিকে তাকিয়েছিলো সিংহটা। মানুষের গায়ের গন্ধ তার দিকে যাচ্ছিলো না, সুতরাং সে আস্তে-আস্তে তার বিরাট মাথা ঘুরিয়ে এই বস্তুটি দেখছিলো। ভয় পায়নি, কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত জন্তুকে উল্টো দিকে রেখে সে জল পান করতে যাবে কি যাবে না এই দ্বিধার মধ্যে জিনিশটাকে অবলোকন করতে-করতে দেখলো একটা মনুষ্যমূর্তি ওটা থেকে বেরিয়ে এলো ; তখন সে তার ভারি মাথাটা ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে পালাতে গিয়ে একটা কর্কশ শব্দ শুনতে পেলো, আর একটা '৩০-০৬-২২০ গ্রেনের জমাট গুলির ধাক্কা খেলো কেশরের মধ্যে ; সঙ্গে-সঙ্গে তার পেটের মধ্যে কি-রকম উত্তপ্ত অদ্ভুত একটা বমির ভাব এলো। ছুটতে লাগলো সে, ভারি পায়ে লাফিয়ে উঠলো, দুলে উঠলো তার সদ্য-ভরা পেট, আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘন ঘাসের আস্তরণের দিকে যাবার সময় বাতাস বিভক্ত ক'রে আরেকটা গুলি তাকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো। তারপর আরেকটা গুলি : তার বুকে এসে লাগলো আঘাতটা ; হঠাৎ তার মুখে চ'লে এলো গরম ফেনামাখা রক্ত। ছুটলো সে ঘাস বনের দিকে, যেখানে গিয়ে গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে ব'সে থাকতে পারবে, যাতে ওই আঘাত-করার বস্তুটা কাছে এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে ঘাড়ে।

সিংহটার কেমন লাগছিলো, গাড়ি থেকে নেমে ম্যাকোম্বারের তা ভাবার ক্ষমতা ছিলো না। এইমাত্র তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর হাত কাঁপছে, উপরন্তু গাড়ি থেকে দূরে যাবার সময় পা নাড়ানোই প্রায় অসম্ভব মনে

হ'লো তাঁর কাছে। কি-রকম শক্ত হ'য়ে গেছে উরুর কাছটা, কিন্তু অনুভব করলেন যে মাংসপেশী কাঁপছে। বন্দুক তুলে, সিংহের মাথা এবং ঘাড়ের সংযোগস্থল টিপ ক'রে, ঘোড়া টিপলেন। কিছুই হ'লো না, যদিও চাপের চোটে তাঁর আঙুল ভেঙে যাবার উপক্রম। তখন মনে পড়লো যে 'সেফটি' তোলা আছে; বন্দুক নিচু ক'রে 'সেফটি' সরাবার সময় আরেকটি শঙ্কিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন তিনি, আর সিংহটা এবার গাড়ির থেকে তাঁর ধূসর ছায়ামূর্তি আলাদা ক'রে চিনতে পেরে ফিরে দাঁড়িয়ে ছোটার জন্য লাফিয়ে উঠলো। গুলির শব্দে ম্যাকোম্বার বুঝতে পারলেন গুলি ঠিক পৌঁচেছে; সিংহটা অবশ্য তবুও ছুটতে লাগলো। আবার গুলি ছুঁড়লেন ম্যাকোম্বার; সবাই দেখতে পেলো যে ছুটন্ত সিংহটার পিছনে কার্তুজটা খানিকটা ধুলো ওড়ালো শুধু। লক্ষ্য একটু নিচু করতে হবে মনে রেখে আবার ম্যাকোম্বার গুলি ছুঁড়লেন এবং শব্দ শুনে প্রত্যেকে বুঝলো গুলি ঠিক তাকমাফিক লেগেছে। প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠলো সিংহটা; বন্দুক আবার ঠিক করার আগেই ঘাস-বনে ঢুকে পড়লো।

তলপেটে বিষম যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাকোম্বার—স্প্রীংফিল্ড-ধরা হাত তখনো কাঁপছে; তাঁর স্ত্রী ও উইলসন পাশে এসে দাঁড়ালেন; উইলসনের পাশে বন্দুকবাহক দু'জন নিজেদের ভাষায় কিচমিচ করছিলো।

'ঠিক লাগিয়েছি; দু'বার মেরেছি আমি ওকে।'

'আপনি মেরেছেন বটে, কিন্তু একটু সামনে মেরেছেন,' কোনো উৎসাহ নেই উইলসনের গলায়। খুব গম্ভীর মনে হ'লো বন্দুকবাহক দু'জনকে—এবার তারা চুপ ক'রে গেছে।

'ঘায়েল করতেও পারতেন আপনি,' উইলসন বললে, 'ওকে খুঁজতে যাবার আগে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন?'

'অনুসরণ করবার আগে ওকে দুর্বল হ'য়ে পড়তে দিন।'

'ও।'

'খাশা ছিলো সিংহটা, যদিও এখন বিচ্ছিরি জায়গায় ঢুকে পড়েছে।' উইলসন হাসিমুখে বললো।

'খারাপ জায়গা কেন?'

'ওর কাছে না-গেলে ওকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।'

'ও।'

'চলুন যাই। মেমসাহেব গাড়িতেই ব'সে থাকবেন, আমরা রক্তের দাগ দেখে আসি।'

'মারগট, তুমি এখানে থাকো,' স্ত্রীকে বললেন ম্যাকোম্বার। গলা শুকিয়ে গেছে তাঁর, কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে।

'আমি কেন এখানে থাকতে যাবো?' মারগট জিগেস করলেন।

'উইলসন তা-ই বলছে।'

'আমরা একবার দেখে আসি। আপনি এখানেই থাকুন না, এখান থেকেই ভালো দেখতে পাবেন।'

সোয়াহিলি ভাষায় চালককে কী যেন বললো উইলসন; উত্তরে সে মাথা নেড়ে বললে, 'আচ্ছা, বাওয়ানা।'

তারপর তাঁরা নদীর খাড়া পাড় দিয়ে এগোলেন; নুড়িগুলি পেরিয়ে ঝর্নার ওপারে খানিকটা গিয়ে ম্যাকোম্বারের গুলি খেয়ে সিংহটা প্রথম যেখানে লুকিয়েছিলো সেই জায়গাটা চোখে পড়লো। বন্দুকবাহকেরা দেখালে সেখানে তৃণগুল্মের উপর জমাট কালো রক্ত প'ড়ে আছে; ক্রমে নদীর পাড়ের গাছের আড়ালে চ'লে গেছে সেই রক্তের ধারা।

'এখন আমরা কী করবো?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'বিশেষ-কিছুই করার নেই। বড্ড খাড়া নদীর পাড়, গাড়িটাকে এখানে আনা যাবে না। বরং কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা ক'রে আপনি আর আমি হতভাগাকে খুঁজতে বেরোবো।'

'ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলে হয় না?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'ঘাস বড্ড কাঁচা।'

'বাজনদার পাঠালে হয় না?'

কথাটার ওজন বোঝবার জন্য উইলসন তাঁর দিকে তাকালো। 'নিশ্চয়ই পাঠাতে পারি,' সে বললে, 'কিন্তু তা একটা খুনজখমের ব্যাপার হবে। সিংহটা যে আহত, তা তো আমরা জানি। একটা অক্ষত সিংহকে আপনি বাজনা বাজিয়ে তাড়াতে পারেন, কিন্তু আহত সিংহ সোজা এসে আক্রমণ করবে। ওর সামনাসামনি না-গেলে ওকে দেখতেই পাবেন না। একটা খরগোশও যেখানে লুকোতে পারবে না মনে হয় ও সেখানেও নিজেকে লুকিয়ে

রাখতে পারে। এমন অবস্থায় ওখানে কাউকে পাঠানো যায় না—কেউ না কেউ বিপদে পড়বেই।'

'বন্দুকবাহকেরা কী করবে?'

'ওরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। এ তো চুক্তিতেই আছে। ওদের অবশ্য তেমন স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না, তাই না!'

'আমি ওখানে যেতে চাই না,' ম্যাকোম্বার বললেন। কী বলছেন তা বোঝার আগেই কথাটা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'যেতে আমিও চাই না,' ফুর্তির ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো উইলসন, 'কিন্তু আর যে কোনো উপায় নেই!' তারপর যেন কী মনে ক'রে ম্যাকোম্বারের দিকে তাকালো উইলসন; আর হঠাৎ এই প্রথম তার চোখে পড়লো কী-রকম কাঁপছেন, কী-রকম কাতর মুখে চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে। 'আপনাকে অবশ্য যেতে হবে না,' উইলসন বললে, 'তার জন্য আমি আছি। এই জন্যই তো আমাকে ভাড়া করতে এত টাকা লাগে।'

'তুমি বলছো, তুমি নিজেই যাবে? কেন? ওটাকে ওখানেই ফেলে রাখলে হয় না?'

রবার্ট উইলসন এতক্ষণ সিংহটার সমস্যাতেই উদ্ব্যস্ত ছিলো; শুধু যা একটু ভয় পেয়েছেন, এছাড়া ম্যাকোম্বার সম্বন্ধে তার কিছুই মনে হয় নি। কিন্তু এখন হঠাৎ তার মনে হ'লো সে যেন একটা হোটেলের ভুল দরজা খুলে ফেলে একটা অশ্লীল ও ঘিনঘিনে দৃশ্য দেখে ফেলেছে।

'কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'ওটা ওখানেই থাক না।'

'আপনি বলছেন সিংহটার কোনো আঘাত লাগে নি এই ভান করবো আমরা!'

'না, শুধু ছেড়ে দিন এ-সব।'

'কিন্তু কাজ তো শেষ হয় নি।'

'কেন?'

'একটা কারণ, ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে এখন। দু-নম্বর কারণ, হঠাৎ কেউ ওর সামনাসামনি প'ড়ে যেতে পারে।'

'বুঝলাম।'

'কিন্তু আপনাকে তো আর-কিছু করতে হচ্ছে না।'

'আমার ইচ্ছে আছে,' বললেন ম্যাকোম্বার, 'কিন্তু আবার ভয়ও করছে।'

'আমি চিহ্ন ধ'রে আগে-আগে যাবো, আপনি পিছনে আসবেন। যতদূর মনে হয় আমরা ওর কাতরানি শুনতে পাবো। যদি দেখতে পাই তাহ'লে দু'জনেই গুলি করবো। ভয়ের কিছু নেই, আমি আপনার সঙ্গেই আছি। আর নয় তো থাক, আপনার না-যাওয়াই ভালো। হ্যাঁ, সেটাই বেশি ভালো হবে। আপনি মেমসাহেবের কাছে গিয়ে না-হয় অপেক্ষা করুন, আমি কাজ সেরেই আসছি।'

'না, আমি যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আপনার অনিচ্ছা থাকলে যাবেন না। চুক্তি অনুযায়ী আমিই এখন যাবো।'

'আমি যেতে চাই।'

একটা গাছের তলায় ব'সে তাঁরা সিগারেট ধরালেন।

'মেমসাহেবের সঙ্গে কথা ব'লে আসবেন? আমরা অপেক্ষা করছি।'

'না।'

'তাহ'লে আমিই গিয়ে ওঁকে ধৈর্য ধ'রে থাকতে ব'লে আসছি।'

'সেই ভালো,' বললেন ম্যাকোম্বার। সেখানেই ব'সে রইলেন তিনি: বগল ঘামে ভিজে যাচ্ছে, গলা শুকনো, পেটের মধ্যেটা ফাঁকা: এমনকি এই সাহস-টুকুও পাচ্ছেন না যাতে তাঁকে বাদ দিয়ে একা উইলসনকে সিংহটা মেরে আসবার হুকুম দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে তাঁর এই অবস্থা আগে লক্ষ ক'রে বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয় নি ব'লে এমনিতেই উইলসন খাপ্পা হ'য়ে আছে। একটু পরেই উইলসন ফিরে এলো: 'আপনার বড়ো বন্দুকটা নিয়ে এলাম। এই নিন। জন্তুটাকে অনেক সময় দেয়া গেছে। চলুন।' ম্যাকোম্বার বন্দুকটি নিলেন; উইলসন বললে, 'আমার ঠিক পিছনে পাঁচ গজ দূরে ডান দিকে থাকবেন। ঠিক যা বলবো হুবহু তা-ই করবেন কিন্তু।' তারপর সে সোয়াহিলি ভাষায় কী যেন বললো বন্দুকবাহকদের: তারা দু'জন যেন বিমর্ষতার প্রতিমূর্তি, স্তব্ধ ও করুণভাবে স্থির হ'য়ে আছে।

'এবার যাওয়া যাক।'

'একটু জল খাবো?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

বয়স্ক বন্দুকবাহকটির পিঠে একটা ছোটোখাটো খাবারের দোকান ছিলো; উইলসনের হুকুমে সে জলের পাত্রটার মুখ খুলে ম্যাকোম্বারের হাতে দিলে:

ম্যাকোম্বার অনুভব করলেন সেটা যেন অনেক ভারি হ'য়ে গেছে, এমনকি তার উপরকার শোলার ঢাকনাটাও তাঁর হাতে কেমন রোমশ ও জঘন্য লাগলো। জল খাবার জন্য সেটাকে উঁচু ক'রে ধ'রে উঁচু ঘাস-বন ও দূরের গাছগুলির দিকে তাকালেন একবার। ঠাণ্ডা হাওয়া ব'য়ে আসছে তাঁদের দিকে ; বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে লম্বা-লম্বা ঘাসের শিষ। বন্দুকবাহকের দিকে তাকিয়ে ম্যাকোম্বারের মনে হ'লো সেও যেন ভয়ে কাতর হ'য়ে পড়েছে।

পঁয়ত্রিশ গজ দূরে ঘাস-বনের মধ্যে লম্বা হ'য়ে শুয়েছিলো বিরাট সিংহটা। খাড়া হ'য়ে আছে তার কান দু'টো, সমস্ত শরীরের মধ্যে শুধু লম্বা ল্যাজের কালো প্রান্তভাগটা সামান্য নড়ছে। উপসাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে, কিন্তু এই আস্তরণের মধ্যে এসেই দুর্বল হ'য়ে পড়েছে খুব, ভরা পেটের উপর সেই ক্ষত থেকে যন্ত্রণা শুরু হ'য়ে গেছে, পাঁজরের আঘাতের জন্য প্রতিবার নিশ্বাসের সঙ্গে তার মুখে খানিকটা ক'রে লাল ফেনা উঠে আসছে। কেশরগুলো ভিজে আর গরম, যেখানে গুলির গর্ত হয়েছে সেখানে মাছি জমছে আর তার বিশাল হলুদ চোখ দু'টি ঘৃণায় কুঁকড়ে সোজা সামনে মেলে আছে, নিশ্বাসের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বুঁজে আসছে যন্ত্রণায়, থাবা দু'টো নরম মাটিতে বেঁধানো। তার সমস্ত যন্ত্রণা, জর্জরতা, ঘৃণা এবং অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি সে আরেকবার আক্রমণের জন্য আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কথা তার কানে গেলো এবং সে প্রতীক্ষা করতে লাগলো—লোকগুলি ঘাসের মধ্যে ঢুকলেই যাতে আক্রমণ করতে পারে সেইজন্য তৈরি হ'য়ে রইলো। ওদের কণ্ঠস্বর শুনে তার ল্যাজ শক্ত হ'য়ে ওঠা-নামা করতে লাগলো, আর তারা ঘাস-বনের পাশে আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে একটা চাপা আওয়াজ ক'রে আক্রমণ করলে।

কঙ্গোনি নামের বয়স্ক বন্দুকবাহকটি রক্তের দাগ অনুসন্ধান করছিলো, উইলসন নজর রাখছিলো ঘাসের নড়াচড়া—তার বড়ো বন্দুকটা বাগানো, দ্বিতীয় বন্দুকবাহকটি সামনে তাকিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করছিলো, ম্যাকোম্বার ছিলেন উইলসনের কাছেই—তাঁরও বন্দুক উঁচিয়ে ধরা ; দলটি সবেমাত্র ঘাসের কাছে গেছে সেই সময় ম্যাকোম্বার সেই রক্তমাখা গুমরানো আওয়াজ শুনলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলেন ঘাসের মধ্যে বিদ্যুতের মতো আক্রমণ-কারীকে। তার পরের ঘটনা যা তাঁর মনে আছে : ছুটে পালিয়েছিলেন

তিনি, অন্ধের মতো ছুটেছিলেন, প্রাণের ভয়ে খোলা জায়গায় দৌড়োচ্ছিলেন, ঝর্নার দিকে ছুটে চলেছিলেন।

সেই সময়েই তাঁর কানে গেলো উইলসনের বড়ো রাইফেলের আওয়াজ: 'কা-রা উঙ্গ'; এবং দ্বিতীয়বার 'কা-রা-উঙ্গ' শব্দে পিছনে তাকিয়ে দেখলেন সেই আহত সিংহ—মনে হচ্ছে তার অর্ধেক মাথা উড়ে গেছে, বীভৎস লাগছে দেখতে—ঘাস-বনের প্রান্তে এসে উইলসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে; লালমুখো উইলসন ততক্ষণে তার বেঁটে, কুচ্ছিৎ রাইফেলটি ঠিক ক'রে নিয়ে ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে আরেকবার বিধ্বংসী 'কা-রা-উঙ্গ' শব্দ করলো, তক্ষুনি গুঁড়িমারা অবস্থায় লুটিয়ে পড়লো বিশাল হলুদ সিংহটি, এবং প্রকাণ্ড খণ্ডবিখণ্ড মাথাটা ছড়িয়ে দিলো সামনে। গুলিভরা বন্দুক হাতে নিয়ে ম্যাকোম্বার দৌড়ে-আসা পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলেন, এবং সিংহটা যে সম্পূর্ণ খতম হয়েছে, এটা নিশ্চিতভাবে জেনে সেই দুটি কৃষ্ণাঙ্গ এবং একজন শ্বেতাঙ্গ লোক ঘৃণাভরা চোখে তাঁর দিকে তাকালো। উইলসনের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি: নগ্নতার মতো মনে হ'লো তাঁর শরীরের অতখানি দৈর্ঘ্য, এবং উইলসন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ছবি নিতে চান?'

'না।'

গাড়িতে পৌঁছোবার আগে ওরা তাঁকে ওই একটিমাত্র কথা বলেছিলো। গাড়িতে ফিরে উইলসন বললো, 'যাকে বলে একটা খাশা সিংহ। ছেলেরাই ওর ছালটা ছাড়িয়ে নিতে পারবে; আমরা বরং ততক্ষণ এই ছায়ায় ব'সে অপেক্ষা করতে পারি।'

ম্যাকোম্বার তাঁর স্ত্রীর দিকে একবারও তাকান নি, তিনিও তাঁর দিকে তাকালেন না: পিছনের আসনে বসলেন তাঁরা দু'জনে, উইলসন সামনে। স্ত্রীর দিকে না-তাকিয়েই একবার তাঁর হাতটা টেনে নিয়েছিলেন তিনি, মারগট শুধু হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। ঝর্নাটার ওপারে বন্দুকবাহকরা যেখানে সিংহটার ছাল ছাড়াচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর স্ত্রী পুরো ব্যাপারটাই দেখেছেন! একটু ব'সে থাকার পর উইলসনের কাঁধে হাত রাখলেন তাঁর স্ত্রী, আর সে ঘাড় ফেরাতেই মারগট ঝুঁকে তার মুখে চুমু খেলেন।

'সে কি, সে কি!—' উইলসনের স্বাভাবিক লাল মুখ আরো লাল হ'য়ে গেলো।

'মিস্টর রবার্ট উইলসন,' মারগট বললেন, 'আমার লালমুখো মিস্টর রবার্ট উইলসন।'

তারপর তিনি আবার ম্যাকোম্বারের পাশে ব'সে দূরে ছাল ছাড়ানো নিপাতিত সিংহটির শাদা শিরাতোলা নগ্ন বাহু এবং জঠর দেখতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বন্দুকবাহকেরা ভিজে আর ভারি চামড়াটা ব'য়ে নিয়ে এলো, সেটাকে গুটিয়ে ভাঁজ ক'রে রেখে তারা বসবার পর মোটর ছেড়ে দিলো। তাঁবুতে পৌঁছোবার আগে কেউ কোনো কথা বলে নি।

এইটুকুই সেই সিংহের কাহিনী। ম্যাকোম্বার জানতে পারেন নি কী ভেবেছিলো সিংহটা ছুটে আসার আগে, বা যখন অবিশ্বাস্য '৫০৫ কার্তুজটি দু'টন ওজনের আঘাত করেছে মুখে, অথবা আঘাত খেয়েও কেন সে ছুটে এসেছিলো, দ্বিতীয় আঘাতে যখন তার পিছন দিকটা ভেঙে যায় তখনো সে কেন গুঁড়ি মেরে সেই মারাত্মক বস্তুটার দিকে এগিয়ে আসছিলো—যা তাকে শেষ ক'রে ফেলছে। উইলসন কিছুটা জানতো, তাই শুধু এইটুকু বলেছিলো, 'দারুণ সিংহ, খাশা!' কিন্তু উইলসন যে কীভাবে সব ব্যাপার বুঝে ফ্যালে, তাও তিনি জানতেন না। তাঁর স্ত্রী কী-রকম অনুভব করেছিলেন তাও তিনি বুঝতে পারেন নি, শুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে তিনি তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়েছেন।

এর আগেও বহুবার তাঁর উপর রাগ করেছেন মারগট, কিন্তু তা বেশিক্ষণ টেঁকে নি। অত্যন্ত ধনবান তিনি, আরো ধনবান হ'তে পারেন, আর এটাও তিনি জানেন যে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে এখন আর তাঁকে ছেড়ে-যাওয়া সম্ভব নয়। অল্পস্বল্প যে-ক'টা জিনিশ তিনি সত্যি জানেন, এই জানা তার অন্যতম। তিনি মোটরসাইকেল সম্বন্ধে জানেন; একেবারে প্রথমে মোটরগাড়ি সম্বন্ধে জেনেছেন; জানেন হাঁস-শিকার; মাছ ধরা—ট্রাউট, সালমন, সমুদ্রের মাছ; বইতে লেখা যৌন-বিষয় জানেন; বই—অনেক বই জানেন; সভ্যজগতের সব রকম খেলা জানেন; কুকুর সম্পর্কে অনেক, ঘোড়া সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু নয়; টাকা দিয়ে যা করা যায়, সবই; তাঁর নিজের সমাজের সব-কিছু জানেন; এবং জানেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে যাবেন না। এক সময়ে বিখ্যাত রূপসী ছিলেন তাঁর স্ত্রী—এখনো এই আফ্রিকায় অসাধারণ সুন্দরী—কিন্তু নিজের দেশে এখন আর ততটা সুন্দরী নন যাতে এখন তাঁকে

ছেড়ে আরো-ভালো কাউকে পাকড়ানো যায়; এ-কথা তিনি জানেন এবং তাঁর স্ত্রীও তা জানেন। তিনি যদি মেয়েদের ব্যাপারে খুব সার্থক হতেন, তবে তাঁর স্ত্রীর নিশ্চয়ই মাথাব্যথা হ'তো যে তিনি আবার আরো একটা সুন্দর বউ জোগাড় করবেন কিনা; কিন্তু মারগট তাঁকে এতই ভালোভাবে চেনে যে তাঁকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। তাছাড়া চির-কালই তিনি খুব ধৈর্যশীল—এটাই তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ ব'লে ধরা হয়, অবশ্য তা যদি না ভান হয়।

মোটের উপর তাঁরা বেশ সুখী দম্পতি হিশেবে পরিচিত ছিলেন—তাঁদের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কখনো-কখনো ফিশফাশ শোনা যায় বটে, কিন্তু কখনো তা ঘটে না। কাগজের সামাজিক কলমে তাঁদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে তাঁরা তাঁদের ঈর্ষাজনক রোম্যান্টিক দাম্পত্যজীবন আরো সুস্বাদু করার জন্য কিছু উত্তেজনার খোরাক জোগাতে 'আঁধার আফ্রিকায়' শিকার-সফরে এসেছেন, যদিও আফ্রিকা এখন আর তেমন 'আঁধার' নয়, কেননা মার্টিন জনসন বহু চলচ্চিত্রের পর্দায় একে আলো ক'রে দিয়েছেন—এবং, এখানে ম্যাকোম্বার-দম্পতি বিরাট সিংহ, ভয়ংকর মহিষ এবং টেম্বো হাতি তাড়া ক'রে ফিরছেন এবং সেই সঙ্গে জাতীয় ইতিহাসের জাদুঘরের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছেন। খবরের কাগজের ওই লেখকই এর আগে তিনবার তাঁদের বিচ্ছেদ হয়-হয়, এমন গুজব ছড়িয়েছিলো। কিন্তু প্রতিবারেই তাঁরা সামলে নিয়েছিলেন। বেশ শক্ত তাঁদের মিলনের ভিত্তি। মারগট এত বেশি সুন্দরী যে ম্যাকোম্বারের পক্ষে তাঁকে বিদায় দেয়া কঠিন, এবং ম্যাকোম্বারের এত টাকা আছে যে মারগট তাঁকে কখনো ছেড়ে যেতে পারবেন না।

সিংহের চিন্তা কিছুক্ষণ ভুলে ম্যাকোম্বার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; রাত তিনটে আন্দাজ একবার জেগে উঠলেন, আবার ঘুমোলেন, এবং রক্তাক্ত মুণ্ড নিয়ে সেই সিংহটা তাঁর বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে এই স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জেগে উঠলেন; কিছুক্ষণ বুক দুপদুপুনির মধ্যেও কান পেতে শুনে বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্ত্রী অন্য খাটে নেই। এ-কথা জেনে তিনি দু'ঘণ্টা জেগে রইলেন।

দু'ঘণ্টা পর তাঁর স্ত্রী তাঁবুতে ফিরে এলেন, এবং মশারির প্রান্ত তুলে আস্তে নিজের বিছানায় ঢুকে পড়লেন।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' ম্যাকোম্বার অন্ধকারে প্রশ্ন করলেন।

'আরেঃ', মারগট বললেন, 'তুমি জেগে আছো?'

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?'

'বাইরে একটু খোলা হাওয়ায় গিয়েছিলাম।'

'তুমি নরকে গিয়েছিলে।'

'তুমি আমাকে দিয়ে কী বলাতে চাও, সোনা ?'

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?'

'বাইরে একটু নিশ্বাস নিতে।'

'ও-কাজের এটা একটা নতুন নাম। কুত্তি কোথাকার !'

'আর তুমি তো একটি কাপুরুষ।'

'ঠিক আছে,' বললেন ম্যাকোম্বার, 'তাতে হ'লোটা কী ?'

'কিছুই না। আমার এতে কিছু এসে-যায় না। কিন্তু দয়া ক'রে এখন আর কথা বলিয়ো না, সোনা। কারণ আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

'তুমি কী ভেবেছো ? আমি সবই সহ্য করবো ?'

'আমি জানি তুমি করবে, মিষ্টিমণি আমার।'

'না, করবো না।'

'দয়া ক'রে এখন আর কথা বোলো না, সোনা। বড্ড ঘুম পেয়েছে আমার।'

'এ-ধরনের কিছু আর-কখনো হবে না, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে। করো নি ?'

'বেশ তা না-হয় হ'লো,' মধুরভাবে বললেন মারগট।

'তুমি বলেছিলে, যদি আমরা এখানে বেড়াতে আসি, তাহ'লে এ-ধরনের আর-কিছু হবে না। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।'

'ঠিক, সোনা। কিন্তু আমাদের বেড়ানোটা তো কাল নষ্ট হ'য়ে গেলো। এ নিয়ে আর আমাদের কথা বলা উচিত নয়।'

'কোনো সুযোগ পেলে আর-একটুও তর সয় না তোমার, কী বলো ?'

'দয়া ক'রে আর কথা নয়। আমার অসহ্য ঘুম পাচ্ছে, সোনা।'

'কিন্তু কথা আমি বলবোই।'

'তাহ'লে কিছু মনে কোরো না : আমি ঘুমুবো।'—এবং সত্যিই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

দিনের আলো ফোটার আগে তাঁরা তিনজনেই খাবার-টেবিলে এসে বসলেন। ম্যাকোম্বার আবিষ্কার করলেন পৃথিবীতে তাঁর ঘৃণার যোগ্য যত মানুষ আছে তার মধ্যে উইলসনকে তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন।

'ভালো ঘুম হয়েছে?' পাইপ ধরাতে-ধরাতে চাপা গলায় জিগেস করলো উইলসন।

'তোমার?'

'চমৎকার।' শ্বেতাঙ্গ শিকারীটির প্রত্যুত্তর।

বেজন্মা কোথাকার—ম্যাকোম্বার মনে-মনে ভাবলেন—হতভাগা বেজন্মা!

চওড়া ঠাণ্ডা চোখে তাঁদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে উইলসন ভাবলে, তাহ'লে ঘরে ঢোকার সময় মেয়েটা স্বামীকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। বেশ, ও তাহ'লে নিজের বউকে সামলে রাখে না কেন? কী ভেবেছে, আমাকে? আমি কি মালা-প্লাস্টারের তৈরি সাধুপুরুষের মূর্তি নাকি? বউ যেমন, তাকে তো সেই রকম ভাবেই সামলে রাখতে হবে। ওরই দোষ।

'কী মনে হয় তোমার? আজ বুনো মোষ পাওয়া যাবে?' খাবারের থালাটা সরিয়ে দিয়ে জিগেস করলেন মারগট।

'যেতে পারে,' তাঁর দিকে তাকিয়ে উইলসন হাসলো, 'আপনি আজ তাঁবুতেই থাকুন না!'

'কিছুতেই না।'

'ওঁকে তাঁবুতে থাকতে হুকুম করুন না,' ম্যাকোম্বারকে বললো উইলসন।

'তুমিই হুকুম করো,' ম্যাকোম্বারের কণ্ঠ অতিশয় শীতল।

'আজ কোনো হুকুম কিংবা ন্যাকামি বন্ধ থাক, ফ্রান্সিস,' মিষ্টি ক'রে বললেন মারগট।

'বেরুবার জন্য তৈরি তো?' ম্যাকোম্বার জিগেস করলেন।

'যে-কোনো সময়,' উইলসন বললে, 'মেমসাহেব সঙ্গে যান, আপনি কি তা চান?'

'আমি চাই বা না-চাই তাতে কি কিছু এসে যাবে!'

যাচ্ছে তাই, একেবারে যাচ্ছে তাই!—উইলসন ভাবলে—জাহান্নমে যাক। তাহ'লে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে? অ্যাঁ, ব্যাপারটা তবে এই দাঁড়াচ্ছে!

'ঠিক আছে। ওঁর যাওয়া না-যাওয়া সমান।'

'ঠিক ভেবে দেখেছেন তো? ওঁকে নিয়ে তাঁবুতে আপনি একা থাকতেই পছন্দ করবেন হয়তো। আমি বরং একাই গিয়ে মোষ মেরে আসবো।'

'তা কি কখনো হয় নাকি? আমি আপনি হ'লে এ-রকম বাজে বকতুম না।'

'মোটেই বাজে কথা বলছি না। আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।'

'ঘেন্না ধ'রে গেছে কথাটা খুবই খারাপ।'

'ফ্রান্সিস, তুমি কি একটু ভালোভাবে কথা বলবার চেষ্টা করবে, লক্ষ্মীটি?' তার স্ত্রী ব'লে উঠলেন।

'খুব ভালোভাবেই কথা বলছি আমি। এমন খারাপ জিনিশ তুমি কোনোদিন হজম করেছো?'

'খাবারে কোনো গণ্ডগোল ছিলো নাকি?' ঠাণ্ডাভাবে জিগেস করলো উইলসন।

'অন্যান্য সব-কিছুর চেয়ে কী আর এমন খারাপ!'

'টেবিলের কাছে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ও কিন্তু খানিকটা ইংরিজি জানে।' উইলসন বললে।

'চুলোয় যাক।'

উইলসন উঠে দাঁড়িয়ে চারকটাকে দেশীয় ভাষায় কী-একটা ব'লে পাইপ টানতে-টানতে চ'লে গেলো। ম্যাকোম্বার আর তাঁর পত্নী ব'সে রইলেন টেবিলে। কফির পেয়ালার দিকে তাকিয়েছিলেন ম্যাকোম্বার।

'তুমি যদি এ-রকম কাণ্ড করো, তাহ'লে আমাকে চ'লে যেতে হবে, সোনা।' মারগট শান্তভাবে বললেন।

'না, তুমি যাবে না।'

'চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো তুমি।'

'না, তুমি আমাকে ছাড়তে পারবে না।'

'না, ছেড়ে যাবো না, যদি তুমি একটু ভদ্র ব্যবহার করো।'

'আমি ভদ্র ব্যবহার করবো? চমৎকার! আমি ভদ্র ব্যবহার করবো!'

'হ্যাঁ, ঠিকমতো ব্যবহার করবে।'

'তুমি নিজে ভদ্র আচরণের চেষ্টা করো না?'

'বহুকাল চেষ্টা করেছি আমি, ব হু কা ল।'

'ওই লালমুখো শূয়োরটাকে আমি ঘেন্না করি। ওকে দেখলে আমার বমি আসে।'

'ও কিন্তু সত্যিই চমৎকার।'

'আঃ, চুপ করো!' ম্যাকোম্বার প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।—ঠিক তখুনি গাড়িটা এসে তাঁবুর পাশে থামলো, এবং চালক ও বন্দুকবাহক দু'জন নেমে

দাঁড়ালো। উইলসন হেঁটে এলো এবং টেবিলে ব'সে-থাকা দম্পতির দিকে তাকালো।

'শিকার করতে যাবেন না?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়ালেন ম্যাকোম্বার, 'নিশ্চয়ই।'

'একটা গরম কিছু নিয়ে আসুন, গাড়িতে ঠাণ্ডা লাগবে।' বললো উইলসন।

'আমার চামড়ার জামাটা নিয়ে আসি।' মারগট বললেন।

'ওটা সঙ্গে আছে,' উইলসন জানালে। উইলসন গিয়ে সামনে বসলো, আর ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার ও তাঁর স্ত্রী একটিও কথা না-ব'লে পিছনে বসলেন। আশা করি পিছন থেকে আমার মাথায় গুলি চালাবার কোনো মতলব নেই এই ন্যাকা কাঙালটার—উইলসন ভাবলে—শিকারের সময় মেয়েরা এক নোংরা ঝামেলা।

সকালটা ভারি চমৎকার—মনে হ'লো উইলসনের, খুব শিশির পড়েছে: গাড়ির চাকা যখন ঘাস আর ছোটো-ছোটো গুল্ম পিষে যায়, তখন তার নাকে আসে লতাপাতা আর শিশিরের মিশ্রিত গন্ধ। এই গন্ধ তার ভালো লাগে; এই শিশির, ভোরের আগে এই কালো-কালো গাছগুলি, পথহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এই গাড়ি চলা সব তার পছন্দ হ'য়ে গেলো। পিছনের আসনের দু'জনকে মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছিলো সে, ভাবছিলো শুধু মহিষের কথা। যে-মহিষের জন্য তারা চলেছে—দিনের বেলায় তারা এত ঘন জঙ্গলে থাকে যে গুলি চালানো অসম্ভব—কিন্তু রাতে তারা দল বেঁধে খেতে বেরোয়, আর যদি একবার গাড়ি নিয়ে ওদের ঝাঁকের মধ্যে গিয়ে পড়া যায়—তবে ম্যাকোম্বারের পক্ষে খোলা জায়গায় একটাকে মারা শক্ত হবে না। ম্যাকোম্বারকে নিয়ে ঘন জঙ্গলে শিকারে যেতে চায় না সে—ম্যাকোম্বারকে নিয়ে আর-কিছুই শিকার করতে চায় না;—কিন্তু সে নিজে একজন পেশাদার শিকারী, আর অনেক দুর্লভ সফরের সঙ্গী হয়েছে বয়সকালে। আজ যদি মহিষ পাওয়া যায় তবে বাকি থাকবে গণ্ডার—সেটাই ও-লোকটার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলা হবে। অনেক কিছু হ'য়ে যেতে পারে। তারপর আর ওই লোকটা বা মেয়েছেলেটা সম্বন্ধে তার আর-কিছুই করবার থাকবে না: ও নিশ্চয়ই সব সামলে নেবে। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে এর আগেও ওকে এমন অনেকবার সইতে হয়েছে। বেচারা! ওর নিশ্চয়ই সামলে নেবার কোনো উপায় আছে। যাই হোক, ওই নপুংসকটার নিজেরই দোষ।

সে, রবার্ট উইলসন, দু'জনের উপযোগী একটা খাট সঙ্গে রাখে, সব রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে। সে এমন সব আন্তর্জাতিক, দক্ষ, খেলোয়াড় মক্কেলদের হ'য়ে শিকার করেছে, যাদের মেয়েছেলেরা মনে করে, এত পয়সা খরচ করা সার্থকই হ'লো না যদি না এই শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সঙ্গে এক খাটে শোয়া যায়। তাদের থেকে দূরে চ'লে গেলেই উইলসন তাদের ঘৃণা করে—যদিও তাদের কয়েকজনকে সে-সময় তার খুবই পছন্দ হয়েছিলো। এদের সাহায্যেই তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। ভাড়া করার পর সকলেই তার সঙ্গে সমান-সমান ব্যবহার করে।

ওরা সব দিক দিয়ে সমান হয়, একমাত্র শিকার ছাড়া। শিকার সম্বন্ধে তার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। ওরা তাকে মানিয়ে নেয়, অথবা অন্য লোক ভাড়া করে। উইলসন জানে, এই কারণেই তাকে সকলে মান্য করে। এই ম্যাকোম্বারটাই যা অদ্ভুত। ও যদি নাও করে, চুলোয় যাক। এখন ওর বউ, হ্যাঁ, ওর বউ, আঃ, ওর বউ, হুম্, ওর বউ! যাক, ও-কথা বাদ দেয়া যাক। উইলসন ওদের দিকে ফিরে তাকালো। ম্যাকোম্বার বিমর্ষ এবং রুষ্ট। মারগট তার দিকে চেয়ে হাসলেন। ওকে আজ আরো তরুণী দেখাচ্ছে, আরো সরল ও ঝকমকে—ওর রূপ কিন্তু মোটেই গতানুগতিক নয়। কী যে আছে ওর মনে, তা কেবল ভগবানই জানেন। কাল রাতে বেশি কথা বলে নি। এবং কথা বলে নি ব'লে ওকে খুব ভালো লেগেছিলো।

গাড়ি খানিকটা চড়াইয়ে উঠে বনের মধ্যে দিয়ে এসে একটা বিস্তৃত তৃণভূমির মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো; উইলসন সতর্কভাবে দূরবীন দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলো। উইয়ের ঢিপি আর খানাখন্দ পেরিয়ে আস্তে চলেছে গাড়িটা; হঠাৎ সামনের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে উইলসন ব'লে উঠলো, 'ওই যে, ওখানে!'

চালককে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিলে উইলসন; তার নির্দিষ্ট দিকে তাকিয়ে ম্যাকোম্বার দেখতে পেলেন তিনটি বিশাল কালো জন্তু, তিনটে কালো সাঁজোয়া গাড়ির মতো, দ্রুত লাফিয়ে তৃণভূমির শেষপ্রান্তে ঘুরছে। ঘাড় শক্ত ক'রে, শরীর টান ক'রে, ছুটছে: তিনি তাদের চওড়া শিংগুলো দেখতে পেলেন: সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে ছুটছে তারা, মাথা নাড়ছে না।

'তিনটে জোয়ান মোষ আছে,' উইলসন বললে, 'ঝোপে ঢুকে পড়ার আগেই আমাদের শেষ করতে হবে।'

'এসো, সবাই মিলে একটু মদ খাওয়া যাক,' ম্যাকোম্বার বললেন।

'নিশ্চয়ই,' উইলসন বললে, 'মেমসাহেবকে দিন এটা।' মারগট ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন; ঢোঁক গেলার সময় তাঁর সর্বাঙ্গ একবার কেঁপে উঠলো। তারপর সেটা ম্যাকোম্বারের হাতে দিলেন এবং ম্যাকোম্বার আবার উইলসনকে।

'ওঃ, কী ভয়ংকর উত্তেজনা এসেছিলো, আমার বড্ড মাথা ধ'রে গেছে। গাড়িতে চ'ড়েও যে শিকার করতে দেয়া হয়, তা আমি জানতুম না।'

'গাড়ি থেকে কেউই গুলি করে নি,' নীরস গলায় বললে উইলসন।

'আমি বলছি গাড়ি নিয়ে তাড়া করা।'

'সাধারণত তাও করা হয় না। কিন্তু আমরা যখন করছিলাম তখন বেশ মজাই লাগছিলো। পায়ে হেঁটে শিকার করার চেয়ে ও-রকম গর্তভরা উঁচু-নিচু মাঠে গাড়ি চালিয়েই আমরা বরং বেশি ঝুঁকি নিয়েছি। আমরা যে-ক'বার গুলি করেছি, প্রতিবারই মোষটা আমাদের তাড়া করতে পারতো। ওদের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাহ'লেও ও-কথা কাউকে বলবেন না। এটা বেআইনি।'

'অমন একটা বিশাল অসহায় জন্তুকে মোটর নিয়ে তাড়া করা—আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

'তাই নাকি?'

'যদি নাইরোবিতে এ-কথা জানতে পারে, তাহ'লে কী করবে?'

'প্রথমত আমি লাইসেন্স হারাবো। আরো অনেক কিছু খারাপ হবে। আমাকে এই পেশা থেকে সরিয়ে দেয়া হবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যিই।'

'আচ্ছা,' ম্যাকোম্বার সারাদিনে এই প্রথম হেসে কথা বললেন, 'এবার মারগট দেখছি তোমাকে ধরেছে।'

'তুমি সব জিনিশই এত সুন্দরভাবে বলতে পারো, ফ্রান্সিস—' মারগট বললেন। উইলসন তাঁদের দু'জনের দিকে তাকালো। যদি 'চার অক্ষরের' একটা লোকের সঙ্গে 'পাঁচ অক্ষরের' কোনো মেয়ের বিয়ে হয়, সে ভাবলে, তবে তাদের সন্তান 'ক-অক্ষরের' হবে? মুখে বললে, 'আমরা একটা বন্দুকবাহককে হারিয়েছি, লক্ষ করেছেন?'

'সে কী! না-না।' ম্যাকোম্বার বললেন।

'ওই তো আসছে,' উইলসন বললে, 'না, ও ঠিকই আছে। প্রথম মোষটা যখন ছেড়ে আসি তখনি বোধহয় ও পিছিয়ে পড়েছিলো।'

টুপি, খাকি জামা, ছোটো পাতলুন আর রবারের জুতো পরা মধ্যবয়স্ক বন্দুক-বাহকটি তাদের দিকে আসতে লাগলো; তার মুখ বিমর্ষ, দেখাচ্ছে ঠিক হৃতসর্বস্ব। আসতে-আসতে সে উইলসনকে ডেকে সোয়াহিলি ভাষায় কী যেন বললো, আর তাঁরা দেখলেন তাই শুনে সেই শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মুখটা কেমন হঠাৎ বদলে যাচ্ছে।

'কী বলছে ও?' মারগট জিগেস করলেন।

'ও বলছে যে প্রথম মোষটা উঠে প'ড়ে ঝোপে ঢুকে গেছে।' তার কণ্ঠস্বরে কোনো ভাব ফুটলো না।

'ওঃ।' ম্যাকোম্বার শূন্য গলায় বললেন।

'তাহ'লে এটাও সিংহটার মতো ব্যাপার হবে,' সম্পূর্ণটা অনুমান ক'রে মারগট বললেন।

'নাঃ, সিংহটার মতো কিছুই হবে না,' উইলসন বললে, 'আপনি আরেকটু মদ নেবেন, ম্যাকোম্বার?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' ম্যাকোম্বার বললেন। সিংহটার সময় যেমন হয়েছিলো, সেই রকম একটা ভাব এবারও আসবে তিনি আশা করছিলেন, কিন্তু আসে নি। জীবনে এই প্রথম তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় বোধ করছেন। বরং ভয়ের বদলে একটা নিশ্চিত জয়ের আনন্দ এসেছে।

'দ্বিতীয় মোষটাকে গিয়ে দেখুন একবার,' উইলসন বললে, 'আমি ড্রাইভারকে বলছি গাড়িটা ছায়ায় এনে রাখতে।'

'তুমি এখন কী করবে তাহ'লে?' মারগটের প্রশ্ন।

'আমি ও-মোষটা একবার দেখে আসবো।'

'আমিও যাবো।'

'আসুন।'

তিন জনেই, যেখানে দ্বিতীয় মোষটা ছিলো সেখানে, হেঁটে গেলেন—উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে তার শিং দু'টো ব্যবধানে ছড়ানো, মাথাটা সামনে ঘাসের মধ্যে প'ড়ে আছে। 'দামী মাথা,' উইলসন বললে, 'প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি ছড়ানো হবে।' খুব আনন্দের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়েছিলেন ম্যাকোম্বার।

'জঘন্য দেখতে,' মারগট বললেন, 'আমরা ওই ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালে হয় না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' উইলসন বললে। তারপর ম্যাকোম্বারকে ডেকে আঙুল দিয়ে দেখালো, 'ওই ঝোপের মতো ওটা দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানেই প্রথম মোষটা ঢুকেছে। বন্দুকবাহকটি বললো একবার মোষটা নাকি প'ড়ে গিয়েছিলো। আমাদের লক্ষ করছিলো সে—আমরা যখন ছুটন্ত দু'টোকে তাড়া ক'রে চ'লে আসছি, হঠাৎ ছাখে প্রথম মোষটা উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ও তখন দৌড়েছে প্রাণপণে, আর মোষটা আস্তে-আস্তে জঙ্গলে ঢুকে গেছে।'

'ওটাকে এখন খুঁজতে যেতে পারি না আমরা?' অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন ম্যাকোম্বার।

কথাটার ওজন যাচাই করবার জন্য ওঁর দিকে তাকালো উইলসন। শালা, সত্যি অদ্ভুত: গতকাল ছিলো ভয়ে নিশ্বাসহীন, আর আজ হয়েছে দুর্দান্ত আগুন-খেকো। 'নাঃ, ওটাকে আরেকটু সময় দেয়া দরকার।'

'দয়া ক'রে, চলুন, ছায়ায় যাই।' মারগট বললেন। শাদা হ'য়ে গেছে তাঁর মুখ, অসুস্থ দেখাচ্ছে।

একটিমাত্র বিশাল বিস্তৃত গাছের ছায়ায় ছিলো গাড়িটা; সকলেই গাড়িতে উঠে বসলো।

'হয়তো ভাগ্যে থাকলে দেখবো, ওটা ওই ঝোপের ভিতরে ঢুকেই ম'রে গেছে। একটু বাদেই গিয়ে দেখবো আমরা।'

একটা অযৌক্তিক, অজ্ঞাতপূর্ব, আনন্দের অনুভব পাচ্ছিলেন ম্যাকোম্বার। 'একেই বলে তাড়া করা,' তিনি বললেন, 'আগে কখনো এ-রকম উৎসাহ পাই নি আমি। চমৎকার হয়েছে, মারগট, তাই না?'

'বিশ্রী লাগছে আমার!'

'কেন?'

'আমার বিশ্রী লেগেছে,' তিক্ত জবাব মারগটের, 'আমার ঘেন্না করেছে।'

'তুমি বুঝতে পারছো না, জীবনে আর-কোনো কিছুতে আমি ভয় পাবো না,' উইলসনকে বললেন ম্যাকোম্বার। 'প্রথম যখন মোষটাকে দেখলাম আর তাড়া করলাম, আমার মধ্যে যেন কী-একটা ঘ'টে গেলো। যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেলো—সত্যিকারের আবেগ ব'লে একে।'

'লিভার পরিষ্কার হয়েছে আপনার ?' উইলসন বললে, 'কত রকম হাস্যকর জিনিশই যে হয় লোকের।'

ম্যাকোম্বারের মুখ জলজ্বল করছিলো। 'সত্যিই আমার মধ্যে একটা-কিছু হয়েছে। আমি একেবারে বদলে গেছি, মনে হচ্ছে।'

তাঁর স্ত্রী কিছুই বললেন না, শুধু অদ্ভুতভাবে তাঁকে লক্ষ করতে লাগলেন। সীটের একেবারে পিছন দিকে হেলান দিয়ে ব'সেছিলেন তিনি, আর উইলসনের সঙ্গে গল্প করছিলেন।

'জানো, আমি আরেকবার সিংহ মারার চেষ্টা করতে চাই।' ম্যাকোম্বার বললেন, 'সত্যিই ওদের আর ভয় পাই না আমি। ওরা কীই বা করতে পারে ?'

'ঠিক ধরেছেন,' উইলসন বললো, 'বড়ো জোর আপনাকে মেরে ফেলবে। তাতে কী হবে ? শেক্সপীয়রে আছে। ভারি চমৎকার। দেখি যদি মনে আসে। দারুণ খাঁটি কথা—এক সময় নিজে নিজে মুখস্থ বলতাম। দেখি চেষ্টা ক'রে, হ্যাঁ, "By my troth, I care not; a man can die but once; we owe God a death and let it go which way it will; he that dies this year is quit for the next" ভারি চমৎকার, না ?'

তার এই সংগোপনে জমিয়ে রাখা জিনিশটুকু বার ক'রে দিয়ে উইলসন অত্যন্ত লজ্জা পেলো। কিন্তু এর আগেও লোককে পরিণত হ'য়ে উঠতে দেখেছে সে, আর আবেগে আপ্লুত হয়েছে। এ তো আর একুশ বছরের জন্মদিন নয়।

শিকারের ব্যাপারটার কী-রকম মোড় ঘুরে গেছে। থিতিয়ে-পড়া লোকটা বিষম উদ্যোগী হ'য়ে উঠেছে। কাঙালটাকে এখন ছাখো একবার! ওদের অনেকেই বহুকাল বাচ্চা থেকে যায়, উইলসন ভাবলো। অনেক সময় সারাজীবনই বালক থাকে। পঞ্চাশ বছর বয়সেও শিশুর মতো দেখতে লাগে, বিখ্যাত মার্কিনি বাল-পুরুষ। ভারি অদ্ভুত মানুষ মার্কিনিরা। কিন্তু তার এখন ম্যাকোম্বারকে পছন্দ হচ্ছে: ভারি অদ্ভুত লোকটা, হয়তো বউয়ের কাছে আর ঠকবে না। শালা, তাহ'লে তো খুব ভালো। খুবই ভালো। সারা জীবন ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে কাঙালটা, ছিলো আস্ত একটা ভীতুর ডিম। কী ক'রে আরম্ভ হয়েছিলো, কে জানে। কিন্তু, এখন সামলে নিয়েছে।

এখন আর মোষটার সম্বন্ধে ভয় পাবার সময়ই পাচ্ছে না। আর রাগও করছে না। গাড়ির কথাও নেই। একেবারে অগ্নিখাদক হ'য়ে গেছে যেন। কৌমার্য ঘুচে যাবার চেয়েও বেশি বদল। যেন অস্ত্রোপাচার ক'রে ভয়টাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে—তার বদলে অন্য-কিছু জন্মেছে, একটি আস্ত মানুষ হ'য়ে উঠেছে, একেবারে পুরো মানুষ। মেয়েছেলেরাও এ-ব্যাপারটা বোঝে। আরেকটুও ভয় নেই।

পিছনের একেবারে কোণ থেকে মারগট ম্যাকোম্বার তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়েছিলেন। উইলসনের কোনো বদল নেই। কাল যখন প্রথম প্রতিভাবান হিশেবে উইলসনকে শনাক্ত করেছিলেন, তখন যেমন দেখাচ্ছিলো, এখনো তেমনিই দেখাচ্ছে। কিন্তু এখন ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বারের বদলটা দেখতে পেলেন।

'এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তুমি তার আনন্দ অনুভব করতে পারছো?' ম্যাকোম্বার তাঁর নবলব্ধ সম্পদ নিয়োগ ক'রে শুধোলেন।

'ও-কথা উল্লেখ না-করাই ভালো দেখায়।' অপরজনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে উইলসন বললো, 'বরং খারাপ লাগছে বলাটাই কায়দা। মনে রাখবেন, এখনো খারাপ লাগতে পারার মতো প্রচুর সময় আছে।'

'কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই যা হবে তার জন্য আনন্দ বোধ হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। এ নিয়ে বেশি কথা বলার কিছু নেই।'

'তোমরা দু'জনেই অতি কুচ্ছিৎ কথা বলছো,' মারগট বললেন। 'যেহেতু তোমরা একটা মোটরগাড়ি ক'রে একটা নিরীহ অসহায় প্রাণীকে তাড়া করেছো, তাই বীরের মতো কথা বলছো।'

'আমি দুঃখিত, আমি একটু বেশি বাড়িয়েই বলছিলাম,' উইলসন বললো। মেয়েটা যে এর মধ্যেই ভাবনায় পড়েছে, তা সে বুঝতে পারলে।

'আমরা কী নিয়ে কথা বলছি, তা যখন তুমি জানো না, তখন চুপ ক'রে থাকতে পারো না?' স্ত্রীকে বললেন ম্যাকোম্বার।

'হঠাৎ খুব সাহসী হ'য়ে উঠেছো দেখছি তুমি, হঠাৎ, ভয়ংকর!' ঘৃণার সঙ্গে বললেন তাঁর স্ত্রী, যদিও সে-ঘৃণা খুব নিশ্চিত নয়। কোনো কারণে তিনি যেন খুব ভয় পেয়েছেন।

হেসে উঠলেন ম্যাকোম্বার, অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর হাসি। 'সত্যিই আমি হয়েছি,' তিনি বললেন, 'সত্যিই সাহসী হয়েছি।'

'একটু দেরি হ'য়ে যায় নি কি?' মারগটের কণ্ঠস্বর অতি তিক্ত, কারণ বহু বছর ধ'রে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছেন; এখন দু'জনের সম্পর্ক যেখানে দাঁড়িয়েছে, তা দু'জনেরই কারুরই দোষে নয়।

'আমার পক্ষে খুব বেশি দেরি হয় নি,' ম্যাকোম্বার বললেন।

মারগট কোনো উত্তর না-দিয়ে কোণে হেলান দিয়ে ব'সে রইলেন।

'ওটাকে কি যথেষ্ট সময় দেয়া হয় নি?' উৎফুল্লভাবে উইলসনকে জিগেস করলেন ম্যাকোম্বার।

'চলুন, একবার দেখা যাক। নিরেট কার্তুজ আর আছে তো?'

'বন্দুকবাহকের কাছে কিছু আছে।'

'আপনি স্প্রীংফিল্ডটাও নিতে পারেন, আপনার তো ওটাতেও অভ্যেস আছে। ম্যানলীচার বন্দুকটা গাড়িতে মেমসাহেবের কাছে রেখে যাবো। ছোকরারা আপনার ভারি বন্দুক বইতে পারবে। আমার তো এই শালার কামানটাই আছে। আচ্ছা, এবার ঝোপের সম্বন্ধে শুনে নিন।'

এই কথাগুলো উইলসন এতক্ষণ পর্যন্ত পুষে রেখেছিলো, কেননা ম্যাকোম্বারকে সে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন করতে চায় নি। 'মোষটা আসার সময় মাথাটা উঁচু ক'রে রাখে আর সোজা যায়। বাঁকানো শিং-এ মাথা বা ঘিলুর জায়গা সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে রাখে, একমাত্র মারার জায়গা সোজা নাকে। এছাড়া আর একমাত্র গুলি করা যায় বুকে, অথবা আপনি যদি পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে ঘাড়ে বা কাঁধে। একবার আঘাত লাগলে ওরা মারাত্মক খুনে হ'য়ে ওঠে। তখন শৌখিন কিছু করতে যাবেন না। সবচেয়ে সোজা যেটা সেটাই মারবেন।...ওদের চামড়া ছাড়ানোর কাজ হ'য়ে গেছে—চলুন, এখন যাবেন কি?'

বন্দুকবাহক দু'জনকে ডাকলো সে: ওরা হাত মুছে এলো। 'শুধু কঙ্গোনিকে সঙ্গে নেবো আমি, আরেকজন থাক, শকুন পাহারা দেবে।'

গাড়িটা যখন আস্তে-আস্তে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ছোটো-ছোটো গুল্মেভরা দ্বীপের মতো জায়গাটায় চললো, তখন আবার বুক দুপদুপ করতে লাগলো ম্যাকোম্বারের, গলা শুকিয়ে এলো—কিন্তু এবার ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

'এখান দিয়েই ওটা পালিয়েছে।' তারপর বন্দুকবাহককে উইলসন বললো, 'রক্তের দাগ লক্ষ রেখো।'

গাড়িটা ঝোপের সঙ্গে সমান্তরালভাবে দাঁড় করিয়ে ম্যাকোম্বার, উইলসন

ও বন্দুকবাহক নেমে পড়লো। পিছন ফিরে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেলেন ম্যাকোম্বার, পাশে বন্দুক প'ড়ে আছে, তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। ম্যাকোম্বার হাত নাড়লেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর করলেন না।

খুব ঘন সামনের ঝোপটা, মাটিটা শুকনো। মধ্যবয়স্ক বন্দুকবাহকটি খুব ঘামছে, উইলসন তার টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামিয়ে নিয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে তার লাল ঘাড়টা, ম্যাকোম্বারের ঠিক সামনেই। হঠাৎ বন্দুকবাহকটি সোয়াহিলি ভাষায় কী ব'লে সামনে ছুটে এলো।

'ওটা ওখানেই ম'রে আছে,' উইলসন বললো, 'ভালোই হয়েছে'—এই ব'লে সে ম্যাকোম্বারের হাত ধরবার জন্য পাশ ফিরলো। তারা যখন করমর্দন করছে, তখন হঠাৎ বন্দুকবাহকটি ভয়ার্তভাবে চীৎকার ক'রে উঠলো। দেখা গেলো, ঝোপের পাশ দিয়ে কাঁকড়ার মতো তীব্রবেগে সে ছুটে আসছে, এবং তার পিছনে মহিষ—তার নাসিকা বিস্ফারিত, মুখ দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, রক্ত ঝরছে, বিশাল মাথাটা সামনে উঁচু করা, মরিয়া হ'য়ে তাড়া ক'রে আসছে; যখন তাদের দিকে তাকালো, দেখা গেলো তার শূকরের মতো চোখ দু'টি রক্তবর্ণ। উইলসন ছিলো সামনে—হাঁটু গেড়ে ব'সে তৎক্ষণাৎ সে গুলি চালালো; এবং ম্যাকোম্বার যখন গুলি করলেন, উইলসনের বন্দুকের শব্দে নিজের গুলির শব্দ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু দেখলেন মোষটার শিং থেকে ভাঙা শ্লেটের মতো অসংখ্য টুকরো ছিটকে এলো; তার মাথাটা কেঁপে উঠলো; আবার তিনি গুলি করলেন তার বিস্ফারিত নাকে; এবং দেখলেন আবার চোট লেগেছে শিঙে, শ্লেটের টুকরো উড়ছে; এখন আর তিনি উইলসনকে দেখতে পেলেন না, ভালো ক'রে লক্ষ্য স্থির ক'রে আবার গুলি ছুঁড়লেন, মোষটার বিশাল শরীর যেন প্রায় তাঁর উপরে চ'লে এসেছে, তাঁর রাইফেল সেই অগ্রসরমান মাথাটার ঠিক সামনে, নাক কেটে গেছে, দেখতে পেলেন তার শয়তানের চোখ দু'টো, মাথাটা নিচের দিকে নামতে লাগলো, এবং ঠিক সেই সময় তিনি শ্বেত-উষ্ণ, চোখ-ঝলসানো বিস্ফোরণ অনুভব করলেন মাথার মধ্যে, এবং সেটাই তাঁর শেষ অনুভব।

কাঁধে গুলি করবার জন্য একপাশে স'রে গিয়েছিলো উইলসন। ম্যাকোম্বার ঠিক নাকে গুলি করবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রত্যেকটা গুলিই একটু উপরে লাগছিলো, এবং ভারি শিং-দু'টোতে আঘাত লেগে শ্লেটের ছাদ ভাঙার মতো শব্দ এবং টুকরো বেরুচ্ছিলো। শ্রীমতী ম্যাকোম্বার ব'সে

ছিলেন গাড়িতে—মোষটা ম্যাকোম্বারকে শেষ ক'রে দিচ্ছে মনে ক'রে ৬·৫ ম্যানলীচার দিয়ে মোষটার দিকে গুলি ছুঁড়েছিলেন, এবং সেই গুলি তাঁর স্বামীর মাথার খুলির দু-ইঞ্চি উপর দিয়ে ভেদ ক'রে যায়।

ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বার এখন মাটিতে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছেন—তাঁর দু' গজেরও কাছে প'ড়ে আছে সেই মহিষ, এবং তাঁর উপর হাঁটু গেড়ে বসেছেন তাঁর স্ত্রী—পাশে উইলসন।

'আমি কিন্তু এখন ওঁকে উপুড় করতে চাই না,' উইলসন বললো। মৃগীরোগীর মতো কাঁদছে স্ত্রীলোকটি।

'আমি একটু গাড়িতে যাবো,' উইলসন বললো, 'রাইফেলটা কোথায়?'

মাথা নাড়লেন তিনি, তাঁর মুখ কুঁচকে গেলো। একজন বন্দুকবাহক রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলে।

'ওটা যেখানে আছে, সেখানেই রেখে দাও,' উইলসন বললো। তারপর: 'যাও, আবদুল্লাকে ডেকে আনো—যাতে সে দুর্ঘটনার ধরনটা দেখে সাক্ষী হ'তে পারে।'

হাঁটু মুড়ে বসলো সে; পকেট থেকে একটা রুমাল বের ক'রে ফ্রান্সিস ম্যাকোম্বারের কোঁকড়ানো চুলভর্তি মাথার উপর ঢেকে দিলো। শুকনো, নরম মাটিতে রক্ত ব'সে যাচ্ছে।

উইলসন দাঁড়িয়ে পাশের মহিষটা দেখলো: পা ছড়ানো, স্বল্পরোম পেটটা একটু কাঁপছে। 'চমৎকার মোষটা,'—তার মস্তিষ্ক আপনা থেকেই ভেবে নিলো তৎক্ষণাৎ—'সুন্দর, পঞ্চাশ ইঞ্চি কি তারো বড়ো, আরো ভালো।' চালককে ডেকে ওটার উপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে পাহারা দিতে বললো সে। তারপর এলো মোটরগাড়িটার কাছে: সেখানে এক কোণে ব'সে কাঁদছে স্ত্রীলোকটি।

'একটা সুন্দর উপায় ছিলো,' স্বরহীন গলায় বললো উইলসন, 'ও হয়তো তোমাকে ছেড়ে যেতে পারতো।'

'চুপ করো,' তিনি বললেন।

'ভয় পাবার কিছু নেই। অপ্রীতিকর ব্যাপার হবে অবশ্য খানিকটা—তা ও-রকম তো অল্পবিস্তর হ'য়েই থাকে—কিন্তু আমি কতগুলো ছবি তুলিয়ে রাখবো, তদন্তের সময় সেগুলো কাজে লাগবে। তাছাড়া বন্দুকবাহক দু'জন

আর চালকটিকে সাক্ষী পাবে। কোনোই ভয় নেই তোমার।'

'চুপ করো,' তিনি বললেন।

'এখনো অনেক কিছু করতে হবে। আমাদের তিনজনকেই নাইরোবিতে নিয়ে যাবার জন্য একটা প্লেন পাঠাবার খবর দিয়ে তার করার জন্য লোক পাঠাতে হবে। তুমি ওকে বিষ খাওয়ালে না কেন? ইংল্যাণ্ডে তো সকলে তাই-ই করে।'

'চুপ করো, চুপ করো, চুপ করো,' রমণীটি কেঁদে উঠলেন।

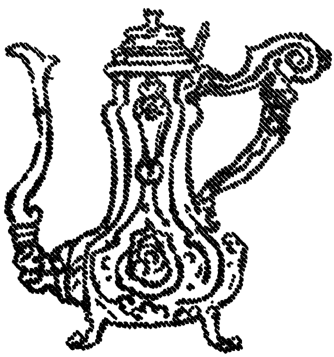
চওড়া নীল চোখে তাঁর দিকে তাকালো উইলসন।

'আমি এখন ঠিক আছি—একটু রেগে গিয়েছিলাম কেবল। তোমার স্বামীকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম আমি।'

'ওঃ! দয়া ক'রে চুপ ক'রো, দয়া ক'রে! দ য়া ক' রে চু প ক রো।'

'এটা মন্দ নয়,' উইলসন বললে, '"দয়া ক'রে" কথাটা অনেক ভালো। এবার আমি চুপ করলাম।'

অনুবাদ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়





নাশ্‌কা

বোরা স্ট্যান্‌কোভিচ

মাঝরাত্তিরে এক-এক দিন আমার ঘুম ভেঙে যেতো। দেখতাম, জ্যোৎস্না আমার মুখের উপরে এসে পড়েছে। বিস্ময়ে আমার সারা মন তখন ভ'রে উঠতো। বাগানের মধ্যে বিছানা পাতা। তার উপরে শুয়ে, অবাক হ'য়ে, আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হ'তো, আমি যেন আমার মায়ের পাশে শুয়ে আছি—হাত বাড়ালেই তাঁকে ছুঁতে পাবো।

গ্রীষ্মকালে আমরা ঘরের মধ্যে ঘুমোই না। বাগানে গিয়ে ঘুমোই। বাড়ির কথা তখন সবাই ভুলে যায়। রান্না করবার জন্য কি বিছানা-বালিশ নিয়ে আসবার জন্য এক-আধবার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হয়, এই পর্যন্ত। তা ছাড়া বাড়ির সঙ্গে তখন আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। গ্রীষ্মকালের এক-একটা সন্ধ্যা, আ, সে যে কী আরামের! উঠোনে জলের ছড়া দেয়া হয়েছে, মাদুর বালিশ আর কম্বল এনে একপাশে জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে। তারপর পরিপাটি ক'রে বিছানা করা হ'লো, আপনি গিয়ে তার উপরে গা ঢেলে দিলেন। সোঁদা-সোঁদা একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। ভারি মিঠে গন্ধ। মাটির গন্ধ। চারদিক নিস্তব্ধ। সামনে টালির ঘর।

তার ছাদের উপরে ছায়া পড়েছে। ছায়া প'ড়ে আরো-অন্ধকার দেখাচ্ছে। আকাশে ঠাণ্ডা গোল চাঁদ। নিশ্বাস নিতেও ভয়-ভয় করে। কাশতে ভয় করে। মনে হয়, এই শান্ত আবহাওয়া যেন সামান্য একটু শব্দ করলেই চমকে উঠবে। গায়ের উপরে কম্বলটাকে টেনে নিয়ে চুপটি ক'রে আপনি শুয়ে আছেন। চাদরটা নতুন কাচা হয়েছে। নতুন-কাচা চাদরে অদ্ভুত একটা গন্ধ থাকে। সেই গন্ধটা আপনার নাকে এসে লাগছে। কোথায় যেন ঝিঁঝি ডাকছে। টুপটাপ ক'রে পাতা ঝ'রে পড়ছে গাছপালা থেকে। পত্রপল্লবের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে আছে রাতজাগা কয়েকটা পাখি। মাঝে-মাঝে তারা উড়ে যাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে। কোথায় যেন জল পড়ছে ঝিরঝির। দূরে, নাচ-গান হচ্ছে জিগান বস্তিতে। শুয়ে-শুয়ে আপনি আবছা একটা বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছেন। এছাড়া, আর-কোথাও কোনো শব্দ নেই।

সেদিন রবিবার। আমাদের প্রতিবেশী ট্রাজ়কোর বড়ো ছেলের সেদিন বিয়ে। ট্রাজ়কোদের বাড়ি আমাদের বাড়ির ঠিক পাশেই। দু-বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান। বিয়েবাড়ি নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইসঙ্গে আছে ঢালাও খাওয়া-দাওয়া। বাবা আর মা গিয়েছেন নেমন্তন্ন রাখতে। দিনভর আমি ও-বাড়িতে ছিলাম। সন্ধ্যা-রাত্তিরে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। আমি একাই বাড়িতে আছি। আর আছে নাশ্‌কা, দূর সম্পর্কে আমার বোন হয়। আগের দিন মা তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। নাশ্‌কাকে আনা হয়েছে ঘর-বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। তা ছাড়া, আমাকেও সামলাতে হবে। মা-বাবা সারাদিন সারারাত বিয়েবাড়িতে থাকবেন, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য তাই একজন লোক দরকার। নাশ্‌কাই রান্না-বান্না করবে, আমাকে খাওয়াবে। ওদিকে বিয়েবাড়িতে সারাদিন ধ'রে নাচগান চলছে। নাশ্‌কার যদি ইচ্ছে হয়, পাঁচিলের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নাচ দেখতে পারে।

পাঁচিলটা নেহাত ছোটো নয়। নাশ্‌কা তাই তার নিচে গাদা-গাদা পাথর সাজিয়ে রেখেছে। পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে নাচ দেখবে সে। নাশ্‌কা যখন পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো, তখনো সন্ধ্যা হয় নি। আমিও তখন বিয়ে-বাড়িতে। তুমুল আনন্দ চারদিকে। সবে কোলো-নাচ জ'মে উঠেছে। আমিও নাচছি। ছেলেরা দেখলাম সকলেই আমার সঙ্গে নাচতে চায়।

আমার বয়স তখন খুবই কম। তখন বুঝি নি যে, আমাকে নিয়ে এত টানা-টানির উদ্দেশ্য আর-কিছুই নয়, আসলে সবাই খুশি করতে চাচ্ছে নাশ্‌কাকে। পাঁচিলের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে নাশ্‌কা। এধার থেকে তার মুখখানিকে শুধু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আর তার বুকের অল্প-একটু · পাঁচিলে বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। নাশ্‌কা অবশ্য বিশেষ ক'রে কাউকে দেখছে না। অথচ তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এদিকে হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে নাচবার জন্য যে এগিয়ে এলো, তার নাম গ্লাডেন। লম্বা চেহারা। লাল টকটকে মুখ। নাশ্‌কার কথা সে শুনেছিলো। তাকে দেখবার জন্যই গ্লাডেন আজ বিয়েবাড়িতে এসেছে। এত সব সুন্দরী মেয়ে থাকতে সে যে তার নাচের সঙ্গী হিশেবে আমার মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে বেছে নিলো, গ্লাডেন চাচ্ছিলো, নাশ্‌কা সেটা দেখুক। দেখে তুষ্ট হোক। ব্যাপারটা বোধ হয় নাশ্‌কা বুঝতে পেরেছিলো। বুঝতে পেরে মিটিমিটি হাসছিলো ও। কিন্তু সত্যি বলতে কি, গ্লাডেনের দিকে সে ভালো ক'রে তাকায় নি পর্যন্ত।

সন্ধ্যা-রাত্তিরে একরকম জোর ক'রেই আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। বিয়েবাড়ি থেকে চ'লে আসবার ইচ্ছে আমার একটুও ছিলো না। অত আলো, অত নাচ-গান, কে ও-সব ছেড়ে আসতে চায়। ভারি বিশ্রী লাগছিলো আমার। আমাকে বাড়িতে রেখে মা-বাবা আবার বিয়েবাড়িতে ফিরে গেলেন। নাশ্‌কা আমাকে খাবার এনে দিলো। খাবার আমি ছুঁলাম না পর্যন্ত। থালা থেকে বাদামগুলোকে তুলে নিয়ে নাশ্‌কার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। কিচ্ছু খাবো না আমি। কেন খাবো। নাশ্‌কা কিন্তু চ'টে গেলো না। উঠোনে জলের ছড়া দেয়া হ'য়ে গিয়েছে। ধীরে-সুস্থে সে গিয়ে বিছানা পাতলো। তারপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে বাটিতে ক'রে খাবার নিয়ে এলো।

আমার রাগ তখন প'ড়ে এসেছে। কিন্তু এত সুন্দর রাত্রি, কে এখন খাবার খাবে? চাঁদ উঠেছে। টালির ছাদের উপরে জ্যোৎস্না প'ড়ে ভারি শোভা খুলেছে। উঠোনটা অন্ধকার। সব-কিছুই যেন সেই অন্ধকারের মধ্যে গলা ডুবিয়ে ব'সে আছে। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। ন'ড়ে উঠছে গাছের পাতা। মনে হচ্ছে, অন্ধকারও যেন ন'ড়ে উঠবে। বিয়েবাড়িতে হট্টগোল কিন্তু একটুও কমে নি। এখন চলেছে খাওয়া-দাওয়ার পালা। মাঝে-মাঝেই

পেয়ালা, পিরিচ, চামচে আর কাঁটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে অল্প-একটু আলো এসে উঁকি দিচ্ছে এধারে। হলুদ আলো। কখনো বা ব্যাঙের মিঠে আওয়াজ। মিঠে, নরম। মনে হচ্ছিলো, গোটা পরিবেশটাই যেন নেশাতুর হ'য়ে উঠেছে।

'নাশ্‌কা, তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও।' অনেক কষ্টে কথাটা আমি বলতে পারলাম।

আলতো হাতে এক টুকরো রুটি তুলে নিলো নাশ্‌কা। নিয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে সেটাকে সাজিয়ে রাখতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো, কী যেন হয়েছে ওর। ভারি অস্থির হ'য়ে উঠেছে। বডিসের বোতামগুলোকে খুলছে আর বন্ধ করছে। খোঁপা খুলে চুলের রাশিকে কখনো পিঠের উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছে বা। আবার খোঁপা বাঁধছে।

'উঃ, কী ভীষণ গরম লাগছে!' নাশ্‌কা বললো। গলার স্বরে কেমন যেন উত্তেজনা আর বিরক্তি। শুনে আমি অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকালাম। এমনিতে নাশ্‌কা ভারি শান্ত মেয়ে। কখনো আমি ওকে উত্তেজিত অথবা বিরক্ত হ'তে দেখি নি। নাশ্‌কাকে যে আমি চিনি না, এমন তো নয়। মাঝে-মাঝেই ও আমাদের বাড়িতে দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। সারাক্ষণ ওর মুখে হাসি লেগে থাকতো। একে খেপাতো, ওকে নিয়ে রসিকতা করতো, কিংবা সবাইকে নিয়ে খেলতে বসতো—বাড়ির ছেলেমেয়ে আর অল্পবয়সী বউদের নিয়ে। খেলা সাধারণত শুরু হ'তো রাত্তিরের খাওয়ার পাট চুকে যাবার পর। বাবা রাত জাগতেন না। খাওয়া শেষ হ'লেই ঘুমুতে চ'লে যেতেন। মা কিন্তু আমাদের কাছে থাকতেন, গল্পগুজব করতেন। বাবা চ'লে যাবার পর আমরা গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিতাম; দরজায় কোনো ফোকর থাকলে সাবধানে সেটাকে বুঁজিয়ে দিতাম। তারপর শুরু হ'তো খেলা; কিংবা নাচ, আর গান। নাশ্‌কাই তার নেত্রী।

কত রকমের খেলাই যে হ'তো! কখনো-কখনো মেয়েরা গিয়ে পুরুষদের পোশাক পরতো। পরস্পরকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করতো। কুস্তি লড়তো, অথবা গাছের তলাকার লম্বা ঘাসের উপরে হুটোপাটি করতো। নাশ্‌কাই নেত্রী। তার পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে লম্বা কালো চুল। পাগলের মতো হাসছে, দৌড়ুচ্ছে, কপট ভয়ে কখনো চেঁচিয়ে উঠছে বা।

ভারি সুন্দর নাচতো নাশ্‌কা। আকাশে হাত ছুঁড়ে দিয়ে গান গাইতো।

গানের বিষয়বস্তু হ'লো, কে এক দস্যু একটি মেয়েকে তার ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে একদিন পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। গাইতে-গাইতে মস্ত বড়ো একটা পিরিচ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতো নাশ্‌কা। তারপর আঙুল দিয়ে সেই পিরিচের গায়ে টোকা মারতে-মারতে নাচ শুরু ক'রে দিতো। পিঠময় একরাশ এলোচুল, গাল দুটি রক্তাভ, সমস্ত শরীর যেন থরথর ক'রে কাঁপছে। এই হ'লো নাশ্‌কা।

আজ কিন্তু তাকে অন্যরকম লাগছিলো।

'কী হয়েছে তোমার নাশ্‌কা?' জিগেস করলাম। নাশ্‌কা এ-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। যেন নিজেকে আমার কাছ থেকে গোপন করতে চায়। সত্যিই কিছু-একটা হয়েছে। বারে-বারে নাশ্‌কা তার বডিসের বোতামগুলিকে খুলছে আর বন্ধ করছে, রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া করছে নিজেকে, ব্লাউসের হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে বারবার। যে-নাশ্‌কাকে আমি চিনি, আজকের এই মেয়েটির সঙ্গে তার কোনোখানেই কোনো মিল নেই। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে ওকে। জ্যোৎস্না ততক্ষণে উঠোনে এসে পড়েছে। একপাশে খাবারের থালা। বলতে গেলে সে-খাবার আমরা ছুঁই নি পর্যন্ত। চারপাশে দেয়ালের আর গাছের ছায়া নিবিড় হ'য়ে আছে।

বাজনার তাল হঠাৎ দ্রুত হ'য়ে উঠলো বিয়েবাড়িতে। মাঝে-মাঝেই কারা যেন সশব্দে হেসে উঠছে। আর নয়তো কাউকে কিছু বলছে চেঁচিয়ে। নাশ্‌কা যেন হঠাৎ আরো অস্থির হ'য়ে উঠলো। "আ—" মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর। তারপরেই ও উঠে দাঁড়ালো। অস্থির হ'য়ে পায়চারি করলো কিছুক্ষণ। তারপর, হঠাৎ, সামনে ঝুঁকে প'ড়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। বলতে গেলে একরকম জোর ক'রেই আমাকে সেই পাঁচিলের ধারে নিয়ে গেলো।

'বিয়েবাড়িতে কী হচ্ছে, চল, দেখা যাক।'

আপেল গাছের ধারে পাঁচিলের যে-জায়গাটা সবচাইতে অন্ধকার, সেইখানে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। আমাকে ধ'রে পাঁচিলের উপরে তুলে দিলো নাশ্‌কা, নিজে কিন্তু অন্ধকারে মিশে রইলো।

আপেল গাছের গুঁড়িতে পা ঠেকিয়ে দেয়ালের উপরে ঝুঁকে আছে নাশ্‌কা। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আছে। বিয়েবাড়ির উঠোন আলোয়-আলো। উৎসবের মত্ততা তখনো কিছুমাত্র কমে নি। ভরপেট মদ খেয়ে অনেকে

বাগানের উপর শুয়ে আছে। বর-কনে এসে মাঝে-মাঝে তাদের এটা-ওটা খাবার দিয়ে যাচ্ছে। নাশপাতি গাছের ডাল থেকে ঝুলছে জোরালো একটা লণ্ঠন, সেই একটা লণ্ঠনেই আলোয়-আলো হ'য়ে আছে সারা উঠোন।

বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা কুয়ো। কুয়োর পাশে ধুলোর উপর জল জ'মে আছে। তার উপরে আলো প'ড়ে চকচক করছে। কয়েক মিনিট পর-পর বাড়ির ভিতর থেকে থালা-বোঝাই খাবার আর পিপে-ভরা মদ নিয়ে আসা হচ্ছে। উঠোনের একপাশে অন্ধকার। সেখানে ব'সে আছে জনকয়েক বেদে পুরুষ আর মেয়ে। কী যেন গান গাইছে তারা। গানের সুরটা ভারি করুণ। শাবান-বেদে নাম-করা গাইয়ে। তার সঙ্গীরা তাই তাকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। জোড়াসন হ'য়ে ব'সে আছে শাবান। গান গাইছে। কখনো চড়ায় উঠছে, কখনো খাদে নেমে যাচ্ছে তার গলা। যেমন মোহময় এই রাত্রি, তেমনি মোহময় তার সুর। একটু বাদে দেখলাম, সবাই মিলে তার সঙ্গে গাইতে শুরু করলো। কেউ বা গুনগুন গলায়, কেউ জোরে। গোটা পরিবেশটাই যেন হঠাৎ মাতাল হ'য়ে গিয়েছে।

কে একজন বুড়ো এই সময়ে সামনে এগিয়ে এলো, এসে বললো, 'ওহে শাবান, পুরোনো আমলের একখানা গান গাও দেখি। বেশ করুণ দেখে একখানা।'

আবার বেজে উঠলো বেদেদের বাজনা। মেয়েরা এতক্ষণ বোধহয় এরই প্রতীক্ষায় ছিলো: বাজনা শুরু হ'তেই বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো তারা। সামনে এসে ঝুঁকে পড়লো। তারপর এক সময় দেখি বাজনার তালে-তালে নাচ শুরু হ'য়ে গিয়েছে। কোলো-নাচ। মেয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছে। একাই নাচছে কেউ-কেউ। সঙ্গী জুটিয়ে নিতে পারে নি। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। যাতে পদক্ষেপের ছন্দে কোনো ভুল না হয়। ধীর মন্থর নাচ। কিন্তু দেখেই বোঝা যায়, তার মধ্যে শক্তির অভাব নেই। শক্তি যেন সংহত হ'য়ে আছে।

'আঃ, মাইল, কী সৌভাগ্য তোমার।'

গলা শুনে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি ম্লাডেন। অন্ধকারের ভিতর থেকে একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় টকটক করছে তার মুখ, তার উপরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। আমাকে উদ্দেশ ক'রেই ম্লাডেন কথা বলছিলো বটে, কিন্তু তার আসল লক্ষ্য যে কে, নাশ্‌কার তা বুঝতে কোনো ভুল হয় নি। নাশ্‌কা কিন্তু কিছু বললো না। শুধু

দেখলাম যে, সে আরো জোরে আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। যেন গ্লাডেনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে চায়। গ্লাডেন তার ব্যাগ খুলে আমার দিকে একটা দিনার এগিয়ে দিলো। বললে, 'নাও, মাইল, তোমাকে দিলাম।' ব'লে সে সেই দিনারটাকে আমার কোটের পকেটে ফেলে দিলো। দেখলাম, দিনারটাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে নাশ্‌কার হাতখানাকে ছুঁয়ে দিয়েছে।

'না, না, মাইল, ও-পয়সা নিসনে তুই, নিসনে।' কেমন যেন বিপন্ন, ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো নাশ্‌কা।

নাশ্‌কার দিকে ফিরে তাকালাম। সে তখন নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হাঁটু দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে তার। মনে হ'লো, অনেক কষ্টে সে দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি যেন প'ড়ে যেতে পারে। গ্লাডেন তখনো তার হাত চেপে ধ'রে আছে। আর সেই হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে নাশ্‌কা। ওদিকে বেদেরা তখনো সমানে গান গেয়ে চলেছে। নতুন ক'রে আবার নাচের পালা শুরু হয়েছে। কিন্তু গ্লাডেন যে নাশ্‌কার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেবে, এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে নাশ্‌কা তার হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিলো। অস্ফুট-গলায় বললে, 'চল, মাইল, আমরা যাই।'

পাঁচিলের উপর থেকে আমাকে নিচে নামিয়ে নিলো নাশ্‌কা। তারপর আবার আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। আমরা তখন পাঁচিলের নিচের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি। নাশ্‌কার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলাম আমি। কেমন যেন রাঙা টকটকে হ'য়ে উঠেছে তার মুখ। তপ্ত ঘর্মাক্ত। আমারও শরীর তখন ঘেমে উঠেছে। দু'হাত দিয়ে নাশ্‌কার গলা জড়িয়ে ধ'রে আছি, আর সে তার তপ্ত, স্বেদাক্ত ঠোঁট দু'টি আমার কপালের উপর চেপে ধরেছে। আমি অনুভব করতে পারছিলাম তার তপ্ত, পৃথুল, কঠিন বুকের স্পর্শও। তার শরীরের উত্তাপে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমারও সর্বাঙ্গে যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো।

'না, না, শুনিসনে ওর কথা। ও পাগল, ও বদ্ধ পাগল!'

বলছে, আর একটু-একটু ক'রে পাঁচিলের কাছ থেকে স'রে আসছে নাশ্‌কা। মনে হচ্ছিলো, কেউ যেন তাকে জাদু করেছে। কী যে সে বলছে, তার অর্থ যে কী, তা হয়তো সে নিজেই জানে না।

হঠাৎ দেখি, পাঁচিলের উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে গ্লাডেন। যেন এখুনি পাঁচিল টপকে এধারে লাফিয়ে পড়বে। দেখে নাশ্‌কা যেন ভয় পেয়ে গেলো। দৌড়ে যে বাড়ির ভিতর পালিয়ে যাবে, এমন শক্তি যেন তার নেই। কী করবে বুঝতে না-পেরে আমাকে আরো শক্ত ক'রে তার বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর এক-পা এক-পা ক'রে পিছু হঠতে লাগলো নাশ্‌কা। চারদিকে ডালপালা। সেই ডালপালা তার গায়ে লাগছে, আর সে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাগানের ছায়া-ছায়া অন্ধকার, রাত্রির কুয়াশা, সব কিছুই যেন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে সে বাগানের সীমানা পার হ'য়ে এলো। আর মনে হ'লো, এতক্ষণ যেন কেউ তাকে জাদু ক'রে রেখেছিলো, জাদুর প্রভাবটা এইবারে কেটে গেলো। আঙুল দিয়ে সে কপালটা টিপে ধ'রে রইলো খানিকক্ষণ। রুমাল ঘুরিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে লাগলো। কুয়ো থেকে জল তুলে চোখমুখ একবার ভালো ক'রে ধুয়ে নিলো। তারপর দেখি উঠোনে গিয়ে আবার জলের ছড়া দিচ্ছে।

এতক্ষণে যেন নাশ্‌কা আবার সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে তার চোখ দু'টি। একটু আগে চোখেমুখে জল দিয়েছে। সেই জল তার চুলেও লেগে থাকবে। ভিজে চুল তার গালের উপরে লেপটে রয়েছে।

ওদিকে বিয়েবাড়িতে তখনো কোলো-নাচ চলছে। পর-পর কয়েকবার বন্দুকও ছোঁড়া হ'লো। তারপর আবার শুরু হ'লো গান। গানের লয় এবারে অনেক বেশি দ্রুত। কে যেন ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সবাই গাইছে, 'য়োভান, তোমায় দেখেছিলাম…'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো নাশ্‌কা। হাত বাড়িয়ে বড়ো একটা থালা তুলে নিয়ে সে নাচতে শুরু করলো। তার সেই নাচ আমার চিরকাল মনে থাকবে। কেউ কোনোখানে নেই, একা আমি তার দর্শক। নাচের ছন্দে তার সমস্ত শরীরের উপরে দিয়ে যেন ভারি সুন্দর, ভারি মধুর একটি তরঙ্গ ব'য়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে মৃদু গলায় সে গান গাইছে। কী মিষ্টি তার গলা!

আপন মনে নেচে চলেছে নাশ্‌কা। কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে কালো এক ঢাল চুল, হাওয়ায় ফুলে উঠছে তার কাপড়। বডিসের বোতাম খুলে গিয়েছে, তার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে তার মর্মর-ধবল দু'টি স্তন। বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে ভিজে, কালো

চুলের রাশি। জ্যোৎস্নার আলোয় দৃশ্যটাকে কেমন যেন অপার্থিব বলে মনে হ'লো। কোনোদিকেই খেয়াল নেই নাশ্‌কার। কী এক আনন্দে তন্ময় হ'য়ে সে নেচে চলেছে। চকচক করছে তার চোখদু'টি। গানের তালে-তালে হিল্লোলিত হ'য়ে উঠছে তার শরীর। দেখতে-দেখতে মনে হ'লো, যেন আমার মস্তিষ্কে গিয়ে প্রবেশ ক'রে ফুলে ফেঁপে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে চাঁদের আলো। মনে হ'লো যেন জ্যোৎস্নার এক অনন্ত সমুদ্রে আমি ভেসে চলেছি। মাথা ঘুরছে আমার। আর শুনছি সেই গান : 'য়োভান, তোমায় দেখেছিলাম…'

নাচতে নাচতে এক-একবার সমস্ত শরীরটাকে পিছনদিকে অসম্ভবরকম ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে নাশ্‌কা। তখন মাটিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে তার কালো এলোচুল। জামার ফিতে তার কাঁধের থেকে খ'সে গিয়ে স্তনের উপরে এসে পড়েছে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে তার হাতের থালাটা। তার উপরে সজোরে একবার আঘাত হানলো নাশ্‌কা। তারপর মৃদু গলায় গেয়ে উঠলো :

'য়োভান, তোমায় দেখেছিলাম '

গানের মধ্যে যেন ডুবে গিয়েছে নাশ্‌কা। মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে আছে। ঠোঁট দুটি বিস্ফারিত। যেন এই মোহময়ী রাত্রি, এই জ্যোৎস্না, এই অপূর্ব সুরলহরী— সমস্ত কিছুকেই সে নিঃশেষে পান ক'রে নেবে।

সেই আশ্চর্য নাচও এক সময়ে শেষ হ'লো; যেন বেহুঁশ হ'য়ে গিয়েছিলো, এতক্ষণে আবার সংবিৎ ফিরে পেলো : দ্রুত হাতে বিছানাটাকে ঠিক ক'রে নিয়ে তার উপরে লুটিয়ে পড়লো নাশ্‌কা। কোলের মধ্যে টেনে নিলে আমাকে। তার দুই স্তনের মধ্যে চেপে ধরলো আমার মাথাটা।

'ঘুমো, মাইল, ঘুমো।' সান্ত্বনার গলায় সে বলতে পারলো কোনোরকমে; কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আজ সারা রাত তার আর ঘুম হবে না। বুঝতে পারছিলাম যে অসম্ভব দ্রুত তার নিশ্বাস পড়ছে, আর থরথর ক'রে কাঁপছে তার সারা শরীর।

অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী